সৃষ্টি যাঁর বিধান তাঁর

আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলাম

(বিশ্বরাজনীতির ব্যবস্থাপত্র)

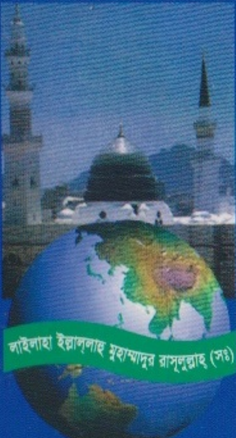

বিশ্বরাজনীতির সমাধান পর্ব- ১

মুক্তির সনদ সিরিজ- ২

শাহ্ মিঞা মুজিবুর রহমান বাগদাদী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলাম

শাহ্ মিঞা মুজিবুর রহমান বাগদাদী

সম্পাদনায়

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

সহযোগিতায়

জোহরা বেগম

মনিরা সুলতানা (স্বপ্না)

আবু সাদাৎ মো: মুরাদুল্লাহ (পরাগ)

আবু সাদাৎ মো: মাসুম বিল্লাহ (সোহাগ)

আবু সাদাৎ মো: হাসানুল বান্নাহ (সাগর)

গ্লোবাল পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক	ঃ	গ্লোবাল পাবলিশার্স ৪৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ৭ম তলা, ঢাকা-১০০০।
প্রথম প্রকাশ	ঃ	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
স্বত্বাধিকারী	ঃ	লেখক
প্রচ্ছদ	ঃ	কালার ক্যামপাস
কম্পিউটার কম্পোজ	ঃ	মোঃ মোনাব্বর হোসেন (বাদল) ডায়ালকম কম্পিউটার ১৯২, ব্লক-সি, বাকুশাহ মার্কেট নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫। মোবাঃ ০১৭১০-৬৪৫৩৯৮
মুদ্রণ	ঃ	মানিকগঞ্জ প্রিন্টিং প্রেস ২৯/১, রূপচাঁন লেন, প্যারীদাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০। মোবাঃ ০১৭২৬-৩৪৮৮৬৩
মূল্য	ঃ	পাঁচশত টাকা

Adarsha Rashtro O Bishwa Babosthay Islam
Shah Mia Mojibur Rahman **Bagdadi**
Global Publishars
44, Dilkusha C/A, Dhaka- 1000.
Price: Tk. 500.00 Only
US $: 20
ISBN: 984-300-000846-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পিতা - মরহুম মাওলানা গোলাম আহমদ মিয়া
মাতা - মরহুমা জামিলা খাতুন
যাঁদের ভালোবাসায় আজ আমি পৃথিবীতে
তাঁদের স্মরণে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

শাশ্বত সত্যকথা জিনিস যিনি বানান তিনিই এর ব্যবহারবিধি প্রদান করেন। তৎপ্রণীত ব্যবহারবিধি তৎ-অনুমোদিত গাইড লাইন অনুসারেই এ বিষয়ের ব্যবহার নির্ধারিত। এর বাইরে গেলে তার ব্যবহার অসম্ভব হবে তা-ই নয় অধিকন্তু নিজের ও অন্যের জন্যেও তা উপকারী না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে একটি গাড়ি যদি তার নির্মাতা প্রদত্ত গাইড বুক অনুসরণ না করে চালনা করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে সেই গাড়ি এক্সিডেন্টের সম্মুখীন হবে এবং চালক ও যাত্রী উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এমনকি এতোদুভয়ের বাইরে পথচারীকে এর দুর্ভোগের ভাগী হতে হবে। সর্বোতভাবে নির্মাতা প্রদত্ত গাইডবুক অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সকলের সার্বিক কল্যাণ। একমাত্র নির্মাতাই মূলত জানেন এই গাড়ির ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সঠিক-বেঠিক হওয়ার সকল পন্থা ও পদ্ধতি।

আমরা জানি এই মানুষ এবং সকল সৃষ্টি এমনি এমনি এই দুনিয়াতে এসে পড়েনি। এসব কিছুই রয়েছে প্রজ্ঞাময় আলীমু ও খাবির এক সৃষ্টিকর্তা যিনি সুমহান। সব ধরনের দুর্বলতা, ক্ষতি এবং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে পবিত্র, সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে, ভূত ভবিষ্যৎ, একাল সেকাল ত্রিকাল যার দর্পণে, সব ক্ষেত্রে যিনি প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। সৃষ্টি করার পর তিনি সব কিছুর জন্যই নির্ধারণ করে দিয়েছেন চলার নির্দিষ্ট পন্থা, আবর্তন কক্ষপথ। এর বাইরে এক চুলও এধার ওধার যাওয়ার, একে অতিক্রম করার শক্তি কারো নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা নিজে এই অপূর্ব সম্ভাবনাময় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকেও কিছু জৈবিক বিধি-বিধানের অধীন করে দিয়েছেন। এর বাইরে যাওয়ার তার কোন সুযোগ নেই, শক্তিও নেই। জন্ম, পালন, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিন্দ্রা, তন্দ্রা, আরাম, বিশ্বাস এসব কিছু এই বিষয়ের অন্তর্গত। ইসলামের পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় তাকবিয়াত বা সৃজনধর্ম। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাওআন ওয়াকারহান সমগ্র সৃষ্টিকেই এ বিধান মেনে চলতে হয় অন্যসব সৃষ্টির মত। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে এখতিয়ার বা স্বেচ্ছা নির্বাসন নামে আরেক মহান শক্তি দিয়েছেন। ফলে তা স্বাধীনভাবে চলা বলা ও করার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রাণী বা সৃষ্টির এই অধিকার নেই। এক্ষেত্রে মানুষ কোন কিছু গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে নৈতিকতার মত বাধ্যগত নয়। তার স্বাধীনতা আছে যে কোন একটিকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে গ্রহণ বর্জন করার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ভাল-

www.pathagar.com

মন্দ, লাভ-ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তার স্বাধীন ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। মানব জাতির স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য খোদা প্রদত্ত নবুয়ত বা রেসালাতের মাধ্যমে ওয়াহিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হবে। সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী যেমন মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ম বিধান দ্বারা পরিচালিত, তেমন স্বাধীন ইচছা শক্তি সম্পন্ন মানব জাতি ও ওয়াহির মাধ্যমে নবী রাছুলগণের খোদা প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমেই কল্যাণ পেতে পারে, তা তিনি মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর বিপরীতে মানব কুলের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলে বিপর্যয় অনিবার্য। ওয়াহিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলে ইহকালের কল্যাণ ও পারলৌকিক পুরস্কার প্রাপ্ত হবে আর মানব জাতির নিজস্ব সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলে ইহকালীন অকল্যাণ পদে পদে বিপদ ও বিপর্যয় ঘটবে এবং ওয়াহিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালনার পদ্ধতি মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্বে এসেছে ছাহিফা বা (পুস্তিকা) আকারে, শেষে এসেছে ৪ চারটি মহাগ্রন্থ তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও ফোরকান বা কোরআন মজিদ। রোজ কেয়ামাত পর্যন্ত মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য পরম দয়াময় মেহেরবান মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে মহাবিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে পাঠিয়েছেন মানব জাতির জন্য। তা অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ এবং মুক্তি নিহিত। আজ পর্যন্ত সেই পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআন মজিদের জীবন বিধানকে যারা আকড়ে ধরে আছেন তারা রয়েছেন ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ এবং শান্তির পক্ষে আর যারা মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা রচিত মতবাদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, বাজার অর্থনীতি, ধোকাবাজি, রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছেন তারা নিজেরা এবং বিশ্ববাসীকে মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তাদের এইসব ভ্রান্ত মতবাদের কারণে ভ্রান্ত পথের যাত্রীরা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীব্যাপী মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ, খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, জাতি নির্মূল জনপদের পর জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মানব সৃষ্ট মতবাদের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য শাহ মুজিব লিখেছেন বক্ষমান বইটি। অত্র বইটির সব বিষয়ের সাথে সব পাঠক একমত নাও হতে পারেন। তবে বইটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও

www.pathagar.com

উপস্থাপনের ধরন ও ধারাবাহিকতা, বক্তব্যের নির্ভীকতা মানব জাতির সমস্যা সমূহ উপলব্ধি করে ব্যবস্থাপত্র প্রদানের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রায়শ খন্ডন করা যায় না। বইটি পাঠক প্রিয়তা পাবে সন্দেহ নেই।

অত্র বইতে মানব জাতির কল্যাণে যে ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়েছে তাতে এখানে লেখা হয়েছে সংঘাতময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলন। এরপর লেখা হয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামত। এরপর লেখা হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে। এরপর উল্লিখিত মহান সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামত, ইসলামের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এরপর লেখা হয়েছে মানব জাতিকে সত্যিকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কি কি কাজ করা উচিত সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নির্দেশনামূলক বক্তব্য। যার মাধ্যমে মানব জাতি মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকারের খাঁটি মানুষ হতে পারে এবং মহান আল্লাহ্ পাকের সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চড়াই -উৎরাই পার হয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যেতে পারে। একজন মুসলমান কত নির্ভীক, কত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সারা জীবন সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে। ইহকাল এবং পরকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই অর্জনের মাধ্যমে সফল মানুষ হতে পারে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার মানুষ সৃষ্টির স্বার্থকতা অর্জন করতে পারে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যায় অত্যাচারীদের সাথে যুদ্ধে জয় এবং পরাজয়ে সব ক্ষেত্রেই মুসলিম বীর মুজাহিদগণের জেহাদে শাহাদাত বরণ এবং বিজয়ী হলে গাজী সব ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ সফলতা পায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ঈমান ও আনুগত্য সম্বন্ধে তারপর লেখা হয়েছে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রাসূল (সঃ)-এর আগমন বাণী সম্পর্কে। ঈমানের জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য, যে বিষয় মুসলমানদের খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এরপর লেখা হয়েছে কালেমায়ে তৈয়্যেবায় মুসলিম উম্মাহ যে নেয়ামত পাবেন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা কি? এই বিষয়ের উপর কোরআন মজিদের আলোকে প্রামাণ্য দলিলসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ইবাদাতের মৌলিক অর্থ যাকাতের মৌলিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কোরআন মজিদের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জিহাদের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন মজিদের আলোকে ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

করা হয়েছে। ইজমার রাজনৈতিক ভূমিকা, ইসলামী আইনে মানবিক অবদান, ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে খুৎবার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ভূমিকা সম্পর্কে। ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান সম্পর্কে। মানব জাতির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শের সফল প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে দিকনির্দেশ রয়েছে।

এরপর আলোচিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার প্রতিকার, ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদের পাপের ফল ঝরে পড়ার অপেক্ষা। এরপর আলোচিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দী হবে মানব জাতির শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, কল্যাণ ও গৌরবের। উপস্থাপিত হয়েছে ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রণকৌশল। সর্বশেষে দিগভ্রান্ত মানব জাতির দায়িত্বশীল প্রজ্ঞাবান নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্রের উদাহরণ সম্বলিত বাস্তবতার নিরিখে আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটির আদ্যপান্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এই অধমের। বইটি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি ব্যস্ততার কারণে প্রথম সংস্করণে ভুল থাকা স্বাভাবিক। বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দ ভুলগুলো জানিয়ে দিলে দ্বিতীয় সংস্করণে তা শুধরে দেওয়া হবে।

আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের আরজ

মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কোরআন মজিদের আলোকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম মানব জাতির সার্বিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিতে সক্ষম, আজকের দিনের ঝনঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থাই কেবল একমাত্র সমাধান হতে পারে এই আলোকেই আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলাম বইটি লেখা হয়েছে। মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে মহাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মহান সৃষ্টিকর্তা কোরআন মজিদে মানব জাতির যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়েছেন শুধুমাত্র তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সর্বশেষ বিশ্ব বাস্তবতার আলোকে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগীর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের মত এবং অংক শাস্ত্রের হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি গ্রহণ করে সর্বাধুনিক বিশ্ব রাজনীতির ব্যবস্থাপত্র তৈরি করা হয়েছে। অত্র ব্যবস্থা থেকে মানব জাতি উপকৃত হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন তার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপাতা

বিবরণ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: সংঘাতময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলন	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ	১৫
তৃতীয় অধ্যায়	: অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রাসূলের আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী	১১৫
চতুর্থ অধ্যায়	: ঈমানের জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য	১২৪
পঞ্চম অধ্যায়	: যে বিষয়ে মুসলমানদের খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে	১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়	: কালেমা তাইয়্যেবায় মুসলিম উম্মাহ্ যে নেয়ামত পাবেন	১৩৮
সপ্তম অধ্যায়	: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা	১৬২
অষ্টম অধ্যায়	: ইবাদাতের মৌলিক অর্থ	১৭২
নবম অধ্যায়	: যাকাতের মৌলিক শিক্ষা	২৩৩
দশম অধ্যায়	: হজ্জের মৌলিক শিক্ষা	২৬৭
একাদশ অধ্যায়	: ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা	২৯৯
দ্বাদশ অধ্যায়	: জিহাদের মৌলিক শিক্ষা	৩০৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব	৩৫২
চতুর্দশ অধ্যায়	: রাসূলের মর্যাদা	৩৫৮
পঞ্চদশ অধ্যায়	: উর্ধ্বতন আইন	৩৫৯
ষোড়শ অধ্যায়	: খেলাফত	৩৬০
সপ্তদশ অধ্যায়	: ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংজ্ঞা	৩৯০
অষ্টাদশ অধ্যায়	: ইজমার রাজনৈতিক ভূমিকা	৪০৫
উনবিংশ অধ্যায়	: ইসলামী আইনে মানবিক অবদান	৪১২
বিংশ অধ্যায়	: ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা	৪১৪
একবিংশ অধ্যায়	: ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে খুৎবার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ভূমিকা	৪২২
দ্বাবিংশ অধ্যায়	: ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবদান	৪২৫

www.pathagar.com

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়: বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪৩৭
চতুর্বিংশ অধ্যায়: ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শের সপল প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	৪৪৩
পঞ্চবিংশ অধ্যায়: মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার প্রতিকার	৪৪৫
ষড়বিংশ অধ্যায়: ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদের পাপের ফল ঝড়ে পড়ার অপেক্ষায়	৪৫২
সপ্তবিংশ অধ্যায়: একবিংশ শতাব্দী হবে মানব জাতির শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, কল্যাণ ও গৌরবের	৪৫৪
অষ্টবিংশ অধ্যায়: ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রণকৌশল	৪৫৯
ঊনত্রিংশ অধ্যায়: আত্মসংশোধন ও নাফসের সাথে সংগ্রাম	৪৬৩
ত্রিংশতি অধ্যায়: আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ	৫১৮
গ্রন্থপঞ্জি	৫২৪

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সংঘাতময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলন

বর্তমান সংঘাতময় পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত যৌক্তিক, অপরিহার্য এবং অনস্বীকার্য। কারণ বর্তমান বিশ্বে যান্ত্রিক সভ্যতা এবং তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় এবং বিস্ময়কর উন্নতির ফলে পৃথিবীর মানুষ বিশ্বকে হাতের মুঠায় পেয়েছে। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের জীবন অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দের হয়েছে। মানুষের জীবনের সবগুলো দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হয়েছে। রোগব্যাধি জরাজীর্ণ দূরীভূত করার জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। মরণ রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হয়েছে। মানুষের গড় আয়ুবৃদ্ধির জন্য একবিংশ শতাব্দীর প্রচেষ্টায় আরো অভূতপূর্ব উন্নতি সুসংবাদ আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ববাসী শুনতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন কল্যানমূলক আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মানব জাতির যে কোন অঞ্চলের মানুষ বা জাতি গোষ্ঠীর অসুবিধা হলে সাথে সাথে সহৃদয় বিশ্ববাসী সেই জাতি গোষ্ঠীর এমন কি ব্যক্তির পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সহযোগিতা, সহমর্মীতা ও ভ্রাতৃত্বের হাত প্রসারিত করছে। এক মানুষ, আর এক মানুষের ভাই এক মানুষ আর এক মানুষের অতি আপন তা বিশ্বের সচেতন মানুষ প্রমান করছে। পৃথিবীটা এখন একটি গ্রামে পরিনত হয়েছে। গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা এবং বাজার অর্থনীতির আদর্শের কথা শুনে বিশ্ববাসী আজ আশান্বিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজ আর বাজার অর্থনীতির যারা প্রবক্তা আর বর্তমানে যারা বিশ্ব পরিচালক সেই ইহুদীবাদীরা এবং সাম্রাজ্যবাদীরা এই বক্তব্য আর কাজের মাঝে মারাত্মক সুভংকরের ফাকির ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই আদর্শ এই ধারণা শুধু মাত্র উপরে, আর কাগজে কলমে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের কাজ তারা করে যাচ্ছে। সমস্যা এখানেই। বিশ্ববাসীর এত অর্জন, মানব জাতির এত সম্ভাবনা, বিজ্ঞানের চরম উন্নতি, আর তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর সফলতার সব সুযোগ সুবিধা ইহুদীবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ববাসীকে ধোকা দিয়ে বঞ্চিত

www.pathagar.com

রেখে শুধু মাত্র নিজেরাই এসবের সুফল ভোগ করতে চাইছে। সমস্যা এখানেই। আর এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। পৃথিবীতে এই সমস্যার সমাধান আর কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থাপত্র বা আদর্শ একমাত্র মুসলমানদের কাছেই রয়েছে। তা জিব্রাইলের মারফত, হযরত মুহাম্মদ (স) এর কাছে আল্লাহপাক পাঠিয়েছিলেন। এখন তা মুসলিম জাতির কাছে রয়েছে, আর তা অন্য কিছু নয়। তা হচ্ছে মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ, মানব জাতির কল্যাণের জন্য দান করা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন। শুধুমাত্র আল কোরআনই পারে বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধন করতে, আর কেউ তা পারবে না, আর ইসলাম তা পারবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক কারণে।

এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ধরা যাক একটি গাড়ি জাপান থেকে ইমপোর্ট করে আনা হয়েছে। সেই গাড়ির সাথে একটি গাইড বুকও জাপান থেকে আনা হয়েছে। গাইড বুক অনুসরণ না করে একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি ঐ গাড়ি সেট করে চালানোর চেষ্টা করে, তাহলে ঐ গাড়িটি কি চালানো সম্ভব? এক কথায় বলা যায় সম্ভব নয়। কারণ গাড়িটি যিনি যে কারখানায় তৈরি করেছেন তিনিই জানেন কোথায় কোন পার্টস সেট করতে হবে (আর সেই নির্দেশনা গাইড বুকে দেওয়া থাকে)। সেই গাইড বুক ছাড়া গাড়িটি সেট করলে আসলেই চলার কথা নয়। মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জুড়ে তাই রয়েছে। গাইড বুক ছাড়া সেট করে গাড়ি চালানো ঝুঁকি আর বিপর্যয়। তবুও মানব জাতির শিক্ষার শেষ নেই। যুগে যুগে গাইড বুক দিয়ে সৃষ্টিকর্তা তার প্রেরিত পুরুষদের পাঠিয়েছেন। সেই গাইড বুক অনুসরণ করে মানুষ যতদিন চলেছে, ততোদিন সুন্দর সুশৃংখলভাবে সুখে-শান্তিতে চলতে পেরেছে। আর যখন শয়তানের প্ররোচনায় গাইড বুক বর্জন করে চলা শুরু করেছে, তখন পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন, বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

আজ পৃথিবীর মানুষ সেই ধরনের একটি চরম বিপর্যয় কাল অতিক্রম করছে। আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে অনেক কিছু আছে তথাপি মানুষ সুখী হতে পারছে না। সবকিছু থাকতেও যেন কিছু নেই এ এমন একটি অবস্থা।

এ এমন একটি অবস্থা যেন তরকারী রান্না করার জন্য সব উপায় উপাদান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ, অথবা আগুন নেই যা দিয়ে পাক করা যাবে এবং খেয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া যাবে। সব কিছু থাকতেও না খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণের ব্যবস্থা করা যাচেছ না। না খাওয়ার কষ্টে দিন যাপন করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

মানুষের হাতে কি নেই? সব কিছুই আছে। যেসব হলে মানুষ সুখি হতে পারে। সব উপায় উপদান উপস্থিত শুধুমাত্র আদর্শ নেই। আদর্শের পুস্তকও আছে শুধু তার বাস্তবায়ন নেই। বাস্তবায়ন হলেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। বিশ্বটি একটি ভূস্বর্গে পরিণত হওয়া সম্ভব। ইসলামের মাহাত্ম খুব কম সংখ্যক লোকই বুঝতে পেরেছে। ইসলাম যত বড়, ইসলাম বুঝতে গেলে ততো বড় হতে হয়। নিজে ছোট থেকে বড় ইসলামকে বোঝা যায় না। ছোট মানুষ বড় জাতি যেমন হয় না, বড় জাতি এবং উন্নত জাতি গঠনে বড় মানুষ উন্নত মানুষ গড়ে তুলতে হয়। তেমনি ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের মহান আদর্শ ধারণ করে বড় মানুষ বা মুসলিম হওয়া দরকার। বড় ধর্ম ছোট মুসলমান তা কখনও হয় না।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতি ইহুদীবাদী চক্রান্তের স্বীকার। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত কঠিন ষড়যন্ত্র চলছে যে ঈমানদার মুসলিম মুজাহিদরাও ষড়যন্ত্র বুঝে উঠতে না পেরে ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মহামূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেও ফল পাচেছ না।

যেমন রান্না করার জন্য রান্নার মালামাল হাঁড়ির মধ্যে ঢালতে হবে তারপর তা জ্বাল দিয়ে রান্না করতে হবে। কিন্তু রান্নার মালামাল বা উপায় উপাদান যদি ড্রেনের মধ্যে ঢেলে তারপর খালি হাঁড়ি চুলায় দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয় তাহলে কি খাবার রান্না হবে? তা যুক্তিযুক্ত কারণেই হতে পারে না।

বর্তমান মুসলমানরা জীবন দিয়ে যদি ইহুদীবাদী মূল ষড়যন্ত্রকারীদের ধ্বংস করতে পারতো তাহলে মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারতো। তারা শিয়া মুসলমান সুন্নি মুসলমানদের হত্যা করছে এবং সুন্নি মুসলমান শিয়া মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। আর এই ভাবে এক মুসলমান ভাই আর এক মুসলমান ভাইদের হত্যা করুক, মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য এবং জাতির শক্তি বিনষ্ট হোক ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা তাই চাচ্ছে। আর সেটাই মুসলমানরা করছে। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীরা চায় মুসলমানরা নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত থাকুক। যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা কি করছে তা দেখার জন্য ফিরেও তাকাবার সুযোগ না পায়, সেটাই তাদের চাওয়া। ইহুদী খ্রিস্টান জগৎ তাদের প্রতিদ্বন্ধী হিসাবে একমাত্র মুসলমানদেরকেই মনে করে। তাই প্রায় সব মুসলিম দেশেই গন্ডগোল বাধিয়ে রেখেছে। হয় তারা সরাসরি আক্রমণ করে, না হয় দেশের

www.pathagar.com

মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধিয়ে অশান্তি আর অস্থিতিশীলতার মধ্যে রেখেছে। মুসলিমরা যাতে একেবারেই দিশেহারা হয়ে থাকে। যাহক এসবই ইহুদীবাদীদের কারসাজি। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য না থাকার কারণেই এসব সম্ভব হচ্ছে। মুসলমানদেরকে পবিত্র কোরআন মজিদের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রথম তোমরা মানুষ হও এবং অন্যকে তার শিক্ষা দাও। অথচ মুসলমানরা নিজেরাই মানুষ হতে পারছে না। সব সময় শিয়া- সুন্নি, খারেজি, মোতাজেলা, আহলে হাদিস, তরিকা-মাজহাব, দল-উপদল নিয়ে ব্যস্ত, তারপর হাতে সময় কোথায় যে অন্য ধর্মের লোকের কাছে ইসলামের আদর্শ নিয়ে যাওয়ার। যা দেখে অন্যান্য ধর্মের লোক আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবে, সে কোথায়? ইসলাম ধর্ম বলে না যে, মন্দির আর গির্জা ভাংলে আল্লাহ খুশি হবেন। ইসলাম বলেনি যে, খ্রিস্টান, ইহুদী আর হিন্দুদের হত্যা করলে আল্লাহ খুশি হবেন। কারণ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের রক্ত ভিন্ন নয়। সব ধর্মের মানুষের রক্তের রং একই। তাই মানুষ হত্যা মহাপাপ বলে ইসলাম মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছে। সব ধর্মের মানুষ হত্যাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন এই হত্যা? কেন এই মানবতা লংঘন? এটাই এখন বিবেকবান মানুষের জিজ্ঞাসা? এসব প্রশ্নের উত্তর এই বইতে দেওয়া হয়েছে। ধর্মে জবরদস্তি নেই। যার যার ধর্ম তার তার কাছে সমান, এটাই পবিত্র কোরআনের বাণী। অন্যান্য সব ধর্মেরও মূলমন্ত্র, তাহলে কেন এত সংঘাত, এত হত্যা, নির্যাতন, নীপিড়ন, মসজিদ-মন্দির-গির্জার অবমাননা। আসুন তা খতিয়ে দেখি। তাহলে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মানবাধিকার লংঘনের সর্বব্যাপী কার্যক্রম চলে আসছে কেন? একমাত্র সুনির্দিষ্ট অপরাধ ছাড়া পাইকারীভাবে হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, অথচ রাস্তার উপর পেতে রাখা বোমায় জনপদে আত্মঘাতি হামলায় কতইনা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হচ্ছে। আমাদের মানুষের ছোট্ট সংসারে পিতা যেমন সব সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসে তেমনি মহান সৃষ্টিকর্তার এই বড় সংসারে সবাই তাঁর সন্তানতুল্য প্রিয়। এখানে সাদা-কালো ধনী-নির্ধন নেই, ভাষাভাষী নেই, ধর্মীয় জাতিভেদ নেই, খোড়া লুলা বোবা নেই। সবাইকে যেমন খেতে পরতে দেওয়া হয়, কোন কারণেই যেমন আহার বন্ধ করা হয় না, অক্সিজেন বন্ধ করা হয় না, তেমনি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও কোন তারতম্য

www.pathagar.com

নেই। এই যে মহান সৃষ্টিকর্তার বড় সংসারে সাম্যের আদর্শ তা মানব জাতিকে শিক্ষা দেবে কে? উত্তর হচ্ছে মুসলিম জাতি। অথচ তারা আজ বিভ্রান্ত, নিজেদেরই শিয়া-সুন্নি দলাদলি নিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে। তারা ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের পা-চাটা দালাল হিসাবে বিশ্বে মানবতা বিরোধী কাজে সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পী বহন করে চলেছে। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর থেকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যুগের চেতনানুযায়ী আদর্শ এবং দিক নির্দেশনা নিয়ে নবী-রাসূলদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নির্দেশনা এসেছে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে গোটা মানব জাতির জন্য। তা মানব জাতির কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারলে পৃথিবীতে কোন গন্ডগোল, যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকতে না। এর জন্য দায়ী মুসলমানরা। কারণ তারা মানব জাতির কাছে তাদের আদর্শ সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব অথচ তারা মুসলিম বিশ্বের সম্মান এবং মর্যাদা বিনষ্ট করে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র ব্যবসা ইহুদীবাদীদের নির্লজ্জ দালালী করে চলেছে। মুসলমানদের অধিকাংশ শাসক শ্রেণী ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বা চর হিসাবে তাদের মদদপুষ্ট হয়ে তাদের পারপাস সার্ভ করার জন্য কাজ করছে। তাদের সমস্যার সমাধান করা আর মুসলমানদের সমস্যার মধ্যে ফেলাই ঐ সব শাসকদের একমাত্র কাজ। অথচ বিশ্বের সাধারণ অধিকাংশ মুসলমানরা যানে যে ঐ দেশের শাসকরা আমাদের ভাই। মুসলমানদের বিপদ হলে মুসলিম দেশের জনগন স্বতঃস্ফূতভাবে দাবি তোলে যে ওআইসির সম্মেলন ডেকে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান করা হোক। কিন্তু নিরীহ বিশ্ব মুসলিম ভাইরা জানেন না যে ওআইসি সংগঠনটা জাতিসংঘের মতই ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল। ওটার একমাত্র কাজ মুসলমানদের অধিকার হরণ করা, আর মুসলমানদের বিপদ হলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, ছলচাতুরি করে, মুসলমানদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অভিনয় করে, মুসলমানদের বিপক্ষে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে কাজ করা। মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ, আর ওআইসি এ সবই ওদের দালাল বিশ্বাসঘাতক। একমাত্র ইরান সিরিয়া, আর মালয়েশিয়া ছাড়া আর সবই দালালী করছে এদের। তবে আশার কথা সব দেশের সাধারণ মুসলমান, ইহুদীবাদী, খৃষ্ট বাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে।

www.pathagar.com

তারা চায় মুসলিম বিশ্ব তথা বিশ্বের সব অমুসলিম দেশগুলোসহ দুনিয়ার সব মুসলমান শিয়া সুন্নি সহ সব মতভেদ ভুলে গিয়ে এক কাতারে সামিল হয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে। তারা চায় আবার দুনিয়াটাকে দেখিয়ে দিতে মুসলমানরা বীরের জাতি তারা ভাল কিছু করতে পারে। সাধারণ মুসলমানদের এই ধারনা চিন্তা ভাবনার ও গুরুত্ব কম নয়। তবে সচেতন হয়ে পরিকল্পিত উপায়ে কিছু করা দরকার। সে বিষয়ে এ পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচিও দেওয়া হয়েছে।

যাহোক যে বিষয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে আসা যাক। তাহলো মানব জাতির কাছে জীবনকে সুখ-স্বাচছন্দ দিতে যা প্রয়োজন সব আছে শুধু নেই আদর্শ। আর সেই আদর্শই ইসলাম।

ইসলাম মানুষকে যে বড় সম্মান এবং আদর্শ দিয়েছে তা হলো মহান সৃষ্টিকর্তার সকল গুণাবলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর সকল গুণাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলে তার পক্ষে কোন অন্যায় কাজ গোপনে ও প্রকাশ্যে করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সব কাজ দেখেন। তিনি অন্তর্যামি, অন্তরের মধ্যে কোন খারাপ চিন্তা করলেও তিনি তা দেখেন, জানতে পারেন এবং বোঝেন। তাহলে মানুষ প্রকাশ্যে ও গোপনে কোনো খারাপ কাজ করতে পারবে না। কোনো খারাপ চিন্তাও করতে পারবে না। এসব খারাব কাজ ও চিন্তা থেকে মানুষ বিরত থাকবে। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সে ভাল কাজ করবে। কারণ দুনিয়াতে ছল চাতুরি করে বাঁচার চেষ্টা করল, বা বাঁচতে পারল, কিন্তু মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পরে অন্যায় কাজের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। এছাড়া মানুষ পরের সম্পদ লুণ্ঠন করলে বা তহবিল তছরূপ করলে বা মানুষের কোন অধিকার চালাকি বা ছল-চাতুরি করে বা জোর জবরদস্তি করে আত্মসাৎ করলে দুনিয়ায় চালাকি চাতুরতা করে বাঁচা যেতেও পারে। কিন্তু সবার পর শেষ বিচারের দিনে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষ ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। এমন না যে মজসিদ মাদ্রাসায় বা গরীবদের টাকা দিলে ক্ষমা হবে, না তা হবে না। ঐ ব্যক্তি ক্ষমা না করলে সেখানে কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। কোন ঘুষ বা স্পিড মানি সেখানে দেওয়া যায় না সেখানে কেউ

www.pathagar.com

গ্রহণও করবে না। আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করলে কোন অন্যায় অপরাধ গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনভাবেই করা যাবে না। আর তখনই আজকের ইহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা সারা বিশ্বে যে হত্যা লুন্ঠন, ধর্ষণ জ্বালাও পোড়াও, সন্ত্রাস, অশান্তির সৃষ্টি করেছে আল্লাহকে তার সকল গুণাবলিসহ বিশ্বাস করলে কারো পক্ষেই এসব খারাব কাজ করা সম্ভব না। আর সৃষ্টিকর্তার এসব গুণাবলি যে বিদ্যমান তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাই শত সহস্রভাবে প্রমাণ করেছেন। কাজেই সৃষ্টিকর্তাও তার গুনাবলী সহ বিদ্যমান। আর বুদ্ধিমান মানুষ গুলি সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে পারার কথা নয়। সৃষ্টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা আর গবেষণা করলেই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে সে বাধ্য। আর সৃষ্টিকর্তা যদি থাকেন তাহলে সৃষ্টির সব কিছু তিনি পরিচালনা করছেন আর তার প্রিয় সৃষ্টিকে পরিচালনার ভার অন্যের উপর ছেড়ে দেওয়ার কথা নয়। সেটার পরিচালনার জন্য তিনি অবশ্যই আইন- কানুন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আর সেই নিয়ম-কানুন বিধানই হচ্ছে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল কোরান।

আল কোরআন মানব জাতির কল্যাণের জন্য যে উপহার গুলো দিয়েছেন তা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব এ অধ্যায়ে।

আল কোরআনের উপকারিতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। মানব জীনের এমন কোন দিক নেই যে দিকের আলোচনা আল কোরআনে নেই। এখানে সম্পূর্ণ পাঠকবৃন্দের বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি বিষয়ে তুলে ধরেছি।

আল কোরআনকে যদি মানব জীবনের রোগ ব্যাধি নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন হিসেবে আমরা দেখি তাহলে মানব দেহের এবং মানব মনের কি কি রোগ কি কি উপায়ে নিরাময় করা যায় এবং আল কোরআন এ রোগ নিরাময়ের কি কি বিধান পদ্ধতি ও উপায় পেশ করেছে সেই বিষয়গুলো দেখতে হবে। মানব শিশু সুস্থ এবং নিস্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই সমাজ এবং পরিবেশ তাকে পাপ সার্থপরতা সংকীর্ণতা পরশ্রীকাতরতা হিংসা বিদ্বেষ সহ নানা রকম পাপ সংকীর্নতায় নিমজ্জিত করে ফেলে। আল কোরআন মানুষকে এসব অন্যায় পাপ বা গর্হিত কাজের মধ্যে প্রবেশ না করে কিভাবে পাপমুক্ত বা ভাল থাকতে পারে সে শিক্ষা দেয়। সাথে সাথে এ শিক্ষাও দেয় যে মানুষ যদি অন্যায় বা পাপ শয়তানের প্ররোচনায় করেই বসে তাহলে কিভাবে সেই পাপের হাত থেকে

www.pathagar.com

পরিত্রাণ পেতে পারে সে শিক্ষাও দেয়, তাহলো মানবিক ক্ষমা ও গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর শিক্ষা। একজন মানুষের যে গুণাবলি থাকার কারণে মানুষকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টির সবার উপরে সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাহলো, মানুষের মধ্যে দয়ামায়া মমতা, প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, পরোপকারিতা, মহানুভবতা, মানুষের কল্যাণ, সৃষ্টির কল্যান সাধনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং চেষ্টা করার মতো মহৎ গুণ। মানুষের মধ্যে এই গুণের সমাবেশ ঘটার কারণে মানুষ ফেরেস্তার থেকেও উত্তম, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা।

কোরআনের এই শিক্ষা যদি মানুষ গ্রহণ করে তাহলে পৃথিবীতে কোন অশান্তি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই কি হতে পারে? এক কথায় সোজা সাপটা জবাব তা হতে পারে না। মানুষ যদি মানুষকে ভালবাসে তাহলে তাকে কি হত্যা করতে পারে? না পারে না। কারণ ভালবাসার বস্তুকে 'মানুষ খুব যত্ন করে রাখে, খুন করার তো প্রশ্নই আসে না। মানুষ যদি কোরানের শিক্ষা গ্রহণ করে যে মানুষকে ঘৃনা করা যাবে না হিংসা করা যাবে না, খুন করা যাবে না, মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করা যাবে না, মানুষের কোন ক্ষতি করা যাবে না, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া যাবে না। মানুষকে দুঃখ দিলে আল্লাহ্‌কে দুঃখ দেওয়া হবে। মানুষকে খুশি করলে আল্লাহ্‌ খুশি হবেন। প্রতি বেশি না খেয়ে থাকলে, তাকে না খাইয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া যাবে না। যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ত্রাস করা যাবে না। মানুষ হত্যা মহাপাপ। এসব ইসলামের বা কোরআনের শিক্ষা যদি মানুষ পায় তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা কি বোম্বিং করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মারতে পারে? না পারে না। কারণ মানুষ স্বার্থের জন্য পরের অর্থ সম্পদ, পরের দেশ দখল করার জন্যও কাজ করতে মানুষকে কোরান নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে মানুষ হত্যা মহাপাপ তা ক্ষমার অযোগ্য।

সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে, যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে, সার্থপরতার থেকে। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে মহানুভবতা এবং স্বার্থপরতা পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ যদি ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, তাহলে সমাজে, দেশে এবং দুনিয়ায় যত অস্থিরতা, অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে, এসব বন্ধ হয়ে যাবে স্বাভাবিক নিয়মে। জাতিসংঘের মতো ঠুটো জগন্নাথ প্রতিষ্ঠানের শৃগালের মতো চালাক ধাপ্পাবাজ কর্মকর্তাদের আর শান্তির নামে অশান্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা লাগবে না।

www.pathagar.com

এমনিতে পৃথিবীর সমুদয় অস্থিরতা যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি পৃথিবীটা হবে ভালবাসা প্রেম প্রীতিতে পরিপূর্ণ এক ভূস্বর্গ। মানুষের দয়ামায়া, সহানুভূতি, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, মহানুভবতা, পরোপকারিতা আর কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে বিশ্ব পরিণত হবে এক কল্যাণমূলোক আদর্শ বিশ্ব হিসেবে। ভালবাসা প্রেম- প্রীতির পুষ্প পল্লবে সুশভিত হয়ে রচিত হবে এক অতুলনীয় ও অচিন্তীয় এক স্বর্গীয় পরিবেশ।

মানুষের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথম আল্লাহর সন্ধান পাওয়া অপরিহার্য। তারপর তার আদর্শের জ্ঞান অর্জন করা, এর বেশি চিন্তা করা মানুষের কাজ নয়। মানুষ পৃথিবীতে ভীষণ অসহায়। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করা সম্ভব না। আর আল্লাহর ইচ্ছা তখনই হতে পারে যখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন তখনই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আর সেই বলাটা এত বিজ্ঞানসম্মত যে গাণিতিক ফরমূলার মতো। ২+২= ৪ পাঁচ বা ছয় হওয়ার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই ১% এক ভাগও। মানুষ চরম অসহায়। এই পৃথিবী সৃষ্টির উপায় উপাদান নিয়ম পদ্ধতি এত বিজ্ঞানসম্মত যে তার বাইরে দৈব কিছু ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো প্রাণী, কোনো বস্তু, কোনো শক্তি সৃষ্টিকর্তার নিয়ম, তার দয়া, তার মেহেরবানী ছাড়া কিছু করতে পারেনি, পারছে না, আর কোনো দিন পারবে না। পারার সম্ভাবনাই নেই। কোনো ফকিরের মতো, কোনো রাজনীতিবিদের মতো, জাতিসংঘের ভূয়া কর্মকর্তার মতো, ইহুদীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ভাওতাবাজ বিশ্ব পরিচালক ভূয়া নেতার মতো আমি এমন বলবো না, যে হতেও পারে, আমি আশাবাদী। আমি সুস্পষ্ট করে বলছি হে বিশ্ববাসী, আপনারা ভাল করে শুনে রাখুন। আল্লাহ্‌র, দয়া, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া পৃথিবীতে কোন মানুষের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না, সম্ভব হতে পারে না। বিষয়টি মৃত্যুর মতো সত্য, বিষয়টি দিবালোকের মত সত্য, এ সত্যের মাঝে কোন সন্দেহ নেই। ইতোপূর্বে মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে আমি অধমের মত এত জোর দিয়ে কাউকে কখনও বলতে শুনি নি। কাউকে কখনও লিখতে দেখিনি। হয়তো বা তাদের কাছে এত সুস্পষ্ট তথ্য ছিল না যার জন্য কেউ বলতে বা লিখতে পারেনি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে আমি বলতে পারছি। এবং তা বলছি ১০০% এক শত ভাগ নিশ্চিত হয়ে। সৌভাগ্য যে আমি সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিকে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার আদর্শকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিক্ষা

www.pathagar.com

করার সুযোগ পেয়েছি। তাই বিশ্ববাসীর সামনে দ্যার্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করছি। হে বিশ্ববাসী তোমরা অকৃতজ্ঞ। তোমরা নাফরমান, তোমরা ভুলের মধ্যে আছ। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর উন্নতির ফলে সৃষ্টির মাঝে গবেষণা করে সৃষ্টিকর্তার প্রাপ্তির যে সুযোগ তা তোমরা গ্রহণ করো, এবং বিনা বাক্যে আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, মহান, দয়ালু ও দাতা বলে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তার সানে সিজদায় পড়ে যাও। আর ভুল স্বীকার করো এই জন্য যে কেন এত দিন তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের মধ্যে ছিলে? যিনি বিনা চাওয়ায় সুন্দর করে সৃষ্টি করলেন। জীবন ধারন, আর সুখ সাচ্ছন্দের জন্য এত জীবনপোকরন দিলেন, তার নিজেরই এখন প্রমান করতে হবে তিনি এগুলি আমাদের জন্য করেছেন। এত বড় দুঃখ জনক ঘটনা আর বিষয় কিছু হতে পারে? যেমন আমার বাবা মা আমাকে জন্ম দিলেন। শৈসব থেকে লালন পালন করলেন এখন বড় হওয়ার পর আমি বাবা মাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেই যে সত্যিই কি তোমরা আমার বাবা মা? তোমরা আমাকে সত্যিই জন্ম দিয়েছিলে? তোমরা ছোটবেলা থেকে সত্যিই কি আমাকে লালন পালন করেছ? এইসব কথা যদি কোন সন্তান তার বাবা মাকে বলে, তাহলে তার বাবা মা কি ধরনের দুঃখ পেতে পারেন? এইটা যদি আমরা বুঝতে পেরে থাকি তাহলে ভাবতে হবে কখনও সৃষ্টিকর্তা এবং তার অনুগ্রহ দয়া সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন নিজের কাছেও না মানুষের কাছে ও না কোন প্রশ্ন করা যাবেনা। তাহলে সেটা হবে ভীষন দুঃখজনক, ভীষন অমানবিক, ভীষন লজ্জাষ্কর।

আমি আমার জীবনের ৪০ চল্লিশ বছরের গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছি, আল্লাহ কোরআনে বর্ণিত সকল গুণাবলি ও ক্ষমতাসহ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তার অসীম ক্ষমতার মধ্যে আমাদের অবস্থান। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিনা বাক্যে সৃষ্টিকর্তাকে শুধু মান্য করা নয়, তার শানে মনে প্রাণে সেজদায় পড়ে থাকতে হবে জনম জনম ভর। মাথা তুলতে না বললে মাথা তোলা যাবে না। তিনি দয়া করে মাথা তুলতে বললেই শুধু মাথা তুলা যাবে, কিছু চাওয়ার অনুমতি দিলেই চাইবে, চাওয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। তিনি সব জানেন। কার কি অভাব, কার কি চাওয়া, কার কি মনবাসনা। শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য আমরণ কাজ করাই মানুষের দায়িত্ব আর কিছু নয়। তিনি বুঝেন আমার কি দরকার, আমার কি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এ পদ্ধতিতে চলাই পবিত্র কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হে মানুষ সকলে আসুন আমরা এক বাক্যে বলি আল্লাহ মহান, আল্লাহ পরম দয়ালু ও দাতা।

বর্তমান ঝনঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে ইসলামের এই আলোচিত শিক্ষাই পারে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলামের এই বিশ্ব শান্তির আবেদন ১০০% একশত ভাগ যৌক্তিক। কারণ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মেও শান্তির কথা কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে প্রত্যেক বিভাগ, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্বন্ধে, যুদ্ধ, সন্ধি সৃষ্টির কল্যাণ ও রহস্য সম্বন্ধে এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অত্যাধুনিক আদর্শ অন্য কোন ধর্মে নেই। কারণ ঐ ধর্মগুলোর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল বহু পূর্বে। তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ নিষেধ ছিল ঐ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে। এজন্য ঐসব ধর্মের দোষ বা ত্রুটি বলা যাবে না। এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সমস্ত মানুষ এক পরিবারের সদস্যের মতো। এক পিতার দশটি সন্তান যেমন মাতা-পিতার কাছে প্রিয় তেমনি এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সমস্ত ধর্মের মানুষ আপন ভাইয়ের মতো। সকলে মিলে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গীয় পরিবেশ গড়ে তুলুক সৃষ্টিকর্তা তাই চান। তবে হ্যাঁ সৌহার্দপূর্ণ ভাবে যার যার ধর্ম একজন আর এক জনকে বুঝাতে পারেন এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এর থেকে বেশি কোন দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তা কোন ধর্মের লোককেই দেননি। অথচ শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষ হত্যা করছে এসব জবরদস্তি শুধু পাপই নয়, মহা পাপ। তাই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সব মানুষের উচিত বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহ, সমস্যাসংকুল ও ঝনঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য সমগ্র মানবমন্ডলীকেই সর্বশেষ ধর্ম যার মধ্যে জীবনের প্রতিটি বিভাগের সমস্যার সমাধান রয়েছে সেই মহান ইসলামের পতাকাতলে, ইসলামের বটবৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা। মায়ের কোলে যেমন সন্তানের শান্তি। ইসলামের আদর্শের ছায়াতলে তেমন মানব জাতির শান্তি নিহিত রয়েছে। আসুন বিশ্ববাসী শান্তির জন্য সব মতাদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলামের আদর্শে আনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও পালন করি। এটাই আল্লাহ্‌র চাওয়া।

www.pathagar.com

মানুষের আকাঙ্খার কোন শেষ নেই। বিশ্বের সার্থপর মানুষগুলো যখন উচ্চাকাঙ্খার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। পৃথিবীর মানুষ যখন পশুর মতো মানুষ হত্যা করছে, মানব সভ্যতা ধ্বংসের জন্য পায়তারা করছে। নারী শিশু সহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সেই স্বার্থের জন্য হত্যা করছে। বিশ্বে যখন সার্থপরতার আগুন জ্বলছে। তখন আসুন আমরা ইসলামের শান্তির বাণী, আবেজমজমের পানির মতো প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঢেলে দিয়ে বিশ্বের সমস্ত আগুন নিভিয়ে দেই। এত আগুন দেখা যায় না। এত কান্না শুনা যায় না এত মানুষের হত্যা ও ধর্ষণের বিভৎস দৃশ্য দেখে সহ্য করা যায় না।

আসুন আমরা ইসলামের শান্তির আহ্বান নিয়ে বিশ্ববাসীর দরবারে যাই। আমাদের আবেদন আমাদের নিবেদন বিশ্ববাসি নিশ্চয়ই শুনবে। কেন শুনবে না। তারা কি মানুষ নয়? মানুষ হলে তো না শুনার কথা নয়। রক্ত মাংসের মানুষ, মানুষের দয়া আছে। আছে মায়া, ভালবাসা, আছে প্রেম, কেন শুনবে না? নিশ্চয়ই শুনবে। আসুন আবেদন জানাই। শেষ বারের মতো, দেখা যাক কি করে। আমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা নয়।

হে মানুষ, সৃষ্টির সেরা মানুষ, তোমরা আর কত হত্যা দেখবে? তোমাদের হৃদয় কি একবার কাঁদে না? তোমরা কি মৃত্যুবরণ করবে না? তোমরা সব রেখে চলে যাবে কোন কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। যত কিছু যুদ্ধ করে জোগাড় করেছ সবই রেখে যেতে হবে। সাথে কিছু যাবে না। হে মানুষ তুমি ফিরে এসো, শান্তির আহবানে সাড়া দাও।

হে মানুষ তোমরা জানো না যে আগে স্বার্থপর মানুষ টাকা জমা করে রাখলে তাকে সমাজে সম্মান করতো? হ্যাঁ তোমরা তা যান। তাই যান বলেই পিশাচের মতো তোমরা টাকা-পয়সা অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বালিয়েছ। কিন্তু তোমরা এটা যানো না যে একবিংশ শতাব্দীতে বেশি টাকা থাকলে, স্বার্থপর হলে মানুষ হত্যা করলে, অন্যায় এবং পাপ কাজে লিপ্ত হলে তাকে মানুষ ঘৃণা করবে, একঘরে করে রাখবে, তার সাথে কেউ মিশবে না, তার সাথে কেউ আত্মীয়তা পর্যন্ত করবে না। তার সাথে কেউ কথা পর্যন্ত বলবে না। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে অপমানিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হবে। যার বেশি অর্থ এবং সম্পদ থাকবে।

www.pathagar.com

বিশ্ববাসী আরো যানতে পারবে মানবিক গুণাবলি যার মধ্যে যতবেশি থাকবে একবিংশ শতাব্দীতে সেই বেশি সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। তার সাথে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভালবাসার সম্পর্ক করতে সব মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকবে। এটাই আগামী দিনের বিশ্ব, এটাই হবে সভ্য দুনিয়ার দৃশ্য। আর এই সভ্য দুনিয়ার বিশ্বব্যবস্থা আর শান্তির ভূস্বর্গ গড়ে তোলা হবে আল কোরানের আদর্শ দিয়ে। এটাই এখন মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। আল্লাহপাক যা চান তাই হয়ে যায়। এ ইচ্ছা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আর নয় ভেদাভেদ। এক আল্লাহ এক রাসূল (সঃ) এক কোরান, একই উম্মাত। এতে দুই করার বা হওয়ার কিছু নেই। আসুন সবাই মিলে জোরেসোরে পড়ি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসুন আজ থেকে সব দল, উপদল, ফেরকা মতবাদ ভুলে যাই। এ বিশ্ব সংসার আল্লাহ্‌র, আমরা তার সংসারের সদস্য। আমরা সবাই আপন। আমরা কেউই পর না। আসুন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব শান্তির বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ি। নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়াফাতহুন ক্বারিব।

আসুন স্লোগান দেই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাক খড়কুটার মতো পৃথিবীর যত জঞ্জাল প্রতিষ্ঠিত হোক ন্যায়, সত্য, সুন্দর। দুনিয়াটা পরিনত হোক ভূস্বর্গে। ভালবাসার পরশে সজিব হয়ে উঠুক জ্বলন্ত এই পৃথিবী। ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার করে ভালাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হোক মানব জাতি।

এমন একটি বিশ্ব সমাজ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে ধনী নির্ধন উঁচু নিচু সাদাকালো ভেদাভেদ থাকবেনা। কোন ব্যক্তি বিমানে বিমানে ভ্রমন করবে। আর কতিপয় মানুষ ফুটপাথে শুয়ে থাকবে তা হবে না। সেই সমাজে যার যা ক্ষমতা যোগ্যতা আছে সেই অনুপাতে আয় করবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে রাখবে না এবং ভোগ করবে না ভোগ করতেই চাইবে না। এত সভ্য হবে সেই মানুষ। পৃথিবীর সকল পরিবার সমাজ দেশ দুনিয়ায় সকলে সমানভাবে সম্মান এবং মর্যাদা ভোগ করবেন। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। মানুষ সকল সৃষ্টিকে ভালবাসবে সবাই সবাইকে সম্মান ইজ্জত এবং মর্যাদা দিবে। এসবই করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর এই রকম একটি

www.pathagar.com

সমাজ এবং রাষ্ট্র তথা বিশ্ব ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের আলোকে এই জন্যেই এবং এই কারণেই প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটা হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানদের মারতে মারতে শেষ করে দিতে চেয়েছিল শয়তান শত্রুরা। কিন্তু শেষতো হয়ই নি বরং আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হয়েছে মুসলমানরা। লোহা যেমন পুড়িয়ে পিটাতে, আর পানিতে চুবাতে চুবাতে ইস্পাত হয়ে যায়। মুসলমানরা ঠিক তেমনি মার খেতে খেতে অসম্ভব রকম, অবিশ্বাস্য রকম শক্তিশালী হয়েছে। এখন শুধু নেতৃত্বের অভাব আর কোন অভাব মুসলমানদের নেই। বিশ্বের সব মুসলমান এক ও অভিন্ন। এ বিশ্বাস সমস্ত মুসলমানদের আছে। শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বের শাসক গোষ্ঠী, তারাই ইহুদীবাদীদের দালাল। বিশ্বশান্তির আন্দোলনের জোয়ার উঠলে ইহুদীবাদী দালাল শাসকরা পালাবার পথ খুজে পাবে না। চোখে মুখে অন্ধকার দেখবে। তারা সর্বাগ্রে বলবে আমি কখনও ইহুদীদের দালালী করি নি এমনকি আমার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে ইহুদীদের দালাল কেউ ছিল না।

সম্মানিত বিশ্ববাসী শুভ সংবাদ শুনুন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমগ্র বিশ্ববাসী অংশগ্রহণ করুন। জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সকল মানুষ শান্তির সপক্ষে অবস্থান নিন । শুধুমাত্র শয়তান ব্যাতিরেকে।

আসুন আমরা অশান্তিময় পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেওয়ার জন্য মানব জাতি ঐক্যবদ্ধ হই। সব মানুষ একই। মানুষ কেউ কারো পর নয়। আসুন শান্তির আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হই। আসুন খোদার অনুগ্রহের সৃষ্টি এই পৃথিবীটাকে মানুষের বাসপোযোগী করে গড়ে তুলি। মহান সৃষ্টিকর্তার এই প্রিয় সৃষ্টি দুনিয়ায় এত সংঘাত যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করি। গেয়ে উঠি মানবতার জয়গান, রচনা করি ভালবাসার পৃথিবী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামত

বৈজ্ঞানিকের পরিচয়

[মেরিট ষ্ট্যানলী কংডন॥ প্রকৃতি- বিজ্ঞানী ও দার্শনিকঃ পি,এইচ,ডি, এস,সি,ডি ওয়েবষ্টার বিদ্যালয় এস,টি,ডি, বার্টন বিশ্ববিদ্যালয়; ফ্লোরিডা ট্রিনিটি কলেজের মৌলিক বিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক, আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, মেডিকেল একাডেমী অব আমেরিকা এবং বহু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য। মনস্তত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বাইবেল সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষজ্ঞ]

বহু বছর আগে পেনসিলভিনিয়ার এক বিজন পথের ধারে আমি সুন্দর প্রস্ফুটিত একটি গোলাপের ঝাড় দেখেছিলাম। পরে আবার আমি যখন সেই স্থান অতিক্রম করি, তখন ঝাড়ের কাছে আগাছা আর বুনো গোলাপের লতায় ঢাকা একটি কুঠুরি দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ আমার নজরে পড়ে। এর অন্ততঃপক্ষে আধা মাইলের মধ্যে কোন দালানকোঠার চিহ্ন ছিল না। সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে অনুমান করলাম যে, বাতাস, পানি, বুনো মুরগি বা স্তন্যপায়ী কোন জীবের দ্বারা দূরবর্তী কোন ঝোপ বা বাগান থেকে এর বীজ বা পরিবর্তনশীল টুকরো হঠাৎ করে বাহিত হয়ে এখানে এসে পড়েছে আর তারই ফলে এই গোলাপঝাড়ের সৃষ্টি। এমনি অসম্ভব একটা কল্পনা করার পরই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলাম যে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিন সযত্নে তার বাড়ির কাছে এই গোলাপের বাগান করেছিলেন। গোলাপের চারা লাগাবার সময় আমি দেখি নি এবং এই সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যে আমার কাছে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সূত্রও উপস্থিত ছিল না; তবুও বাধ্য হয়ে এই অদম্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, শুধুমাত্র মানুষের সূত্র ধরে এবং মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে এই গোলাপের ঝাড় বর্তমান স্থানে এবং ঐ অবস্থায় হয়তো গড়ে উঠেছে।

প্রথমে সম্ভবত আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাদৃশ্যপূর্ণ হস্তক্ষেপের প্রয়োগকে নিন্দা করতে পারি। কিন্তু অবিলম্বে আমরা এই বিষয়ের সম্মুখীন

www.pathagar.com

যে, ইহা যথার্থই সেই ধরনের প্রমাণ যার উপর আমাদের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্যে আমরা ছায়াপথ, নক্ষত্র অথবা গ্রহগুলোকে তাদের কক্ষপথ থেকে সরিয়ে জোর করে আমাদের কাছে আনতে পারি না। ঘটনাস্থল থেকে আমরা মহাজাগতিক রশ্মিকেও দূর করতে পারি না। ডপলার প্রভাব (Doppler Effect: দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল শব্দ ও আলো তরঙ্গের সংখ্যার পরিবর্তন)-কে সম্ভবত বিশাল দূরত্ব দ্বারা বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবান্বিত করা যেতে পারে এবং দূরবর্তী নীহারিকামন্ডলের গতির বিরামহীন ত্বরণ সম্ভবত "মহাজাগতিক পর্দার ওপারের আলোকে অতিক্রম করে গিয়ে নীহারিকামন্ডলকে ভবিষ্যতে দেখার পথ বন্ধ করতে পারে। কিন্তু আমরা এসব কারণ পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারি না। দূর থেকে আমরা শুধু এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারি, কিন্তু এদের নিয়ে আমরা কোন গবেষণামূলক পরীক্ষার কাজ চালাতে পারি না।

কাজেই আমরা যেমন পরমাণুর মৌলিক কণিকাগুলোর মধ্যে পর্যন্ত জড়পিন্ড ও শক্তি সম্পর্কিত নিয়মাবলির উপর নির্ভর করে থাকি, তেমনি ছায়াপথের মধ্যে সদৃশ যে প্রক্রিয়া বিজড়িত, তারই 'সম্ভাবনার' ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। যদিও আমরা স্পষ্টভাবে নক্ষত্র ও নীহারিকামন্ডল দেখতে পাই এবং তাদের আপাত-প্রতীয়মান ও যথার্থ গতিসমূহ দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারি; তথাপি এ পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরমাণুর কোন উপাদান দেখতে পারি নি। এতদসত্ত্বেও, প্রথম আণবিক বোমা অদৃশ্য পরমাণুর কাঠামো ও ধর্ম সম্পর্কে আমাদের পুঁথিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন ও সত্য বলে প্রমাণ করেছে। এই উভয় শ্রেণীর বাস্তব পদার্থ বা সত্তা (ছায়াপথ ও পরমাণু)-কে যথার্থই কাজের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং 'অভিজ্ঞতালব্ধ' (পরীক্ষামূলক) উপাত্ত থেকে পৃথক করে যুক্তিযুক্ত অনুমিতি দ্বারা প্রমাণ করতে সাহায্য করা যেতে পারে।

অবশ্য মহাজাগতিক পদার্থের (বহির্জগতের প্রপঞ্চের সামগ্রিকতার) নিজস্ব শক্তি ও বিশেষগুণে আমাদের থাকতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে 'ব্যক্তিত্ব' বলে অভিহিত করে থাকি তেমনি কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ নমুনা, মহাজাগতিক কাঠামোর মধ্যে অবশ্য থাকতে হবে। যে কোন দ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয়

www.pathagar.com

ধারণার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এরূপ একটি ব্যবস্থাকে অবশ্যই অধিবিদ্যা (অ-প্রকৃতিক বা অলৌকিক)-এর সাহায্য দরকার হবে। কারণ, ব্যবহার সম্বন্ধীয় মনস্তত্ব স্বয়ং এর জন্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়ে তুলতে অক্ষম বলে মনে হয়।

আমি অনেক সময় আমার ছাত্রদের কাছে একটি 'চিন্তার' যথার্থ রাসায়নিক ফরমূলা কি হতে পারে তাই জানতে চেয়েছি। জিজ্ঞেস করেছি, ঠিক কত সেন্টিমিটারে চিন্তার দৈর্ঘ কত গ্রাম এর ওজন, কি এর রং, কেমন গঠন বা আকার, কি এর প্রচ্ছন্ন চাপ বা অভ্যন্তরীণ টান, এর 'কর্মক্ষেত্র' এবং এর অবস্থান বা দিক, আর চলার শক্তিই বা কি? তারা একটি চিন্তাকে কোন প্রাকৃতিক সংজ্ঞায়, সমীকরণ বা ফরমূলার ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এজন্যে স্বীকৃত অর্থ বা চিহ্নহীন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শব্দ সংগ্রহের চিরাচরিত অর্থশূন্য নতুন শব্দ সংগ্রহের পরিবর্তন করতে হবে।

এই সমস্যাটি কেবলমাত্র "হেসে উড়িয়ে দেয়া" চলে না, কারণ মহাবিশ্ব যদি দ্বি-যোজী (দুটি অংশ বা মৌলিক পদার্থে গঠিত) না হতো, তবে মানুষের 'চিন্তা' সম্পর্কিত সমস্যা কখনও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হতো না। আর যদি অদ্বৈতবাদী (একক, একটিমাত্র মৌলিক পদার্থে গঠিত) তর্কের বিষয়বস্তুতে, চিন্তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক উপাদানের উপর জোর দেয়া হয়, তাহলে একমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শর্তাবলিতে আমাদিগকে 'সম্পূর্ণ' বর্ণনা দানের দাবি করতে হবে। ইহা কখনও করা হয়নি'। ডেমোক্রিটাস, হবস্ বা আধুনিক সৃষ্টিতবাদীদের বস্তুতান্ত্রিক স্বতঃসিদ্ধতা অথবা লিবনিত্‌থ, বার্কলে বা হেগেলের আদর্শবাদ সম্বন্ধীয় পূর্ব অনুমিতি কেবলমাত্র কাল্পনিক প্রকল্প। এতে পরীক্ষামূলক বৈধতার যতটা সম্পর্ক তাতেও অভিজ্ঞতালব্ধ কোন ভিত্তি নেই। কারণ, প্রাকৃতিক বিশ্বের সব রকমের ঘটনা মনোযোগ আকর্ষণকারী নির্দিষ্ট অংশ ও মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে প্রাকৃতিক দর্শনে যদি মূলগত কারণ না যোগায়, তাহলে প্রাকৃতিক সেই দর্শনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং চ্যালেঞ্জ করাই উচিত।

বিজ্ঞান পরীক্ষিত জ্ঞান, তবে এটি এখনও মানুষের খেয়াল বিভ্রম এবং ভ্রমসংকুলতার অধীন। এর নিজস্ব পরিধিতে এটি কেবল রীতিসিদ্ধ। বর্ণনা ও

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বানীর জন্যে এটি সুদৃঢ়ভাবে পরিমাণাত্মক উপাত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্ভাবনা নিয়ে এর আরম্ভ এবং সম্ভাবনা নিয়েই এর সমাপ্তি নিশ্চয়তা নিয়ে নয়। এর ফলাফল হচ্ছে 'সম্ভাব্য ভুল' সাপেক্ষে, বিশেষ করে পরিমাপ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোজনে। এর ফলে সব সময়েই পরীক্ষামূলক এবং মাঝে মাঝেই নতুন উপাত্ত দ্বারা সংশোধিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুমিতিতে সর্বশেষ কোন সিদ্ধান্ত নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেনঃ বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটনা হচ্ছে এই এবং এমনি।

মূলত প্রাকৃতিক সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয় এমনি অনস্বীকার্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও নীতিসূত্র থেকে বিজ্ঞানের শুরু। অতত্রব দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান দার্শনিক ভিত্তির ওপর তার রীতিবদ্ধ জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে। দর্শন ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর তার রীতিবদ্ধ জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে। দর্শন ও ধর্মের ন্যায় বিজ্ঞানেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সকল সত্যের চরম পরীক্ষা এবং এই অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হবে এবং সকল বৈজ্ঞানিক অনুমিতি করলে তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং সকল বৈজ্ঞানিকের জন্যেই তা বৈধ হবে। এতদসত্ত্বেও প্রাকৃতিক প্রপশ্চ সম্পর্কিত আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও আপেক্ষিক।

কখনও এসব অসমর্থ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ মূল্য ও গুণাবলিকে বিনষ্ট করে না, তবে একথা ঠিক যে, এই সব অসামর্থ প্রচেষ্টাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত এবং ফলাফলকে পরিলিখিত করে। ফলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেই সব সমস্যাবলী সরাসরি বিবেচনা করতে অক্ষম যেগুলি পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণ ও সংযোগ সাধনের পক্ষে সংবেদনশীলতা সত্তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই ধরনের সমস্যার জন্য, "স্বয়ংকৃত আল্লাহ আছে কি?" এই প্রশ্ন দৃশ্যত মনে জাগে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক সত্তার সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক সত্তার নির্দিষ্ট বিরোধ থাকে, তাহলে বিষয়টি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যথার্থ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে আচরণে, সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমিতিসহ যে কোন ন্যায়সংগত রীতি বা পদ্ধতি অবশ্য মেনে নিতে হয়।

এমন অনেক নিদর্শন আছে, যা প্রকৃতিক ও বিজ্ঞানের কার্যধারায় অবস্তুতান্ত্রিক সত্তার অস্তিত্ব বা কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে বা অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের বাইরের বাস্তবতার সম্ভাবনাকেও তা

www.pathagar.com

প্রতিরোধ করে না। বিচারশক্তিসম্পন্ন মূল্যবোধে পরিপূর্ণ একটি দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে আমাদের নিজস্ব বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দ্বারা আমাদেরকে অবশ্য ঘন্টাকৃতি বিস্তারণ রেখায় (এমনকি তড়িৎ অণুর কক্ষপথে) 'জলচক্র', 'কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্রে', জীবজগতের পুনঃসৃষ্টির আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়ায়, অনন্তকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শ্রেণীর জন্য সৌরশক্তির সঞ্চয় করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ আলোক-সংশ্লেষের কার্যক্রমের পশ্চাতে অনুরূপ বিজ্ঞ কার্যক্রম ও বুদ্ধিদীপ্ত নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্যকে মেনে নিতে হবে। যথার্থই কি করে আমরা এমন সব প্রক্রিয়া কোন বুদ্ধিদীপ্ত মাধামে ছাড়া কোন স্বেচছাচারী দ্বারা বা আকস্মিকভাবে আরম্ভের কথা ধারণা করতে পারি? একটি ক্রিয়াশীল মহাবিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্য যুগের পর যুগ ধরে সমরূপতা ও সার্বজনীনতা, আকস্মিকতা ও পূর্ণতা, উদ্দেশ্যবাদ ও অন্তবৃত্তি, অথবা নিত্যতা ও সমতা সম্পর্কিত বিমূর্তন কি চলে আসতে পারে? কি করে তারা সমগ্র প্রকৃতিতে একজন বিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার, যিনি সর্বক্ষণ তারই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছেন, তার বুদ্ধিমত্তায় নির্ভর না করে এমনি বিচারমুদ্ধি মত কাজ করে যেতে পারে?

এখনও এই অদ্ভূত দ্রুতবেগে অগ্রগামী মহাবিশ্বের গোপন রহস্য থেকে এমন কোন ঘটনা জোর করে বের করা হয় নি যা নাকি স্বয়ংকৃত আল্লাহ'র অস্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত কার্যাবলিকে যে কোন মাত্রায় অনুমোদন করতে পারে। অধিকন্তু, সাবধানী ও সংশ্লেষণ করি, তখন কেবলমাত্র সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমিতি দ্বারা কেবলমাত্র সেই অদৃশ্য সত্তার, বিপুল কাজের সামান্য প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করি যে সত্তা বা আল্লাহকে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ, আল্লাহ্ যথার্থই নিজেকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন এবং যথার্থই প্রকাশ করেছেন। তাই বিজ্ঞানে বস্তুতঃপক্ষে 'আল্লাহকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।'

অপরিহার্য সিদ্ধান্ত

(জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান- গাণিতিক ও রাসায়নিকঃ পি.এইচ.ডি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক স্টাফ, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, ডালুথ ষ্টেট টিচার্স কলেজ; মিননেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় ডালুথ শাখার

www.pathagar.com

রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান; ক্যানসাস স্টেট টিচার্স কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার। অ্যামোনিয়ামটি নাইট্রাইড ও টেট্‌ভাজল প্রস্তুতে টাংস্টেন পরিশোধন বিশেষজ্ঞ)

বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্‌ লর্ড কেলভিন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন, "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্‌'তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।" আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমিও তাঁর এই উক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সামগ্রিকভাবে এ বিশ্ব সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা নাকি জানা রয়েছে, কৌশলী আর পরিজ্ঞাত বিবেচনা দ্বারা তৎসম্পর্কে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, উক্ত বিবেচনায় অবশ্য যথাতথ্যের তিনটি প্রধান জগতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই তিনটি জগৎ হচ্ছেঃ জড় (পদার্থ), বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত (মন) এবং আধ্যাত্মিক (আত্ম) জগৎ।

এই বিবেচনার ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রীয় জগতের অবদান অপরিহার্য ফল হিসাবেই সীমাবদ্ধ, যেহেতু ইহা সিম্পোজিয়ামে অনেকের মধ্যে একটি অবদান মাত্র।

কারণ, রসায়নশাস্ত্র, প্রধানত পদার্থের মিশ্রণ এবং মিশ্রণের পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে মিশ্রণের এই পরিবর্তনের ফলে শক্তির যে পরিবর্তন ঘটে প্রধানত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই সঙ্গে পদার্থ ও শক্তির আন্তবিনিময়তা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে ইহা প্রধানতঃ জড় এবং দৃশ্যতঃ এক সম্পূর্ণ অ-আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। তাহলে কি করে আশা করা যায় যে, ইহা মহাবিশ্বে সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোন প্রকার প্রমাণ যোগাতে পারে? এ বিশ্ব শুধুমাত্র দৈবের নিকট তার অস্তিত্বের জন্য ঋণী, দৈবক্রমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এতে যা কিছু ঘটছে সবই উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘটে যাচ্ছে, আর শুধুমাত্র দৈবই এ জন্যে দায়ী এই চিন্তাধারাকে, এমনি এক বিজ্ঞান কি করে আসার বলে প্রতিপন্ন করতে পারে বলে আশা করা যায়?

রসায়নশাস্ত্রসহ সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গত কয়েক শত বছর ধরে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তা প্রধানত পদার্থ ও শক্তির গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণার পরীক্ষামূলক অংশে, যাতে করে পরীক্ষার যে ফল পাওয়া যাবে তার সবই শুধুমাত্র দৈবক্রমে পাওয়া গেছে এমনি

www.pathagar.com

প্রতিপন্ন হয়, তার জন্যেই প্রতিটি পরিজ্ঞাত সম্ভাবনাকে দূরে সরানোর সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই গবেষণায় অতীতে, বারংবার এই-ই প্রতীয়মান হয়েছে এবং আদৌ লক্ষহীন নয়; অধিকন্তু, অপরপক্ষে তা নির্দিষ্ট 'স্বাভাবিক নিয়মকানুন' 'মেনে' চলে। প্রায়ই এই নিয়ম বা আইনের অস্তিত্বের কোন কারণ এবং প্রয়োগে পন্থা আবিষ্কারের অনেক আগেই আইনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে যে সকল শর্ত সাপেক্ষে এসব আইনকে বৈধ বলে দেখানো হয় একবার যদি সেই শর্তগুলো জানতে পারেন, তাহলে রাসায়নিক স্থির নিশ্চিত হতে পারেন যে, উক্ত আইন ঐ সব একই শর্তে অবশ্যই একই ফল লাভের জন্য কাজ করে যাবে। পদার্থ ও শক্তির ধর্ম যদি লক্ষ্যহীনই হতো এবং যা কিছু ঘটবার সবই দৈবক্রমে ঘটতো, তাহলে তারা কখনও দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন না। আর যখন চূড়ান্তভাবে জানা যায় কেন আইন বিদ্যমান, কেন যেমনভাবে কাজ করে ঠিক তেমনিভাবে কাজ করা যায়; তখন লক্ষ্যহীনতার সামান্য যেটুকু সম্ভাবনা থাকে তাও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ, মেন্দেলেজেফ আজ থেকে একশ বছর আগে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের আনবিক ওজন বৃদ্ধির জন্যে যে ব্যবস্থা করেছেন (যা নাকি পরবর্তীকালে সামান্য সংশোধিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে) তার জন্যে একই প্রকার ধর্মের অধিকারী মৌলিক পদার্থের সংঘটনের পর্যাবৃত্তিকে যুক্তিযুক্তভাবে শুধুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার বলে কি অভিহিত করা চলে? তাই যদি হতো, তাহলে তিনি যে সব মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন, এবং পরে যখন সেই সকল পদার্থ আবিষ্কৃত হলো এবং তিনি সেই সব মৌলিক পদার্থের যে সব ধর্মের কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন তার সবই পাওয়া গেল, তখন যথার্থই এমনি কোন সম্ভাবনা থাকলে তা অপসারিত হতো। তাঁর এই বিরাট সাধারণ শ্রেণীভুক্তিকে 'দৈব পর্যায়' বলে অভিহিত করা হয় না। অধিকন্তু ইহাকে 'পর্যায়ক্রম' বলে উল্লেখ করা হয়।

আবার যখন 'ক' মৌলিক পদার্থের পরমাণু, সঙ্গে সঙ্গে 'খ' মৌলিক পদার্থের পরমাণুর উপর প্রতিক্রিয়া করে, কিন্তু দৃশ্যত 'গ' মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওপর আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া করে না, তখন কি সেদিনকার বৈজ্ঞানিকগণ একে শুধুমাত্র আকস্মিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন? নিশ্চয়ই নয়। অধিকন্তু তখন

www.pathagar.com

তারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, 'ক' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু এবং 'খ' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকার শক্তি বা আসক্তি রয়েছে, যা নাকি 'ক' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু ও 'খ' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর মধ্যে মারাত্মকভাবে কাজ করে। কিন্তু 'ক' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর সঙ্গে 'গ' মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর এই সম্পর্কই হয় অত্যন্ত নগণ্য মাত্রায় রয়েছে আর না হয় কোন সম্পর্কই নেই।

আবার, ধাতব ক্ষারের পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার হার কি হবে তারা তা জানতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, তাঁরা জানতেন ধাতব ক্ষারের পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার হার পানির সঙ্গে মিলিত হলে আণবিক ওজন বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃদ্ধি পায়। আবার হ্যালোজেন পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের পরমাণুর ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটাই সত্য হয়ে থাকে। কেউ এইরূপ হওয়ার কারণে জানতেন না, কিন্তু তাই বলে দৃশ্যত কেউই এই আপাতপ্রতীয় মান বিপরীত ধর্মকে আকস্মিক ব্যাপার বলেও উল্লেখ করেন নাই অথবা এমনি যুক্তি প্রদর্শন করেন নি যে, সম্ভবত আগামী মাসে বিভিন্ন প্রকারের সকল পরমাণু একই হারে প্রতিক্রিয়া করবে, অথবা একেবারেই করবে না। অথবা বিপরীতভাবে প্রতিক্রিয়া করবে, বা কোন প্রকারের সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন ভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। পরমাণুর ফলে এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক ধর্মের উল্লিখিত সকল দৃষ্টান্তে সঠিক আইন বিদ্যমান; লক্ষ্যহীনতা বা দৈবের কোন কিছু তাতে নেই।

জানা ১০২টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ ও তাদের আশ্চর্যজনক অসাদৃশ্য এবং সাদৃশ্য বিবেচনা করা যায়। এদের কতক রঙ্গীন, অবশিষ্ট বর্ণহীন; কতক গ্যাস জাতীয়, যে গ্যাসকে তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত করা অসম্ভব রকম কষ্টসাধ্য, আবার কতক তরল অবস্থায় বিদ্যমান। কতক আবার কঠিন অবস্থায় থাকে, যাকে তরল বা বাষ্পে পরিণত করা খুবই কঠিন; কিছু খুবই নরম, অন্যগুলো অস্বাভাবিক রকম কঠিন। কতক খুবই কঠিন; কিছু খুবই নরম, অন্যগুলো অস্বাভাবিক রকম কঠিন। কতক খুবই চমৎকার পরিবাহী; বাকীগুলো খুবই সামান্য পরিবাহী; কিছু রয়েছে চৌম্বক, অন্যগুলি তা নয়; কতক অম্ল সৃষ্টি করে আর বাকি ক্ষার সৃষ্টি করে, কতক অত্যন্ত দীর্ঘায়ুর অধিকারী, অন্যগুলো

www.pathagar.com

এক সেকেন্ডের সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় টিকে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও সকল রাসায়নিক পদার্থই ইতোপূর্বে উল্লিখিত পর্যায়ক্রম অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

এসব আপাত প্রতীয়মান জটিলতা সত্ত্বেও ১০২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির প্রতিটি পরমাণু একই রকম তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণিকা দ্বারা গঠিত প্রোটোন (পজিটিভ), ইলেকট্রোনিক (নেগেটিভ) ও নিউট্রোন (প্রত্যেকটি দৃশ্যত একটি প্রোটোন ও একটি ইলেকটোনের এক রকমের সংযোগ), প্রদত্ত এক রকমের একটি পরমাণুতে সব কয়টি প্রোটোন ও নিউট্রোন কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াসের' মধ্যে অবস্থিত এবং সব কয়টি ইলেকট্রোন সংখ্যায় প্রোটোনের সমান এবং এরা নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে বিভিন্ন 'কক্ষপথে' নিউক্লিয়াস থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক দূরে দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করে। ইলেকট্রোনের এই পরিক্রমণ ছোটখাটো সৌরজগতের মত, একেকটি পরমাণুর অধিকৃত অধিকাংশ অংশ শুধুমাত্র 'ফাঁকা শূণ্যতায়' ভর্তি। এবং যদিও এসব অবিশ্বাস্য রকম সহজতর মনে হয় তথাপি এক প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংগে আরেক প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর পার্থক্য- নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটোনের (এবং নিউট্রোনের) সংখ্যার যে পার্থক্য নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকটোনের সংখ্যা ও তাদের বিন্যাসের যে পার্থক্য বিদ্যমান, কেবলমাত্র তারই উপর নির্ভরশীল। যাতে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থসহ সব রকমের লক্ষ লক্ষ দ্রব্য 'সহজতর হয়ে' তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণিকায় পরিণত হয়, যা আবার একটিমাত্র প্রাথমিক সত্তা, বিদ্যুতের বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ হয়, যা সবশেষে সহজে পৃথক বা বিশ্লেষণ করা যায় না এমনি মৌলিক পদার্থের কেবলমাত্র একটি রূপ বা গুণ বা অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়- তাই হচ্ছে শক্তি।

এখন কথা হচ্ছে, অণু ও পরমাণু গড় হিসেবে জড়পদার্থ; অণু ও পরমাণু স্বয়ং; এদের সব উপাদান- প্রোটোন, নিউট্রন, তড়িৎ শক্তি; শক্তি নিজে- সবই দেখা যায়, উপযুক্ত আইন মেনে চলে, আদৌ দৈবের নির্দেশ মানে না। এই উক্তি এতই খাঁটি যে, ১০২ টি মৌলিক পদার্থের ১৭টি পরিচিতির হার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট! নিঃসন্দেহে জড়- এ মহাবিশ্ব, রীতি ও ক্রমের জগৎ, বিশৃংখলার নয়; আইনের জগৎ; দৈব বা লক্ষ্যহীনতার জগৎ নয়।

কোন প্রজ্ঞাবান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ধী-শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির কি এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব যে, অনুভূতিহীন, প্রাণহীন জড়পদার্থ আপনা-আপনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে এবং সবক্রম অতঃপর দৈবক্রমে নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ

www.pathagar.com

করেছে, আর তারপর, দৈবক্রমেই তা তাদের উপর আরোপিত আছে? নিশ্চয়ই এর জবাব হচ্ছে 'না'। শক্তি যখন 'নতুন' পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত 'আইনানুগতভাবে' অগ্রসর হয় এবং রূপান্তরের ফলে নতুন যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তা ইতোপূর্বে বিদ্যমান পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব আইনেরই অধীন হয়।

রসায়নশাস্ত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, জড়পদার্থ ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে, কতক খুব ধীরে ধীরে, আবার কিছু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা চলে, জড় পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়। অতএব, নিশ্চয়ই জড় পদার্থের একটা আরম্ভও রয়েছে। রসায়নশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এই ইঙ্গিত করে যে, এই সূচনা কখনও ধীরে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়নি; অপরপক্ষে হঠাৎ এর সূচনা হয়েছিল। ঠিক কখন এই সব জড় পদার্থের সূচনা হয়েছিল, উক্ত সাক্ষ্য আমাদেরকে আনুমানিক সেই সময়ও বলে দিতে পারে। অতএব বলা যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই জড়জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকেই 'আইন' মেনে চলছে, দৈবের কোন নির্দেশ মেনে চলছে না।

এখন কথা হচ্ছে, এই জড়জগৎ যখন নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি, পারেনি তাকে পরিচালনাকারী আইনাবলি সৃষ্টি করতে, তখন সৃষ্টির এই কাজ নিশ্চয়ই অ-জড় প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত প্রতিনিধি এই কাজ করতে গিয়ে অতীব বিস্ময়কর অলৌকিক যে ব্যাপার সম্পাদন করেছেন, তাতে এই-ই প্রতিপন্ন হয় যে, এই প্রতিনিধি নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী- যে মনীষাকে 'মনের' প্রতীক বলা যায়। জড়জগতে মনকে কাজে লাগাতে হয়; যেমন, চিকিৎসাকার্য পরিচালনে, অধিমনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'ইচ্ছাকে কাজে লাগানোর দরকার হয় এবং একজন 'ব্যক্তির বা সত্তার' পক্ষে ইচ্ছাকে কাজে লাগানো সম্ভব। অতএব আমাদের যুক্তিযুক্ত এবং অপরিহার্য সিদ্ধান্ত শুধু এই নয় যে, সৃষ্টি হয়েছে; বরং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই সৃষ্টি এক সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা ও জ্ঞানের (সর্বদর্শী) অধিকারী এক সত্তার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি একে সৃষ্টি করার ও সেই সৃষ্টিকে কায়েম রাখার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান (সর্বশক্তিমান)। তিনি সকল সময় এবং সর্বত্র মহাবিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান (সর্বত্র বিদ্যমান)। অন্য কথায় বলতে গেলে, এ প্রবন্ধের শুরুতে যে তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা

www.pathagar.com

ও নিয়ন্তা হিসেবে, আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে সেই "সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সত্তা আল্লাহ্'র অস্তিত্বকেই" মেনে নিচ্ছি।

লর্ড কেলভিনের যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতখানি অগ্রগতি হয়েছে যে, তৎসমুদয় অগ্রগতিই তাকে পূর্বাপেক্ষা আরো দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করতে সক্ষম করেছে, "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্'তে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করবে।"

উত্তর দেওয়া হয়নি এমনি সব প্রশ্নের জবাব

(ডোনাল্ড হেনরী পোটার। গণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদঃ বি,এস-সি, মেরিয়ন কলেজ, পি-এইচ, ডি, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক টিচিং ফেলো, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়। মেরিয়ন কলেজের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। স্পর্শ রূপান্তর, দুই-দ্বিমাত্র সীমিত পরিবৃত্তির ও পরম অনবচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ)।

যেমন করে জ্যামিতির পিথাগোরাসের সম্পাদ্য প্রমাণ করা হয়ে থাকে, যদি কেউ ঠিক একইভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন অবশ্য কর্তব্য হতো। আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের কোন প্রমাণের অস্তিত্ব নেই। অপরপক্ষে, অপ্রমাণিত আইন বা নীতির উপর ভিত্তি করেই মূলতঃ বিজ্ঞানের সৃষ্টি। এসব আইন সম্ভবতঃ হরেক রকমের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এগুলো প্রমাণ করা হয়নি কাজেই কেউ তাদের ব্যবহার করতে পারবে না এমন কোন নিষেধ নেই। যখন প্রাকৃতিক জগতে প্রমাণ মেলে না তখন অতিপ্রাকৃত জগতে প্রমাণের আশা করা আদৌ যুক্তিসংগত নয়।

পদার্থবিদ্যায় সকল প্রশ্নের সবচাইতে ভাল করে যেসব জবাব দেওয়া যেতে পারে তা আরম্ভ হচেছ, 'কি করে' এই কথা দিয়ে। পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে, 'কেন' দিয়ে আরম্ভ এমন অনেক প্রশ্নরই জবাব দেওয়া হয় না। 'কি করে' এই দিয়ে আরম্ভ প্রশ্নগুলোর জবাব সম্ভবত সত্যের সন্নিকর্ষ। কি করে দুটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, নিউটনের সার্বিক মহাকর্ষ আইনে তার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন দুটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই প্রশ্নের কোন জবাব তাতে উপস্থিত নেই।

www.pathagar.com

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদেরকে পৃথিবীর উপরে ধরে রেখেছে এবং সূর্যের চারদিকে নিজ কক্ষপথে স্থির দূরত্বে ধরে রেখেছে আমাদের এই পৃথিবীকে। কিন্তু এর জন্যেই শুরু হয়েছে অনুমিতি। বিশ্বের একটি থিওরির জন্যে মহাকর্ষ আইনের বিপরীতটার প্রয়োজন হয় এবং যদি দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিকর্ষণকারী শক্তি হওয়ার প্রয়োজন হয়।

বৈদ্যুতিক উপায়ে আহিত (Charged) বস্তুর মধ্যে, শক্তি পরিচালনাকারী একটি স্বীকৃত আইন বিদ্যমান। এরূপ আধান (Charged)-কে বলা হয়, অপরা (Nagative) ও পরা (Positive) আধান। উক্ত আইনে বলা হয় যে, এই আধান যদি বিপরীত চিহ্নের হয়, তাহলে আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হবে, আর যদি একই চিহ্নের হয় তা হলে বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হবে, আর শক্তি সকল ক্ষেত্রেই দুটি আধানের গুণফলের সরাসরি আনুপাতিক রাশি ও দুটি বস্তুর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক রাশি হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটোন নামে অভিহিত পরা-আধান সম্পন্ন কণিকা থাকে। কিন্তু আমরা যখন একটি পরমাণুর অতিশয় ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রবিষ্ট হই তখন এই আইন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, আর তখন আমাদের শক্তির একটি নতুন আইন অপরিহার্যরূপে ধরে নিতে হয়। এই আইনকে বলা হয়, 'নিউক্লিয়াস শক্তি'। কাজেই প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষ যখন এর খুব বড় অথবা খুব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে, তখন তার প্রচেষ্টা নগণ্য প্রতিপন্ন হয়, কুলোয় না।

মনে হয়, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও তার সূত্র ব্যাখা করতে যেয়ে যেন বাধ্য হয়েই ঘটনাস্থলে আল্লাহ্‌কে টেনে না এনে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ গাণিতিক ও দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেল, "খোদাকে কে সৃষ্টি করেছে?" এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি বলে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খোদা বলে কেউ নেই। রাসেলের চিন্তাধারা চিন্তারাজ্যের গভীরতম প্রদেশে আরো বহুদূর প্রসারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু যখন প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক থিওরি শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি এমনি প্রশ্নে পৌঁছায়, তখন এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া কি যুক্তিসংগত হয়েছে? আমার নিজের কথা হচ্ছে, আমি খোদাকে ঘটনাস্থলে স্থাপন

www.pathagar.com

করে থাকি। সৃষ্টিকর্তাই বস্তুর ধর্ম বস্তুর পরিবার এবং পরিচালনার আইনসহ সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

যেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি এমনি প্রশ্নের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মহাবিশ্বে দুটি থিওরী বর্তমানে সর্বাধিক অভিনন্দিত হচ্ছে। কিন্তু এই দুটি থিওরীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আগে আসুন আমরা কিছু প্রাথমিক বিষয় দেখে নি।

সৃষ্টি তত্ত্বে, আমাদের মহাবিশ্বের সাধারণ আকৃতি, মহাশূন্যে ইহা কতদূর পরিব্যাপ্ত এবং কালের হিসাবে কতদিন এর স্থিতিকাল, তারই গবেষণা বিদ্যমান। পালেমার পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে ২০০ ইঞ্চি বিশাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ মহাশূন্যে এক মহাপদ্ম আলো বছরের বেশি দেখতে পায় এবং প্রায় এক মহাপদ্ম ছায়াপথ তার নজরে পড়ে, দূরত্বের মাত্রা হিসেবে আলো বছর বলতে প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রমকারী আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বুঝায়। আজকের দিনে আকাশের যদি আলোকচিত্র নেওয়া হয়, তাহলে আলো চলে যাওয়ার পর নক্ষত্রগুলোকে যেমন দেখিয়েছিল, ঠিক ছবিতে তেমনি দেখাবে। সম্ভবত এই আলো বহু লক্ষ বছর আগে চলে গেছে।

একটি ধারণা, যা নাকি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে! তিন পলা কাচের মধ্য দিয়ে মানুষ যখন দেখে তেখন সে রঙধনুর রংগুলো দেখতে পায় এবং যদি একটি ধারাবাহিক বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি করার জন্যে বর্ণগুলো একত্রে মিলিত হয়, তখন তাকে ধারাবাহিক বর্ণালী বলা হয়। মৌলিক পদার্থগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সব বর্ণের দ্বারা সনাক্ত করা যেতে পারে এই সত্যের উপর ভিত্তি করে বর্ণালী বিষয়ক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত আলোর প্রতিসরণ দ্বারা উক্ত মৌলিক পদার্থের বর্ণালী সৃষ্টি হয় এবং এই প্রতিসরণ দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণ যার বণ্টন ও পরিমাত্র মৌলিক পদার্থের বৈ আর কিছু নয়। এমনিভাবে, এই পৃথিবীতে আর সব আবিষ্কারের আগে সূর্যে একটি পদার্থ আবিষ্কৃত হয় এবং এর নামকরণ করা হয়, হেলিয়াম। গ্রিক ভাষায় 'হেলিয়াম' শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য, তা থেকেই এই নাম। বর্ণালীর যে পাশে লাল রং সেই দিকে বর্ণালীর স্থান পরিবর্তন বা সরে

www.pathagar.com

যাওয়াকে লাল চালান বলা হয় এবং এই চালান এটাই নির্দেশ করে যে, আলোর উৎস পর্যবেক্ষণকারীর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। দূরবর্তী ছায়াপথগুলি পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই থিওরী গড়ে উঠেছে যে, মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আলোকপথগুলো ক্রমান্বয়ে বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে।

এখন পূর্বোল্লিখিত দুটি সর্বাধিক অভিনন্দিত থিওরিতে আসা যাক। একটি হচ্ছে, আলফা ও গামার বিকাশের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির থিওরি এবং অপরটি হচ্ছে হেয়ালীর নিয়ত অবস্থা সম্পর্কিত থিওরি।

প্রথম থিওরী মোতাবেক, কল্পনানীত ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট অবস্থা থেকে বিস্ফোরণের ফলে এই মহাবিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে। এই থিওরী আরও প্রস্তাবনা করে যে, অত্যন্ত সম্প্রসারিত এবং মারাত্মক রকম উত্তাপমূলক গ্যাস থেকে মহাবিশ্ব তথা নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্রহাদি ও বিশ্বের বিশাল পটভূমির যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথের এই যে বাইরের দিকে বর্তমানের গতি, তা উক্ত যাবতীয় বিস্ফোরণের ফল।

এই আলফা ও গামার থিওরী স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করে যে, যখন আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স মাত্র পাঁচ সেকেন্ড হয়েছিল, তখন তার তাপমাত্রা ছিল এক মহাপদ্ম ডিগ্রী। এর আগে যাবতীয় জড়পদার্থ শুধুমাত্র প্রোটোন, নিউট্রন ও ইলেকট্রোন দ্বারা গঠিত ছিল এবং মারাত্মক রকম তাপমাত্রা আর চাপের জন্য জড়পদার্থ বিযুক্ত অবস্থায় ছিল। বিস্ফোরণের পর অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হওয়ার পর তিরিশ মিনিটের মধ্যে সকল রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই থিওরী অনুযায়ী হাল্কা মৌলিক পদার্থ অপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থগুলো সৃষ্টি হতে অনেক বেশি ধারাবাহিক পর্যায় অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আজকের এই ছায়াপথগুলি সৃষ্টি হয়, হয়তো বিস্ফোরণের পর বহু লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হলে অথবা অনুরূপ বহু বছর পরে এই ছায়াপথের সৃষ্টি হয়। ছায়াপথগুলো সৃষ্টির ব্যাপারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল ফলোৎপাদী কারণ।

কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনার ঠিক আগের মুহূর্তে কি অবস্থা বিদ্যমান ছিল? প্রস্তাব করা হয়েছে, আমরা যেন সৃষ্টির গোটা প্রক্রিয়াকে এমনিভাবে বিবেচনা করি যে, আমাদের মহাবিশ্ব পূর্ববর্তী একটি মহাবিশ্বের মারাত্মক রকম

www.pathagar.com

সংকোচনের ফলে উদ্ভুত হয়েছে। পূর্ববর্তী মহাবিশ্ব অসীম অনুভবন (সূক্ষ্মতা বা ছিদ্রময়তাঃ এর ঘনত্বের বিপরীত) এর অবস্থা থেকে অনন্তকালের জন্য যখন ধ্বংস হতে চলেছিল, তখনই মারাত্মক সংকোচনের সৃষ্টি হয়।

আমি যদি এই থিওরী গ্রহণ করি যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব খুবই মারাত্মক রকম সম্প্রেষিত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করেছে এবং সূচনায় ইহা কল্পনাতীত উত্তপ্ত ছিল, তাহলে যেসব কণিকা ও যে উৎস শক্তি থেকে এই চাপ ও উত্তাপের সৃষ্টি সেইসব কণিকা ও শক্তির উৎসের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে আনতে হয়। তাহলে, আল্লাহ ঘটনাস্থলে এসে যাচ্ছেন।

বোন্ডি গোল্ড হেয়ালী থিওরীকে নিয়ত অবস্থার থিওরী বা ধারাবাহিক সৃষ্টির থিওরী বলা হয়। উক্ত থিওরী এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, মহাশূন্যও সময় উভয়ের মধ্যেই মহাবিশ্ব সমমাত্র কিন্তু স্থৈতিক নয়; এই থিওরীর উদ্ভাবকগণ স্বীকার করেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচেছ এবং ছায়াপথগুলো ক্রমশ বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে। ছায়াপথগুলোর সরে যাওয়ার ক্ষতিপূরণের পরেও মহাবিশ্বের সেই পূর্বের আকৃতি ধরে রাখার জন্য তারা স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধরে নিয়েছে যে, জড়পদার্থ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হচ্ছে এবং যেসব ছায়পথ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট আমাদের দৃষ্টি সীমানা অতিক্রম করে বাইরে চলে যাচ্ছে, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন নতুন ছায়াপথ সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আলোর সাহায্যে দেখে থাকি, এবং যদি কোন বস্তু আলোর গতির অধিক গতিবেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে আমাদের দিকে আলো আসতে পারবে না এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, উক্ত দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। হিসেব করা হয়েছে, দুই মহাপদ্ম আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথের এমনি গতিবেগ থাকতে পারে এবং তাই তা চিরদিনের জন্যে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। পালোমার পর্বতের উপরে যে বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে বর্তমানে তার সাহায্যে যতটা দূরে দেখা যেতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে এই দূরত্ব তার দ্বিগুণ। সূর্যের যতটা বয়স হয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে যদি এ মহাবিশ্ব উক্ত হিসেবের এক-পঞ্চমাংশ সময় ধরে উল্লেখিত গণনাকৃত হারে সম্প্রসারিত হতো তাহলে এতদিন আমাদের নজর সম্পূর্ণ শূন্যতায় পরিণত হতো।

www.pathagar.com

সারাক্ষণই যেহেতু ছায়াপথের সৃষ্টির জন্য বিশ্বের জড়পদার্থ সংকুচিত হতো কাজেই ধারাবাহিক সৃষ্টির থিওরী অনুযায়ী পটভূমিকায় জড়পদার্থ নতুন কিছু সৃষ্টি করতো। এমনিভাবে মহাবিশ্বের সাধারণ আকৃতির কোন পরিবর্তন হতো না। নয়া সৃষ্ট জড়পদার্থ বাইরের দিকে চাপের সৃষ্টি করতো তার ফলে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতো। সৃষ্টি সম্পর্কে হেয়ালী এই আভাস দিয়েছেন যে, জড় পদার্থ কোন স্থান থেকে আসে না। ইহা শুধু মাত্র আবির্ভূত হয়।

আমার দিক থেকে বলতে হয়, আমাকে যদি এই ধারাবাহিক সৃষ্টি সম্পর্কিত থিওরী সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমি অবশ্য সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্কে স্বীকার করবো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ ঘটনাস্থলে সমুপস্থিত।

প্রকৃতির প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কোন কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন অথবা প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন পর্যালোচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে সক্রিয় প্রধান ভূমিকায় আল্লাহকে বসিয়ে আমি চরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ছবিতে (ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ হচ্ছেন মূল চরিত্র। যে সব প্রশ্নের আজো জবাব দেওয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।

পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়ে আসুন অন্যের দিকে তাকাই

(এডওয়ার্ড লুথার কেসেল- প্রাণীতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববীদঃ এম.এস.সি. পি.এইচ,ডি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সানফ্রানসিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমী অব সায়েন্সের স্টাফ-কীটপতঙ্গের এসোসিয়েট কিউরেটর, জীববিদ্যার ওয়াসম্যান জার্নালসহ কারিগরী প্রকাশনার সম্পাদক। কীটপতঙ্গের ভ্রূণতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, সালামান্ডার ক্লিথীডির ডিপটারোলজী বিশেষজ্ঞ।)

তিনি বলেছেন, সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আল্লাহ্ আছেন বলে সনাতন দর্শনে যেসব প্রমাণ রয়েছে তাকে সমর্থন করে নতুন প্রমাণ সৃষ্টি করছে। এই নতুন প্রমাণের যে কোন প্রয়োজন আছে তা নয়। কারণ, যার মন পক্ষপাতের ঠুলিতে ঢাকা নয়, তাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে সনাতনী প্রমাণগুলো প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি। তবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই বিশ্বাসীদের একজন হিসাবে আমি দুই কারণে পূর্ব প্রমাণের সংগে এই অতিরিক্ত

www.pathagar.com

প্রমাণসমূহকে স্বাগত জানাইঃ (১) এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কতিপয় সিফাত বাগুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে; (২) আমি বিশ্বাস করি, এসব প্রমাণ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সত্যাশ্রয়ী অনেক নাস্তিকের চোখ খুলে দেয়, যাতে তারা দেখতে পারেন- যথার্থই আল্লাহ্‌ একজন আছেন।

এক বিরাট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বিগত কয়েক বছরে আমাদের সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, ধর্মীয় চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই আলোড়নের ঢেউ শুধু আমাদের কাজগুলোকে অতিক্রম করেনি, অধিকন্তু আমাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জীবনের সংযোগের সৃষ্টি করেছে। ইহা অত্যন্ত নিশ্চিত ব্যাপার যে, সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা ও নির্দিষ্টকারী আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ব্যাপারে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অবশ্য যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে তা কখনও আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে করা হয় নি। কারণ, বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হচেছ প্রকৃতির তথ্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন তাই বিজ্ঞানের উৎকণ্ঠা নেই। বিজ্ঞান কেবল প্রাকৃতিক কলকজা নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু এই কলকজা কোথা থেকে এল এই মৌলিক প্রশ্নটি বিজ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তবে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, তা তিনি বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন; একটি করে দার্শনিক মন লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, একজন ভাল বৈজ্ঞানিক সব সময় ভাল দার্শনিক হন না। অনেকে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে খুব অস্পষ্টভাবে চিন্তা করেন। আবার অনেকে আছেন, যারা এই মহাবিশ্ব নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এমনি একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আসছেন। আবার অন্যান্যরা বলেন, আবহমানকাল থেকে এই মহাবিশ্ব বিরাজমান। এই কথাটি তাদের কাছে মনে করা যেমন সোজা, তেমনি সর্বকালে বিরাজমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাও তাদের পক্ষে সহজ।

তাপ গতিবিদ্যা-র দ্বিতীয় আইন বা Law of Entropy নামে অভিহিত আইন অধিকাংশ সময় প্রমাণ করে যে, শেষ গোষ্ঠী ভুল করেছেন। বিজ্ঞান সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে কখনই বিরাজমান হতে পারে না। Law of entropy বলে যে, উত্তপ্ত বস্তু থেকে ততোধিক শীতল বস্তুতে

www.pathagar.com

সব সময় তাপ প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাপ প্রবাহের এই নিয়মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপরীতগামী করার জন্যে কখনও পাল্টানো যায় না। মাপ্য শক্তির তুলনায় অমাপ্য শক্তির অনুপাত হচ্ছে entropy; যাতে করে বলা যায় যে, মহাবিশ্বের entropy সব সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতত্রব, মহাবিশ্ব এমন এক সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যখন সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রা সমান হবে এবং তখন প্রয়োজনীয় আর কোন শক্তিই থাকবে না। পরিণামে আর কোন রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া থাকবে না এবং সকল প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এখনও পৃথিবীতে প্রাণী বিরাজমান এবং রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে; কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে না। অন্যথায় এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাজে লাগানোর উপযোগী শক্তি বহুদিন আগেই শেষ হয়ে যেতো আর সেই সংগে প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যেতো। কাজেই, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিজ্ঞান এই কথাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। আর এই কথা প্রমাণ করতে যেয়ে বিজ্ঞান সেই সংগে আল্লাহর সত্তাকে প্রমাণ করে, যারই সূচনা রয়েছে সেই আপনা থেকে আরম্ভ হয়নি, অধিকন্তু এর জন্যে এক পরম ও চরম প্রস্তাবক একজন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রয়েছেন।

অনাদিকাল থেকে আমাদের মহাবিশ্ব বিদ্যমান ছিল না এই কথা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের কাছে শুধু যে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ রয়েছে তাই নয়, সেই সংগে বিজ্ঞান এমন কথাও প্রমাণ করেছে যে, একটিমাত্র প্রচণ্ড সৃষ্টিশীল বিস্ফোরণের ফলে এই মহাবিশ্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই বিস্ফোরণ ঘটে প্রায় পাঁচ মহাপদ্ম বছর আগে। বাস্তবপক্ষে, মহাবিশ্ব তার সৃষ্টির মূলকেন্দ্র থেকে এখনও সম্প্রসারিত হচ্ছে। আজকের দিনে যারা বিজ্ঞানের প্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তাদের অবশ্য সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, সৃষ্টি প্রকৃতির সকল আইনকে অতিক্রম করে যাবে। কারণ এইসব আইন নিজেরাই সৃষ্টির ফল। অবশ্য যাকে আল্লাহ্র সঙ্গে শামিল করা যেতে পারে, এমন একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনক্রমেই এমন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তিনি একেবারে প্রকৃতির সব সাজ-সরঞ্জাম এবং এসবকে পরিচালনাকারী আইনাবলি প্রতিষ্ঠা করার পর এই যান্ত্রিকতাকে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার করেন- যে সৃষ্টি অবঘাতন (সৃষ্টি, উৎকর্ষতা)-এর মধ্য দিয়ে অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে, অবঘাতন কথাটি অনেক মহলেই নিষিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে শুধু কথাটি উচ্চারিত হলেই অনেকের ভ্রূকুচকে যায়। অদ্ভুত মনে হলেও আমি এসব সৎ-বন্ধুদের শুধু যে বুঝতে পারি তাই নয়, অধিকন্তু আমি তাদের সংগে একমত। অবঘাতন বলতে তাঁরা জড়বাদ সম্বন্ধীয় (বলবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বা যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত) অবঘাতনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে তুলতে চান।

যে সততা নিয়ে এবং পক্ষপাতিত্ববাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজস্ব গবেষণার ফলাফলের মূল্য নিরূপণ করে থাকেন, যদি তেমন মন নিয়ে সকল বিজ্ঞানী এখানে বর্ণিত, বিজ্ঞানের সকল সাক্ষী বা প্রমাণ বিবেচনা করতেন, যদি তারা শুধুমাত্র ভাবাবেগের উপর নিজেদের বুদ্ধিমত্তার স্থান দিতেন, তাহলে আল্লাহ যে আছেন একথাটি মেনে নিতে তারা বাধ্য হতেন। এসব তথ্যের জন্য উপযুক্ত এই একটিমাত্র পরিসমাপ্তিই হতে পারে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যায়ন করলে, আমরা যাকে আল্লাহ বলি সেই 'মূল কারণ'- এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি নিঃসন্দেহে তার মন এগিয়ে যাবে।

আল্লাহ্ আমাদের যুগের প্রতি অত্যন্ত উদার এবং তাই আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রকৃতি সম্পর্কে আবিষ্কার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। এমন সকল মানুষের, তা তিনি বৈজ্ঞানিক হন বা অবৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব হচ্ছে তাদের বিশ্বাসকে সূত্রাকারে গ্রথিত করার ব্যাপারে বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞানকে বিবেচনার মধ্যে নেয়া। সংস্কারমুক্ত একজন বৈজ্ঞানিক যেমন আবশ্যকীয়ভাবে এই প্রমাণের প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং স্বীকার করবেন যে, আল্লাহ বলে নিশ্চয়ই কেউ আছেন; তেমনি অবৈজ্ঞানিককেও অবশ্যই এই প্রমাণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতন আল্লাহ্রই সৃষ্টির পদ্ধতি। তিনি একেবারে এই মহাবিশ্বের সকল উপাদান সৃষ্টি ও আইনাবলি প্রতিষ্ঠার পর এই সৃষ্টিপদ্ধতি কায়েম রেখেছেন। আমাদের জন্য প্রকৃতির প্রতিটি পৃষ্ঠাময় যেসব প্রমাণ সমুপস্থিত করা হয়েছে, সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতনই তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার আকারে বাইবেলের সব ভাষ্য বা টীকা সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতনের প্রমাণ দান করে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ- অংগ-সংস্থান বিদ্যা, শরিরতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, জীব

www.pathagar.com

রসায়ন, জাতি-বিদ্যা, জীবাশ্ম বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান ও প্রাণীবৃত্তান্ত ইত্যাদিতে এই প্রমাণ মেলে।

অবঘাতন যেমন সৃষ্টির কলকব্জা তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচন অবঘাতনের অন্যতম প্রধান কলকব্জা। ইহা প্রকৃতির প্রধান প্রধান আইনের একটি এবং বিজ্ঞানের অন্যসব আইনের মতই ইহা গৌণ কারণ হিসেবে কাজ করে। কারণ ইহাও আল্লাহ্'র সৃষ্টিরই একটি ফল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যেসব প্রজাতি উৎপন্ন হয়, তা আল্লাহ'র সৃষ্টির সমান সমান; মনে হয় যেন আল্লাহ্ এদের উৎপন্ন করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু প্রকৃতিতে জাতির প্রকারান্তরের উদ্বর্তন ও পুনরুৎপাদনকে অনুমতি প্রদান করে। জাতির এই প্রকারান্তর যা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন করে থাকে তা জাতিবিদ্যা (বংশ ইত্যাদি)-র আইনাবলির ফল পরিব্যাপ্তি (পরিবর্তন) থেকে উদ্ভূত এবং জড়জাগতিক অভিব্যক্তিবাদিরা এসব প্রকারান্তর অন্ধ দৈবাধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মাতে চাইলে তদনুযায়ী পরিচালিত হয় না।

পরিব্যাপ্তি কখনও সম্পূর্ণভাবে দৈবাধীন বা লক্ষ্যহীন নয়- যদিও অনেকেই এতকাল ধরে এমন দাবিই করে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ সেই সব পরিব্যাপ্তি বিবেচনা করা যাক্ যা অংগের আকার নির্ধারণ করে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব পরিব্যাপ্তির অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট অংগের আকারের হ্রাস ঘটিয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন, উদ্দেশ্যহীন পরিব্যাপ্তিতে অন্ধ দৈবাধীনে কাজ করে কেবলমাত্র হানিকর অংগের হ্রাস ঘটাতে পারে, তা সত্ত্বেও সাধারণ গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিরপেক্ষ অংগগুলোও হ্রাস পেয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরিব্যাপ্তি সব সময় উদ্দেশ্যহীন হয় না এবং অবঘাতনের কলকব্জা অন্ধ দৈবাধীন নয়। তাই আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই সৃষ্টির পশ্চাতে এবং এই আইনাবলি প্রতিষ্ঠার পেছনে মনীষা রয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, অবঘাতনের এই কলকব্জা পরিকল্পিত এবং এটাই এক মহাজ্ঞানী পরিকল্পনাকারীর দাবি করে।

প্রকৃতির পরিকল্পনার অন্যান্য যেসব প্রমাণ রয়েছে, স্থানাভাবে তার উল্লেখ সম্ভব হচ্ছে না, তবে কীট ভ্রূণতত্ত্ব ও তাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমি আমার সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

সামান্য গবেষণায় অনেক প্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি। প্রকৃতি সম্পর্কে আমি যত বেশি গবেষণা করি, এসব প্রমাণ আমাকে ততই মুগ্ধ করে। বিজ্ঞানে আমরা যেসব পদ্ধতি ও প্রপঞ্চকে পর্যবেক্ষণ করি তা যথার্থই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর অভিব্যক্তি, আর অবঘাতন শুধুমাত্র সৃষ্টির একটি পর্যায়কে বর্ণনা করে।

মূলতত্ত্বী ও জড়বাদী, উভয় শিবির থেকে অত্যন্ত উৎসাহী সমালোচনা সত্ত্বেও, অবঘাতনিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ধর্মীয় কোন নীতিবাচক গুরুত্ব নেই; যদিও এদের ধর্মান্ধ সমালোচনা উভয় পক্ষের অনেক প্রকৃত সত্য-সন্ধানীকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এর সম্পূর্ণ বিপরীতটাই সত্য- কারো পক্ষে অবঘাতনের সত্তাকে মেনে নিয়ে সেই সংগে আল্লাহর সত্তাকে স্বীকার না করা যেমন পরস্পর বিরোধী, তেমনি অযৌক্তিক ও উদ্ভট।

চতুর্দশ শতকের মহান অগস্টাইনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহতে বিশ্বাসী এমন অসংখ্য লোক রয়েছেন যারা অবঘাতন দ্বারা সৃষ্টির মতবাদকে সমর্থন করে নির্মাণ প্রণালী দ্বারা সৃষ্টির কল্পনাকে বর্জন করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব কারণে (এবং আমি নিজেকে তাদের একজন মনে করি বলে) অবঘাতনের একটি ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে- যা সম্পূর্ণ খাটি ও পূর্বসংস্কারবিমুক্ত তথ্যানুসন্ধানীকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে।

তাই আমি আঁবার বলছিঃ সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনকে আকর্ষণ করবে বেশি।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রয়োগ

(ওয়াল্‌টার অসকার ল্যান্ডবার্গ। শরীরবৃত্তবিদ ও জীব রাসায়নিকঃ পি-এইচ. ডি, জনস হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যলয় ও ইউএস স্টীল কর্পোরেশনের পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক রাসায়নিক; শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত রসায়নের অধ্যাপক, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; কৃষি সম্পর্কিত জীব রসায়নের অধ্যাপক, মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪৯ থেকে হর্সেল ইনস্টিটিউটের কার্যকরী ডিরেক্টর। বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও রাসায়নিক সমিতির সদস্য, প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টর। 'চর্বি ও অন্যান্য বস্তুর রসায়নে অগ্রগতি' Progress in the Chemistry of

www.pathagar.com

fast and other Fquids)- এর ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ডের সম্পাদক এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার)।

তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে পেশাদারী বৈজ্ঞানিকের অন্যান্যদের তুলনায় একটি বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে, অবশ্য যদি তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তার বৃত্তির নিয়মবদ্ধতা যে সমুদয় মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তার সবই বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেকে, যারা এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেন না, তারা বৈজ্ঞানিক হিসেবে সিদ্ধপুরুষ এবং একে সাধারণ রীতিবহির্ভূত বলে মনে করা উচিত হবে না। প্রধানত স্বীকৃত নিয়মবদ্ধতার প্রয়োগের উপর বিজ্ঞানের সাফল্য নির্ভর করে এবং এই জন্যে এর মৌলিক সত্যসমূহের সুক্ষ্মদর্শী মূল্যবোধের কোন প্রয়োজন হয় না।

এসব মৌলিক নীতির আস্তিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে এবং স্বীকৃতিদানে কতিপয় বিজ্ঞানীর ব্যর্থতা বহুবিধ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, যার মাত্র দুটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথমত অনেক সময় প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ স্বেচ্ছাচারী নীতি অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। নাস্তিকতা যে রাষ্ট্রের ধর্ম, সে রাষ্ট্রে সামাজিক পরিণতির এমন কি শারীরিক নিপীড়নের ভয় প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের যেসব নিদর্শন মেলে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের পক্ষে তার সক্রিয় পক্ষাবলম্বনকে নিরুৎসাহিত করে।

আবার এমনও হয়, যখন মানুষের মন যথার্থই ভয়ভীতিমুক্ত থাকে তখন তা অন্যান্য পূর্বপ্রবণ সংস্কারমুক্ত নাও হতে পারে। প্রায় বেশির ভাগ সময়েই সুসংবদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্মে অত্যন্ত ধীরে ধীরে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের মনে মানুষের রূপে আল্লাহ্ সম্পর্কে একটি ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়, আল্লাহ্‌র রূপে যে মানুষের সৃষ্টি এমন ধারণা তারা পায় না। এসব মন যখন পরে বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে তখন এর বিপরীত হয় এবং সসীম নরধর্মী প্রত্যয় ক্রমশ বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত উপপাদক মনোভাবের কাছে অধিক থেকে অধিকতর অসংগত হয়ে ওঠে। পরিশেষে যখন সমন্বয়ের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (যেমন অধিকাংশ সময়ই হয়ে থাকে কারণ এই প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

যে যুক্তাভ্যাস প্রক্রিয়াকে জড়ানো হয় সে সব প্রক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক নিয়মের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ) তখন আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাটি পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে। সেই সংগে মোহমুক্তি ও অন্যান্য মনঃস্তাত্ত্বিক পরিণতি নতুন কোন প্রত্যয়কে আঁকড়ে ধরার চিন্তাকে নিরুৎসাহ করে।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম কি এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব ব্যক্তকারী মূলতত্ত্বগুলোই বা কি? সংক্ষিপ্তাকারে ও সরল ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, নিম্নলিখিত ক্রমগুলো এই আলোচনার উদ্দেশ্য হাসিল করবে।

প্রথমত বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রাকৃতি প্রপঞ্চ পর্যবেক্ষণ ও তার ফল লিপিবদ্ধ করেন। প্রপঞ্চের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে যেমন করা হয়ে থাকে নাক্ষত্রিক পদার্থ এবং আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যের গবেষণায় অথবা গবেষণাগারের পরীক্ষায় যেমন আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তেমনি ভাবে এই কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক তার গবেষণার ফলের সংগে, তার পূর্ববর্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সম্পর্কে একত্র করে নিয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রকল্প গড়ে তোলেন। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পে যতটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী মানসিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, কাজেই ইহাতে অবরোহ প্রণালী অপেক্ষা আরোহ প্রণালী বিজড়িত। বস্তুতপক্ষে, এইগুলিই ভবিষ্যদ্বাণী। অবশেষে, যদি বৈজ্ঞানিক স্বীয় সিদ্ধান্তাবলী পরীক্ষা বা বৈধ করার অভিলাষী হন তাহলে তিনি অতিরিক্ত এবং নতুন পর্যবেক্ষণকার্য পরিচালনা করেন এবং তার ভবিষ্যদ্বাণীর সংগে সেগুলি মতৈক্যে পৌছায় কিনা তাই নির্ধারণ করেন।

সংক্ষেপে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের সুশৃংখলতা আর ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আরও সংক্ষেপে বলা যায়, এই সুশৃংখলতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতাই প্রকৃতিতে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশকে তুলে ধরে মানুষের সম্মুখে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব নেই এমনি কাঠামোতে অর্থাৎ যেখানে যুক্তিসিদ্ধতা অনুপস্থিত সেখানে সুশৃংখলতা ও ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা অর্থহীন অসংগতি মাত্র।

www.pathagar.com

প্রকৃতিতে সুশৃংখলতা আর ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা যথার্থ হৃদয়ংগম করায় মানুষের যে ক্ষমতা, সাধারণত তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রভাকে অনুসরণ করে না। কিন্তু এই হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কল্পনায় মানুষকে সৃষ্টি করার ফল। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণাকে বর্জন করে, প্রকৃতির প্রত্যাদেশসমূহকে আল্লাহর কল্পনায় মানুষের সৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেই মানুষ এমন এক প্রারম্ভিক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখান থেকে সে আল্লাহ্‌র গরিমা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করতে পারে।

মানুষ কিন্তু এখনও জ্ঞানের প্রথম সোপানে রয়েছে। তার নিজ শারীরিক আকার-আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, নাক্ষত্রিক পদার্থ আর আন্তনাক্ষত্রিক মহাশূন্য যে অস্বাভাবিক রকম বিকাশ, জড় পদার্থ ও শক্তির মৌলিক উপাদানগুলো যে কল্পনাতীত ক্ষুদ্র এবং তার নিজের আয়ুষ্কাল চলমান মহাবিশ্বের অসীমতার মাঝে যে এক সেকেন্ডেরও নিরতিশয় ক্ষুদ্র সময়ের সমান সে সম্পর্কে তার কিছুটা সচেতনতা আছে। শক্তি, মহাশূন্য এবং কাল ও অনুরূপ অন্য যে সব ক্ষীণ ধারণা পোষণ করতে পারে। সে জীবনকে সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সত্য, কিন্তু কি এর প্রকৃতি সে সম্পর্কে তার কোন বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি নেই। তথাপি সুশৃংখলতা ও ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তার সামনে অনাবিষ্কৃত জ্ঞানের যে বিরাট সীমাহীন দৃশ্য পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তার সীমাবদ্ধ বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়। এখানে পৌঁছেই সে এক ঝলক আল্লাহ'র গরিমা অবলোকনে সক্ষম হন।

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে আল্লাহ্‌কে যে ভাবমূর্ত করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে হৃদয়ংগম করার ক্ষমতা আজও মানুষের সীমাবদ্ধ, তাই মানুষের মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব। তার বিশ্বাসের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তিও থাকে, ঈমানের একটি ভিত্তি, এটাই মানুষের স্বাভাবসিদ্ধ। ঈমানের ভিত্তিতে এক স্বয়ংকৃত আল্লাহ্'তে বিশ্বাস স্থাপন করা অনেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেন, তাদের আরো একটি অতিরিক্ত পরিতুষ্টি রয়েছে, যা আসে প্রতিটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের হাত ধরে। কারণ, প্রতিটি আবিষ্কার, আল্লাহ্ সম্পর্কে তার ধারণার আরও অতিরিক্ত অর্থ এবং তাৎপর্য দুই-ই বৃদ্ধি করে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্'র বাহ্যিক প্রমাণঃ

(পলক্ল্যারেন্স ইবারসোল্ড। প্রাণপদার্থ বিজ্ঞানবিদঃ এ,বি কানডেল, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এম,এ, পি-এইচ,ডি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ফিনে হাওয়েল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সাবেক বিকিরণ বিশেষজ্ঞ ও রোয়েন্টজেনোলজিস্ট, ইউ,এস, বুরো অফ স্টান্ডার্ডস এর মানহাটন পরিকল্পনার রিচার্স লিয়াজো। এইড, আণবিক শক্তি কমিশনের ওকরীজ অপারেশন আইসোটোপ বিভাগের ডিরেক্টর। আণবিক বিজ্ঞান কমিটি, জাতীয় গবেষণা কাউন্সিলের এবং বিভিন্ন জাতীয়জীবতত্ত্ব সম্পর্কিত ও রেডিওলজি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য। আণবিক পদার্থ বিদ্যা, প্রাণ পদার্থ বিদ্যা, নিউট্রন বিকিরণের উপাদান ও আইসোটোপ বিশেষজ্ঞ।)

বলেছেন, ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্রান্সিস্ বেকন তিন শতাব্দীরও আগে বলেছিলেন, "সামান্য দর্শন-জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।"

নিঃসন্দেহে বেকন সত্য উক্তি করেছিলেন

মানব জাতির অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষকে লক্ষ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার চাইতে বেশি সংখ্যক চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র এসব রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন কোন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, কোন অনন্ত শক্তিশালী মানুষ এই অন্তহীন মহাবিশ্বকে পরিচালনা করেন? জীবন আর মানুষের অভিজ্ঞতার মূলে অথবা বাইরে কি আছে?

যদি পৃথিবীর উপরে এই প্রাণিজগতে বেঁচে থাকে তাহলে ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি বংশধরদের অগণিত মহাপদ্মসংখ্যক মানুষের প্রত্যেকে এইসব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে। যেহেতু গভীর ও বহুল আত্মা এসব প্রশ্নের একান্তভাবেই খোঁজ করছে, কাজেই আমরা কোন প্রকারে পূর্ণ হতে পারে এমনি কোন জবাবের প্রত্যাশী না হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবেই প্রশ্নগুলো বিবেচনা করতে এগিয়ে যাই।

একটি কথা খুবই সত্যি যদিও মানুষ খুব উপায় উদ্ভাবনে পটু এবং বুদ্ধিমান তথাপি সে কখনও নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমনি ধারণা করতে পারেনি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্মের, জাতির এবং মহাদেশের মানুষ ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে এবং সার্বজনিন মনোভাব নিয়ে এই বিশ্বে জীবনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য কি এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসহ বিশাল মহাবিশ্বকে বুঝতে আর বোঝাতে যেয়ে মানুষের মারাত্মক রকমের অসামর্থকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন।

বুদ্ধি অথবা চেতনা যা দিয়েই হোক না কেন, প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রাণহীন জড়, অনিয়ন্ত্রিত পদার্থের সঙ্গে দৈব ও লক্ষ্যহীন ঘটনা সম্পর্কিত কোন কল্পনাকে ঠাঁই না দিয়ে, প্রায় সর্বজনীনভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে সকল দিকে পরিব্যাপ্ত, পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর মনীষা আর নিয়মবদ্ধতা বিদ্যমান। মানুষ যখন তার নিজের বুদ্ধিমত্তার বাইরে ixtrapolation-এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনীনভাবেই স্বীকার করে নেয়, তখন তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার মধ্যে এক সুদৃঢ় প্রমাণ।

অবিমিশ্রিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। অবশেষে প্রত্যেকটি মানুষ, তার বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে একত্রে ছাঁচে ফেলে তারপর উত্তমরূপে পিটিয়ে, তার জবাব তৈরি করবে- তার নিজের জীবন ও আল্লাহ্র মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তা উদ্ভাবিত হবে তার জবাবে। অন্তত বিস্তৃত ও জটিল জড় মহাবিশ্ব সম্পর্কে তার বোধশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা, ভাবাবেগ ও চেতনার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতি তার অন্তরের অন্তঃস্থলের সহানুভূতিশীলতাকে একত্র করে নিজেই এই জবাব পাওয়া যাবে। যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দুনিয়ার সকল প্রান্তের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কাছে আল্লাহ্কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যদি তার শুমারী নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার বিচিত্রতার দিক থেকে অসীম-সামগ্রিক প্রত্যার্পণেও প্রকৃতই অভিভূতকারী।

আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার গোড়ার দিকে আমি মানুষের বিচারশক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের ক্ষমতায় এতই মোহিত হয়েছিলাম যে, নিশ্চিতভাবেই অনুভব করেছিলাম বৈজ্ঞানিকেরা শেষে গিয়ে নিশ্চয়ই মহাবিশ্বে সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারেন- জীবনের উৎস, কোথা থেকে বুদ্ধি এসেছে এমন সব কিছুরই অর্থ করতে পারেন। কিন্তু এসব কিছু সম্পর্কে আমি ক্রমশ যতই অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞানার্জন করতে লাগলাম, পরমাণু থেকে ছায়াপথ, রোগ-জীবাণু থেকে মানুষ

www.pathagar.com

সম্পর্কে যতই আমার জ্ঞান বাড়লো ততই অধিক থেকে অধিকতর বিষয়ই আমার কাছে অব্যক্ত রয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞান পরমাণুর খুটিনাটি তথ্য সম্পর্কে হয়তো জয়ের ধজা উড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই মহাবিশ্বে জীবন, মানুষ ও মন তখনও অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা তাড়াতাড়িই জানতে পারেন যে, বিজ্ঞান যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে- "কি করে" এই প্রশ্নের অধিক থেকে অধিকতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যেই কেবলমাত্র সীবাবদ্ধ। কিন্তু বিজ্ঞান বা মানুষ 'কেন' এর জবাব দিতে সক্ষম নয়। বিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা, পরমাণু, নক্ষত্র, ছায়াপথ, প্রাণ এবং সকল অলীক গুণের অধিকারী মানুষ কেন রয়েছে এই প্রশ্ন কখনও ব্যাখ্যা করবে না, যদিও বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত মহাপ্লাবনিক একটা থিওরী দাঁড় করাতে পারে- তারই ফলে ছায়াপথ, নক্ষত্র, সব কয়টি গ্রহ এবং পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু কোথা থেকে এই সৃষ্টির জন্যে জড়পদার্থ আর শক্তি এসেছে, কেন এই মহাবিশ্ব এমনিভাবে গঠিত, সুশৃঙ্খ চিন্তা করলে সুস্পষ্ট বিচার শক্তি এই 'কেন'র জবাবে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাকেই কাছে টেনে নেবে।

অনেকে আল্লাহ'কে যেমন মনে করেন, তিনি কি তেমনি সত্যি 'স্বয়ংকৃত' আল্লাহ? একজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাঁকে এই অর্থে স্বয়ংকৃত মনে করি না যে, তিনি কোথাও মানুষের রাজা-বাদশাহ'র মত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন। আল্লাহ ও তাঁর স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র লেখাগুলোতে মানুষের জীবন ও মানবেতিহাস থেকে নেওয়া যথেষ্ট বাক্যলংকারের ব্যবহার পাওয়া যায়। আল্লাহ এক আধ্যাত্মিক সত্তা বিধায় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাষায় তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, যেহেতু মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী এবং মাটির সংগে তার নিবিড় সম্পর্ক; কাজেই এই ধরনের সংজ্ঞাকে কাজে লাগানো বা হৃদয়ংগম করা তার পক্ষে অসম্ভব।

অপরপক্ষে, আধ্যাত্মিকতা ও শ্রেষ্ঠতায় আল্লাহ'র নৈতিক উৎকর্ষতা বিদ্যমান। তিনি চিন্তা করার ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতি রয়েছে এমনি সব বর্ণনা অনেক বোধগম্য এবং এই দিক থেকে আল্লাহ হচ্ছেন একটি অভিলক্ষ্য, স্বয়ংকৃত সত্তা। মূলত তিনি হচ্ছেন এক পবিত্র আদর্শ যার কাছে আমাদের মানবীয় ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ পরিমেয় আদর্শ। "মানুষ আল্লাহ'র

www.pathagar.com

প্রতিচ্ছবি” বলে যে উক্তি করা হয়ে থাকে আসলে এই কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই।

আল্লাহ কোন অর্থেই শরীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই সংগে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তিনি যে বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত, তাঁর সৃষ্টি সেই কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ সকল চেতনার অতীত তাই মানুষ তাঁর সর্বশেষ অভিলাষ কি তা নিরূপণ করতে পারে না। যে বিশাল মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ বিশেষ, সেই মহাবিশ্বের সর্বশেষ উদ্দেশ্য কি তাও সে পরিমাপ করতে পারে না।

তবে আমরা একটি বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি যে, মানুষ ও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এই সবের একটা আরম্ভ আছে এবং তজ্জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন। আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, বিশ্বের এই চমৎকার ও জটিল প্রাকৃতিক আইনাবলি কখনও মানুষের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয় না এবং প্রাণের যে রহস্য তারও একটা উৎস নিশ্চয়ই আছে, মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত এক নির্দেশ শক্তি একটি পবিত্র প্রথমারম্ভ এবং একটি পবিত্র নির্দেশ।

আল্লাহ্ অপ্রাকৃতিক আত্মিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার

(মারলিন বুকশ ক্রীডার। শারীরবৃত্তবিদ এম.এস-সি, পি-এইচ.ডি. মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়। নাটিক, ম্যাসাচুচেটসের ইউ,এস, কোয়ার্টার মাস্টারের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পারিপার্শিক প্রতিরক্ষা ডিভিশনের শরীরবৃত্তবিদ, ইস্টার্ন নাথারেন কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক। আমেরিকান সোসাইটি অফ প্রফেশনাল বায়োলজিস্ট, ন্যাশনাল স্পেলিওলজিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতির সদস্য। বিপাক ও সঞ্চালন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ)।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ'র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন। তবে তাঁর অস্তিত্ব বিজ্ঞানাগারে প্রমাণ করা যায় না, গবেষণাগারে নিয়ম মাফিক পারা যায় না তাঁকে কোন প্রকার বিশ্লেষণ বা পুংখানুপুংখরূপে বিচার করে দেখা। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আত্মিক প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার।

তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তবুও আমরা মানুষ ও প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের যে অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি। আমার মনে হয়, ঐসব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বিশ্বাসজনক।

আমি কি এখানে বলতে পারি যে, বিজ্ঞানের তথাকথিত অনেক থিওরী বা তথ্য, যা নাকি অনেক মানুষই সত্য বলে মনে করেন, তা আদৌ প্রমাণিত সত্য নয়। এদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত মৌলিক সত্য না হয়ে কেবল প্রকৃত তথ্যের দিক নির্দেশ করে মাত্র। বিষয়টা কতকটা এই রকমঃ আপনি দেখলেন একটা লোক আপনার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং তারপর আবিষ্কার করলেন বাড়ির সবকিছু চুরি হয়েছে। সে যে অপরাধী তা প্রমাণ করার জন্যে আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই, তবে ঘটনা পরিদৃষ্টে নিঃসন্দেহে তারই অপরাধ বলে মনে হয়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে বিচারক তাই সাক্ষ্য প্রমাণের যথার্থতা যাচাই করে থাকেন।

তদুপরি, বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রত্যেকটি সত্তার অস্তিত্ব হাতে-কলমে দেখানোর বা প্রমাণ করার পক্ষে অপ্রতুল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন সব শক্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রেম অন্যতম। কিন্তু প্রেম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা বিশ্লেষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি সৌন্দর্য বা সংগীতের রস গ্রহণ করে একথা কি বোঝানো যায়? কিন্তু প্রেম, সৌন্দর্য এবং সংগীতের যে মাধুর্য রয়েছে, তা কে অস্বীকার করতে পারে? যদিও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণের অভাব থাকতে পারে তবুও যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেমন অনেক প্রমাণকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তেমনি শক্তিশালী প্রমাণ, আল্লাহ্'র অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিদ্যমান।

আমাদের প্রাণের প্রথম পর্যায় মেলে সৃষ্টিতত্ত্বে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বে, যার সবকিছু প্রকৃতির নির্দিষ্ট কতকগুলো শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যার সুশৃংখলতা একজন নিয়ামক বা পরিচালক রয়েছে, এমনি ইংগিত দিয়ে থাকে। এই যথার্থতা

www.pathagar.com

এত বিশাল যে, গ্রহগুলোর কক্ষপথ এবং অধুনা 'পূর্বাহ্নে' কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ বলে দেয়া যেতে পারে। এ যথার্থতা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে বিজড়িত বৈদ্যুতিক আধানের মিথষ্ক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা অধিকাংশ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে গাণিতিক নিয়ম ও সূত্রে ব্যাখ্যা করতে সম্মতি দান করে।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এ ধরনের শৃংখলা একটি সুশৃংখল মনের ফল। পরিকল্পনাকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এর পশ্চাতে না থাকলে শৃংখলতার পরিবর্তে বিশৃংখলাই মাথা উঁচু করতো।

প্রাণী রাজ্যে এবং জৈবিক কাঠামোতে আরেক শ্রেণীর প্রমাণ বিদ্যমান শারীরবৃত্তবিদ হিসেবে মানুষ ও জীবদেহের আকৃতি আর কাঠামোর জটিলতা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। যদিও কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় কতিপয় কাঠামোর কাজ নতুন করে করা যায়, তথাপি দেহের যে কোন একটি অংশ আগের সৃষ্টি বা নির্মাণ, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনক্ষম সুদক্ষ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এই প্রসংগে, কৃত্রিম ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, মূত্রাশয় এবং যান্ত্রিক মস্তিষ্কের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী মস্তিষ্ক সম্পর্কে বলা যায় যে, মস্তিষ্ক বিদ্যুতের মত আধান উৎপাদন ও পরিচালন করতে পারে এবং মস্তিষ্কে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সামান্য বিষয় ছাড়া আমরা এখনও এর প্রাকৃতিক ভিত্তি খুব কমই জ্ঞাত আছি। কিন্তু মস্তিষ্কের যে অগণিত কাজ- কে তার ব্যাখ্যা করতে পারে বা হিসেব দিতে পারে? পেশীর যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্যে এই মস্তিষ্ক দায়ী এবং ইহা দেহযন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শ্বাসপ্রক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে থাকে স্মৃতি, এবং মুহূর্তের স্মরণে স্মৃতিপটে ভেসে উঠার জন্যে হাজার মানসিক প্রতিচ্ছবি এতে ধরে রাখা হয়। মস্তিষ্কের এই একত্রীকরণের ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, অথবা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান, উদ্দেশ্য, আকাংখা এবং স্থৈর্য- শক্তির কি কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব? সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় উপলব্ধি করার মত রুচিজ্ঞান, প্রেমের মত অপার্থিব সত্তাকে অনুভব করার মত শক্তি, আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ- সবকিছু একই ক্ষুদ্রাকার জীবনের মূলীভূত উপাদানের বা

www.pathagar.com

প্রোটোপ্লাজমের সমাবেশে গড়ে ওঠা মস্তিষ্কের নিত্যকার কর্ম। কিন্তু প্রাকৃতিক অথবা অন্য কোন ভিত্তিতে কে একে ব্যাখ্যা করতে পারে?

দেহের অনেক জটিলতার মধ্যে সারাক্ষণ দেহাভ্যন্তরে যে অযুত রাসায়নিক বিক্রয়া হচ্ছে, যার অনেক বিক্রিয়াই আদৌ দেহের বাইরে ঘটানো সম্ভব নয়, তার দুর্বোধ্য নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। দেহমধ্যস্থিত ঝাঁকুনি দ্বারা শরীর উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে পরিপূরক অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখে। এতে করে দেহাভ্যন্তরে ক্ষতিকারক কোন রোগ জীবাণু ঢুকলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে রক্তে রোগ জীবাণুর প্রতিষেধক সৃষ্টি হয় এবং অনাক্রমণ্যতাও লাভ করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে যেমন প্রোটোপ্লাজম গঠনকারী পদার্থের কাঠামো সুনির্দিষ্ট, তেমনি প্রত্যেকটি রোগের জন্যে রক্ত মধ্যে রোগ জীবাণুর প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেকটি মানুষ একটি রাসায়নিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে? নিশ্চয়ই শুধুমাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একবার হৃদযন্ত্রের কথা ভাবুন। একটি জীবনে গোটা আয়ুষ্কাল ধরে এই ক্লান্তিহীন দেহযন্ত্রের বিরামহীন সব দাবি মিটিয়ে চলে। তা'ছাড়া এটি রহস্যজনক ছন্দোবদ্ধতার অধিকারী এবং যখন দেহের সকল স্নায়ুতন্ত্রী বিকল হয়ে পড়ে তখন এই ছন্দোবদ্ধতা একে স্পন্দিত হতে সাহায্য করে- দুর্ঘটনার সময় এই বৈশিষ্ট্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়। শারীরিক সনাতনী এই রহস্য আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যায়? কি করে আমরা একে ব্যাখ্যা করতে পারি।

দেহাভ্যন্তরের কাজের এই সব অলৌকিক ব্যাপার প্রাণের রহস্যের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই রহস্য উদঘাটনের জন্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন- কিন্তু দীর্ঘকালের এই সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য এবং সারাক্ষণ দেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে, তবুও এই বিষয়ে যথোপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞার যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান।

প্রাণবাদ বলে অভিহিত একটি থিওরী আছে। উক্ত থিওরী এই ধরনের প্রস্তাবনা করে যে, প্রাণের প্রয়োজনীয় জানা প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়া অতিরিক্ত আরও কোন শক্তি এর পেছনে কাজ করে চলেছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই, প্রথমত অনেক

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিকের এই থিওরী সম্পর্কে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান এবং দ্বিতীয়ত প্রাণের প্রকৃত সারবস্তু, কি তা এই থিওরী অত ব্যাখ্যা করে না, ব্যাখ্যা করে না- জ্ঞাত ও সীমিত পরিমাপ করা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রত্যেকটি প্রাণবস্তু অবয়বীর জন্ম ও ক্রমবিকাশের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান দিক বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে। অবিভাজ্য কোষের একটি ক্ষুদ্র সমাবেশকে পরিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক কলার জটিল ব্যবস্থারূপে গড়ে তোলার জন্যে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের পশ্চাতে কোন্ সংগঠন ও পরিচালন শক্তি রয়েছে কে তা বলতে পারে?

এ প্রসঙ্গে আমাদের যথার্থ উপলব্ধি করতে হবে যে, আমারা যে সব বিষয় বুঝতে অক্ষম, সেগুলোকে আদিমকালের মানুষ যেমন আল্লাহর অসন্তোষের নির্দেশ হিসেবে ঝড় ও বজ্রকে মেনে নিয়েছিল, তেমনি করে আল্লাহর বিশেষ হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করি না। সে যাই হোক, প্রাণ ও তার ক্রমিক বৃদ্ধিতে পরিদৃষ্ট এই উদ্দেশক, নিশ্চয়ই ক্রমপরিকল্পনার দিক নির্দেশ করে।

সৃষ্টিতত্ত্বের আরেকটি দিক, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা যদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা সৃষ্টিধর্মী অতি জাগতিক শক্তির অতিরিক্ত প্রমাণের সম্মুখীন হই। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উত্তপ্ত চক্রাকারে আবর্তিত গ্যাসের মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রথম জড় পদার্থ গঠিত হয় এবং আয়তনে ক্রমশ পরিবর্ধিত হয়ে ও ভেংগে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিন্ডাকারে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরিশেষে জ্যোতিষ্কমন্ডলীতে পরিণত হয়। প্রস্তাব করা হয়েছে, অনুরূপভাবেই জীবনের সৃষ্টি। তবে পাস্তুরের সময় থেকেই এই কথা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে, প্রাণ কখনও অ-প্রাণ জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়নি। অতত্রব, দেখা যাচ্ছে, ইহা প্রাণের সূত্রপাত সম্পর্কিত থিওরীকে অস্বীকার করেছে। তদুপরি আমরা গবেষণাগারের বিচিত্র পরিবেশজনিত অবস্থা সৃষ্টির উপযোগী বহুবিধ উপকরণের সাহায্যে প্রোটোপ্লাজমের কতিপয় উপাদান সৃষ্টি করতে পারলেও তা প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া, সঠিক আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় সব কয়টির কারণ সৃষ্টি হওয়ার গাণিতিক সম্ভাবনাও প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য।

যদিও বা কিছু পদার্থ এভাবে সৃষ্টি হয় তবুও প্রারম্ভিক মৌলিক পদার্থ বা বৈদ্যুতিক আধার বা নবগঠিত পিন্ডগুলোকে উত্তাপ ও প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা

www.pathagar.com

বিলম্বিত করেও চলমান রাখে এবং যা নাকি বর্তমানে প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার উৎপত্তির প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

সৃষ্টি সম্পর্কিত এই মতবাদ অন্যান্য সমস্যারও সৃষ্টি করে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের ক্ষুদ্র একটি পিণ্ড হিসেবে যদি প্রাণের সূচনা হয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর উপর যে অগণিত বিচিত্র প্রাণের সমারোহ বিদ্যমান তা সৃষ্টির জন্য নিশ্চয় একটা বিস্তৃত শক্তি উক্ত প্রোটোপ্লাজমের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। প্রোটোপ্লাজমের একটি পিণ্ড যে জৈবিক অবঘাতন দ্বারা আজকের দিনের জটিল মানুষের আকারে পরিণত হতে পেরেছে, যখন তার পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক কল-কব্জাগুলো পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় সেগুলো অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

প্রথমত, সুপ্রজননবিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান, বংশের সামান্য কয়েকরকম রদবদলের প্রকাশ করে, কিন্তু মূল কাঠামোর কোন প্রকার বড় রকমের জটিলতার জন্যে যে এই পরিবর্তন দায়ী তেমন কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন সম্পর্কিত আইন কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে এ প্রস্তাব করে, কিন্তু তা পৃথিবীর প্রাণী বা উদ্ভিদের অসংখ্য প্রকারভেদ বা প্রজাতি কেন গড়ে উঠছে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অধিকন্তু এনট্রপি বা বিশ্বের লভ্য শক্তির গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটি প্রারম্ভিক ক্রম থেকে তাপশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। সাধারণ প্রোটোপ্লাজম থেকে জটিল মানুষ পরিবর্তিত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় জৈবিক অবঘাতনের এই নিয়ম সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জগতের কেউই সৃষ্টিতে যে পদ্ধতি বিজড়িত কখনও তার প্রমাণ পাবে না, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সম্পূর্ণ জড়বাদী ব্যাখ্যার মধ্যে এতবেশী অসম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করে যে, প্রধান কারণ হিসেবে বিশেষ সৃষ্টির একটি রূপ এবং বাইরের শক্তির প্রভাবকে স্বীকার করে নেয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন এই বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনী শক্তিকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে কে "অসীম সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী শক্তি" বলে উল্লেখ করে 'ব্যাপক মহাবিশ্বে' এই শক্তি প্রতীয়মান বলে মন্তব্য করেছেন।

শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমি এই 'শক্তিকেই আল্লাহ বলি'। মহাজাগতিক পদার্থের শুরুতে আমি অনন্ত শক্তি বা জড় পদার্থ দেখিনা। দেখি

www.pathagar.com

না 'দুর্জেয় কোন অদৃষ্ট', না আমার নজরে পড়ে, 'আদিম মৌলিক পদার্থগুলির একটি আকস্মিক সমাবেশ', না পড়ে কোন 'মহান অজানাকে'- আমি স্পষ্ট দেখতে পাই পরম শক্তিমান আল্লাহকে।

এই সঙ্গে, আমি কখনও আমার মনোভাবকে 'অযৌক্তিক' বলে মনে করি না। মরণশীল মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই আমার মতে এটা 'যুক্তিযুক্ত' ওটা 'অযৌক্তিক' এই সব না বলে, যদি তারা খুব বেশি তাদের যুক্তির উপর নির্ভর না করে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কথা কয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেছি তাই মেনে নেন, তাহলে বিচক্ষণতার কাজ করবেন।

যে কোনো অবস্থাতেই হোক না কেন, এই আমার বক্তব্য এবং এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস যা আমি ধ্রুব সত্য বলে মনে করি।

বৈজ্ঞানিক প্রত্যাদেশ আল্লাহ্‌কে নির্দেশ করে

(জর্জ আর্ল ডেভিস। পদার্থবিদঃ এম,এস,আই, ওরাস্টেট কলেজ, পি-এইচ,ডি, মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ন্যাভাল অর্ডিন্যান্স ল্যাবরেটরির সাবেক পদার্থবিদ, ১৯৪৮ হতে ম্যাটেরিয়াল ল্যাবরেটরির নিউইয়র্ক ন্যাভাল শিপইয়ার্ড, ব্রুকলিনের নিউক্লিওনির্ক শাখার প্রধান; স্পের্কট্রোফটোমেট্রি সৌর বিকিরণ, জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক অপটিক বিশেষজ্ঞ।)

তিনি বলেছেন, যতই জ্ঞান বাড়তে থাকে এবং পুরাতন কুসংস্কারগুলো আসলে কি, তাই যখন জানা যায়, তখন ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের নীতিসমূহের আরও খুটিনাটিভাবে মূল্য নিরূপণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এরূপ পূর্ণ মূল্য নিরূপণের পেছনে বহুবিধ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, এই উদ্দেশ্য সত্যকে জানার যথার্থ কামনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অজ্ঞেয়বাদ ও অনীশ্বরবাদের ভুল-চুকের বিরূদ্ধে আমাদেরকে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের একথাও মেনে নিতে হবে যে, যদি কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সনাতনী যে সব ভিত্তি রয়েছে সেগুলোকে তীব্র সমালোচনা করে, একমাত্র এ কারণে সে 'নাস্তিক' অপবাদ পাবার যোগ্য নয়। এরূপ ব্যক্তি হয়তো

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে, যথার্থই তার বিশ্বাস অত্যন্ত সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

বৈজ্ঞানিক মহলে যে নাস্তিকতা বিদ্যমান আছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অবৈজ্ঞানিকদের চাইতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নাস্তিকতা অধিক বিদ্যমান বলে সর্বসাধারণের ধারণাও যে সম্পূর্ণ সত্যি, তা কখনও প্রমাণিত হয়নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রথম যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সর্বশক্তিমানে আমার নিজস্ব যে বিশ্বাস রয়েছে, সেই সম্পর্কে এই কথা না বললে বোকামি করা হবে যে, আমার এই বিশ্বাস ছেলেবেলার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি। চিন্তাধারা গড়ে উঠার বয়সে আমরা যেসব ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকি কখনও তার প্রভাব এড়াতে পারি নি। কিন্তু আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি, আমার বর্তমান বিশ্বাস যদিও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তথাপি তার এমন একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে যা যাবতীয় মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একজন পদার্থ বিজ্ঞানবিদ হিসেবে এই মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামোর যৎকিঞ্চিত দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, যার ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অভ্যন্তরীণ প্রাণস্পন্দন বৃহত্তম নক্ষত্রের বিশাল কর্মতৎপরতার তুলনায় কোন অংশেই কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যেখানে প্রতিটি আলোকরশ্মি, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া, প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য, একই অপরিবর্তনীয় আইনাবলির বিক্রিয়া, প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটি নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এই ছবিই সবার সামনে মেলে ধরেছে। যে কেউ এই ছবির প্রতি যতবেশি অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবে, এই ছবি তার কাছে ততই জটিল আর ততই মনোরম রূপ পরিগ্রহ করবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে, আশ্চর্যজনক সব রহস্য উদঘাটিত হওয়ায় সেই সঙ্গে কতকগুলো অপরিহার্য প্রশ্ন জেগেছে। অবশ্য এর কোনটাই নতুন নয়, তবে বিশ্বের শিল্প-নৈপুণ্যে সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নতুন পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মানব জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা পড়েছে। এ সবের মধ্যে একটি প্রশ্ন আমাদের নৈতিক দায়িত্বাবলি ও চরম অদৃষ্টের ব্যাপারে তার অনুমিতির জন্যে অতীব

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ। এটি অতি পুরাতন প্রশ্ন "সর্বশক্তিমান এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ আছেন কি?" এবং এই সঙ্গে রয়েছে ততধিক কঠিন আর একটি প্রশ্ন, যা নাকি অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে আশ্চর্যজনক আর অপ্রতিভ করা চমৎকার যুক্তিপূর্ণ উপায়ে উপস্থাপিত করে থাকে, 'আল্লাহ' যদি আমাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে 'আল্লাহকে' কে সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ আছেন কি আল্লাহ্ নেই এর কোন প্রশ্নেরই যে বৈজ্ঞানিক যথার্থ প্রমাণ নেই একথা অনস্বীকার্য। ইহা আরও সম্ভবপর হতে পারে যে, যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কখনই সূত্রাকারে গ্রথিত করা যাবে না। আমরা এমন একটি প্রাকৃতিক বিশ্বে বাস করি যার সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অন্তর্দিষ্টি সম্পন্ন গবেষণা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এর কাঠামো, এর নিয়মাবলী সবই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই বিশ্ব তার নিজের বাইরে কোন কিছু সম্পর্কে আমাদেরকে তথ্য যোগাতে পারে এরূপ বিশ্বাস করার পশ্চাতে কোন যুক্তি নেই। এই বিশ্ব জানালাহীন একটি কক্ষ, অথবা কাচের জানালাযুক্ত একটি কক্ষও হতে পারে যে জানালা দিয়ে ভেতরের দিকে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের কোন কিছুই দেখা চলে না।

যেহেতু আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা প্রমাণ করতে পারি না। কাজেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে আমরা যা জানি তা থেকেই বুদ্ধিসম্পন্ন একটা অনুমিতি করে নেয়া। এমন একটা অনুমিতি, যা নাকি আমাদের পরিজ্ঞাত জ্ঞানের কোন ভিত্তিতেই যুক্তিসংগত উপায়ে সমালোচনা করা চলবে না। এই অনুমিতি হচ্ছেঃ কোন পার্থিব জিনিস আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না।

যদি একটি মহাবিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তাতে সৃষ্টিকর্তা খোদা তা'আলার ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে বলে ধরে নিতে হবে এবং আমরা বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, এই বিশ্বই খোদা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ'র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। তবে এখানে এক অদ্ভুতরূপে আল্লাহকে কল্পনা করা হচ্ছে- আল্লাহ'র আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় রূপে। আমি কিন্তু এমনি এক আল্লাহ'র কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, যিনি নিজের সংগে কোন সাদৃশ্য রেখে একটি জড় জগতকে সৃজন করেন নি, কিন্তু

www.pathagar.com

তারই সৃষ্টি সেই বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন এবং যিনি এই বিশ্বের প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবেশের ক্ষমতা রাখেন।

এই সঙ্গে আমি দ্বিতীয় অনুমিতি যোগ করতে চাইঃ সৃষ্টির দিকে পরিচালিত ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় উৎকর্ষতা যতই উচ্চস্তরের হচ্ছে, সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞার অস্তিত্বের প্রমাণ ততই জোরদার হবে।

আমাদের মহাবিশ্বের অবঘাতনিক ক্রমোন্নতি বিজ্ঞানের সাহায্যে হাতে-কলমে এতখানি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাই আমাদের প্রমাণ। 'আকারহীন ও শূন্য' মৌলিক কণিকাসমূহের একটি মহাবিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র এবং সম্ভবত তার চাইতে অনেক লক্ষ কোটি গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে- যে নক্ষত্র ও গ্রহ নিকৃষ্ট আকারের এবং অবশ্য বর্ণনাযোগ্য। তারপর অপরিবর্তনীয় আইনের অধীনে তাদের অবশ্যম্ভাবী সব জীবনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নক্ষত্র ও গ্রহ যে মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, তারাই অপরিমেয়রূপে ক্ষুদ্র কণিকায় কি করে পরিণত হলো এবং কোন দক্ষতার জন্য এই জীবন রক্ষা পাচ্ছে, তা সম্ভবত চিরদিনই মানুষের বোধশক্তির বাইরে থাকবে। এটিই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদেরকে অবশ্য সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় যোগ করতে হবে যে, ঐ সব মৌলিক অপরিমেয়রূপে ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে সকল প্রকার নীতি বিদ্যমান রয়েছে, যা নাকি শুধু নক্ষত্র ও গ্রহ সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়োজনীয় তা নয়- সেই সঙ্গে চিন্তা ও আকাঙ্খায় সক্ষম, জটিল আর মনোরম সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী এবং পরিশেষে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দেবতুল্যতার হাতে-কলমে মহান প্রমাণ দ্বারা জীবনের মূল রহস্যে প্রবেশকারী জীবনসহ অযুত আকৃতির জীবন্ত বস্তুরও সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন। পারস্যের মহান জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়াম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'রুবাইয়াত'-এ সৃষ্টির এই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কে অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "মহাবিশ্বের অবঘাতনের মূলে বিশ্বের অতীত মনীষার এসব প্রত্যাদেশ আমার জন্যে আল্লাহর অস্তিত্বের পর্যাপ্ত প্রমাণ। কোন পার্থিব জিনিস আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না- এই অনুমিতি ছাড়াই এ সব প্রত্যাদেশ আমার জন্যে যথেষ্ট।"

www.pathagar.com

সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে

(থমাস ডেভিস পার্কস্। রিসার্চ কেমিস্টঃ পি-এইচডি, ইলিনিয়স বিশ্ববিদ্যালয়। স্ট্যামফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বর্তমানে কোরক্স কেমিক্যাল কোম্পানির রিসার্চ ডিরেক্টর। মাইক্রো কেমিস্ট্রি ইকেটোলিটিক ফেনোমেনা, রঞ্জনরশ্মি ব্যবচ্ছেদ এবং সিন্থেটিক রেসিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ)

তিনি বলেছেন, হুইটেকার চেম্বার্স তাঁর 'উটটনেস' নামক বইয়ে একটি মামুলী ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই ঘটনাই তাঁর জীবনের (এবং সম্ভবত মানব জাতির ঘটনাবলির) মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি তাঁর মেয়েকে নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন এবং নিজের অজান্তেই তিনি মেয়েটির কানের আকারের প্রতি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আপন মনে ভেবেছিলেন, কানে এমনি নাজুক কুন্ডলী দৈবক্রমে সৃষ্টি হওয়া কতই না অসম্ভব। একমাত্র পূর্ব কল্পিত নমুনা থেকেই এমনি অপরূপ জিনিস সৃষ্টি করা হতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা তাঁর মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অজ্ঞেয়বাদী মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পর্যায়ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ পরবর্তী ধাপই হবেঃ এই পরিকল্পনায় আগে থেকেই আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া- এমন একটি গবেষণামূলক বিষয় যা মেনে নেওয়ার জন্য তিনি তখনও তৈরি হননি।

আমার অধ্যাপক ও গবেষণা কাজে আমার সহকারী অনেক বৈজ্ঞানিককে আমি জানি, যারা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় পরীক্ষিত বিষয় সম্পর্কে অপরূপ চিন্তাধারা পোষণ করে থাকেন। অবশ্য এই কথা সত্যি, হুইটেকার চেম্বার্স নিজেকে যে রূপ হতাশার সখাদ সলিলে নিমজ্জিত বলে উপলব্ধি করেছেন, তারা তেমন কোন গভীর হতাশা থেকে কোন কথা বলেন নি।

আমি অজৈব এই বিশ্বে, আমার চারিদিকে নিয়ম-শৃংখলা আর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই দেখতে পাই। আমি বিশ্বাস করি না- আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমাণুর একত্রিত হওয়ার ফলে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার চারদিকে তারা বিরাজ করছে। তার কারণ মনে করি, পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন; আর সেই মনীষাকেই আমি আল্লাহ বলে অভিহিত করি। সম্ভবত একজন রাসায়নিকের কাছে মৌলিক পদার্থের পর্যাবৃত্ত খুবই আকর্ষণীয় বিষয়।

www.pathagar.com

রসায়নশাস্ত্রের একজন নবীন শিক্ষার্থী সর্বপ্রথম যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তা হচ্ছে মৌলিক পদার্থের মধ্যে এই পর্যাবৃত্তির ক্রম। বিভিন্ন প্রকারের এই ক্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে আমরা সাধারণত এই পর্যাবৃত্তি সারণির জন্য বিগত শতকের যে জ্ঞান সকল মৌলিক ও তাদের উপাদান পর্যবেক্ষণের উপায় করে দিয়েছে তাই নয়, অধিক যেসকল মৌলিক পদার্থের আজও আবিষ্কৃত হয়নি, সেগুলো আবিষ্কারের ব্যাপারে সন্ধানকার্য পরিচালনার যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। সারণিয় ক্রমব্যবস্থায় যে শূন্যস্থান বিদ্যমান তাই তাদের যথার্থ অস্তিত্বের স্বতসিদ্ধতা প্রমাণ করে।

আজকের দিনের রাসায়নিকেরা এখনও অজ্ঞাত নতুন যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এবং এই সারের উপাদান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে তাদের কাজের সহায়ক হিসেবে এই পর্যাবৃত্ত সারণির সাহায্যে গ্রহণ করে থাকেন। এই গবেষণা ও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে তাদের সাফল্য অজৈব বিশ্বে যে সুন্দর ক্রম বিদ্যমান তারই অভ্রান্ত প্রমাণ।

কিন্তু আমরা আমাদের চারদিকে যে ক্রম দেখতে পাই, তা আদৌ হৃদয়হীন সর্বশক্তিমত্তা নয়। পরোপকারিতার সুকোমল আবরণ এর উপর বিস্তৃত। ইহা এই কথাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইনাবলীর সঙ্গে আমাদের যতটা সম্পর্ক, বিশ্বে কল্যাণ ও আনন্দে ঐশ্বরিক মনীষার সম্পর্ক বা উৎকণ্ঠা তার চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনাদের চারদিকে যেসব বর্জিত পদার্থ ব্যত্যয় যথার্থই প্রকাণ্ড যুক্তিসিদ্ধ আইনাবলিকে অবজ্ঞা করে, তার দিকে একবার দৃষ্টি দিতে বলছি।

উদাহরণস্বরূপ পানির কথা ধরা যাক। এত সূত্রগত ওজন ১৮। এই থেকে কেউ এই ভবিষ্যদ্বাণী করবে যে, সামান্য তাপ ও চাপে পানির গ্যাসে পরিণত হবে। অ্যামোনিয়া-সূত্রগত ওজন ১৭ সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের চাপে ৩৩ সেঃ তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয়। পর্যাবৃত্ত সারণিতে অবস্থানের দিক থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সূত্রগত ওজন হচ্ছে- ৩৪ আর ৫৯ সেঃ তাপমাত্রায় পৌঁছে ইহা গ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু এমনি সাধারণ তাপমাত্রায় এই যে পানি তরল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তা এমনি একটি ব্যাপার যা নাকি মানুষকে একদণ্ড থমকে দিয়ে ভাবিত করে তোলে।

www.pathagar.com

তবে পানির আরও অনেক কয়টি ধর্ম রয়েছে যা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং এই সব ধর্ম একত্রিত করতে তা আমার কাছে পরিকল্পনার জোরদার প্রমাণ বলে প্রতীয়মান হবে। সাধারণভাবে বলা চলে, আমাদের পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পানি বিস্তৃত। তাই এই পানি তাপমাত্রা ও আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর মারাত্মক রকম প্রভাব সৃষ্টি করে। পানির সবগুলো ধর্মের মধ্যে যদি একটি অনুপম সমন্বয় না থাকতো, তাহলে তাপমাত্রায় যে কি ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা দিতো তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। পানি গলার জন্যে অত্যন্ত বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। গলে তরল অবস্থায়ও দীর্ঘ সময় থাকে এবং বাম্পীভবনের জন্যে অত্যধিক তাপমাত্রার জন্যে পানির যে সৃষ্টি প্রতিবন্ধ রয়েছে যদি উক্ত প্রতিবন্ধ না থাকতো তা হলে এই পৃথিবী জীবন ধারণের জন্য অনেক কম উপযোগী এবং মানুষের কর্মতৎপরতার জন্যেও অত্যন্ত কম আনন্দদায়ক হতে পারতো।

পানির আরও অনেক অনুপম বিশেষ ধর্ম রয়েছে যা নাকি প্রত্যক্ষ করলেই আমার মন এই ধারণায় সংবেদনশীল হয়ে উঠে যে, নিজ সৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট সচেতন সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই একমাত্র এইসব বিশেষ ধর্মের ব্যবস্থা আগে থেকে করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের জানা সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র পানিই একটি পদার্থ যা জমাটবদ্ধ হলেও ওজনে আরো হাল্কা হয়। জীবন ধারণের জন্যে এই গুণ অস্বাভাবিক রকম গুরুত্বপূর্ণ। এই একটি মাত্র কারণে বরফ, হ্রদ বা নদীর তলদেশে তলিয়ে না গিয়ে পানির উপরে বরফের এই আবরণ, আস্তরণের কাজ করে। ফলে আবরণের নিচেকার পানির তাপমাত্রা সকল সময় হিমাঙ্ক বিন্দুর অধিক থাকে। গাছ ও অন্য সব জলজ প্রাণী এই কারণে রক্ষা পায়। আবার বসন্তকালে উক্ত বরফের আস্তরণ তাড়াতাড়ি তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

এই অতি সাধারণ পদার্থ পানির অন্যান্য অনেক চমৎকার সব বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, পানির উপরিভাগের অত্যধিক টেনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকার ফলে তা মাটির মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকারক পদার্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করে উদ্ভিদ জন্মাতে সাহায্য করে। পরিবর্তনীয় দ্রবীভূত করার ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তাই দ্রাবক হিসেবে জানা পদার্থগুলোর মধ্যে পানি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রাবক এবং এ

www.pathagar.com

কারণেই আমাদের দেহের জীবন-প্রক্রিয়ায় আমাদের রক্তের প্রধান উপাদান হিসাবে পানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। তাপমাত্রার এক অতি বিস্তৃত পরিসরের উপর পানির অত্যন্ত বেশি বাষ্পীয় চাপ বিদ্যমান সত্ত্বেও প্রাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ পরিসরের মধ্যে পানি সর্বত্র তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

অনেক বৈজ্ঞানিক পানির এসব আশ্চর্যজনক বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং যেসব প্রপঞ্চ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বিষয়ে তাঁদের থিওরিও দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু যদিও আমরা সম্পূর্ণ বিষয়ের 'কি করে' এই প্রশ্নের জবাব বুঝতে শিখব, তাহলেও আমাদেরকে তখনও এই বিষয়ের 'কেন'র জবাব খুঁজতে হয়। আর পানিই একমাত্র আশ্চর্যজনক পদার্থ নয়। অন্যসব পদার্থের মধ্যে কোন সংখ্যার অনেক পদার্থ পাওয়া যাবে যা নাকি পানির মতই এত অসাধারণ যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মানব মনের তা দেখে থমকে না গিয়ে উপায় নেই। তারপর ধীরে ধীরে অতিনিঃশব্দে এসব অসাধারণত্বকে সম্মান দেখানোর জন্যে আরাধনাকালের মতো অজান্তে আমাদের নতজানু হতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে এসব আশ্চর্যজনক বিষয়ের জন্যে আমি আমার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছি- অত্যন্ত সন্তোষজনক ব্যাখ্যা- প্রকৃতির এই ক্রমের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার এবং পরিকল্পনার জন্য বর্ণনা দিতে গিয়ে এর সব কিছুর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারীর মধ্যে আমি একটি শান্ত সমাহিত যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনার পরিচয় পাই- আমি এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার তাঁর সৃষ্টির প্রতি এক গভীর উদ্বেগ, যথার্থ প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করি।

প্রকৃতির জটিলতা ও আল্লাহ্

(জন উইলিয়াম ক্লটয্। সুপ্রজননবিদ্যাবিদঃ পি-এইচডি; পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি,ডি, কনকর্ডিয়া সেমিনারী। ১৯৪৫ থেকে কনকর্ডিয়া টিচার্স কলেজের জীববিদ্যা, শরিরবৃত্ত এবং প্রকৃত পর্যবেক্ষণ বিষয়ের অধ্যাপক। জেনেটিকস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। হ্যাবরোব্রেকন ও মরমোনীলা, বাস্তব বিদ্যা, লেথাল ও আধা লেথাল প্রভৃতির জাতি বিশেষের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞ)।

www.pathagar.com

তিনি বলেছেন, যে বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চলেছি, তা বিবেচনা করতে গেলে সংগে সংগে পুরাতন পবিত্র সত্যার্পণ মনে জেগে ওঠে। স্বর্গ আল্লাহ্‌র মহিমা প্রচার করে এবং আসমান প্রকাশ করে আল্লাহ'র কারুকার্য।"

মুর্খের অন্তর বলে আল্লাহ্‌ নেইঃ

আমাদের এই পৃথিবী এতই জটিল ও এতই দুর্বোধ্য যে, এর পক্ষে দৈবক্রমে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাব্যতা খুবই কম। এ বিশ্ব এত জটিলতায় সমাচ্ছন্ন যে, এই সব জটিলতা সৃষ্টির মূলে অত্যন্ত বিচক্ষণ সত্তার প্রয়োজন, এ এক অন্ধ অদৃষ্টের বা দৈবের কাজ নয়। বিজ্ঞান যথার্থই আমাদেরকে এসব জটিলতা উপলব্ধি করতে ও সেই সংগে হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়তা করে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বাড়িয়েছে এবং এই জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

এসব জটিলতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ সম্পর্ককে কতিপয় চিত্তাকর্ষক জটিলতা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে সবচাইতে পরিজ্ঞান দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার সঙ্গে স্পেনীয় বেয়নেটের চিত্তাকর্ষক সম্পর্ক। উক্কা ফুল নিচের দিকে ঝুলে থাকে এবং গর্ভকেশর বা ফুলের স্ত্রী অংশ পুংকেশরের বা ফুলের পুরুষ অংশের নিচের দিকে থাকে। তবে, গর্ভমূন্ড বা ফুলের যে অংশটি পরাগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে থাকে তা বাটির আকৃতি বিশিষ্ট হয়। কিন্তু এখানে এমনই ব্যবস্থা যে, পুংকেশর থেকে এতে পরাগ পড়া একেবারেই অসম্ভব। তার পরিবর্তে স্ত্রী উচ্চ পতংগকে পরাগ পরিবহনের কাজ করতে হয় এবং স্ত্রী উক্কা পতংগ ঠিক সন্ধার পর পরই তার এই কাজটি শুরু করে। সে উদ্ভিদের পরাগ কোষ থেকে বেশ কিছুটা পুষ্পরেণু সংগ্রহ করে এবং তার মুখের সম্মুখভাবে বিশেষভাবে তৈরী অংশে সেই পুষ্পরেণু ধরে রাখে। তারপর সে উড়ে যেয়ে আরেকটি উক্কা মুলে বসে এবং তার ডিম্বনালী দিয়ে ডিম্বকোষ ভেদ করে। সেখানে সে একা বা একাধিক ডিম দিয়ে গর্ভদন্ড বেয়ে নীচে নেমে যায় এবং মুখের পরাগে ছোট বলটি গর্ভমুন্ডের মধ্যে এটে দেয়। তারপর উদ্ভিদ বহু বীজ জন্মায়। উক্ত পতংগের শুককীট কিছু বীজ খেয়ে ফেলে এবং কিছু বীজ উদ্ভিদের বংশকে জিইয়ে রাখার জন্যে ক্রমে উক্কা উদ্ভিদে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

আমেরিকার বাজারে ফল হিসেবে এক রকম ডুমুর পাওয়া যায়। এই ডুমুরও এক শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বোলতার সম্পর্কে কতকটা একই রকম অবস্থায় পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ডুমুরের দুই প্রকারের পুষ্পগুচ্ছ জন্মে। এক গুচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল দুই-ই থাকে। আরেক গুচ্ছে থাকে কেবল স্ত্রী ফুল। উভয় গুচ্ছই স্ত্রী বোলতা দ্বারা পরাগিত হয়। এই পুষ্প গুচ্ছের মুখ উপর্যুপরি স্থাপিত শুল্কের সাহায্যে প্রায় এক রকম বন্ধ থাকে। তাই অতি কষ্টে স্ত্রী বোলতা যখন প্রবেশ করতে যায় তখন তার ডানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরুষ ও স্ত্রী বোলতা ফুলের মধ্যে ডিম দেয় এবং তারপর মরে যায়। এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় ও বাচ্চা বোলতারা পরস্পরের সংগে মিলিত হয়। একমাত্র স্ত্রী বোলতাই ফুলের গুচ্ছ পরিত্যাগ করে বের হয়ে আসতে পারে। পুরুষ বোলতা সব জন্মস্থানেই মরে যায়। ফুলের গুচছ থেকে বেরিয়ে আসার আগে স্ত্রী বোলতাদের গায়ে পরাগ মেখে যায়। তাই নিয়ে সে অন্য পুষ্প গুচ্ছে প্রবেশ করে তাহলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যদি সেই গুচ্ছে কেবল স্ত্রী ফুল এত লম্বাটে হয় যে, ডিম দেওয়ার জন্য সেই ফুলের তলদেশে পৌছান তার আর ভাগ্যে হয় না। তবে ফুলের তলদেশে পৌছার চেষ্টা করতে গিয়ে স্ত্রী বোলতাগুলো তাদের দেহের পরাগ খুব ভাল করে এই ফুলের গায়ে মেখে দেয় এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত পাকা ডুমুর পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যখন ডুমুর আনা হলো, দেখা গেল তা থেকে ডুমুর ফল পাওয়া যায় না। তারপর এই বোলতা আমদানি করার পরই ডুমুর শিল্প লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে।

জেলফুল, যেমন জ্যাক-ইন-দি পালপিট ফুলে আরো অদ্ভুত রকম ব্যাপার ঘটে। এই উদ্ভিদের দুই প্রকারের ফুলের গুচ্ছ রয়েছে- পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের গুচ্ছ। পালপিটের মধ্যে এই ফুলের গুচ্ছ জন্মে এবং পালপিটের নিচের দিকে ঠিক মাঝখানটায় সংকোচনের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণত এক রকম ক্ষুদ্রাকৃতি মাছির সাহায্যে এই ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটে। উক্ত মাছি সংকোচন ব্যবস্থা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তারপর ফিরে দেখে তার বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তার নির্গমণ পথে ঐ সংকোচন ব্যবস্থাই যে শুধু একমাত্র অন্তরায় তাই নয়। পালপিটের চতুষ্পার্শ্ব মোমের মত পিচ্ছিল হয়ে থাকে। তার বেরোবার জন্যে মাছি কোথাও পা আটকে জোর করতে পারে না। তাই সে ভেতরেই প্রাণপণে

www.pathagar.com

বোঁ বোঁ করে উড়তে থাকে, ফলে তার সারা দেহে পুষ্পরেণু লেগে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই পালপিটের গা অমসৃণ হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত মাছি পরাগ মাখা অবস্থায় কোনরকমে বুকে হেটে বেরোতে পারে। যদি এরপরও সে যেয়ে আরেকটি পুরুষ ফুলের গুচেছ প্রবেশ করে তা'হলে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যদি সে স্ত্রী ফুলের গুচেছ পৌছায় তা'হলে সম্ভবত তার অদৃষ্টে আর বের হওয়া ঘটে না। বেরোবার জন্যে এখানেও সে ফুলের মধ্যে প্রাণপণে বোঁ বোঁ করে উড়ার ফলে তার গায়ের সব পরাগ সারা ফুলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এবার তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে উদ্ভিদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। প্রথমে উদ্ভিদ তার নিজের স্বার্থের খাতিরেই তাকে পুষ্পরেণু গায়ে মেখে পুরুষ পালপিট থেকে বেরোবার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে হয় স্ত্রী ফুলের ভেতর থেকে মাছির বের হবার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে উদ্ভিদের আর কোন উৎকণ্ঠা নেই।

এই দৃষ্টান্তগুলোর সব কটিই আল্লাহ্'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই ব্যাপারগুলো অন্ধ দৈবের ফলে সংঘটিত হয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এসব ব্যাপার একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশকারী হাতের ও তাঁর সৃজনী ক্ষমতার বলেই সম্ভব হয়েছে।

যেখানে মানুষ প্রকৃতির ভারসাম্যের পরিবর্তন আনতে গিয়ে শুধু সেই সমতায় বিশৃংখা আনয়ন করে তাই নয়, সেই সঙ্গে নিজেদেরও বিপর্যয় ডেকে আনে; সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এর আরও প্রমাণ দেখতে পাই।

প্রথমত বসতি স্থাপনকারীরা যখন অস্ট্রেলিয়ায় গেলেন তখন তারা দেখতে পেলেন, ডিংগো বা বুনো শুয়োর ছাড়া সেখানে আর কোন অমরাজাত স্তন্যপায়ী জীব নেই। ইউরোপ থেকে আগত এসব বসতি স্থাপনকারীদের স্মৃতিপটে তখনও খরগোস শিকারের কথা ভাস্বর হয়ে আছে। তাই ১৮৫৯ সালে থমাস অস্টিন নামে এক ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্যে এই অভাব দূর করার জন্য প্রায় ২৪টি ইউরোপীয় খরগোস অস্ট্রেলিয়ায় আমদানী করলেন। পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হল, কারণ খরগোসের বংশবৃদ্ধি রোধ করার জন্যে তখন অষ্ট্রেলিয়ায় কোন প্রাকৃতিক শত্রু ছিল না। তাই আশাতীতভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হল এবং যে ঘাস খেয়ে অষ্ট্রেলিয়ার মেষপাল জীবনধারণ করতো তার সবই খরগোসেরা নষ্ট

www.pathagar.com

করে ফেললো। সর্বপ্রথম খরগোসের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এই মহাদেশের কুইন্সল্যান্ডে দীর্ঘ ৭,০০০ মাইল খরগোস-প্রুফ বেড়া তৈরী করা হলো। কিন্তু দেখা গেল, এতে তেমন কোন উপকার হচ্ছে না। তার কারণ খরগোসেরা বেড়ার ভিতর দিয়েই তখন ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তারপর চললো পারিতোষিকের ভিত্তিতে খরগোস নিধন অভিযান। কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হলো। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে এর একটা সমাধান পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে মিক্সোমেটিয়াস নামক এক প্রকার জীবাণুর সাহায্যে সংক্রামক রোগের প্রবর্তন। এই রোগে ব্যাপকহারে খরগোসের মৃত্যু হয় এবং তাদের সংখ্যা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলা চলে না। কারণ, আজকাল আমরা জানতে পাই, অস্ট্রেলিয়ার উক্ত রোগজীবাণু প্রতিরোধকারী খরগোসও নাকি দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, বর্তমানে এদের সংখ্যা যতটা হ্রাস পেয়েছে তার ফলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। এক কালে যে প্রহরী অঞ্চল রক্ষণের দরুণ ধ্বংস হয়েছিল, পাহাড়গুলির গায়ে মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি, এখন সেখানে সবুজ তৃণরাজি গেয়ে গেছে। ১৯৫২.৫৩ সালে একমাত্র মেষ-শিল্পে উৎপাদনের আয় প্রায় ৮৪,০০০০,০০০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের খরগোসের সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্রে যে জাতের খরগোস রয়েছে, ইউরোপীয় খরগোস তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনের উপকূল ভাগের অদূরে কেবলমাত্র সানজুয়ান দ্বীপেই এই জাতের খরগোস পরিচিত ছিল। ১৯০০ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই এই খরগোস সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইতোপূর্বে যদিও আন্তঃষ্টেট কটনটেল আমদানী সম্ভবপর ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভবপর নয়। তাই সম্প্রতি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কতিপয় খেলা-ধূলার ক্লাব এই ইউরোপীয় বা সান জুয়ান খরগোস যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে চালু করার চেষ্টা করেন। এর পরিণাম সহজেই মারাত্মক হতে পারতো, যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার মত সান জুয়ান খরগোসেরও যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হতো। এই বংশবৃদ্ধি রোধকল্পে একটি স্টেটের শিকার কমিশন সান জুয়ান খরগোস শিকারের উপর থেকে সব রকম বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছেন। এখন সারা বছরই এই খরগোস শিকার করা চলে।

www.pathagar.com

এদিকে আবার ইউরোপে খরগোস মারার জন্যে যে রোগ জীবাণু সংক্রমণের ব্যবস্থা করা হয় তার ফলে সেখানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তা লক্ষ্য করা খুবই মজার ব্যাপার হয়েছে। একজন ফরাসি ডাক্তার তাঁর বাগান খরগোসে নষ্ট করায় অতিষ্ট হয়ে এই রোগ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যবস্থা করলেন, তারপর তিনি বন্দী কতকগুলো খরগোসের দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এবারে তিনি খরগোসগুলোকে ছেড়ে দিলেন। ফলে শুধু যে ফ্রান্স তাই নয়, সেই সংগে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও মারাত্মক রকমভাবে খরগোসের সংখ্যা হ্রাস পেল। ফলে সামগ্রিকভাবে কতটা ক্ষতি হলো, তা তখনও অনুমিত হয়নি। তবে ইতোমধ্যেই এই সব স্থানে গোস্ত সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কারণ ইতোপূর্বে সাধারণ মানুষ এই খরগোস খেতো এবং খাদ্য হিসাবে খরগোসের উপর তাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হতো। সব্জি বাগানে উৎপাদন অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতির চাইতে লাভ বেশি হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

একটু আগে সত্যি যে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে তারই প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এই মাত্র যে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো, তা আল্লাহর জ্ঞানের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। প্রকৃতিতে তিনি যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন তা অত্যন্ত নাজুক এবং মানুষ মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি স্বীকার করে নিয়ে তবেই তাতে হস্তক্ষেপ করে। প্রকৃতির ভারসাম্যে উন্নতি বিধান করতে গেলে মানুষকে স্বভাবতঃই পুর্বাপর ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়। কারণ প্রকৃতি আল্লাহ্‌র তুলনায় সে স্পষ্টই দেখতে পায়, মানুষের বুদ্ধিমত্তার কোন স্থানই সেখানে হতে পারে না।

আমাদের মুখোমুখী অত্যন্ত অপরিহার্য প্রশ্ন

(অসকার লিও ব্রউয়ার। পদার্থ বিজ্ঞানের ও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞঃ এম,এস-সি, পি-এইচ.ডি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৬ থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ার সান জোসে স্টেট কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। জৈবিক রসায়ন, সিনেকোনানের বিষক্রিয়ার হার, ফসফরাসের সয়েল-এনালাইসিস ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ।)

www.pathagar.com

তিনি বলেন, আমাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে জড় পদার্থের উৎপত্তির প্রশ্ন। আমরা জড়পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা খুঁজে পাই তারই উপর যে কোন জীবন দর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে।

আসুন, আমাদের আবাসভূমি এই গ্রহ বা পৃথিবীর দিকে একবার আমরা ভাল করে তাকিয়ে দেখি। কোন মানুষই সুস্থ মন নিয়ে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে না- অস্বীকার করবে না অবশিষ্ট বিপুল নক্ষত্রে ভরা এই মহাবিশ্বকে। অতত্রব দেখা যাচ্ছে, আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি যা নিঃসন্দেহে 'বাস্তব'।

এই পৃথিবী ধারণাতীত রকমের বিশাল একটি পিন্ড, যার ওজন মহাপদ্মকে ৬,৬০০ মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যাবে প্রায় তত টন হবে। এক মহাপদ্ম বা মহাপদ্মকে মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল দাঁড়াবে তার কথা দূরে থাক, এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ যে কত মানুষের মত তা অনুমান করতে কেউ পারে কিনা তাই এক গুরুতর প্রশ্ন। দিন-মজুর দৈনন্দিন কাজের শেষে সোল্লাসে বলে, "আরেক দিনে আরেক ডলার, এক মিলিয়ন দিনে এইভাবে তার হবে এক মিলিয়ন ডলার।" কিন্তু হায়, সে একথা খুব কমই উপলব্ধি করে যে, এক মিলিয়ন দিন মানে হচ্ছে ২৭৪২ বছর এবং তার মধ্যে আবার একটি দিনও ছুটি নেই।

এই যে কল্পনাতীত ভারী জড়পিণ্ড যাকে আমরা পৃথিবী বলি তার সব জড় পদার্থ কোথা থেকে এলো?

আর তারপর, আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য সকল গ্রহের জড়পিন্ডের কথা একবার বিবেচনা করুন। সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সদস্য সূর্য পৃথিবীর চাইতে ৩,৩০,০০০ গুণ বেশি, মহাপদ্মকে ৬,৬০০ মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করে তাকে আবার ৩,৩০,০০০ দিয়ে গুণ করলে যে ওজন পাওয়া যাবে, তত টন ভারী। আমাদের ছায়াপথে কমপক্ষে এক মহাপদ্ম সংখ্যক সূর্য রয়েছে, যাদের গড়পড়তা ওজন আমাদের সূর্যের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হবে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণ আবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের এই কথাই বলেছেন যে, আমাদের ছায়পথের মত অন্ততঃপক্ষে একশ হাজার ছায়াপথ রয়েছে। সে যাই

www.pathagar.com

হোক, একথা সত্য যে, অযুত সংখ্যক বিশালাকৃতির আসমানি গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র ও সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। এসব জ্যোতিষ্ক মিলে মোট কত টন জড়পিণ্ড, হতে পারে? এ সম্পর্কে কেবল চিন্তা করলেই হতবুদ্ধি আর স্তম্ভিত হতে হয়। তারপর কি করে এসব জড়পিন্ড, এই অযুত সংখ্যক বিশালকায় সব জ্যোতিষ্ক জন্মলাভ করলো? এসব প্রশ্নের শুধুমাত্র দু'টি সম্ভাব্য জবাব হতে পারেঃ হয় এগুলো আবহমানকাল থেকে অবস্থান করছে, আর না হয় এগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথম জবাবের ক্ষেত্রে, আমরা একটি মিথ্যা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছি। জড় পদার্থের মৌলিক বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পদার্থের পরিবর্তন, বৃদ্ধি এবং উন্নতি রয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিশ্চয়ই জড় পদার্থের সূচনা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় জবাব সম্পর্কে বলা যায়, সৃষ্টি সম্পর্কে সকল যুগেই ব্যাপক মতদ্বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে যেসব মতবাদ, ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে, তাকে অতি সহজেই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, পৌরাণিক কাহিনী অবশ্য সম্পূর্ণ মানুষের কল্পনাপ্রসূত। এতদ্‌সত্ত্বেও পৌরাণিক কাহিনীগুলো এমনি নির্দেশ করে থাকে যে, মানুষের চেতনায় এমন কিছু আছে যা নাকি মানুষকে আদিম সত্যের দিকে, যে অতিমানবীয় ঐশ্বরিক শক্তি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছে, তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এর মূলে ঐতিহ্য রয়েছে। এতে রয়েছে বংশ পরম্পরায় মানুষের কাছে পৌঁছেছে এমনি সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনী ও বিবরণী। যদিও এ বিবরণ খুব অবহেলা ভরে গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি একথা সত্য যে, এই সমুদয় বিবরণে অনেক তথ্য রয়েছে যা নাকি আমাদেরকে জেনেসিস বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পুস্তকে বর্ণিত রিপোর্ট সম্পর্কে জোর করে স্মরণ করিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, এই ভাগে রয়েছে দর্শন। মানুষের মধ্যে যারা গভীর চিন্তাশীল, তাঁরা জড়পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে দার্শনিক প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং প্রকল্প অনুসারে তাদের চিন্তাধারাকে কার্যকরী করেন। যদি কখনও তাদের এসব প্রকল্প অন্য কোন চিন্তাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে সেগুলি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার নির্ভরযোগ্য ফল হিসাবে গৃহীত হয়। অগণিত ছোটখাট বিদ্বান ও শিক্ষক সেই প্রকল্প অনুকরণ করেন।

www.pathagar.com

চতুর্থত এর মূলে প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা বিজ্ঞানও রয়েছে। আমরা জানি, প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা বিজ্ঞানে, মানুষ ও প্রকৃতির কঠিনতম বিষয় নিয়ে কাজ-কারবার করে। তারা পরীক্ষা করে, পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করার জন্য খন্ড খন্ড করে কাটে, পরস্পরের মধ্যে তুলনা করে, তারা তাদের অস্ত্রোপাচারের ক্ষুদ্র তারকাটি এবং উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট লেন্সটি জড়পদার্থের অস্তিত্বের সবচাইতে আদিম রূপ-ভ্রুণের গভীরে নিয়ে যায়, তারা পরিমাপ করে, হিসাব করে, তারা প্রকৃতির ইতিহাস ও নিয়মাবলি কাজের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে এবং এইভাবে অন্য উপায়ে সকল জড়পদার্থ কি করে সৃষ্টি হলো সেই সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ সত্য বের করার জন্যে চেষ্টা করে।

পঞ্চমত বিশেষ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশে (বাইবেলের শেষ গ্রন্থ) রয়েছে, এক কথায় তারই নাম হচ্ছে বাইবেল। বিজ্ঞান এক স্বর্গীয় মনীষা এবং এক স্বর্গীয় ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সঙ্গে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারে যে, কোন এক সময়ে একটি সৃষ্টিধর্মী কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। বিজ্ঞান একথাও প্রমাণ করতে পারে যে, মহাবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশাল ও জটিল সব নিয়ম-কানুনের এক স্বর্গীয় মনীষা ছাড়া অন্য কেউ প্রণেতা বা সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু একমাত্র বাইবেল, এ স্বর্গীয় মনীষা ও ক্ষমতাকে আল্লাহ্ বলে উল্লেখ করতে পারে------ যে আল্লাহ সম্বন্ধে আমরা অধিকাংশই নেহায়েত ছেলেবেলা থেকে জানতে আরম্ভ করেছি- যে আল্লাহ্ অবিসংবাদিত ও সর্বশক্তিমান যীশুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

মহাবিশ্বের বিশাল আকার এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও অগণন সংখ্যা ও কল্পনাতীত জড়পিণ্ডের ওজন সম্পর্কিত আমাদের আলোচনায় ফিরে এসে এবং এসব নক্ষত্র ও গ্রহ পরিচালনাকারী আইনাবলীর বিধিতত্ত্বের কথা চিন্তা করে- যখন দেখি, আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা, যাদের নিয়ে গোট মানবজাতির একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে, তারা আল্লাহ্ যে আছেন এই চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তখন সত্যিই অদ্ভুত লাগে নাকি? অকমিউনিস্ট বিশ্বেরও শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করে প্রকারান্তরে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন দেখলে তাও তেমনি অদ্ভুত লাগে নাকি?

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দান এবং তার ফলে মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেওয়ার মাত্র একটি অর্থ থাকতে পারে, তাহলো মানুষের প্রতি অমানুষী আচরণের পরিসমাপ্তি। এর অর্থ হবে, মানুষের মধ্যে নতুন প্রেরণা, একটি সংবেদনশীল বিবেক এবং একটি শুদ্ধ সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব। এর অর্থ হবে প্রেম আর পবিত্রতা।

নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি এর কোনটিই চাই না। থিওরী হিসাবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে ইহা মারাত্মক ক্ষতিকর।

বিজ্ঞান ও ঈমানের মধ্যে ঐক্য

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছু (চিন্তা-ভাবনা) না করে মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে না। ব্যক্তিগত আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মানুষের সমগোত্রীয় লোকদের প্রতি আচরণের পরিবর্তন আসবে, জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে এবং সে সঙ্গে জড় বিশ্বজগতের পিছনে যে উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, সে বিষয়ে তার মনোভাব বা ধারনা পাল্টে যাবে।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা বলতে বোঝায় আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি প্রকল্পকে সত্য বলে ধরে নিয়ে পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে, জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। তবুও এক ব্যক্তিগত আল্লাহতে ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসকে বলা চলে না যে, এ বিশ্বাস বিজ্ঞানভিত্তিক। তার কারণ আমরা জানি আল্লাহ পদার্থশক্তি নন। তাছাড়া তিনি সীমাবদ্ধ নন যে, সীমাবদ্ধ মন ও অভিজ্ঞতা তাঁকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। অপর পক্ষে, একজনের আল্লাহতে যে বিশ্বাস তা প্রধানতঃ 'ঈমানের ব্যাপার' যদিও তার এ ঈমান 'প্রথম কারণ' এর পরোক্ষ লক্ষ্য থেকে বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করে এবং সম্ভবত 'অবিচ্ছিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ' থেকেও সমর্থন লাভ করে থাকে।

মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যারা বিচরণ করেন তাদের কারও কাছেই ঈমান কোন একটা অপরিচিত বিষয় নয়, তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদেরকে অবশ্য বিশেষভাবে

www.pathagar.com

এ ঈমানকে কাজে লাগাতে হবে। মানুষের জীবন যেমন খুব দীর্ঘকালের নয়, তেমনি একই মানুষের পক্ষে নিজেরই প্রত্যেকটি বিষয় পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীগণ যে সকল তথ্য প্রকাশ করে গেছেন, যে সব আবিষ্কার করে গেছেন তাই বোঝার জন্য মানুষ যতখানি গবেষণা করার দরকার আছে ঠিক ততটা অত্যন্ত সাধারণ ধরনের গবেষণা চালায় মাত্র। কাজেই বলা যায়, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই অতীত অভিজ্ঞতায় লিখিত ইতিহাস থেকে নেওয়া। এই যেমন, খুব কম বিজ্ঞানীই আছেন যারা আলোর গতিবেগ মেপে দেখেছেন, কিন্তু তা হলেও বিশ্বজনীনভাবে এ কথাটি মেনে নেওয়া হয়েছে যে, আলোর গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকে। তেমনি বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করেন তার কার্যকারিতার বৈধতা আগে থেকেই মেনে নেন। এর প্রকল্প হচ্ছে, তারা যে সকল বিষয় দেখেননি তারই আদর্শ। কেউ প্রোটন বা পরমাণু দেখেনি, তবে এদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। পরমাণুর বোর মডেলটি, আণবিক আচার-আচরণ সম্পর্কে আন্দাজ করার জন্য একান্ত সহজতম পদ্ধতিতে অংকিত একটি চিত্র। আমাদের সুদূর আকাশের ছায়াপথ আর মহাদূরের নক্ষত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান তা পরোক্ষ প্রমাণ ও গবেষণার ফল। এ খুবই সত্য যে, সাধারণভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে এরূপ জ্ঞানের অনেকখানি বিশ্বাসের বদৌলতেই মেনে নিতে হয়। এ কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নয়- অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে যে বিশ্বাস পরীক্ষিত হতে পারে এবং এভাবে আরও জোরদার হয়, এ তেমনি বিশ্বাস।

অনুরূপভাবে আমরা যদি বিশ্বাসকে প্রয়োগ করি, তাহলে তা আমাদের আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। আগের যুগের মানুষের কাছে আল্লাহ একটি লিখিত দলীল বা প্রগতিশীল প্রত্যাদেশ শুনিয়েছেন। এ দলীলে আল্লাহকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে মানুষের অবস্থা, তার কি প্রয়োজন এবং কি করে পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে তাই বর্ণিত হয়েছে। সময় আর শূন্যলোক অর্থাৎ, ইতিহাস ও ভূগোলের সীমারেখার মধ্যে এ বাইবেলকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক দিন থেকে বাইবেল এক অতুলনীয় বই এবং অনেক ক্ষেত্রে একে পরীক্ষা করারও সুযোগ রয়েছে। এতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে- এটা কম উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়।

www.pathagar.com

এতে অনেক অংশ আছে; যা নাকি আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে বোধগম্য হয় না, তথাপি ঐতিহাসিক অথবা ভৌগলিক যে সমস্ত তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে, তার কোন একটি খুটিনাটি তথ্যের ক্ষেত্রে বাইবেল ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। অনেক ধ্বংসাত্মক সমালোচনা বাইবেলের করা হয়েছে, কিন্তু যে মহত্ত্ব বাইবেল দাবী করে তার তুলনায় উক্ত সমালোচনা কিছুই নয়। যদি কেহ সময় নিয়ে এ সব সমালোচনা বিশ্লেষণ করে তাহলে সহজেই ধরা পড়বে যে, ইতিহাস ও আমাদের প্রত্নতাত্তিক ক্রমবর্ধিত তথ্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সে সব সমালোচনাকে অসার বলে প্রমাণ করেছে এবং আরও প্রমাণ করেছে যে ওসব সমালোচনা অজ্ঞতা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝবার ক্ষমতার অভাব থেকেই উদ্ভূত। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যে অংশ পরীক্ষা সাপেক্ষ, এ সব এলাকা (ভবিষ্যদ্বাণী, ইতিহাস, ভূগোল) তারই অন্তর্ভুক্ত এবং পরীক্ষা সাপেক্ষ।

একজনের অস্তিত্বের ব্যাপারে ঈমান যেমন প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক অঙ্গ তেমন মানুষের পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও দর্শনের জন্য আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা অপরিহার্য। মানুষে অভিজ্ঞতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যদিও সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তবুও তাই বলে সেগুলো গুরুত্বের দিক থেকে কোন কারণেই উপেক্ষণীয় নয়। বহু সহস্র যুক্তিবাদী, প্রসিদ্ধ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগত আরাধনার একটা ক্ষমতা (আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের) রয়েছে। এই মানুষেরাই তাঁদের নিজেদের তথা মানবজাতির উর্ধে অবস্থিত ঈমান দ্বারা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, আবেগানুভূতির ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছেন।

পদার্থিক প্রকৃতির পিছনে একটি উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, এ কথাটি যুক্তি সঙ্গতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহকে সব কিছুর পরিকল্পক ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়ার ফলে, উৎপত্তি, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে এবং সে সঙ্গে যে কোন প্রক্রিয়া যা নাকি ঘটেছে বলে পরিজ্ঞাত, তাকে মেনে নেওয়া হয়।

যান্ত্রিকতা সম্পর্কিত মতবাদ সর্বপ্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে বিবেচনা করে না আর পরবর্তী ঘটনাবলির জন্য দৈবের হাতকে স্বীকার করে না। দৈবক্রমকে দর্শনের পূর্ণতা হিসাবে আল্লাহর বিকল্পরূপে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু অ-খ্রিস্টান অথবা অ-ধর্মীয় মতবাদ, আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাকে, দৈবক্রম অপেক্ষা অধিকতর

www.pathagar.com

সন্তোষজনক মনে করে এবং মহাবিশ্বের যাবতীয় শৃংখলা, অত্যন্ত সুশৃংখল আল্লাহ্র কথাই নির্দেশ করে। এসব উদ্দেশ্যহীন অনিয়ন্ত্রিত দৈবঘটনাবলি কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

অতিপ্রাকৃত সম্পর্কিত ধারণা অনেক বিজ্ঞানীর মনকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। কিন্তু সে সঙ্গে তাদেরই অনেক 'স্বাভাবিক' বলে কতগুলো প্রপঞ্চকে অভিহিত করে থাকেন, যদিও এসকল প্রপঞ্চ সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট কোন ধারণাই নেই। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এদেরকে 'স্বাভাবিক' বলে উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে এগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে, কিন্তু তাই বলে এতে প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করা হয় না। কাজেই কোন একটি সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রপঞ্চকে মেনে নেওয়া- তা সে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক হোক না কেন- তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঈমানের ব্যাপার।

বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার কথায় ফিরে গিয়ে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গতিসম্পন্ন যে রাডার রয়েছে, তার আবিষ্কার ও নির্মাণের মূলে কোন পরিকল্পনা ছিল না, না সেটি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অত্যন্ত জটিল ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন ছোট বাদুর, হ্যাঁ বাদুর সৃষ্টির পিছনে কি কোন পরিকল্পনা আছে? না, অনাগত সকল যুগে একই রকম বাদুর জন্মাবার অধিকারী এ বাদুর নামীয় জীবটি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? বৈজ্ঞানিক মন সব কিছুতেই একটা কারণের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। কাজেই তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এ সবের পিছনে অনুমিতি হিসাবে এক মহান মনের বা সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বদর্শী তাঁকে মেনে নেবে, স্বীকার করে নেবে ও সকল সৃষ্টি ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের জন্য তিনি আগ্রহশীল।

আরও অনেক প্রপঞ্চ রয়েছে, যার উল্লেখ করা হয়নি এবং একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই এসব প্রপঞ্চের একটা অর্থ হতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে অসীম মহাশূন্য, অগণিত নক্ষত্র আর ছায়াপথ, সর্বশেষ মৌলিক কণিকার পদার্থকে বিভক্ত করণের ক্ষমতা, আমাদের জানা সকল জীবিত পদার্থের মধ্যে সমরূপিতা এবং প্রতিটি আঙুলের ছাপে স্বাতন্ত্র্য প্রতিটি মেপলের পাতা এবং প্রত্যেকটি তুষার কণার সাদৃশ্যতা। এছাড়া সৃষ্ট অন্যান্য সকল জীবের চেয়ে মানুষ মনে ও দক্ষতায় যে শ্রেষ্ঠ- সে শ্রেষ্ঠত্বের বিশাল জগৎ রয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহতে বিশ্বাস অনেকাংশে ঈমানের উপর নির্ভর করে। এর ঈমান যে কোন মানুষের কাছেই অপরিচিত নয়। সকল শ্রেণীর বিশ্বাসই অন্ধ বিশ্বাস নয়, অধিকন্তু তা হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্বাস। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, অনেকের কাছেই যে সাক্ষ্য বিদ্যমান, তা হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। জড় বিজ্ঞানের কতিপয় প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ দ্বারা এটাকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

জ্ঞানের আকাঙ্খা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কেন ও কি করে- এ প্রশ্ন করাই হচ্ছে মনের বৈশিষ্ট্যের অংশ- মনের বিশেষ গুণ। একবার যদি কোন বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে এ বিশ্বাস যে কোন দিকে গবেষণার ফল হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

চিকিৎসা পদ্ধতিতে আল্লাহঃ

এ আলোচনার মূল প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে আমি একথাই বলতে চাই যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর অস্তিত্ব ও যথার্থতা স্বীকার করি। আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস শুধু যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাই নয়, অধিকন্তু বিশ্বাস দ্বারা আমি যা সত্য বলে স্বীকার করেছি, চিকিৎসা পদ্ধতি তাকে আরও ভালভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমি যখন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন আমি আঘাতের ফলে দেহ-কলাসমূহের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তৎসম্পর্কিত একটি মৌলিক জড়বাদী ধারণা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেহ-কলার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গবেষণার দ্বারা আমার এ ধারণা জন্মায় যে, যে সকল অনুকূল প্রভাবের ফলে টিস্যু বা দেহকলা বর্ধিত হয়, তাই এ দেহ-কলার সন্তোষজনক মেরামতের কাজ সম্পাদন করছে। তারপর যখন আমি হাসপাতালে শিক্ষা চিকিৎসক হিসাবে আমার নতুন জীবন শুরু করলাম, তখন আমি একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, তাহলে সে সেই অনুযায়ী নিশ্চয় ক্ষতিপূরণ করে যাবে, কোন ক্ষত থাকলে তাকে অবশ্য সারিয়ে তুলবে। কিন্তু সে সঙ্গে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে আমার মেডিক্যাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগে শামিল করতে একেবারেই ভুলে গেছি এবং সে হচ্ছে সকল মৌলিক পদার্থের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আল্লাহ।

www.pathagar.com

শিক্ষানবীশ থাকা কালে আমার এক রোগী আসেন কোমরের নিচের হাড় ভেংগে এবং তিনি ছিলেন সত্তুর বছর বয়সের এক দাদীমা। আমি অনেক কটি এক্স-রে প্লেট পরীক্ষা করে দেখলাম তাঁর দেহকলাগুলো খুব ভালভাবে তাঁকে নিরোগ করার জন্য সাড়া দিচ্ছে। যথার্থই এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আরোগ্যলাভ করতে দেখে আমি ধন্যবাদ জানালাম। তিনি তখন চাকা ওয়ালা চেয়ার থেকে ক্রাচ ব্যবহারের পর্যায়ে এসে গেছেন। তাঁর রোগের তদারককারী ভারপ্রাপ্ত সার্জন আমাকে বললেন যে, তিনি নিশ্চিত হয়েছেন বুড়ী ভদ্রমহিলা নিশ্চিতভাবে দ্রুত আরোগ্যলাভ করেছেন, কাজেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করতে হবে।

সেদিন ছিল রবিবার। নিয়মিত সাপ্তাহিক পরিদর্শনে তাঁর মেয়ে এলে আমি জানালাম তিনি যেন আগামীকাল এসে তাঁর মাকে নিয়ে যান- কারণ স্বরূপ আরও বললাম যে, এখন আর কোন আশংকা নেই, উনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন। মেয়েটি তার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাকে কোন কথাই বলল না। মায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য চলে গেল। সে ফিরে এসে বলল যে, সে তার স্বামীর সংগে আলাপ করেছে এবং তার স্বামী-স্ত্রী স্থির করেছে যে, তাদের বাড়িতে বুড়ি ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কোন বুড়ো মানুষের বাড়ীতে নিঃসন্দেহে তাঁকে সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর, আমাকে বুড়ী ভদ্রমহিলার শয্যার পাশে ডাকা হল। আমি যেয়ে দেখলাম তার সাধারণ শারীরিক অবনতি ঘটেছে। তারপর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তিনি মারা গেলেন কোমরের হাড় ভাঙ্গার জন্য নয়, মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হলো। অবশ্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যে সব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা নিস্ফল হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই কসুর করিনি।

তাঁর কোমরের ভাঙ্গা হাড় কোন প্রকার বাধাবিপত্তি ছাড়াই জোড়া লেগেছিল কিন্তু তাঁর ভাঙ্গা হৃদয় কোনক্রমেই জোড়া লাগেনি। তাঁর অবস্থার পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে আমরা যে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ প্রয়োগ করেছিলাম, তার ভাঙ্গা অংশটি স্থিতিশীল করে রেখেছিলাম, তার সব কিছুতেই অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করলেও, তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। আরও নিশ্চিত করে বলা যায় যে,

www.pathagar.com

তাঁর ভাঙ্গা হাড়ের দুটি প্রান্ত জোড়া লেগেছিল, তাঁর কোমরের হাড় শক্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি আরোগ্য লাভ করেননি কেন? তাঁর আরোগ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন ছিল তা ভিটামিন নয় তার ভাঙ্গা জোড়ালো নয়। তাঁর প্রয়োজন ছিল আশার, সে আশা যখন চলে গেল, তখন আরোগ্য লাভের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

আমি একজন অকপট খ্রিস্টান হিসাবে যেমন আল্লাহ্‌কে সকল আশার মূল উৎস বলে জানি উক্ত বুড়ী ভদ্রমহিলা ঠিক তেমনটি জানতে পারতেন তাহলে এমন অবস্থা তাঁর হত না, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল বলেই ঘটনাটি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। বিষয়টি আমার মনের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। মেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসাবে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রূপে আমার আল্লাহ্‌তে গভীর বিশ্বাস ছিল, যে করেই হোক না কেন, যদিও মেডিক্যাল তথ্যাবলির সংগে আমার আল্লাহতে যে বিশ্বাস রয়েছে তার কোন সম্পর্ক নেই তবুও আমি মেডিক্যাল তথ্যাবলিকে তার নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

তা সত্ত্বেও, এ পারস্পরিক পৃথকীকরণকে কি যুক্তিসঙ্গত বলা চলে? এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগীকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তাঁর সাধারণ শরীরে সারা দুনিয়ার শক্তি সঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মন বা আত্মাকে হারিয়ে এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে আত্মার যে আশা থাকে তাই হারিয়ে (কারণ নিশ্চিত করে বলা চলে যে, মানুষের সঙ্গে যতটা তার সম্পর্ক সে তার মেয়ের সঙ্গে ততটাই একান্তভাবে জড়িত ছিল) জীবনের পরিবর্তে মরণ লাভ করেছিল। এ কথাই যীশু বলেছেনঃ "মানুষ যদি নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে আর সারা পৃথিবী তার বিনিময়ে লাভ করে তাহলে কি লাভ হবে?"

আমার সংগে সংগে এ প্রতীতি জন্মাল যে, চিকিৎসা পদ্ধতি ও অস্ত্রপচারে আমার যে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তারই সংগে আল্লাহতে আমার যে বিশ্বাস তার প্রয়োগ করে আমাকে একাধারে দেহ ও মন দুয়ের রোগ নিরাময় করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এ উপায়েই আমি আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করতাম আমার রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজন এ ব্যবস্থাই হচ্ছে সেই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। তদুপরি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি, প্রচলিত চিকিৎসা দর্শনের সকল প্রয়োজন মিটে থাকে।

www.pathagar.com

সম্প্রতি চিকিৎসা পদ্ধতি মেডিসিন বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক মৌলিকতা সংযুক্ত করার যে গুরুত্ব দেখা দিয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সংগে মিলে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ আজ এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের আমেরিকার বড় বড় নগরীতে যে সকল রোগ হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটে থাকে; আবার তার শতকরা ৫০ ভাগ রোগের ফলে মানব দেহ যন্ত্রে কোন প্রকারেই বিঘ্ন দেখা দেয় না। এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্য উল্লেখ করতে হয় যে, মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিজড়িত এসব রোগ বা তার কোন উপসর্গই কাল্পনিক নয়। এ সব রোগের কারণও যে কাল্পনিক তা নয় অধিকন্তু চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত ডাক্তারগণ সাধারণত অন্তর্দৃষ্টিকে একটু যুক্তিসঙ্গত উপায়ে প্রয়োগ করলেই সহজে রোগের কারণ নিরূপণ করতে পারেন।

তথাকথিত এই যে স্নায়ুরোগ, আসলে তার মৌলিক কারণ কি কি? মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে রয়েছে অপরাধ, প্রতিহিংসা, (ক্ষমা না করার প্রকৃতি) ভয়, উৎকণ্ঠা, হতাশা, সিদ্ধান্তের অভাব, সন্দেহ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও বিরক্তি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে, মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানী আবেগের বিশৃংখলতা সম্পর্কিত রোগ নিরূপণে যদিও ঠিক অগ্রসর হন, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তারা বেশ উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হন। তার কারণ হচ্ছে মৌলিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের ব্যাপারটি একেবারে বাদ দিয়ে থাকেন।

অধিকন্তু হৃদয়াবেগে এ সব বিশৃংখলা, রোগ সৃষ্টির জন্য এসব কারণ কি? বাইবেলে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে যেসব বিষয় থেকে উদ্ধার করার জন্য এসেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলো কি সে রোগ?

আল্লাহ্‌ বহুদিন আগে থেকেই আমাদের মনের জন্য কিসের প্রয়োজন তা জানতেন এবং এজন্য তিনি তার সঠিক আরোগ্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। মনোচিকিৎসাজ্ঞানিগণ যে কারণে আমাদের স্বাস্থ্যটি কিছুতেই সারাতে পারেন না সে কারণরূপী তালার সমুদয় জটিলতা তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর আলমের মধ্যে আমাদের জন্য সে তালার চাবিটি দিয়েছেন। নির্ভুলভাবে এ চাবি সে তালায় লাগে এবং তাতে করে স্বাস্থ্যের দরওয়াজা আমাদের সামনে খুলে যাবে। তালার ভিতরকার প্রতিটি চেহারার ঠিক তেমনি উপযোগী কতগুলো পদার্থ বিদ্যমান বলেই মনের দুয়ার খোলা সম্ভবপর হয়।

www.pathagar.com

কেবল আল্লাহ্ এ চাবি সরবরাহ্ করতে পারেন। আমাদের জটিল যান্ত্রিকতাময় মনের যে তালা অন্ধ পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা কখনও তার চাবি সৃষ্টি হতে পারে না; মানুষের আত্মার দরজা খুলতে পারে, অন্ধভাবে এমন চাবি তৈরি করা সম্ভব নয়। আর একমাত্র আল্লাহ্ই এ চাবির সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম। কবি কাউপার তাই যথার্থই বলেছেনঃ

অন্ধ অবিশ্বাস ভুল করবেই
ব্যর্থভাবে তাঁর কাজের বিশ্লেষণ করবে;
আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নিজের ভাষ্যকার,
আর তিনিই একে সহজ করতে পারেন।

"আল্লাহ্ নিজেই তাঁর ভাষ্যকার" হিসাবে কি করেন, আমাদের এ চাবির কথা বলে দেন? খুব সংক্ষেপে তিনি এই করবেনঃ যেহেতু আমরা দোষী, পাপী, যীশুর মাধ্যমে আমাদের আল্লাহ্র ক্ষমার প্রয়োজন, যাতে আমরা তাঁর অনুচরের মর্যাদা পেতে পারি এবং অপরদের প্রতি ক্ষমাশীল হই, তাই বলবেন। এমনিভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী কূল, তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হই, তাই বলবেন। এমনিভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী কূল, তাদের ভয় ও উৎকণ্ঠাকে বাদ দেবার জন্য নিজেদের মনের মধ্যে আল্লাহর দান লাভ করবে এবং তাদের চারদিকে তাঁর এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যে সেখানে হতাশা প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁর প্রেম যখন আমাদের হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে তখন ঈর্ষা, স্বার্থপরতা এবং সকল দোষ-ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। আনন্দে বিরক্তি বিদায় গ্রহণ করবে। আশা তখন সবচেয়ে সক্রিয় বিষয়- প্রাণবন্ত ও জীবন সঞ্জীবনী রূপ নেবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে আমি দেখেছি, আধ্যাত্মিক এ শক্তিধর্ম ও সে সংগে চিকিৎসাপদ্ধতির যে জ্ঞান আমার আছে উভয় নিয়ে আমি যখন দৈনন্দিন রোগের বিরূদ্ধে লড়াই করি তখন যথার্থ সাফল্য পেতে পারি। আল্লাহকে যদি এ থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে আধা চিকিৎসা অসমাপ্তই থেকে যায়।

তাই অধিকাংশ পেপটিক্ আলসারের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে মানুষ কতটা খায় তার উপর রোগীর রোগ নির্ভর করে না, যে জিনিস তাকে খেয়ে যাচ্ছে তার উপর রোগের আসল গুরুত্ব। এ ব্যাপারে রোগের যে বিতৃষ্ণা অবশ্য তার চিকিৎসা করতে হবে। এ অসন্তোষ সারাতে গিয়ে দেখি যীশু

www.pathagar.com

যেমনভাবে তাঁর শত্রুদেরকে ক্ষমা করেছিলেন আমরা সেই মৌলিক ক্ষমতার আদর্শের সম্মুখীন হয়েছি। আমরা যদি যথার্থই যীশুর অনুসারী হই তাহলে অন্যের প্রতি আমাদের যে তিক্ততা আর অসন্তোষ তাকে অবশ্য আমাদের কাছে সরে যেতে হবে। আমরা যদি সরলতা নিয়ে কাজ করি তাহলে নিঃসন্দেহে সেগুলো আমাদেরকে বর্জন করবে। এরূপ অবস্থার জন্য যে পথ্য দেওয়া হয়ে থাকে, তার সংগে নির্দিষ্ট অ্যান্টিস্প্যাসমোডিক ও অ্যান্টাসিড ওষুধপত্র যা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা দিয়ে, তদুপরি যদি এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে পেপটিক আলসার নিরাময় হওয়ার পথ পেতে পারে।

অনুরূপ অনেক স্নায়ুবিক অবস্থা রয়েছে, যাতে ভয় আর উৎকণ্ঠা রোগের কারণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মামুলিভাবে আল্লাহ'তে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা যে ক্ষেত্রে ভয় ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে থাকে, সেখানে অনুরূপ নাটকীয়ভাবে স্বাস্থ্যোদ্ধার হয়ে থাকে।

একমাত্র আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করলে যে কোন রোগ সারে তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভবপর হল না। আমি আর 'হেলথ শ্যাল স্প্রিং ফোর্থ নামক বইয়ে এমনি কতিপয় রোগের উদাহরণ দিয়েছি চিকিৎসা পদ্ধতির আত্মা হিসাবে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস জন্মিয়ে যেসব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় করা হয়েছে।

মানব দেহের সংগে যখন তার সৃষ্টিকর্তার মধুর সম্পর্ক থাকে তখন মানুষের দেহ খুব ভালভাবে কাজ করে। আল্লাহ্‌কে বাদ দিলে আমাদের মধ্যে বিশৃংখলা আর রোগ দেখা দেয়।

তাই বলছিলাম, নিশ্চয় আল্লাহ আছেন। আমি অগণিত অভিজ্ঞতা থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছি। জেনেছি ভাঙ্গা হাড় আর ভাংগা মন, একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই জোড়া লেগেছে।

ফুল আর ওরিওল পাখি সম্পর্কে

বিজ্ঞান জগতের যে দিকেই আমি দৃষ্টি ফিরাই না কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা আইন ও শৃংখলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দেখতে পাই। সূর্যকরোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান এবং সেই সংগে ফুলের অত্যন্ত খুটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলো একবার লক্ষ্য করুন, মন দিয়ে রবিন পাখির মিষ্ট গান

www.pathagar.com

শুনুন এবং বালটিমোর ওরিওলের জটিল বুনটওয়াল বাসা পর্যবেক্ষণ করুন। পতংগকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু তা কি আকস্মিকভাবে ফুলের মধ্যে পৌঁছেছে? পতংগ যে আগামী বছরে আরও ফুল জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলো, তা কি আকস্মিকভাবে হলো? অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু, ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশ অংকুরিত হয়ে এই যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এটাকে কি মামুলি দৈব ব্যাপার বলে উল্লেখ করা চলে? আমরা যেসব আইন সম্পর্কে সবেমাত্র জ্ঞান লাভ করেছি আল্লাহ্ সেই সব আইন দারা অদৃশ্যভাবে এসকল ব্যবস্থা সম্পাদন করেছেন, একথা ভাবা কি এর চাইতে বেশি যুক্তিযুক্ত নয়? শুধু সাথী আছে বলে রবিন পাখী গান করে আনন্দ পায় আল্লাহ্ তা জানেন বলেই রবিন গান গায়? মানুষের জন্য আল্লাহ্র সকল দান যেমন সব সময় মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তৈরি থাকে কিন্তু মানুষ তার খবর রাখে না তেমনি অগণিত পাখি প্রতিদিন আল্লাহর তারিফ করে কত গান গাইছে মরণশীল মানুষের কাছে সে গান পৌঁছায় না।

বালটিমোর ওরিওলের বাসা কি করে তৈরি হয়েছে? কে এ পাখিকে এমন সুন্দর শিল্পকলা শিক্ষা দিয়েছে? কেন সকল ক্ষেত্রেই একই ধরনের বাসা তৈরি হয়? প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার সহজ জবাব হচ্ছে, 'সহজাত প্রবৃত্তি' এমনি সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছে, কিন্তু তাই বলে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ জবাব হলোনা। 'সহজাত প্রবৃত্তি' কি? অনেকে বলেন, যে সকল আচরণ শেখা হয়নি, তাই। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, এ হচ্ছে কতকগুলো আদর্শ মোতাবেক আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলো কাজ, তাহলে কি সেটা অধিকতর যৌক্তিকতাপূর্ণ হবে না?

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি। আমি এমন আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি যিনি একমাত্র উপাস্য, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রব এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে পালন করছেন তাই নয়, অধিকন্তু সে আল্লাহতে বিশ্বাস করি যিনি সারাক্ষণ তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

এই দৃঢ় বিশ্বাস শুধু যে খ্রিস্টান আমেরিকার সংস্কৃতি থেকে আমি অর্জন করেছি তাই নয়- প্রথমত, প্রকৃতির সকল বিস্ময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, আমার মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ্র উপস্থিতি উপলব্ধির পর এ বিশ্বাস আমাদের জন্মেছে।

www.pathagar.com

মানুষ তার চারদিকে উত্তর না দেওয়া সব প্রশ্ন দেখতে পায়। সে যখন তার জবাব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখন প্রকল্প তাকে গড়ে নিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের কোন জবাবের বা অংশ বিশেষ গড়ে তোলার জন্যে খুঁজে পাওয়ার আগে তাকে সেই সব প্রকল্প পরিত্যাগ করতে অথবা মারাত্মকভাবে পাল্টাতে হয়। সে যাই হোক, জবাব পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিটি বছর পার হওয়ার সংগে সংগে এই জবাব আরো পাওয়া যেতে থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেলেও তাতে করে অধিক মাত্রায় এই আল্লাহ্‌কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অপর পক্ষে এমনি মনে হয় যে, মানুষ কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে পেরে সে আল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তার উপর গুরূত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তাই অনেকখানি হ্রাস করেছে। কিন্তু যদি একবার সব মানুষ উপলব্ধি করতো যে, এসব আবিষ্কার মহাবিশ্বের সব কিছুর পেছনে যে সর্বশক্তিমান মনীষা বিদ্যমান তাঁরই সাক্ষ্য বহন করছে।

আমরা যখন গবেষণাগারে গিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বদ্ধ ডোবার এক ফোঁটা পানি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি এবং সে সংগে যখন এ পানির ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ বাসিন্দাদের লক্ষ্য করি, তখন আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতির এত অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ভেসে উঠে। এখানে একটি সদাপরিবর্তনশীল জীবাণুর অত্যন্ত ধীরে ধীরে একটি অতিক্ষুদ্রকায় অবয়বীকে ঘিরে ফেলে দেয় এবং আমরা দেখতে দেখতে তাকে হজম করে উচ্ছিষ্ট বের করে দেয়। আমাদের পর্যবেক্ষণের সময়ের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই উক্ত জীবাণুটি নিজের থেকে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আবার প্রতিটি অর্ধাংশ একটি পূর্ণ জীবে পরিণত হয়। এখানে আমরা একটি দেহ কোষের মধ্যে জীবনের সকল বিকাশ দেখতে পাই, প্রাণীদেহে যে বিকাশের জন্যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ দেহকোষের প্রয়োজন হয়। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ আশ্চর্য রকমের জীব তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তার সৃষ্টির পেছনে দৈব ঘটনারও কিছু নিশ্চয়ই বিদ্যমান।

বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রে কোথাও প্রাকৃতিক আইনাবলিকে এতটা প্রত্যক্ষভাবে জীবনের প্রপঞ্চের উপর প্রয়োগ করা হয় না, যতটা জীবরসায়নের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মানব দেহের মধ্যে যেখানে হজম প্রক্রিয়া ও পরিপাক প্রণালীর

রহস্যাবলি ঐশী হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হতো, এখন তার প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে সকল রহস্যের ব্যাখ্যা মেলে। আরো মেলে যে, একটি উৎসেচক এ সকল পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এতে করে আল্লাহ্‌কে কি তাঁর মহাবিশ্ব থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে? এরূপ বিক্রিয়া যে হওয়া উচিত এবং এরা ঠিক যে এমন নির্দিষ্টভাবে উৎসেচক কর্তৃক পরিচালিত হবে, তা কে নির্ধারণ করেছিল? এক নজর যদি আমরা এ বিক্রিয়া সম্পর্কিত বর্তমানকালের চার্টটি দেখি এবং কিভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা লক্ষ্য করি, তাহলে অতি সহজেই সব কিছুর মূলে দৈবের হাত, এমন মনে করার সকল সম্ভাবনা আমাদের তিরোহিত হবে। সম্ভবত অন্য কোথাও অপেক্ষা এখানে মানুষ ভালো করে এ বিষয়টি শেখে যে, আল্লাহ্‌ কতগুলো নীতি মেনে চলেন এবং প্রাণ সৃষ্টির সংগে সংগে তিনি এ নীতিগুলো কায়েম করেছেন।

একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেখানকার সুশৃংখল দৃশ্য দেখে আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হতে হয়, রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিঃশূন্যের সকল জগৎ আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে, বহু শতাব্দী আগেও সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারতো। এর পরেও কি এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি এগুলোকে দৈবক্রমে একত্রীভূত জ্যোতিষ্ক জাতীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই এগুলো আকাশ মার্গে বিচরণ করছে? যদি তাদেরকে পরিচালনের কোন আইন না থেকে থাকে, তাহলে মানুষ কি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলোকে আকাশের অ-চিহ্নিত পথে পরিচালিত করতে পারবে? যদিও বা মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তারা একথা মানতে রাজী আছে যে, জ্যোতিষ্কমন্ডলী যে কোন ভাবেই হোক পরিচালিত হচ্ছে এবং এই পরিচালন নির্ভরযোগ্য; দৈবক্রমে এদেরকে নির্দেশ দিলেও এই নির্দিষ্ট পথ থেকে টলানো যাবে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি নিকটে পানির যে বিন্দুটি পর্যবেক্ষণ করি আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশে যে নক্ষত্রই আমি প্রত্যক্ষ করি না কেন,

www.pathagar.com

সর্বত্র একটা সঠিক নিয়মশৃংখলা আমাকে মুগ্ধ করে- এই সব এতই নির্ভুল যে, এর স্থিতিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য আইন প্রস্তুত হয়েছে, আর তা হচ্ছে সব আইন প্রণয়ন করা একটি মাত্র কারণেই সম্ভব হয়েছে, আর তা হচেছ এই যে, মানুষ সারা জীবন ধরে এই সব তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্যে বদ্ধপরিকর রয়েছে এবং তারা সেই সংগে এও বিশ্বাস করেন যে, এমনি সব আইন প্রণয়ন সম্ভব। কারণ এমনি বিশ্বাস আর দৃঢ়চিত্ততা না থাকলে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদি প্রত্যেকবারই পরীক্ষার ফলে পৃথক ফল দেখা যায়, আর কোন প্রাকৃতিক আইন প্রয়োগ না করে যদি দৈবকে নিয়ন্ত্রণকারী কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া যায় তাহলে কি অগ্রগতি হতে পারে? নিশ্চয়ই এ আইন ও শৃংখলার পেছনে কোন সর্বময় ক্ষমতা বিদ্যমান, কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ মন ছাড়া কিছুতেই এমনি নিয়ম-শৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে না। যখনই প্রতিটি নয়া আইন আবিষ্কৃত হয়, তখন কি আইনটি ঘোষণা করে না। আল্লাহ, আমার সৃষ্টিকর্তা; মানুষ শুধু মাত্র আমার আবিষ্কর্তা?

বিজ্ঞানের তথ্যপূর্ণ প্রমাণগুলো যেমন প্রকৃত সত্য তেমনি সত্য আমার মধ্যে প্রকৃত আল্লাহর উপস্থিতি। যেমন করে আমরা নক্ষত্রগুলোর চিত্রগ্রহণ করতে পারি, তাদের শূন্য আকাশের গতিপথ নির্দিষ্টভাবে এঁকে দিতে পারি, যেমন করে স্লাইডের উপরিস্থিত অতি ক্ষুদ্র, সর্বদা আকার পরিবর্তনশীল জীবাণুর চিত্রগ্রহণ করতে পারি, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাদের কাছে অবশ্য এমন কোন স্পর্শনীয় সাক্ষ্য নেই। মানুষ যদি নিজেকে এমন অবস্থায় স্থাপন করে, যাতে করে আল্লাহ সব সময় তার সংগে থাকতে পারেন তাহলেই ব্যক্তিগতভাবে তার পক্ষে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হবে। যদি কেউ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে অস্বীকার করে, অথবা একটি পরিবর্তনশীল জীবনের যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে অস্বীকার করে, তাহলে সে যত ইচ্ছা এই বলে তর্ক করতে পারতো যে, পরিবর্তনশালী জীবাণুর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একবার যদি এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি বা তার ছবি তার নজরে পড়ে তারপর তার তর্কের কোন ভিত্তিই থাকবে না। তেমনি মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর দিকে তাকাতে অথবা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে অস্বীকার করে ততক্ষণ সে তর্কের খাতিরে আল্লাহ'র অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে- চিৎকার করে বলতে পারে যে, "আল্লাহ নেই"। কিন্তু একবার অবিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে এক নজর দেখতে পারলে,

www.pathagar.com

তাঁর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বলার তার কিছুই থাকবে না। এ হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। যদি কেউ এ ব্যাপারে নজর দিতে অস্বীকার করে তাহলে করার কিছুই নেই। "যারা তাঁকে সন্ধান করেন, তিনি তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন"। (হিব্রুজঃ ৯ঃ ২৮)

হ্যাঁ, আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি- বিশ্বাস করি মহাবিশ্বের আল্লাহ্‌কে আমার বন্ধু হিসাবে। আমার মধ্যে আর আমার চারদিকে যে আল্লাহ্‌ আছেন আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

আল্লাহর অস্তিত্বের নিশ্চয়তার পূর্ণতা

আল্লাহ আছেন কি? হ্যাঁ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমি যেমন নিশ্চিত এ ব্যাপারেও আমি ততটা নিশ্চিত। এই আমি যেমন আছি যেমন রয়েছে আমার অস্তিত্ব ঠিক তেমনি আল্লাহ যে আছেন সে সম্পর্কেও আমি স্থির নিশ্চিত। আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসের ফলে, আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের সম্পর্কে সম্পুর্ণ চরম ও যুক্তিসংগত একটা অর্থ হয়। মানুষ যে জড়পিণ্ড ও শক্তির সমষ্টি নয়, সে একটি ব্যক্তি এবং তার চাইতেও বেশি এ নিশ্চয়তার সম্পূর্ণতার জন্যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসই হচ্ছে একমাত্র সর্বশেষ চরম যুক্তি। সম্পূর্ণতার জন্যে আল্লাহতে বিশ্বাস। সর্বময় ও যথার্থ প্রেম, ন্যায়বিচার ও ক্ষমার আধার আল্লাহ্‌র কাছে সবাই সমান বলে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আর কর্তব্যের চরম ও সন্দেহাতীত উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস। আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করলে এমন একটি ক্ষমতা জন্মায়, যা নাকি এমনি গ্যারান্টি প্রদান করে যে, আল্লাহ্‌তে যারা যথার্থই বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস আসতে পারে না। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহতে বিশ্বাসই হচ্ছে একমাত্র ঈমানের দৃঢ় ভিত্তি। কারণ, এমনি স্থায়িত্ব কেবলমাত্র বাইরে ও ঐশী ব্যক্তিত্বেই চিরস্থায়ী হতে পারে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে হাতে কলমে প্রমাণ করা যেতে পারে

মনের যন্ত্রপাতি দিয়ে দৈনন্দিনকার ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মিশ্রক্রিয়ার ফলে চিন্তাধারার যে সব নীতি গড়ে উঠে, তারই প্রয়োগের ফলে যুক্তিবিদ্যার নীতি

www.pathagar.com

অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্বকে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেতে পারে। থমাস অ্যাকুইনাইস সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রমাণটি সম্পন্ন করেন। স্বাভাবিক শিশুর মনের উন্নতির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সকল বিষয় পিতামাতা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাই প্রমাণের মৌলিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করে থাকে। এমনিভাবে যুক্তিসংগত উপায়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে- প্রমাণিত হয়েছে, সেই মহান বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি মোতাবেক, যাদের বিজ্ঞান মানবতার কল্যাণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে।

আল্লাহ্ নেই- একথা যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না

"আল্লাহ যে আছেন", এ প্রকল্পকে অস্বীকার করা যায় না। "আল্লাহ নেই" এ প্রকল্পকেও প্রমাণ করা চলে না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেতে পারে, যেমন অস্বীকার করেছেন নাস্তিক কার্ল মার্কস আর লেনিন? কিন্তু নাস্তিকেরা কোন দিন তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিস্বরূপ কোন কিছুই পেশ করতে পারে নি। কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও মনে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সেখানেও সন্দেহের একটা ভিত্তি থাকা উচিত। "আল্লাহ্ নেই" একে প্রমাণ করে এমন কোন যুক্তিসংগত অবতারণার কথা আমি পড়িনি আমার শোনারও সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ আছেন এ প্রকল্প সত্য বলে প্রমাণ করে এমন লেখা আমি পড়েছি, তা নিয়ে গবেষণাও করেছি। আমি আরও প্রত্যক্ষ করেছি, আল্লাহ্'র ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মানুষের কি কল্যাণ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করার ফলে মানুষের কি ক্ষতি হয়েছে।

'আল্লাহ্ আছেন' এই প্রকল্প সত্য বলে প্রকাশ করার জন্য নাস্তিকগণ এবং অজ্ঞেয়বাদীদের অনেকেই এমন ধরনের প্রমাণ চায়, যা নাকি আল্লাহকে মানুষের মত কেউ একজন বলে প্রমাণ করতে পারে, অথবা প্রস্তর-মূর্তি, দেবমূর্তি অথবা বিগ্রহরূপে প্রমাণ করতে পারে। যদি এমন গুণাবলি সম্পন্ন কোন আল্লাহ্ই থাকতো তাহলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনোনয়নের যে স্বাধীনতা বিদ্যমান তা আর থাকতো না। মানুষের জন্য আল্লাহর যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে যেহেতু আল্লাহ্ মানুষকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন, কাজেই আল্লাহ্ আছেন বলে বিশ্বাস করা, অথবা আল্লাহ নেই একথা বিশ্বাস করা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনারই অংশ। কাজেই আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করা

www.pathagar.com

অথবা সন্দেহ প্রকাশ করা মানুষের নিজস্ব মর্জির ব্যাপার। অস্বীকার এবং সন্দেহ প্রকাশ দ্বারা নিজেকে বিভ্রান্ত মনে করে পরিণাম ভোগ করার স্বাধীনতাও মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। অধিকাংশ নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী এবং এমনি অনেক তথাকথিত খ্রিস্টান আল্লাহ্কে এমন একটি সত্তা বলে মনে করেন যার সঙ্গে দরকষাকষি করা চলে। তারা এমন সব উক্তি করে থাকেনঃ "আল্লাহ্ যদি আমার আত্মাকে রক্ষা করেন, তাহলে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করবো, যদি তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন অথবা বন্যা রোধ করেন, অথবা আমার ব্যথা সারিয়ে দেন অথবা দুনিয়া থেকে সকল পাপ, সকল অনাচার-অবিচার দূর করেন। কল্যাণ কামনাকারী আল্লাহ যদি সত্য থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার দাঁতের ব্যথা হতো না।" কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায় যে, আমি আল্লাহ্তে বিশ্বাস করতে পারি, যদি আমার পরিকল্পনা মোতাবেক এ মহাবিশ্বকে নির্মাণ অথবা পুনর্নির্মাণ করেন- গড়ে তুলেন আমার স্বার্থান্ধ পরিকল্পনা এবং আমার জ্ঞান বুদ্ধি মতো!

আল্লাহ্র দিকে এগুতে হলে, সোজাসুজি আর যুক্তিসংগতভাবে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, মানুষ মাত্রেরই তাদের স্বার্থান্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা বৈরাগ্যধর্মী মতামত, তিক্ততা আর যেসব মানসিকতা স্বাধীন চিন্তাধারায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা সবই বর্জন করে যাতে তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস ও আল্লাহ্কে ভালবাসতে পারেন এবং সেই সংগে তারা যে পাপ ও অনাচারের কথা জোর গলায় বলে থাকেন, দুনিয়া থেকে তাকে অপসারণের জন্য যাতে সাহায্য করতে পারেন, তদুদ্দেশে কলুষমুক্ত মন নিয়ে তাদেরকে এগুতে হবে। আল্লাহ্র অস্তিত্বের যথার্থতা সম্পর্কে এ কথাই বলা যায়, যে সব সাধু ফকীর আর প্রকৃত আল্লাহওয়ালা তাঁদের কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন, তাদের খাদ্য যেমন জীবন ধারণের জন্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা জীবনকে যে উৎসাহিত করেছে তা অস্বীকার করা আদৌ যুক্তিসংগত হতে পারে না। বিশ্বে পাপ ও অনাচার আছে বলে অভিযোগ না করে আল্লাহ্র পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমাদের বুদ্ধিমত্তা আর স্বাধীন চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া থেকে সে অবিচার দূর করার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের কাজ হবে, যাতে এ পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; স্বর্গের ন্যায় যাতে পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়।"

www.pathagar.com

বিশ্বাস, আশা আর প্রেম সবকিছু যুক্তিভিত্তিক হওয়া উচিত

আল্লাহতে আমার বিশ্বাস; যে আল্লাহ্ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ মহাবিশ্বের ভেতর ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান এবং যিনি আপনার ও আমার প্রতি আগ্রহশীল, তা প্রথমে যুক্তি ও তারপর বিশ্বাস, আশা আর প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি যুক্তিভিত্তিক না হয় তাহলে আমি বিশ্বাস-আশা আর প্রেমের অধিকারী হতে পারি না।

যুক্তি থেকে কারো দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকের সঠিকভাবে এবং বলপূর্বক যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত। যে বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি নেই, সে বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। সব রকম সমালোচনা- মারাত্মক সমালোচনার সম্মুখীন হতে এবং পরিশেষে তেমন বিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। যুক্তিবহির্ভূত ধর্মীয় বিশ্বাস সকল সময়ই খারাপ চরিত্র আর মন্দ স্বভাবের জন্ম দিতে বাধ্য। যে যুক্তি ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দৈনন্দিনের কাজকর্ম এবং বিশ্বাস গড়ে ওঠে, সে যুক্তি ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দুনিয়ার বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাদের কাজকর্ম এবং বিশ্বাসকে পরিচালনা করেন তা থেকে আমাদের সরে যাওয়া উচিত হবে না। যে বিশ্বাসের চিন্তাধারার ওপর ভবিষ্যৎ জড়-জগতের অগ্রগতি নির্ভর করে, সেই একই চিন্তাধারার ওপর আল্লাহ্তে বিশ্বাসও নির্ভর করে। এই দৈনন্দিনকার বিশ্বাস হচ্ছে যেমন, কাল যে সূর্য উঠবে এ কথাটি আপনি, আমি যাতে বিশ্বাস করি তার পেছনে যে কারণ আছে সেটি; অথবা আগামীকাল আমার জীবনের অন্যান্য সব কিছুর প্রয়োজন হবে; অথবা আমি বেঁচে থাকবো; অথবা আমার কাজকে ভালবাসবো ইত্যাদি। যদি জড় জগতের অগ্রগতির ভিত্তি যুক্তি হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি যুক্তি হবে না কেন? প্রত্যেকেরই তার ধর্মীয় বিশ্বাসের যে ভিত্তি রয়েছে তা দৃঢ়তার সংগে প্রকাশ করার সৎসাহস থাকা উচিত। আর ভাল কাজ করে তাদের সে বিশ্বাসের প্রতি যে দৃঢ় নিষ্ঠা রয়েছে, তা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

যদি আপনি সন্তোষজনকভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে অথবা বলতে হবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে আত্মসাৎ; ঠিক যেমনটি ঘোষণা করেছিলেন থমাস জেফারসন স্বাধীনতা ঘোষণা-সনদের মূল বিষয় রচনাকালে।

www.pathagar.com

থমাস জেফারসন বলেছিলেন; "সব মানুষ সমান- এই সত্য উক্তিটি আমার আত্মরক্ষা হিসেবে মনে করি। আমরা মনে করি, তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সেই সব অধিকার হচ্ছে তাদের জীবনে স্বাধীনতার এবং শান্তির সন্ধানের অধিকার; এসব অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে- যে সরকার শাসিত জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে তার ন্যায় করার ক্ষমতা লাভ করে থাকেন।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তথা সরকারের ধর্মীয় তথা নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে রয়েছে থমাস জেফারসনের এ সারগর্ভ উক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। থমাস জেফারসন এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ যাঁরা যুক্তরাষ্ট্র কায়েম করেন তাঁদের এমনি বিশ্বাস কার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও যখন মানুষ বলে যে, তারা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে মানে তখন দেখা যাবে যে, তাদের বিশ্বাস কতগুলো পূর্বঘটনা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা যুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন কিছুতেই বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে কোন না কোন পূর্ববর্তী জ্ঞান বা যুক্তির একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌র অস্তিত আত্ম-সাক্ষ্য মূলক- এ বলার অর্থ হচ্ছে আমি যেহেতু আনুষ্ঠানিক জ্ঞানের অধিকারী নই অথবা যেহেতু কখনও আমার যুক্তিকে সুসংবদ্ধ করি নি, অথবা যেহেতু আমি তৈরি নই অথবা বর্তমানে আমার যুক্তিসমূহ পেশ করা উচিত হবে না বলে মনে করি, কাজেই আমার পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে হাতে কলমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমি কখনও এমন মানুষের পরিচয় পাই নি তারা এই ধরনের যুক্তি প্রদান করে থাকে যে, নিশ্চয়ই কোন একজনকে আইন তৈরি করতে হয়েছে। "সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোন রকমেই মেশিন তৈরি হতে পারে না।" এই মৌলিক সত্যটি প্রতিটি স্বাভাবিক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকই বুঝতে পারে।

শিশুর মনে কার্য-কারণ বোধের ক্রমবিকাশ

আমি যখন তিন বছরের শিশু, তখন তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের পক্ষে যে সব কথা বলা স্বাভাবিক, তেমনিভাবেই বলেছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার বাবাকে, "কে আমাকে বানিয়েছে?" "কে পাখি সৃষ্টি করেছে?" "কে আমাদের গরুকে বানিয়েছে?" "কে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?" জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অথবা

www.pathagar.com

আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তার ফলে আমার কচি মন বা বুদ্ধিমত্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'প্রস্তুতকারক ছাড়া কখনও মেশিন তৈরি হতে পারে না।' আমাকে বুদ্ধিমত্তা-আশু ঘটনাসমূহের পরেও যেসব বিষয় রয়েছে তৎসম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে আমার মস্তিষ্কের উপযুক্ত অংশকে নাড়া দেয়। আমি আছি, পাখি, গরু এসবই তো আছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিমত্তা এরও পরে, আরো সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, যথেষ্ট কারণ, একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আমি জন্মাতে পারি না, পাখি, গরু সৃষ্টি হতে পারে না।

আমার সরল, অকপট, পূর্ব সংস্কারমুক্ত, অবিভ্রান্ত, আশাবাদী, বোধশক্তি সম্পন্ন, যুক্তিবাদী মন, অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা মৌলিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছে। মানুষের মন যে অস্তিত্বের ও চিন্তাধারা নীতি কল্পনা করেছে, তাই আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছে।

আমার মস্তিষ্কে মন গড়ে তোলার যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তার সংগে ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার এত বেশি সম্পর্ক যে, তার সাহায্যে অতি সহজেই আত্মসচেতন বোধসম্পন্ন মন গড়ে উঠে। এই সচেতনতাকে অনুভূতিও বলা যায়। যে অনুভূতির সঙ্গে আমি যে একটি সত্তা এই উপলব্ধি জন্মায়- 'এই আমি' এই ভাবটি উপলব্ধি করায়। এই আমি নই সে সংগে এই অনুভূতিও আমাদের জন্ম দেয়। 'আমি পাখি নই, আমি পৃথিবীও নই' এ অনুভূতিও এক সংগে আমার উদ্রেক হয়। অন্যকথায় আমার মন 'হওয়া না হওয়া' এই সত্য বা নীতিকে প্রকাশ করে। সেই সংগে আমার মন অংশ ও সম্পূর্ণ সম্পর্কেও অভিমত ব্যক্ত করে। অর্থাৎ, প্রকাশ করে যে, অংশের চেয়ে সম্পূর্ণ অনেক বড়।

হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠার পরই শিশুর মনে চিন্তার প্রথম নীতি জন্মলাভ করে। অর্থাৎ, "আমরা একই সংগে কোন কিছুকে মানতে ও অস্বীকার করতে পারি না।" একটি ছোট ছেলেঃ "আমি হচ্ছি টম' এবং এ হচ্ছে আমার বোন মেরী। ছেলেটির যুক্তিবাদী মত তাকে এমন করেছে যে, একমাত্র ঠাট্টা করা ছাড়া অন্য কোন অবস্থাতেই সে বলবে না যে আমি হচ্ছি মেরী এবং এ আমার বোন টম। শিশু আরও শেখে যে, বর্গক্ষেত্রকে গোল বলা ভুল। সে জানে যে বর্গক্ষেত্র হওয়ার জন্যে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান এবং এই কারণগুলোই তাকে বর্গক্ষেত্র রূপে সৃষ্টি করেছে এবং এ ভাবে সে বিষয়টিকে বোধগম্য করে তোলে।

www.pathagar.com

শিশুর এই জ্ঞান এবং শিশু যে জিজ্ঞেস করলো "কে আমাকে বানিয়েছে?" এবং কে পৃথিবীকে তৈরি করছে? এ কথা এটি প্রমাণ করে যে, শিশু হেতুবাদের মৌলিক নীতি আবিষ্কার করেছে। এই নীতিকে "কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন" বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। "কারণ ছাড়া কোন প্রকারেই ফল থাকতে পারে না, প্রস্তুতকারণ ছাড়া যন্ত্র সৃষ্টি হতে পারে না, প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য একটি করে কারণ আছে" এই হচ্ছে কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন। এই চিন্তাধারাই "আমার অস্তিত্ব" এবং "পৃথিবীর অস্তিত্ব" সম্পর্কে একটা অভিমত গড়ে তোলার সংগে সংগে তারই সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় এসে পড়ে এবং তা হচ্ছে মূল কারণ হিসেবে আল্লাহ্'র অস্তিত্ব অথবা গতির অস্তিত্বের সংগে প্রধান পরিচালকের অস্তিত্ব। চিন্তাধারার গতিকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন, পরিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী; পরিকল্পনার জন্য একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন; এই পরিকল্পককে অবর্ণনীয় ক্ষমতার অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে; আর এই ব্যক্তিত্বই হচ্ছে আল্লাহ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সব আইন এমনি হয় যে, তিন চার পাঁচ বছরের গড়ে ওঠা শিশুর মতো একথা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা একজন থাকতেই হবে।

হাতের কাছে আমাদের যেসব প্রমাণ জানা আছে, তার বাইরে কি কারণ রয়েছে, তারই সন্ধানের জন্য বিজ্ঞানী হিসাবে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমার মন, অস্তিত্বের জড় ও আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে মূল্যবান নতুন বিষয় বা সত্য আবিষ্কারের জন্য জীবনে আশু বিষয়গুলোর পরে অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চায়। আমার এই সন্ধান প্রচেষ্টায় আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অথবা "প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী যা" সম্পর্কে পড়াশোনা এবং গবেষণা করি। সে সংগে চরিত্র, নৈতিক ও ধর্মীয় বিজ্ঞান অথবা "পৃথিবী যেমন হওয়া উচিত" সে সম্পর্কেও গবেষণা করি। এ অধ্যয়নে আমি দেখেছি, অনেক ভাল ভাল লেখক, বড় বড় দার্শনিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অত্যন্ত উন্নত ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক সময় হয় চটুল অথবা নিশ্চিত ভুল করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিষয়টি আরও জটিল করে তোলেন এবং আশু বিষয়গুলো পেরিয়ে তার বাইরে নজর দেওয়ার পথে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে কুয়াশার বেড়াজাল সৃষ্টি করেন অথবা

www.pathagar.com

বলা যায়, আশু ও সর্বজনবিদিত বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করেন। যে বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে এমনি কাজ করেন, তিনি তার অগ্রগতির পথ প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেন। জানা বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দান করে, জড় ও আধ্যাত্মিক মূল্য, আইন ও শৃংখলার গবেষণাগারের বাইরে প্রাকৃতিক আইনের যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং বিশ্বাস, আশা ও সত্যের প্রতি প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবলোকন দ্বারা সকল অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে।

কারণতত্ত্বের নীতি

বেশ কয়েক বছর আগের কথা, কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যিনি নাস্তিক বলে আমি শুনেছিলাম, আমরা সবাই নৈশভোজ সভায় মিলিত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা হচ্ছিল। একজন ব্যবসায়ী বললেনঃ আমি পড়েছি অধিকাংশ বিজ্ঞানীই নাস্তিক। কথাটা কি সত্য?

প্রশ্ন করে ব্যবসায়ী আমার দিকেই তাকালেন। আমি তাকে কতটা এরূপ জবাব দিয়েছিলামঃ "আমি বিশ্বাস করি না। এই উক্তির কোন সত্যতা নেই। প্রকৃতপক্ষে পড়াশোনা করে এবং আলোচনার মাধ্যমে আমি জেনেছি যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা মানব জাতির সবচাইতে মঙ্গল করেছেন, তাঁরা নাস্তিক নন। অনেকে ভুল করে, অথবা ভুল বোঝানো হয়ে থাকে। আমি আরও বলি, নাস্তিকতা অথবা নাস্তিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিক যেভাবে চিন্তা করেন, কাজ করেন, জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তা নাস্তিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি এ নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করেন যে, নির্মাতা ছাড়া মেশিন তৈরি হতে পারে না। তিনি জানা বিষয়াবলির ভিত্তিকে যুক্তিতে প্রয়োগ করেন, তিনি যখন গবেষণাগারে ঢোকেন তখন বিশ্বাস আর আশায় বুক বেঁধে ঢোকেন। আর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই জ্ঞানের জন্য তাঁদের যে আগ্রহ রয়েছে, মানুষ ও আল্লাহর প্রতি তাদের যে ভালবাসা রয়েছে, তারই জন্যে কাজ করে থাকেন। হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করেন, তিনি দেহের কলকব্জা সম্পর্কে বলেন। কিন্তু তিনি কারণতত্ত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে গবেষণা চালান। মহাবিশ্বে যে আইন ও শৃংখলা বিদ্যমান তিনি তার উপর নির্ভর করেন। অন্যান্য সকলে যেমন করেন তেমনি তিনিও কারণতত্ত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, প্রতিটি চিন্তাশীল কাজ সম্পাদন করেন।

www.pathagar.com

শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন কেউ শরীরের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, সংরক্ষণ এবং দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরের মেরামত প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন তখন তিনি দেখতে পান যে, প্রতিটি দেহ-কোষ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কাজটি ভাল করে জানে এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক দেহের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থায়, সাধারণ প্রতিসরণ কাজটি একটি উদ্দেশ্যমূলকতারই প্রকাশ মাত্র। ইহাই মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। আরও গবেষণার ফলে যে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, মনের উন্নতির জন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে যে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, তা এমনিভাবে গঠিত যে, যখন ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সংগে বিক্রিয়া করে, তখন কারণতত্ত্বের নীতি অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রকাশ পায়। অন্য কথায়, সকল অবয়বীর প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতির জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দায়ী, মনের ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিক্রিয়ার ফলে যতক্ষণ না সচেতনতা জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব যন্ত্রপাতি অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পার্থক্য করার ক্ষমতা সম্পর্কিত সচেতনতা যখন তারপর গড়ে ওঠে তখন কোনটা গুরুত্বপূর্ণ অথবা কার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, সে সম্পর্কে একটা মনোভাব জন্মায়। অথবা একটি জীবনকোষের উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি থেকে শুরু করে এবং অধিক থেকে অধিকতর পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতনতা উদ্ভূত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রদত্ত হলে, কারণতত্ত্বের আইনের উপর ভিত্তি করে একজনের পক্ষে যুক্তিসংগত উপায়ে পৃথককারী সচেতনতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। ফলে মানুষ তার পরিবেশের উপরে অধিক থেকে অধিকতর অধিকার কায়েম করতে পারবে।

শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত বিজ্ঞানে মাছের কানকো, পানির প্রাধান্যকে প্রকাশ করে যেমন প্রকাশ করে পাখির ডানা আর মানুষের ফুসফুস বাতাসের অস্তিত্ব। মানুষের চোখ আলোর প্রাধান্য ব্যক্ত করে; বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য ঘটনা প্রাধান্য প্রকাশ করে; জীবনের উপস্থিতি, প্রাকৃতি আইনে জীবন ধারণের উপযুক্ততাই প্রকাশ করে থাকে। এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সুস্পষ্ট যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, বিরাট সাহস, মহান কর্তব্য, চরম বিশ্বাস, গভীর প্রেম- এসব কিছু কি কোন কিছুর গুরুত্বই প্রকাশ করে না? সর্বাপেক্ষা সুগভীর

www.pathagar.com

চিন্তাধারা, মানুষের ভাবাবেগ ও কার্যাবলী কোন কিছুরই গুরুত্ব সম্পর্কে যুক্তিপ্রদর্শন করে না, একথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে। তারা একটি সর্বোৎকৃষ্ট মন বা সৃষ্টিকর্তার পূর্ব উপস্থিতিকেই প্রকাশ করে। যারা সর্বোৎকৃষ্ট মন বা সৃষ্টিকর্তার সন্ধানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না- তাদের কাছে এই সৃষ্টিকর্তা অভিজ্ঞতার দুনিয়ার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইনকে কখনও অগ্রাহ্য করা যায় না। এর প্রয়োগ ছাড়া সকল প্রাণী মরে যেতো। মানুষের মন কারণতত্ত্বের ভিত্তি ছাড়া অন্য কিছুতেই কাজ করতে পারে না। তাই আমি বলতে চাই যে, কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন একটা বাস্তব বিষয়।

কতিপয় বৈজ্ঞানিককে আমি বলতে শুনেছি যে, অধিবিদ্যা অথবা চিন্তার আদর্শসমূহ প্রয়োগ যে ক্ষেত্রে আরম্ভ হয়, কারণতত্ত্ব সেখানে পৌঁছে শেষ হয়। আমি এ কথা স্বীকার করি যে, চিন্তার, কারণতত্ত্বের গুরুত্বের মৌলিক নীতি সমূহকে কাজে লাগানো অযৌক্তিক হবে যদি তা উদ্দেশ্য হাসিল করতে উপযোগী বলে বিবেচিত ও গৃহীত হয়ে পরে বর্জিত হয়। আকস্মিক সূত্রের মধ্যে অধিবিদ্যক যোগসূত্র যুক্ত করা যুক্তিবিদ্যার পরীপন্থী নয়। আমরা এ কাজ বিজ্ঞান তথা দৈনন্দিনকার জীবনে বহুবার করে থাকি। অবশ্যি এই যোগসূত্র আদৌ সত্য বলে প্রমাণিত হয় কি না সে অন্য কথা। কিন্তু যদি কখনও এই যোগসূত্র নিয়ে কোন কিছুতে প্রয়োগ করে এবং সঞ্চানকার্য গুরুত্ব সহকারে পরিচালিত না করা হয়, তাহলে সূত্রের সত্যতা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। এই রকম যোগসূত্র স্থাপিত হলে তা সন্ধানকারীর সংগে সত্যের, চরম সত্যের একটা যোগসূত্র হতে পারে।

মনে হয় যেন নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদীদের ফাঁকা সন্দেহ বিদ্যমান এবং তাদের মনে একটা অন্ধ চিহ্ন, অনুভূতি- ক্ষমতা বিলোপ করার স্থান বিদ্যমান বা তাদের একথা উপলব্ধি করতে বিরত করে যে, আমাদের সকল জড় ও প্রাণচঞ্চল জগৎ, আল্লাহ'র অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কল্পনাতীত ব্যাপার। আইনস্টাইন যেমন লিখেছেন ঃ "যে মানুষ নিজের এবং সেই সংগে অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করে, সে শুধু যে হতভাগ্য তাই নয় অধিকন্তু তার জীবনের কোন মূল্য নাই।" আমি এই সংগে আরও একটু বলতে চাই যে, যদি

www.pathagar.com

বিশ্বাস ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তার আশা থাকে তাহলেই কেবলমাত্র তার জীবন ধারণ ব্যর্থ হবে না, এতে করে সে রক্ষা পেতে পারে বা তার পুনর্জন্ম হতে পারে এবং সে আবার শিশুর মতো চিন্তা শুরু করতে পারে।

তারপর আমি সেই বৈজ্ঞানিকের দিকে তাকালাম; যার সমালোচনা করার ক্ষমতাকে আমি ও অন্যান্য সবাই খুব প্রশংসা করতাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যা আমি বললাম, তা কি ঠিক?' তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে- কি প্রকার আল্লাহ?"

আমি তার সংগে একমত হলাম। কারণ সর্বপ্রথম মানুষ, চিন্তাশীল মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ আছেন কি?" দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগেঃ "কি প্রকার আল্লাহ্?" তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছেঃ "বেঁচে থেকে কি লাভ?" এবং চতুর্থ প্রশ্ন জাগে ঃ "ঠিক এবং বেঠিক কি?"

আমি তারপর বললামঃ আল্লাহকে "সৃষ্টিকর্তা ও পরিকল্পক" হিসাবে কেবলমাত্র কল্পনা করলে তা খাটো করে দেওয়া হয়। আমি আপনাকে তাই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, যা নাকি খ্রিস্টান আস্তিকতার মৌলিক ধারণা। সুস্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে এ জবাব দিতে গেলে, আমাকে মেশিন ও তার প্রস্তুতকারকের কথা থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু এটি করার আগে আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস সকল গন্ডী পেরিয়ে যাবার যুক্তিক্ষম একজন প্রস্তুতকারক যখন একটা যন্ত্র তৈরি করেন তখন নিশ্চয়ই যন্ত্রটি নির্মাণের পেছনে তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য থাকে। তারপর মেশিনটা তৈরি করার সময় সে তাতে তার আধ্যাত্মিক বা মানসিক 'আত্মা'-কে সংযোগ করে। তারপর, যন্ত্রটি শেষ হবার পর এর জন্য তার একটা আকর্ষণ থাকে, কিভাবে যন্ত্রটি কাজ করে তিনি তাতে আগ্রহশীল হন। আমি কোন যুক্তিক্ষম সৃষ্টিকর্তার কথা ভাবতে পারি না, যার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তটি প্রযোজ্য হতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির মধ্যে যেমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিধর্মী বলা যায়। আপনার একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, আমি এমন আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি, মানুষ যখন তাদের মনে তাকে প্রবেশ করতে দেয়, তখন তাদেরকে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলেন, সাধু উদ্দেশ্য লাভের পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ্ ও মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা প্রদান করেন।

www.pathagar.com

রাত দুটো বেজে গিয়েছিল, কাজেই খাওয়ার সময় তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই আলাপ-আলোচনা সেখানেই শেষ হলো। আমরা প্রশ্নটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো তেমন স্থান সংকুলান এ বইয়ে হবে না এবং তা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। সে যাই হোক, "আল্লাহ্ আছেন কি?" এ প্রশ্নের আমার জবাব শেষ হবার আগে আরও কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই।

আল্লাহর গুণাবলি

যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মীয় পন্ডিত ও ক্লাসিক্যাল দার্শনিকগণ বিস্তৃতভাবে আল্লাহর গুণাবলি বিবেচনা করেছেন। যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কতিপয় গুণ রয়েছে। নিচে এসব গুণের সারমর্ম দেওয়া হল।

আল্লাহ্ অনন্ত এবং সর্বকালে বিরাজমান; কোন পদার্থ নন; কোন দৈব ঘটনাও নন; ঐশী পবিত্রতায় সম্পূর্ণ; সকল মঙ্গলের তিনি মঙ্গল; সকল পাপ ও পাপীকে জানেন; পাপ হতে পারেন না; পাপ ইচ্ছা থাকতে পারে না; কোন কিছুই ঘৃণা করেন না; আল্লাহ্'র রয়েছে প্রেম ও স্বাধীন পছন্দ; আল্লাহ্র ক্ষুধার কোন তাড়না নেই; আল্লাহ্তে নৈতিক গুণাবলি বিদ্যমান; যা কার্যকারণ ও চিন্তাশীল গুণাবলি বই অন্য কিছু নয়।

বাইবেলে আল্লাহ্র যেসব গুণাবলির উল্লেখ আছে, এসব গুণাবলির বেশীর ভাগই তার সংগে ঐক্য আছে; বিশেষ করে নিউ টেস্টামেন্টে উল্লিখিত গুণাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু বাইবেলে যেসব গুণাবলীর উল্লেখ আছে তা যুক্তিসংগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, নির্ভরযোগ্য বা আত্মসাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নৈতিক কারণতত্ত্ব তৎসহ স্বাধীন পছন্দ

আল্লাহতে বিশ্বাস করার অনেক কারণ আছে। আমি যে কারণটিকে 'নৈতিক কারণতত্ত্ব তৎসহ স্বাধীন পছন্দ' বলে উল্লেখ করলাম, তাকে কোন কারণেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক হচ্ছে- অমানবিক প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন ছাড়া, মানুষের কল্যাণ সম্পাদন সম্ভব নয় এবং মানুষের এটিই করা উচিত। প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, আমাদের এ বিশ্বকে, যাতে আমরা বসবাস করি

www.pathagar.com

তাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, আর বাড়িয়ে দেয় আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে, জীবনের আনন্দের জন্যে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে জীবনের কষ্টকে লাঘব ও আনন্দময় দীর্ঘ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ক্ষমতা। আজকের দিনে আমাদের দুনিয়ার সবচাইতে বড় নৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা হচ্ছে, কি করে মানুষের ধ্বংস ডেকে না এনে আমরা আণবিক শক্তিকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি। মানুষের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার সমাজজীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে তা ছিল নৈতিক সমস্যা অর্থাৎ ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্যা।

আমাদের চারদিকে আমরা দেখতে পাই, প্রাকৃতিক অনমনীয় আইনাবলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সবকিছু। একই আইন গহীন অরণ্যে পশুর স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র- তার রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। অথবা মানব সমাজকে কতক আত্মা বা মানুষের সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানরূপী মহীরূহ ভক্ষণ করা না করা তাদের ইচ্ছা। আমরা যদি আল্লাহ্‌র নৈতিক আইনাবলি না মানি তাহলে আমাদের পরিণাম ভোগ করতে হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রকৃতির যদি স্বাধীনভাবে মতামত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতো তাহলে মানুষের পছন্দের স্বাধীনতা থাকতো না; সব বিশৃংখল হয়ে যেতো।

প্রাণী জগতের আচরণ নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, মানুষের নিচে সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে দুটি মাত্র সাধারণ প্রাকৃতিক আইন তাদের আচরণকে পরিচালনা করে- (১) নিজের বেঁচে থাকা; (২) বংশ রক্ষা করা। এই দুটি আইন যদি চিরস্থায়ী না হতো তাহলে কোন পশুজাতি রক্ষা পেত এমন সামান্য প্রমাণই মেলে। প্রাণীজগতের আচরণ তারা শিক্ষা লাভ করে না, কিন্তু মনে হয় যেন একই রকম আচরণ তাদের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু প্রাণীরাজ্যে যতই উপরের দিকে উঠা যায়, ততই অধিক থেকে অধিকতর শিক্ষিত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা যেমন মানুষের আছে, মানুষের নিচে অন্য কোন প্রাণীর তা আছে কি না তা খুবই সন্দেহের ব্যাপার। আর যদি থেকে থাকে তবে তা খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রাণী প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণীর নিজ দেহের প্রতি যত্ন নেওয়া বা দেহকে ভালবাসার, দেহে আঘাত না লাগানোর জন্যে,

www.pathagar.com

নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, জাতিকে রক্ষা করার জন্যে এসব ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পশুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোগিতার নীতি, "জংগলের আইন" "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি প্রযোজ্য। বানর থেকে শুরু করে নিম্ন স্তরের সকল প্রাণীর মধ্যে যতটা গবেষণা করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে একটা 'পেক্ অর্ডার' পরিলক্ষিত হয়। যেসব পশু দলবদ্ধ হয়ে বাস করে তাদের মধ্যে একচ্ছত্র অধিকার বা একাধিকার দেখা যায়। কথা হলো এই যে, নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে আচরণ সম্পর্কিত অনেক আইন রয়েছে, যা নাকি একেবারে অনমনীয়।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাণীজগতের প্রাকৃতিক আইন ও সেই সংগে আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে রয়েছেঃ প্রথমত রহস্যময় কিছুর জন্যে বিস্ময়ানুভূতি, দ্বিতীয়ত ভালমন্দ, বোধশক্তি এবং তৃতীয়ত যে ক্ষমতা ভাল-মন্দকে বিচার করে তা ঠিক-বেঠিক বিচার বুদ্ধি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাণী জগতের নিম্নস্তর থেকে আরম্ভ করে উপরের সকল স্তরের পশুর মধ্য থেকে প্রাকৃতিক বিশ্বের কারণিক সূত্র মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছে- যা পরিবেশ ও তার নিজের উপর মানসিক অধিকার থেকে মানুষ একটি সচেতনতাও অর্জন করে।

এই কারণিক সূত্রের উৎস কি হতে পারে? এই সূত্র কি শূন্য থেকে আসতে পারে না, আকস্মিকভাবে এটা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে? এই কারণিক সূত্র কোন কিছু থেকে আসে নি, আকস্মিকভাবে এর উৎপত্তি ঘটেছে- একথা বিশ্বাস করা, মেঝেতে পানি ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি হতে পারে একথা কল্পনা করার চাইতে অতিমাত্রায় অবাস্তব।

কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন, প্রত্যেক জগতের আইনাবলি অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রাণী জীবন সম্পর্কিত আইনসমূহ পরিচালনের জন্যে একেবারে অপরিহার্য? আমাদের মনের ক্রমবিকাশের জন্যে সেসব আইন রয়েছে- যা নাকি আমাদেরকে স্বাভাবিক নৈতিক আইন যেমন প্রেম, ন্যায়, ক্ষমতা, অধিকার, দায়িত্ব, সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি আল্লাহতে পৌঁছে দেয় সেগুলো পরিচালনের জন্য কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন যে অপরিহার্য এটি প্রত্যক্ষ করলেও আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্য কথায় যে মূল্যবোধ বা উচ্চ ধারণা নিক্তিতে ওজন করা যায় না তার জন্যে এ আইন।

www.pathagar.com

আমি বলতে চাই যে, মানুষের ভবিষ্যতের আশা প্রধানত জীবনের এ মূল্যবোধের অধিকারের উপর নির্ভর করে। জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু যদি পাওয়া যায়, কামনা যে সকল জিনিস পরিমাপ বা গণনা করা যায় না তা থেকে প্রকৃত আনন্দ আসে এবং যে আনন্দ থেকে অনুশোচনা আসে না মানুষ তা থেকে প্রকৃত তৃপ্তি পেতে পারে।

ইতিহাস ও গভীর চিন্তা আমাকে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত করেছে যে, মানুষের যে বিশ্বাস তাকে পরিচালনা করে তাতে এক ঐশী ব্যক্তিত্ব, যিনি ঐশী সম্পূর্ণতার প্রতীক, তার অস্তিত্ব থাকা না থাকার উপর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সর্বশ্রেষ্ঠতার নিশ্চয়তা নির্ভর করে। আমাদের বিচারবুদ্ধি মহাবিশ্বের ঐক্য ও ক্রম প্রকাশ করে এবং কারণতত্ত্বের নীতি প্রকাশ করে। কিন্তু এসব ঘটনা ধর্ম অথবা স্থায়িত্বসম্পন্ন ধর্ম গড়ে তোলে না। যে পর্যন্ত না এই সব ঘটনা আমাদের দৈনন্দিনকার জীবনে কার্যকরী হয় এবং এ থেকে আমরা আল্লাহ্‌কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর কাছে সকল মানুষ সমান- ভাই ভাই এ কথা না মানি ততক্ষণ কিছুতেই ধর্ম হয় না।

যদি দুনিয়ার সুখী উন্নততর জীবন অক্ষুণ্ন রাখতে হয় তাহলে অতীতের উর্ধ্বমুখী গতি প্রবণতাসহ ঐশী পরিচালনের প্রয়োজন হবে। সাম্প্রতিক দুঃখময় চরম করুণ যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল তা এটাই প্রতিপন্ন করে যে, মরণশীলতা, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা ও স্বাধীনতা যখন আস্তিকতায় বদ্ধমূল থাকে না, তখন তার পরিণতি ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে। নাৎসী পেগ্যান রাষ্ট্রে, নাস্তিক কম্যুনিস্টদের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের সত্তা ও সম্মানকে বিনষ্ট করা হয়েছে, কর্দমে প্রোথিত করা হয়েছে।

একমাত্র নৈতিক বিশ্বে, দায়িত্বশীল দুনিয়ার মানুষ স্বাধীন হতে পারে এবং মানুষের যেমনভাবে বসবাস করা উচিত তেমনিভাবে বসবাস করতে পারে। একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবেই মানুষ সত্যিকারের সমান ও স্বাধীন। কারণ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে এবং আল্লাহ্'র নজরে ও চরম নৈতিক আইনের শেষে মানুষ যথার্থই সমান। যদি আল্লাহ্ ও চরম নৈতিক আইন অস্বীকার করা হয় তাহলে দাস প্রথার বিরুদ্ধে বলার তেমন কোন যুক্তিই থাকে না। যদি মানুষের কোন মূল্য না থাকতো তাহলে অধিকতর বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালীদের হাতে অন্য

www.pathagar.com

মানুষ এক কথায় গোলামে পরিণত হতো। কোন স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, কোন চরম কর্তব্য কিছুরই সে অধিকারী হতে পারতো না। আল্লাহ্ মানুষকে যে অধিকার দিয়েছেন তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মানুষ বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে, তা ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা সেই মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের। মানুষ যদি চরম সৃষ্টিকর্তা থেকে শক্তি ও অধিকার না পেয়ে থাকে তাহলে মানুষের অধিকারকে, মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই- একথা বলার কোন মানে হয় না। আল্লাহ্র সৃষ্টি ছাড়া, মানুষের মৌলিক কোন মূল্য বা মর্যাদা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব থাকতে পারে না।

মানুষের ভ্রাতৃত্ব এটা কি মানুষের গড়া জড়বাদী রাষ্ট্রের একটা বিশেষ সুবিধা; যে সুবিধার সংগে উপযোগিতা, ব্যক্তিবিশেষের তথা সরকারের আচরণের একমাত্র নীতি নির্দেশক? অথবা এটাকি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ উক্তি? কে এর চিরস্থায়ীত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি দেবে? আত্মার স্বাধীনতা থেকে এই স্বাধীনতা আসে? অথবা এ কি জড়বাদী সমাজের একটি কনসেশন বা বিশেষ সুবিধা? যখন কোন একটি মানুষ একটি রাষ্ট্রের জীব হয় তখন কি করে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকতে পারে?

মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত ধারণার অভাব ঘটলে, তার ফলে নৈতিক মহাপরাধ এবং নৃশংসতা দেখা দেয়, এবং তা "উন্নততর ক্রম" সম্পর্কিত মতবাদ ও রাষ্ট্রের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের একমাত্র উৎস এই উক্তিকে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করে। আর সেই সংগে আরও সমর্থন করে যে, এই সর্বশেষ উৎসই হচ্ছে যে কোন উপায় বা পন্থা গ্রহণের অধিকারী। এই ছিল নূরেমবার্গের উভয় সংকটের বিষয়। নাৎসি আইন-শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে যেসব নাৎসি নেতা ও চিকিৎসক নৃশংস হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল, তাদেরকে কিভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? তাদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র শাশ্বত প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে অভিযুক্ত করে দণ্ডদান করা যেতে পারে। এই আইন নাস্তিক রুশ প্রতিনিধি কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে মানবতার আইনরূপে। যদি মানুষের তৈরি আইনই মৌলিক মানবাধিকারের একমাত্র উৎস হয় তাহলে নাৎসিগণ কর্তৃক কেন ইহুদী, জিপসি, পোলিশ ও রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা করার কাজকে অন্যায় বলে দোষারূপ করা হয়ে থাকে? কেন

www.pathagar.com

হাঙ্গেরির দেশ প্রেমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করার কাজকে নিন্দা করা হয়? নাৎসি আইনের অধীনে ইহুদীদের কোন অধিকার নেই। কম্যুনিস্ট লাল ফৌজের আইনে হাঙ্গেরীর দেশপ্রেমিকদের কোন অধিকার নেই। লৌহ যবনিকার অন্তরালে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট সরকারের অধীনে মানুষের অবিচ্ছেদ্য কোন অধিকার নেই। যদি অবিচ্ছেদ্য অধিকার থাকে তাহলে কি করে সে তার নিজের উপর স্বীয় মূল্য, মর্যাদা, অধিকার, কর্তব্য, পছন্দের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত আজাদী সৃষ্টি করার ভার অর্পণ করতে পারে? সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর অস্তিত্ব পাওয়া যায়; তবে আপনি যদি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই জোর করে সব অস্বীকার করে দেন তাহলে কথা হবে স্বতন্ত্র।

সমসাময়িক আমেরিকান জীবনে আমরা অনেক প্রমাণই পাই যা নাকি এই নির্দেশ করে যে, গণতন্ত্র সম্পর্কিত আমেরিকান বিশেষ পদ্ধতিটিকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। ক্রমশ মার্কিন গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হচ্ছে এবং একে এর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য বিশ্বমানবীয় অধিকারের ঐশী সূত্রকে অস্বীকার করে মানবীয় অধিকারের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন। খ্রিস্ট ধর্মের আধ্যাত্মিক মূলধন ও ফল আসল বৃক্ষের মূল কেটে ফেললে অথবা বিনষ্ট করলে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না।

তাদের কাজের মাধ্যমে আপনি তাদের চিনবেন

যেহেতু আমি, যতটা সমসাময়িক ইতিহাসের সংগে সম্পর্কিত ততখানি উক্তিতে লেনিনের সংগে একমত, কাজেই আমি আস্তিক্য-সম্বন্ধীয় মানবতাবাদ, সর্বশ্বরবাদ এবং অন্যান্য দর্শনের উল্লেখ করতে চাই না। লেনিন নিজেই এই বলে শেষ করেছেন; ভবিষ্যৎ হয়-

(১) জড় পরম বা নাস্তিকতাবাদ সম্বন্ধীয় জড়বাদ অথবা নাস্তিকতা সম্বন্ধীয় কম্যুনিজম, অথবা,

(২) অধিবিদ্যক যুক্তির পরম, যার অর্থ আস্তিকদের আল্লাহ এবং যাহার সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশ যীশু খ্রিস্টের মধ্যে বিদ্যমান- এই হবে।

আমরা পছন্দ করি আর না করি, আজকের দিনে দুনিয়ার অধিকাংশ জড় শক্তি দুটি অগ্রগামী শিবিরের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। আস্তিক শিবির জড় শক্তি ছাড়াও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে অনুমিত হয়। মার্কস ও লেনিনের

www.pathagar.com

নাস্তিক শিবিরের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদ ও আস্তিকতা ধ্বংস করা এবং এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং সকল প্রকার নৃশংসতাকে তাদের নীতি বলে মনে করে। পুঁজিবাদ নিশ্চিহ্ন হবে, আল্লাহ'কে ঘিরে মানুষের যে সকল নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা জন্মেছিল তা মানুষ ভুলে যাবে এবং নতুন নশ্বরতা জাগ্রত হবে। তখন এটি হবে নশ্বরতার একটি শ্রেণী বা রাষ্ট্র; কিন্তু এই নশ্বরতা ব্যক্তিগত মানুষের নশ্বরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে না। কিন্তু মার্কসীয়- লেনিনপন্থী দর্শনের অসামঞ্জস্যতা হচ্ছে এই যে, যেহেতু তাতে কোন অপরিবর্তনীয় আইন নেই কাজেই প্রয়োজন অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই দেখা যায় "শাসনকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণী" ও "শাসনকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হতে আগ্রহশীল" শ্রেণীর মধ্যে বারবার সংঘর্ষ ঘটবে। যেহেতু নৈতিকতার কোন বালাই নেই কাজেই এ ক্ষেত্রে নৃশংস আচরণ হতে বাধ্য। এর বিকল্প আরেকটি ব্যবস্থা হচ্ছে ডিক্টেটরশীপ। কিন্তু এটি মানুষের মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। মানুষ কীটপতঙ্গের চাইতে, জড় পদার্থের চাইতে এবং ডিক্টেটর কর্তৃক পরিচালিত নরাধম জনতার চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

যদিও কোথাও কোন প্রকার সাম্যবাদ সন্তোষজনকভাবে কাজ করে থাকে তবে তা হচ্ছে কনভেন্ট বা মাঠ। কিন্তু ছলনা ও অত্যাচার দ্বারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এ সকল দলকে গড়ে তোলা হয়নি। মানুষের মনের মধ্যে যে বিপ্লব হয় তাই তাদের গড়ে তুলেছে। আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক নৈতিক আইনের উপর ভিত্তি করে তারা গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে একটি পক্ষ অপর পক্ষকে হত্যা করার জন্য ব্রতী হয়েছে। খ্রিস্টান যুগের প্রথম তিন শতাব্দীতে ১ কোটি ১০ লক্ষ খ্রিস্টানকে জড়বাদী ধর্ম না মেনে খ্রিস্টান ধর্ম আঁকড়ে থাকার জন্য হত্যা করা হয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে নাস্তিক নাৎসী রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ্য মানুষ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন। মানবীয় অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আজকের দিনের আমাদেরকেও আমাদের জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৯০৩ সাল থেকে আমরা শাসকগোষ্ঠীর আচরনে আস্তিক বা জড়বাদী প্রভাব প্রত্যক্ষ করছি। পাশ্চাত্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

শিক্ষায়তন, কলেজ এমনকি সানডে স্কুল থেকে নৈতিকতা, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থা বাদ পড়ে এবং সেখানে মার্কসীয় দর্শন, নাৎসি সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়। যে সকল সাধারণ মানুষ দৈনন্দিনকার আহার সংস্থানে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে বিপ্লব আনার জন্য আলোচনায় রাজা-উজির মারা হয়। এ সকল বিপ্লবী নেতা হয় বুদ্ধিদীপ্ত মহলের নাস্তিক অথবা ইচ্ছাশক্তির নাস্তিক। তাই তাদের দেবতা হয় বর্ণ শ্রেণী, বিজ্ঞান এবং অগ্রগতি, আর না হয় শক্তি, যশ ও সম্পদ। কাজেই তাদের স্বভাব সম্পর্কে আর বিশেষ করে বলার কিছু থাকে না।

নাস্তিক বা জড়বাদী যখন চরম সংকটে পতিত হয় তখন তার পরিণতি একবার লক্ষ্য করুন। সকল আশা তার সংগে সংগে শেষ হয়ে যায়, বেঁচে থাকা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই সমাধান হিসেবে তাকে আমরা আত্মহত্যা করতে দেখি। যারা মাদকদ্রব্য বা মদ খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন, এদের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবনের ব্যর্থতাই একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধ্বংস করার মূলে একমাত্র কারণ। হিটলার ও তার চেলাচামুন্ডাগণ যখন আনেড়া ইহুদীদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করে তখন তাদের অনেকে আত্মহত্যা করে। কিন্তু গোঁড়া ইহুদীদের ক্ষেত্রে এটি সত্য হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ তাদের কাছে জীবনের আরেকটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে, বেঁচে থাকার পৃথক কারণ রয়েছে।

সর্বোপরি কোন শাসকগোষ্ঠী রাজতন্ত্র, জনতা, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যবহারজীবী বা অর্থনৈতিক মনোপলী, সরকারের বাইরের বা ভেতরের গোড়াপন্থী দলকে যদি শাসনভার দেওয়া হয় অথবা যদি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে তাহলে তার পক্ষে কোনক্রমেই নগণ্য পরিমাণ দুর্নীতিমুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। শক্তির সাহায্যে কোন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া অথবা লাভ করা হলে তাতে শাসিতদের নিয়ন্ত্রণের কোন এখতিয়ার থাকে না, কাজেই তেমন শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য। নাস্তিকদের ক্ষেত্রে এ দুর্নীতি নানাভাবে বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের শাশ্বত মূল্য

তিনটি কারণে আল্লাহ্‌তে যে বিশ্বাস তা কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। প্রথমত সকল মানুষের জন্যে, সর্বপ্রকার সংকটে এবং সকল কালের জন্যে একমাত্র যে

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তা আস্তিকতাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে এবং সে শিক্ষা, যীশুখ্রিস্টের ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে মানুষের জন্য, আস্তিকদের জন্য আদর্শ হিসাবে রাখা হয়েছে। নিঃসর্গ সম্বন্ধীয় শিক্ষা, যার লক্ষ্য একমাত্র স্বাস্থ্য আর আনন্দ- সে শিক্ষা চিররুগ্ন, মারাত্মকভাবে পঙ্গু ও রোগাক্রান্তদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা হতে পারে না। প্রায়োগিক শিক্ষা, অযোগ্য আর অপরিবর্তনযোগ্য লোকদের উপযোগী হতে পারে না। মানবতাবাদী শিক্ষা সম্পূর্ণ অজ্ঞ আর সম্পূর্ণ যন্ত্র সদৃশ মনোভাবাপন্ন লোকদের উপযোগী হতে পারে। কিন্তু আস্তিক ধর্মীয় শিক্ষা যীশু খ্রিস্টের জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা, কলেজে, হাটবাজারে, সংসারে, হাসপাতালে, বস্তিতে, কারাগারে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সকল মানুষের জন্য উপযোগী; আল্লাহ্‌তে আস্তিকদের যে বিশ্বাস তা তাদেরকে এক ঐশী শক্তিতে শক্তিশালী করে। তারা বিশ্বাস করে তাদের কোন প্রকারেই ক্ষতি হতে পারে না। প্রয়োজনের দিক থেকে ধর্মকে দৈহিক সর্বোচ্চ ক্ষমতার উপাসনা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সর্বাধিক মানুষের এই প্রয়োজনকে দেখানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত মহাবিশ্ব ও জীবনের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে হলে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস অপরিহার্য এবং এই কারণেই চিন্তাশীল মানুষেরা অনুরূপ অর্থ উদ্ধারের জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করে।

তৃতীয়ত দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিশুদের জন্য হবে। কিন্তু সংসারাভিজ্ঞ, অযৌক্তিক, বিভ্রান্ত অথবা যুক্তিযুক্ত একনিষ্ঠ মন শিশুকে যেভাবেই প্রভাবান্বিত করুক না কেন শিশুর মনের মৌলিক দিকটা সব সময়ই বাড়তে থাকবে এবং যতক্ষণ তার ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে মানসিক অবস্থা গড়ে উঠার ব্যবস্থা থাকবে, যতক্ষণ অতীতের মতই এ মহাবিশ্ব তাঁর কাজ করে যাবে ততক্ষণ শিশুর মনের ক্রমোন্নতি ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। যদি চিন্তার মাঝে কোন প্রকার অযৌক্তিক কারণ না ঘটে তাহলে দেখা যাবে প্রাপ্তবয়স্ক বা পরিণত মন, প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারার নীতি অনুসারে সাড়া দিয়ে থাকে। মানুষের সকল কল্যাণকামী মহৎপ্রাণ কোন সময়ই, যে সকল মৌলিক আইন প্রকৃতিকে পরিচালনা করে থাকে তা থেকে কখনও দূরে সরে যায় না। তারা সব সময়ই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে যে সকল কারণ আর প্রকৃত সত্য বিদ্যমান তাই সন্ধান করেন- নতুন সত্য আবিষ্কার করেন; আর আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

এসব কারণেই আমাদের সব চাইতে পরিতৃপ্তি। যেসব জিনিস, সকল মানুষের জন্য এবং সকল কালের জন্য কল্যাণকর একমাত্র সেই সকল জিনিসের সংগে বেঁচে থাকার মূল্যবোধ জড়িত। এই একই মাত্র কারণে সভ্যতার উত্থান-পতন সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার গতিপ্রবাহ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর চিন্তার যা কিছু মৌলিক নীতি সবই শিশুতে নতুন করে জন্মলাভ করে থাকে। একবার স্মরণ করা যাক যে, একটি ছোট শিশু, স্পষ্টভাবে যুক্তি, বিশ্বাস, আশা ও প্রেম প্রকাশ করে। এ কারণেই কি যীশুখ্রিস্ট শিশুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারেঃ

"ছোট শিশুকে আমার কাছে আসতে দাও। তাদের বাধা দিও না; কারণ তারা আল্লাহ্'র রাজত্বের বাসিন্দা।" (মার্ক ১০ঃ১৪)

"ছোট শিশু যেভাবে আল্লাহ'র রাজত্বকে গ্রহণ করে, ঠিক সেইভাবে যদি কেউ তা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার আল্লাহ্র রাজত্বে প্রবেশের কোন অর্থ নেই।" (লুক ১৮ঃ১১)

"যদি তুমি শিশুর মত ছোট সরলপ্রাণ না হতে পার তাহলে তুমি কোন ক্রমেই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" (ম্যাথু ১৮ঃ৩)

"যদি কারও নতুন করে জন্ম না হয় তাহলে তার পক্ষে আল্লাহ্'র রাজত্ব দেখা সম্ভব নয়।" (জন ৩ঃ৩)

পরমাণুর অভ্যন্তরের রহস্যময় জগতের আবিষ্কর্তা, বৈজ্ঞানিক ম্যাকস প্লাংক, তাই যথার্থই বলেছেনঃ ধর্ম ও প্রকৃতি বিজ্ঞান এক সঙ্গে অবিশ্বাস যুক্তিহীন মতবাদে বিশ্বাস, এবং কুসংস্কারের বিরূদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এর একমাত্র ধ্বনি হচ্ছে "ঈশ্বরের কাছে চল" এবং এ ধ্বনিই চিরকাল থাকবে।

মানব জাতির পরম কল্যাণকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম লুই পাস্তরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"যদি কেউ আমাকে বলে যে, এ সিদ্ধান্তাবলিতে উপনীত হতে গিয়ে আমি প্রকৃত বিষয় থেকে দূরে সরে গেছি, তাহলে আমি তাকে বলবো, যে সকল বিষয় সব সময় যথার্থভাবে সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না, সে সকল বিষয়ের মধ্যে

www.pathagar.com

আমি নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি অথবা স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করেছি। কিন্তু সকল বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার এ হচ্ছে আমার নিজস্ব পন্থা।"

যদি কোথাও আমি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে থাকি, তাহলে দয়া করে আমাকে তা দেখিয়ে দেবেন। আমি আজো শিখতে চাই, শেখার জন্যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

আল্লাহর অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের) বহু নিদর্শন রয়েছে, বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল লোকদের জন্য- যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে এবং (গভীর ভাবে চিন্তা করার পর প্রত্যেকটি জিনিসের মাহাত্ম বুঝতে পেরে উদাত্ত কণ্ঠে) বলে ওঠে হে মহান আল্লাহ্! তুমি এর কোন একটিও নিরর্থক সৃষ্টি করনি।"

সূরা আলে ইমরান (১৯০-১৯১)

সূরা আল ইমরানের (১৯০-১৯১) আয়াতে বলা হয়েছে, "আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের) বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল লোকদের জন্য – যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে এবং (গভীরভাবে চিন্তা করার পর প্রত্যেকটি জিনিসের মাহাত্ম্য উদাত্তকণ্ঠে) বলে ওঠে হে মহান আল্লাহ্! তুমি এর কোন একটিও নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। উল্লিখিত আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, গোটা মানব জাতির মধ্যে যারা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান তারা রাত দিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে যতক্ষণ ঘুম নিদ্রা ব্যতিত সজাগ থাকবে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সব সময়ই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই মহান সৃষ্টি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের অমোঘ নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হওয়ার বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করবে অর্থাৎ মহাসৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে, আরো জানতে ও বুঝতে পারবে মহান সৃষ্টিকর্তা কত মহাকৌশলী, কত মহাজ্ঞানী, কত ক্ষমতার ও সৌন্দর্যের

www.pathagar.com

আধার। মহাসৃষ্টির প্রতি তিনি কত যত্নবান, কত দয়ালু ও দাতা। যার গুণাগুণের বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। যার বর্ণনর ভাষা মানুষের জানা নেই। সেই মহান সৃষ্টির সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল মানুষগুলো চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে হতবাক হয়ে যাবে। মনের অজান্তেই তার বুকচিরে বেরিয়ে আসবে একটি মাত্র কথা এবং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে বিস্ময়াবিভূত একটি উচ্চারণ, হে মহান, হে মহিয়ান, হে মালিক, হে সৃষ্টিকর্তা, তুমি এর একটি বস্তুও নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। সৃষ্টি সম্বন্ধে এই গভীর মননিবেশের মধ্যেই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে এবং সমগ্র মহাসৃষ্টির উদ্দেশ্যও বুঝতে পারবে, তখনই তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে। সমস্ত বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীলদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য বলে মহান আল্লাহপাক উক্ত আয়াতের মধ্যে নির্দেশ করেছেন।

অস্তিত্ববান মহান সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাঃ

ইসলাম নামকরণ কেন – দুনিয়ায় যতরকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির সমিকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন, ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক হযরত ঈসা (আঃ) এর নামে। বৌদ্ধ ধর্মমতের নাম রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে। জরদশ্তি ধর্মের নামও রয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশ্তের নামে। আবার ইহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল তার ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। দুনিয়ার আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদেরও নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্যি নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং 'ইসলাম' শব্দটির অর্থের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচেছ এ নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচেছ মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন 'মুসলিম'। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

www.pathagar.com

ইসলাম শব্দটির অর্থ- আরবী ভাষায় 'ইসলাম' বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লার প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে 'ইসলাম'।

ইসলামের তাৎপর্য- সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি চলছে এক অপরিবর্তনীয় বিধান মেনে। সেই বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। দুনিয়া এক নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে এক নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। তার চলার জন্যে যে সময়, যে গতি ও পথ নির্ধারিত রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন নেই কখনো। পানি আর হাওয়া, তাপ আর আলো- সব কিছুই কাজ করে যাচ্ছে এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে। জড়, গাছপালা, পশু পাখীর রাজ্যেও রয়েছে তাদের নিজস্ব নিয়ম। সেই নিয়ম মোতাবেক তারা পয়দা হয়, বেড়ে ওঠে, ক্ষয় হয়, বাঁচে ও মরে। মানুষের অবস্থা চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, সে-ও এক বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী সে জনেম, শ্বাস গ্রহণ করে, পানি, খাদ্য, তাপ ও আলো আত্মস্থ করে বেঁচে থাকে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি, তার দেহের রক্তপ্রবাহ, তার শ্বাস-প্রশ্বাস একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হয়ে চলেছে। তার মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা, পেশী সমূহ, হাত, পা, জিভ, চোখ, কান, নাক- এক কথায় তার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রতঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে সেই একই পদ্ধতিতে যা তাদের প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে।

যে শক্তিশালী বিধানের অধীনে চালিত হচ্ছে দুনিয়া-জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সব কিছু, তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমান বিধানকর্তার সৃষ্ট। সমগ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ এ বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবাই মেনে চলে তাঁরই দেয়া নিয়ম। আগেই আমি বলেছি যে, দুনিয়া-জাহানের প্রভু আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম, তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। সূর্য, চন্দ্র, তারা, গাছপালা, পাথর ও জীব-জানোয়ার সবাই মুসলিম। যে মানুষ খোদাকে চেনে না, যে তাকে অস্বীকার করে, যে খোদা ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং যে খোদার খোদায়ীর ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব

www.pathagar.com

কিছুই খোদার বিধানের অনুসারী। তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, তার দেহের প্রতিটি অনু ইসলাম মেনে চলে কারণ তার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও গতি সব কিছুই খোদার দেয়া নিয়মের অধীন। মূর্খতাবশত যে জিহ্বা দিয়ে সে শেরক ও কুফরের কথা বলছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তাও মুসলিম। যে মাথাকে সে জোর পূর্বক খোদা ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সে-ও জন্মগত ভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয় মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম। তারা সবাই খোদায়ী- নিয়মের অনুগত এবং তাদের সব কাজ চলছে এ নিয়মের অনুসরণ করে। এবার এরা এক আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখা যাক।

প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দু'টি দিক। এক দিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব-জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে মেনে চলতেই হয় সেই নিয়ম। অপর দিকে, তার রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা করে বুঝে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা তার করায়ত্ত। নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী কোন বিশেষ মতকে সে মেনে চলে, আবার কোন বিশেষ মতকে সে অমান্য করে। কোন পদ্ধতি সে পছন্দ করে, কোন বিশেষ পদ্ধতিকে আবার পছন্দ করে না। জীবনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কখনো কোন নিয়ম-নীতিকে সে স্বেচ্ছায় তৈরী করে নেয়, কখনো বা অপরের তৈরী নিয়ম-নীতিকে নিজের করে নেয়। এদিক দিয়ে সে দুনিয়ার অন্যবিধ সৃষ্টি পদার্থের মতো একই ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয়, বরং তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা।

মানব জীবনে এ দু'টি দিকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষ দুনিয়ার অপর সব পদার্থের মতই জন্মগত মুসলিম এবং আমি আগে যা বলেছি সেই অনুসারে মুসলিম হতে সে বাধ্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া বা না হওয়ার উভয়বিধ ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার প্রভাবেই মানুষ বিভক্ত হয়েছে দু'টি শ্রেণীতে।

এক শ্রেণীর মানুষ হচেছ তারা, যারা তাদের স্রষ্টাকে চিনেছে, তাঁকেই তাদের একমাত্র মনিব ও মালিক বলে মেনে নিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেখানেও তাঁরই নির্ধারিত কানুন মেনে চলার

www.pathagar.com

পথই তারা বেছে নিয়েছে, তারা হয়েছে পরিপূর্ণ মুসলিম। তাদের ইসলাম হয়েছে পূর্ণাঙ্গ। কারণ তাদের জীবনই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহতে সমর্পিত। না জেনে-শুনে যার নিয়মের আনুগত্য তারা করছে জেনে-শুনেও তারই আনুগত্যের পথই তারা অবলম্বন করেছে। অনিচ্ছায় তারা খোদার বাধ্যতার পথ চেয়েছিল, স্বেচ্ছায়ও তাঁরই বাধ্যতার পথ তারা বেছে নিয়েছে। তারা হয়েছে এখন সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী। কারণ যে খোদা তাদেরকে দিয়েছেন জানবার ও শিখবার ক্ষমতা, সেই খোদাকেই তারা জেনেছে। এখন তারা হয়েছে সঠিক যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, যে খোদা তাদেরকে চিন্তা করবার, বুঝবার ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার যোগ্যতা দিয়েছে, চিন্তা করেও বুঝে তারা সেই খোদারই আনুগত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের জিহ্বা হয়েছে সত্যভাষী, কেননা সেই প্রভুত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা করছে তারা, যিনি তাদেরকে দিয়েছেন কথা বলবার শক্তি। এখন তাদের পরিপূর্ণ জীবনই হয়েছে পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী। কারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উভয় অবস্থায়ই তারা হয়েছে একমাত্র খোদার বিধানের অনুসারী। সমগ্র সৃষ্টির সাথেই তাদের মিতালী। কারণ সৃষ্টির সকল পদার্থ যার দাসত্ব করে যাচেছ, তারাও করছে তাঁরই দাসত্ব। দুনিয়ার বুকে তারা হচেছ আল্লার খলিফা (প্রতিনিধি)! সারা দুনিয়া এখন তাদেরই এবং তারা হচেছ আল্লার।

কুফরের তাৎপর্য

যে মানুষের কথা উপরে বলা হল, তার মোকাবিলায় রয়েছে আর এক শ্রেণীর মানুষ। সে মুসলিম হয়েই পয়দা হয়েছে এবং না জেনে, না বুঝে জীবনভর মুসলিম হয়েই থেকেছে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে খোদাকে চিনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে খোদার আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের লোক হচেছ কাফের। 'কুফর' শব্দটির আসল অর্থ হচেছ কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোককে 'কাফের' (গোপনকারী) বলা হয়; কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পর্দা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামী স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করে যাচেছ ইসলামী স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পর্দা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার

www.pathagar.com

দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করছে। এখন বুঝা গেল, যে মানুষ কাফের, সে বড় বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

কুফরের অনিষ্টকারিতা- 'কুফর' হচেছ এক ধরনের মুর্খতা; বরং কুফরই হচেছ আসল মূর্খতা। মানুষ খোদাকে না চিনে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তার চেয়ে মুর্খতা আর কি হতে পারে? এক ব্যক্তি দিন-রাত দেখছে সৃষ্টির এত বড় বিরাট কারখানা চলছে, অথচ সে জানে না, কে এ কারখানার স্রষ্টা ও চালক। কে সে কারিগর, যিনি কয়লা, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও আরো কয়েকটি পদার্থ মিলিয়ে অস্তিত্বে এনেছেন মানুষের মত অসংখ্য অতুলনীয় সৃষ্টিকে? মানুষ দুনিয়ার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচেছ এমন সব বস্তু ও কার্যকলাপ যার ভিতরে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, গনিতবিদ্যা, রসায়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপূর্ব পূর্ণতার নিদর্শন; কিন্তু সে জানে না, অসাধারণ সীমাহীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন্ সে সত্তা চালিয়ে যাচেছন সৃষ্টির এসব কার্যকলাপ। ভাবা দরকার, যে মানুষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের খবরও জানে না, কি করে তার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হবে সত্যিকার জ্ঞানের তোরণদ্বার? যতই চিন্তা-ভাবনা করুক, যতই অনুসন্ধান করুক, সে কোন দিকেই পাবে না সরল-সঠিক নির্ভরযোগ্য পথ, কেননা, তার প্রচেষ্টার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সব স্তরেই দেখা যাবে অজ্ঞতার অন্ধকার।

কুফর একটি জুলুম বরং সব চেয়ে বড় জুলুমই হচেছ এ কুফর। জুলুম কাকে বলে? জুলুম হচেছ কোন জিনিস থেকে তার সহজাত প্রকৃতির খেলাফ কাজ যবরদস্তি করে আদায় করে নেয়া। আগেই জানা গেছে যে, দুনিয়ার যত জিনিস রয়েছে, সবাই আল্লার ফরমানের অনুসারী এবং তাদের সহজাত প্রকৃতি (ফেৎরত) হচেছ 'ইসলাম' অর্থাৎ খোদায়ী বিধানের আনুগত্য। মানুষের দেহ ও তার প্রত্যেকটি অংশ এ প্রকৃতির উপরই জন্ম নিয়েছে। অবশ্যি খোদা এসব জিনিসকে পরিচালনা করবার প্রকৃতির দাবী হচেছ এই যে, খোদার ইচছা অনুযায়ী তাকে যেন কাজে লাগানো হয়। কিন্ত যে ব্যক্তি খোদার ইচছা অনুযায়ী তাকে যেন কাজে লাগানো হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি 'কুফর' করছে সে তাকে লাগাচেছ তার প্রকৃতি বিরোধী কাজে। সে নিজের দিলের মধ্যে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব,

www.pathagar.com

প্রেম ও ভীতি পোষণ করছে অথচ তার দিলের প্রকৃতি দাবী করছে যে, সে তার মধ্যে একমাত্র খোদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রেম ও ভীতি পোষণ করবে। সে তার অংগ-প্রত্যংগ আর দুনিয়ায় তার আধিপত্যের অধীন সব জিনিসকে কাজে লাগাচ্ছে আল্লার ইচছা বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথচ তাদের প্রকৃতির দাবী হচেছ বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথচ তাদের প্রকৃতির দাবী হচেছ তাদের কাছ থেকে খোদায়ী বিধান মোতাবেক কাজ আদায় করা। এমনি করে যে লোক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর, এমন কি, নিজের অস্তিত্বের উপর ক্রমাগত জুলুম করে যাচেছ, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

কুফর কেবল জুলুমই নয়, বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামিও বটে। ভেবে দেখা যাক, মানুষের আপন বলতে কি জিনিস আছে। নিজের মস্তিষ্ক সে নিজেই পয়দা করে নিয়েছে, না খোদা পয়দা করেছেন? নিজের দিল, চোখ, জিভ, হাত-পা, আর সব অংগ-প্রত্যংগ- সব কিছুর স্রষ্টা মানুষ না খোদা? এসব জিনিস মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী করে তৈরী করা এবং মানুষকে তা কাজে লাগাবার শক্তি দান করা কি মানুষের নিজের না খোদার কাজ? সকলেই বলবে, খোদারই এসব জিনিস, তিনিই এগুলো পয়দা করেছেন, তিনিই সব কিছুর মালিক এবং খোদার দান হিসেবেই মানুষ আধিপত্য লাভ করেছে এসব জিনিসের উপর। আসল ব্যাপার যখন এই তখন যে লোক খোদার দেয়া মস্তিষ্ক থেকে খোদারই ইচছার বিপরীত চিন্তা করার সুবিধা আদায় করে দেয়, তার চেয়ে বড় বিদ্রোহী আর কে? খোদা তাকে চোখ, জিভ, হাত-পা এবং আরো কত জিনিস দান করেছেন, তার সব কিছুই সে ব্যবহার করছে খোদার পছন্দ ও ইচছা বিরোধী কাজে। যদি কোন ভৃত্য তার মনিবে নেমক খেয়ে তার বিশ্বাসের প্রতিকূল কাজ করে যায়, তবে তাকে সকলেই বলবে নিমক হারাম। কোন সরকারী অফিসার যদি সরকারের দেয়া ক্ষমতা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে থাকে, তাকে বলা হবে বিদ্রোহী। যদি কোন ব্যক্তি তার উপকারী বন্ধুর সাথে প্রতারণা করে, সকলেই বিনা দ্বিধায় তাকে বলবে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার বাস্তবতা কতখানি? মানুষ মানুষকে আহার দিচেছ কোত্থেকে? সে তো খোদারই দেয়া আহার। সরকার তার কর্মচারীদেরকে যে ক্ষমতা অর্পণ করে, সে ক্ষমতা এলো কোত্থেকে? খোদা-ই তো তাকে রাজ্য পরিচালনার শক্তি দিয়েছেন। কোন উপকারী ব্যক্তি অপরের

www.pathagar.com

উপকার করছে কোত্থেকে? সব কিছুই তো খোদার দান। মানুষের উপর সব চেয়ে বড় হক বাপ-মার। কিন্তু বাপ-মার অন্তরে সন্তান বাৎসল্য উৎসারিত করেছেন কে? মায়ের বুকে স্তন দান করেছেন কে? বাপের অন্তরে কে এমন মনোভাব সঞ্চার করেছেন, যার ফলে তিনি নিজের কঠিন মেহনতের ধন সানন্দে একটা নিষ্ক্রিয় মাংসপিন্ডের জন্য লুটিয়ে দিচেছন এবং তার লালন-পালন ও শিক্ষার জন্যে নিজের সময়, অর্থ ও সুখ-স্বাচছন্দ্য কোরবান করে দিচেছন? যে খোদা মানুষের আসল কল্যাণকারী, প্রকৃত বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারদিগার, মানুষ যদি তাঁর অবিশ্বাস পোষণ করে, তাঁকে খোদা বলে না মানে, তাঁর দাসত্ব অস্বীকার করে, আর তাঁর অনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী আর কি হতে পারে।

কখনো মনে করা যেতে পারে না যে, কুফরী করে মানুষ আল্লার কোন অনিষ্ট করতে পারছে। যে বাদশাহর সাম্রাজ্য এত বিপুল-বিরাট যে, বৃহত্তম দুরবীন লাগিয়েও আমরা আজো স্থির করতে পারিনি, কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ; যে বাদশাহ এমন প্রবল প্রতাপশালী যে তাঁর ইশারায় আমাদের এ পৃথিবী, সূর্য, মঙ্গল গ্রহ এবং আরো কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ বলের মতো চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচেছ; যে বাদশাহ এমন অফুরন্ত সম্পদশালী যে, সারা সৃষ্টির আধিপত্যে কেউ তাঁর অংশীদার নেই; যে বাদশাহ এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল যে, সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কাবুর মেখাপেক্ষী নন; মানুষের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে তাঁকে মেনে বা না মেনে সেই বাদশাহর কোন অনিষ্ট করবে? কুফর ও বিদ্রোহের পথ ধরে মানুষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না, বরং নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ খোলাসা করে।

কুফর ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী ফল হচেছ এই যে, এর ফলে মানুষ চিরকালের জন্যে ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে যায়। এ ধরনের লোক জ্ঞানের সহজ পথ কখনো পাবে না, কারণ যে জ্ঞান আপন স্রষ্টাকে জানে না, তার পক্ষে আর কোন জিনিসের সত্যিকার পরিচয় লাভ অসম্ভব। তার বুদ্ধি সর্বদা চালিত হয় বাঁকা পথ ধরে, কারণ যে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে গিয়ে ভুল করে, আর কোন জিনিসকেও সে বুঝতে পারে না নির্ভূলভাবে। নিজের জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপে তার ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অবধারিত। তার নীতিবোধ, তার কৃষ্টি,

www.pathagar.com

তার সমাজ ব্যবস্থা, তার জীবিকা অর্জন পদ্ধতি, তার শাসন-পরিচালন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এক কথায় তার জীবনের সর্ববিধ কার্যকলাপ বিকৃতির পথে চালিত হতে বাধ্য। দুনিয়ার বুকে সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, খুনখারাবি করবে, অপরের অধিকার হরণ করবে, অত্যাচার উৎপীড়ন করবে। বদখেয়াল, অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কৃতি দিয়ে তার নিজের জীবনকেই করে তুলবে তিক্ত-বিষাক্ত। তারপর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আখেরাতের দুনিয়ায় পৌঁছবে, তখন জীবনভর যেসব জিনিসের উপর সে জুলুম করে এসেছে, তারা তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তার মস্তিষ্ক, তার দিল, তার চোখ, তার কান, তার হাত-পা- এক কথায় তার সব অংগ-প্রত্যংগ আল্লার আদালতে অভিযোগ করে বলবেঃ এ খোদাদ্রোহী জালেম তার বিদ্রোহের পথে জবরদস্তি করে আমাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছে। যে দুনিয়ার বুকে সে নাফরমানীর সাথে চলেছে ও বসবাস করেছে, যে জীবিকা সে অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে, যে সম্পদ সে হারামের পথে রোজগার করে হারামের পথে ব্যয় করেছে অবাধ্যতার ভিতর দিয়ে যেসব জিনিস সে জোর করে দখল করেছে, সেসব জিনিস সে তার বিদ্রোহের পথে কাজে লাগিয়েছে তার সব কিছুই ফরিয়াদী হয়ে হাজির হবে তাঁর সামনে এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারক খোদা সেদিন মজলুমদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দিবেন অপমানকর শাস্তি।

ইসলামের কল্যাণ- এতো গেলো কুফরের অনিষ্টকারিতা। এবার আমরা দেখবো ইসলামের পথ ধরলে কি কি কল্যাণ লাভ করা যায়।

উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, এ দুনিয়ার প্রত্যেক দিকে ছড়িয়ে রয়েছে খোদার খোদায়ীর অসংখ্য নিদর্শন। সৃষ্টির এ বিপুল বিরাট যে কারখানা চলছে এক সুসম্পূর্ণ বিধান ও পরিচালক এক মহাশক্তিমান শাসক- যাঁর ব্যবস্থাপনায় কেউ অবাধ্য হয়ে থাকতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টির মত মানুষের প্রকৃতি হচেছ তার আনুগত্য। কাজেই অচেতনভাবে সে রাত-দিন তারই আনুগত্য করে যাচেছ, কারণ তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল আচরণ করে সে বেঁচেই থাকতে পারে না।

কিন্তু খোদা মানুষকে জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা, চিন্তা ও উপলব্ধি করার শক্তি এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা দিয়ে তাকে ইচছাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতার কিছুটা আজাদী দিয়েছেন। আসলে এ আজাদীর ভিতরেই মানুষের

www.pathagar.com

পরীক্ষা, তার জ্ঞানের পরীক্ষা, তার যুক্তির পরীক্ষা, তার পার্থক্য অনুভূতির পরীক্ষা। এছাড়া তাকে যে আজাদী দেয়া হয়েছে, কিভাবে সে তা ব্যবহার করছে, তারও পরীক্ষা এর মধ্যে। এ পরীক্ষায় কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি, কারণ বাধ্যতা আরোপ করলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হয় ব্যাহত। একথা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, প্রশ্নপত্র হাতে দেয়ার পর যদি পরীক্ষার্থীকে কোন বিশেষ ধরনের জবাব দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে পরীক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। পরীক্ষার্থীর আসল যোগ্যতা তো কেবল তখনই প্রমাণিত হবে, যখন তাকে প্রত্যেক ধরনের জবাব পেশ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সে সঠিক জবাব দিতে পারলে হবে সফল এবং আগামী উন্নতির দরজা খুলে যাবে তার সামনে, আর ভুল জবাব দিলে হবে অকৃতকার্য এবং অযোগ্যতার দরুন নিজেই নিজের উন্নতির পথ করবে অবরুদ্ধ। ঠিক তেমনি করেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ পরীক্ষায় যে কোন পথ অবলম্বন করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে এখন এক ব্যক্তির কথা বলা যায়, যে নিজের ও সৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি উপলব্ধি করেনি, স্রষ্টার সত্তা ও গুণরাজি চিনতে যে ভুল করেছে এবং মুক্ত বুদ্ধির যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে, তার সাহায্যে না-ফরমানী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে চলেছে। এ ব্যক্তি জ্ঞান, যুক্তি, পার্থক্য অনুভূতি ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হয়েছে। সে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে প্রত্যেক দিক দিয়েই নিকৃষ্ট স্তরের লোক। তাই উপরের বর্ণিত পরিণামই তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

অন্যদিকে রয়েছে আর এক ব্যক্তি, যে এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে সে জ্ঞান ও যুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে খোদাকে জেনেছে ও মেনেছে, যদিও এ পথ ধরতে তাকে বাধ্য করা হয়নি। সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে সে ভুল করেনি এবং নিজস্ব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা দ্বারা সে সৎ পথই বেছে নিয়েছে, অথচ অসৎ পথের দিকে চালিত হবার স্বাধীনতা তার ছিল। সে আপন সহজাত প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছে, খোদাকে চিনেছে এবং না-ফরমানীর স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও খোদার আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে। সে তার যুক্তিকে ঠিক পথে চালিত করেছে, চোখ দিয়ে ঠিক জিনিসই দেখেছে, কান দিয়ে

www.pathagar.com

ঠিক কথাই শুনেছে, মস্তিষ্ক চালনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে এবং তার দিলকে সঠিক সত্যের সাধনায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছে বলেই পরীক্ষায় সে সাফল্য ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে। সত্যকে চিনে নিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে, সে সত্য সাধক এবং সত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দেখিয়েছে যে, সে সত্যের পূজারী।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, যার মধ্যে এসব গুণরাজির সমাবেশ হয়, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

এ শ্রেণীর লোক জ্ঞান ও যুক্তির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথ অবলম্বন করবে, কারণ যে ব্যক্তি খোদায়ী সত্যকে উপলব্ধি করেছে এবং তার গুণরাজির পরিচয় লাভ করেছে, সেই জ্ঞানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সব কিছুই জেনেছে। এ ধরনের লোক কখনো বিভ্রান্তির পথে চলতে পারে না, কারণ শুরুতেই সে পদক্ষেপ করেছে সত্যের দিকে এবং তার সর্বশেষ গন্তব্য লক্ষ্যকেও সে জেনে নিয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে। এরপর সে দার্শনিক চিন্তা ও অনুসন্ধানের মারফতে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করবে; কিন্তু কাফের দার্শনিকের মতো কখনো সংশয়-সন্দেহের বিভ্রান্তি মধ্যে নিমজ্জিত হবে না। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবে, সৃষ্টির লুক্কায়িত ধনভান্ডারকে নিয়ে আসবে প্রকাশ্য আলোকে। দুনিয়ার ও মানুষের দেহে খোদা যে শক্তি সমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তার সব কিছুরই সন্ধান করে সে জেনে নেবে। জমিন ও আসমানে যত পদার্থ রয়েছে, তার সব কিছুকে কাজে লাগাবার সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান সে করবে, কিন্তু আল্লার প্রতি নিষ্ঠা তাকে প্রতি পদক্ষেপে ফিরিয়ে রাখবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার থেকে। আমি এসব জিনিসের মালিক, প্রকৃতিকে আমি জয় করেছি, নিজের লাভের জন্য আমি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাব, দুনিয়ায় আনব শান্তি ও শৃংখলা। করব না ধ্বংস-তান্ডব, লুটতরাজ ও খুন খারাবি। মুসলিম বিজ্ঞানী যত বেশী করে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জন করবে, ততোই বেড়ে যাবে খোদার প্রতি তার বিশ্বাস এবং ততোই সে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবে। তার মনোভাব হবেঃ 'আমার মালিক আমায় যে শক্তি দিয়েছেন এবং যেভাবে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, তা থেকে আমার

www.pathagar.com

নিজের ও দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা আমি করবো।' এ হচেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পথ।

অনুরূপভাবে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যবিধ শাখায় মুসলিম তার গবেষণা ও কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে কাফেরের পিছনে পড়ে থাকবে না; কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বতন্ত্র। মুসলিম প্রত্যেক জ্ঞানের চর্চা করবে নির্ভুল দৃষ্টিভংগি নিয়ে, তার সামনে থাকবে এক নির্ভুল লক্ষ্য এবং সে পৌছবে এক নির্ভূল সিদ্ধান্তে। ইতিহাসে মানবজাতির অতীত দিনের পরীক্ষা থেকে সে গ্রহণ করবে শিক্ষা, খুজে বের করবে জাতি সমূহের উত্থান-পতনের সঠিক কারণ, অনুসন্ধান করবে তাদের তাহজীব-তমুদ্দুনের কল্যাণকর দিক। ইতিহাসে বিবৃত সৎ-মানুষদের অবস্থা আলোচনা করে সে উপকৃত হবে। যেসব কারণে অতীতের বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে বেঁচে থাকবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন ও ব্যায়ের এমন অভিনব পন্থা সে খুজে বের করবে, যাতে সকল মানুষের কল্যাণ হতে পারে; কেবল একজনের কল্যাণ ও অসংখ্য মানুষের অকল্যাণ তার লক্ষ্য হবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ মনোযোগ থাকবে এমন এক লক্ষ্য অর্জনের দিকে, যাতে দুনিয়ায় শান্তি, ন্যায়-বিচার, সততা ও মহত্বের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; কোন ব্যক্তি বা দল খোদার বান্দাহদেরকে নিজের বান্দায় পরিণত করতে না পারে, শাসন ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ শক্তিকে আল্লার আমানত মনে করা হয় এবং তা ব্যবহার করা হয় আল্লার বান্দাহদের কল্যাণে। আইনের ক্ষেত্রে সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কোন প্রকারে কারুর উপর অন্যায় জুলুম হতে না পারে।

মুসলিম চরিত্রে থাকবে খোদা ভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সব কিছুরই মালিক খোদা, এ ধারণা নিয়ে সে বাস করবে দুনিয়ার বুকে। আমার ও দুনিয়ার মানুষের দখলে যা কিছু আছে সবই আল্লার দান। কোন জিনিসের, এমনকি আমার নিজের দেহের ও দেহের শক্তির মালিকও আমি নিজে নই। সব কিছুই আল্লার আমানত এবং এ আমানত থেকে ব্যয় করবার যে স্বাধীনতা আমাকে দেয়া হয়েছে, আল্লার ইচছানুযায়ী তা প্রয়োগ করাই হচেছ আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন এবং সেদিন প্রত্যেকটি জিনিসের হিসেব দিতে হবে।

এ ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে, তার চরিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। কুচিন্তা থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখবে, মস্তিষ্ককে দুস্কৃতির চিন্তা থেকে

www.pathagar.com

বাঁচিয়ে রাখবে, কানকে সংরক্ষণ করবে অসৎ আলোচনা শ্রবণ থেকে, কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে চোখকে সংরক্ষণ করবে, জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবে অসত্য উচচারণ থেকে। হারাম জিনিস দিয়ে পেট ভরার চেয়ে উপবাসী থাকাই হবে তার কাম্য। জুলুম করার জন্যে সে কখনো তুলবে না তার হাত। সে কখনো তার পা চালাবে না অন্যায়ের পথে। মাথা কাটা গেলেও সে তার মাথা নত করবে না মিথ্যার সামনে। জুলুম ও অসত্যের পথে সে তার কোনো আকাংখা ও প্রয়োজন মিটাবে না। তার ভিতরে হবে সততা ও মহত্ত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে সে দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিকতর প্রিয় মনে করবে এবং তার জন্যে সে তার সকল স্বার্থ ও অন্তরের আকাংখা, এমন কি নিজস্ব সত্তাকে পর্যন্ত কোরবান করে দেবে। জুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করবে সবচেয়ে বেশী এবং কোন ক্ষতির আশংকায় অথবা লাভের আশায় তার সমর্থন করতে অগ্রসর হবে না। দুনিয়ার সাফল্যও এ শ্রেণীর লোকই অর্জন করতে পারে।

যার শির আল্লাহ ছাড়া আর কারুর সামনে প্রসারিত হয় না, তার চেয়ে বশী সম্মানের অধিকারী, তার চেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত আর কে হতে পারে? অপমান কি করে তার কাছে ঘেষবে?

যার দিলে খোদা ছাড়া আর কারুর ভীতি স্থান পায় না, খোদা ছাড়া আর কারুর কাছে সে পুরস্কার ও ইমানের প্রত্যাশা করে না, তার চেয়ে বড় শক্তিমান আর কে? কোন্ শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে কোন্ সম্পদ খরিদ করতে পারে তার ঈমানকে?

আরাম-পূজারী যে নয়, ইন্দ্রিয়পরতার দাসত্ব যে করে না, বল্গাহারা লোভী জীবন যার নয়, নিজ সৎপরিশ্রম লব্ধ উপার্জনে যে খুশী, অবৈধ সম্পদের স্তুপ যার সামনে এলে সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তি ও সন্তোষ যে লাভ করেছে, দুনিয়ায় তার চেয়ে বড় ধনী, তার চেয়ে বড় সম্পদশালী আর কে?

যে ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষের অধিকার স্বীকার করে নেয়, কাউকে বঞ্চিত করে না তার ন্যায্য অধিকারে; প্রত্যেক মানুষের সাথে যে করে সদাচরণ, অসদাচরণ করে না কারুর সাথে, বরং প্রত্যেকেরই কল্যাণ প্রচেষ্টা যার কাম্য, অথচ তার

www.pathagar.com

প্রতিদানে সে কিছু চায় না, তার চেয়ে বড় বন্ধু ও সর্বজন প্রিয় আর কে হতে পারে? মানুষের মন আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে তার দিকে, প্রত্যেকটি মানুষই বাধ্য হয় তাকে সম্মান ও প্রীতি দিয়ে কাছে টেনে নিতে।

তার চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে না, কারণ সে কারুর আমানত বিনষ্ট করে না, ন্যায়ের পথ থেকে মুখ ফিরায় না; প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং আচরণে সততা প্রদর্শন করে, আর কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক আল্লাহ তো সব কিছুই দেখছেন, এ ধারণা নিয়ে সে সব কিছুই করে যাচ্ছে ঈমানদারীর সাথে। এমন লোকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কে প্রশ্ন তুলবে, কে তার উপর ভরসা না করবে?

মুসলিম চরিত্র ভাল করে বুঝতে পারলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, দুনিয়ায় মুসলিম কখনো অপমানিত, বিজিত ও অপরের হুকুমের তাবেদার হয়ে থাকতে পারে না। সব সময়েই সে থাকবে বিজয়ী ও নেতা হয়ে, কারণ ইসলাম তার ভিতর যে গুণের জন্ম দিয়েছে তার উপর কোনো শক্তিই বিজয়ী হতে পারে না।

এমনি করে দুনিয়ায় ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে তার প্রভুর সামনে হাজির হবে, তখন তার উপর বর্ষিত হবে আল্লার অসীম অনুগ্রহ ও রহমত, কারণ যে আমানত আল্লাহ তার নিকট সোপর্দ করেছিলেন, সে তার পরিপূর্ণ হক আদায় করেছে এবং আল্লাহ যে পরীক্ষায় তাকে ফেলেছিলেন, সে কৃতিত্বের সাথে তাতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এ হচেছ চিরন্তন সাফল্য, যা ধারাবাহিক চলে আসে দুনিয়া থেকে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত এবং তার ধারা কখনো হারিয়ে যায় না।

এ হচেছ ইসলাম- মানুষের স্বভাবধর্ম। কোনো জাতি বা দেশের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এ বিধান। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে যেসব আদর্শ ছিলো তা ছিল ইসলাম। তারা ছিলেন মুসলিম- হয়তো তাদের ভাষায় সে ধর্মের নাম ইসলাম অথবা অপর কিছু ছিলো।

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা

উপরোল্লিখিত আলোচনায় সৃষ্টিকর্তাকে আন্দাজ অনুমানের উপর বিশ্বাস এবং অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর

www.pathagar.com

উন্নতির ফলে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য গাণিতিক পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। তা এরকম যে মহাজ্ঞানী, মহাপরিকল্পনাকারী, মহাপরিচালক সর্বদ্রষ্টা, পরম দয়ালু ও দাতা চরম ও পরম সৌন্দর্যের আধার আল্লাহ্ ব্যতিরেকে এই মহাবিশ্ব এই নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক জগৎ সৃষ্টি অসম্ভব। এবং তা এত নিয়ম পদ্ধতি মাফিক লালন-পালন ও পরিচালনা কোনক্রমেই সম্ভব না। অর্থাৎ সৃষ্টি আমরা যেভাবে দেখছি আছে। সৃষ্টিকর্তাও ঠিক এ একইভাবে সৃষ্টির মাঝেই বিদ্যমান। যা একমাত্র আস্তিকতার দৃষ্টি দিয়ে বা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেকে বলেন অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়। আমি বলি স্থূল দৃষ্টি দিয়েই দেখা যায়। বলতে পারেন সে আবার কেমন?

আমি বলব মানুষকে যেভাবে চলাফেরা করতে দেখছি আল্লাহ্ পাকও তেমনি মানুষের মাঝে, সমগ্র সৃষ্টির মাঝে, ঐভাবেই অবস্থান করছেন। এটা না দেখার বা অস্পষ্টতার কোন কিছু নেই। সমগ্র সৃষ্টির প্রান শক্তির সাথেই আল্লাহ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছেন। মানুষ দুঃখ পেলে আল্লাহ দুঃখ পান। মানুষ সুখ পেলে আল্লাহ সুখ পান। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ অকৃতজ্ঞ মানুষকে বলবেন দুনিয়ায় তুমি আমাকে সাহায্য কর নি, আজ আমিও তোমাকে সাহায্য করবনা। তখন মানুষ বলবে, হে আল্লাহ দুনিয়াতে আমি আপনাকে সাহায্য করব এমন ক্ষমতা কি আমার ছিল? তখন আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তোমার কাছে রহিম, করিম, ছাত্তার, গাফফার নামের যে লোক গুলি সাহায্য চেয়েছিল না? ঐটা আমি ছিলাম। তোমাকে কোটি টাকা দিয়ে ১০টি টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু তাও দাও নি। যাও জাহান্নামে, তোমার জন্য আমার কাছে আজ আর কোন সাহায্য নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, হে মানুষ তুমি আমার কাছে যে ধরনের ব্যবহার আশা কর, মানুষের সাথে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার কর। তুমি মানুষের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করবে, আমি তোমার সাথে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার করবো। তুমি মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমার কাছে ভাল ব্যবহার আশা করবা তা হবে না, তা পাবে না, তা পাওয়া অসম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব। মানুষকে আপনি ভালবাসুন আল্লাহ্‌কে ভালবাসা হবে। মানুষকে কষ্ট দিবেন, আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হবে। মানুষের নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসা, সেবা আর সুবিচার এবং সুশাসনের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি নিহিত আর এটাই এবাদত। ঈমান, কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ,

www.pathagar.com

যাকাত এটা এবাদত। তবে এই আনুষ্ঠানিকতা, এমন যে, সরকারের জমি ভোগদখল করলে, তার ট্যাক্স যেমন দিতে হয় বাধ্যতামূলক, তা না হলে রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যেতে হয় ঠিক এমনি আর কি। আর আসল এবাদাত হলো সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে ভালবাসতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে, ছোট বড় সব মানুষকে সম্মান করতে হবে। মানুষ সম্মানিত সৃষ্টি মানুষ প্রিয় সৃষ্টি। কার প্রিয় সৃষ্টি? আল্লাহ্‌র। আল্লাহ কে? কত ক্ষমতাবান? এটা বুঝতে হবে। সরকারি অফিসের ছোট বড় যে কোন কর্তা ব্যক্তির সামনে গেলে ভক্তি সম্মানে আমরা গদ গদ হয়ে যাই। কত গুরুত্ব দেই কত যত্ন কত আপ্যায়ন কত মূল্যায়ন তার হিসাব নেই। অথচ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শোকর করার জন্য সেজদায় পড়ে থাকলেও মহান সৃষ্টিকর্তার শোকর করে শেষ করা যাবে না। অথচ তার প্রতি গুরুত্ব নেই। ভাল পোষাকটি পরে সরকারী অফিসে যাই, আর আল্লাহ্‌-র অফিসে যখন নামাজ পড়ার জন্য যাই, তখন ময়লা ছেড়া কাপড়টি জোটে। অথচ সবচেয়ে ভাল পোষাকে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়াতে হবে। এটাই আদব, এটাই সৃষ্টিকর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

যাহক যা বলছিলাম তাহলো সৃষ্টিকর্তা ঐভাবে বিদ্যমান যেমন ২+২=৪ হয়, ৫ বা ৬ হতে পারে না ঠিক তেমনি সৃষ্টি আছে যেমন সৃষ্টিকর্তাও আছেন তেমনি সকল সৃষ্টির মধ্যে। সকল সৃষ্টির প্রান শক্তির মধ্যে সৃষ্টিকর্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন। সৃষ্টির মাঝেই তার কুদরত, আর নূর, তার জ্যোতি।

উল্লিখিত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও লালন পালন করছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব কিছু সুনিয়ন্ত্রণ করছেন।

এবার আসা যাক, বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই শুধুমাত্র সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিধান দিতে পারেন। আর তা দিয়েছেনও। বিশ্বজাহানের পরিচালনার জন্য পবিত্র কোরান পাক তিনি তার প্রিয় মাহবুব হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে মানব জাতির পরিচালনার জন্য পাঠিয়েছেন। এখন দেখাযাক সেই পবিত্র কোরানপাকে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন, সৃষ্টি পরিচালনা, মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, পরিচালনা তথা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য কি কি নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রাসূলের আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী

হযরত মুহাম্মদ ছিলেন প্রতিশ্রুত পয়গম্বর অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠাবেন, একথা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। প্রত্যেক শিল্পবস্তুই প্রথমে শিল্পীর ধ্যানে জন্মলাভ করে, তার অনেক পরে বাইরে প্রকাশ পায়। মুহম্মদ সম্বন্ধেও একথা সত্য। তিনি ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই তার জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহ্র ধ্যানে প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল। এই জ্যোতির্মূর্তিই নূরে মুহম্মদী। সর্বপ্রথম তাই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন মুহম্মদের নূর। একটি হাদিসে তাই এসেছেঃ

"আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী"

অর্থাৎঃ (হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলছেন) "সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেন তা আমার নূর।" কাজেই, একথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ তার জন্মের অনেক আগেই জন্মেছিলেন। সারা সৃষ্টি তাঁর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। চাঁদে-চাঁদে, তারায়-তারায়, গ্রহে-গ্রহে, লোকে-লোকে, তাঁর ধ্যান-মূর্তি একটি অস্পষ্ট ছায়া ফেলেছিল। বিশ্ব- প্রকৃতির অন্তর জুড়ে তাই এক পরম কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জেগেছিলঃ কোথায় কবে কোন্খানে কিভাবে নিখিলের সেই ধ্যানের ছবি বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে।

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তিনি-যাঁর আবির্ভাব সৃষ্টির স্বাভাবিক নীতিতে পূর্বেই অঙ্গীকৃত হয়ে থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে যা অনিবার্য, আবির্ভাবের পূর্বে তাই প্রতিশ্রুত। মুহম্মদ আসবে একথা তাই বিশ্বনিখিলের অবিদিত ছিল না। হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা প্রমুখ পূর্ববর্তী যাবতীয় পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই জানতেন সেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে; তাই তাঁরা প্রত্যেকেই হযরত মুহম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা, দিঘা-নিকায়, তওরাৎ, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থে মুহম্মদের গুণগান ও তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হয়েছে। নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত হতেই পাঠক সেকথা বুঝতে পারবেন।

বেদ-পুরাণেঃ বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে 'আল্লাহ' 'রসূল', 'মুহম্মদ' ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

'অথর্ববেদীয় উপনিষদ'-এ আছেঃ

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্য
হবয়ামি মিলং করব ইল্লালাং
অল্লোরসুলমহমদকং
বরস্য অল্লো আল্লাম ইল্লল্লতি ইল্লাল্লাল॥ ৯॥

'ভবিষ্য পুরাণ'- এ আছেঃ

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ ॥৫॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্‌
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম্‌ ॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে ॥৭॥

ভোজরাজ উবাচ-

ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থ মুপাগতম্‌ ॥৮॥

ভাবার্থঃ ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি- যাঁহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)- আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

'অল্লোপনিষদ'- এর একটি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়ঃ

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণ আল্লাম।
অল্লোরসুলমহমদকং বরস্য অল্লো অল্লাম্‌।
আদল্লাহ্‌বুকমে ককম আল্লাবুক নিখাতকম ॥৩॥

ভাবার্থঃ আল্লাহ্‌ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ - এ উল্লিখিত অর্থবেদে হইয়াছেঃ

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দবহে ॥১॥

www.pathagar.com

ভাবার্থঃ হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়ে শোন। 'প্রশংসিত জন' লোগদিগের মধ্য হতে উত্থিত হবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পেলাম।

বলাবাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বলা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ মুহম্মদের অর্থই 'প্রসংসিত জন', আর মক্কার অধিবাসীদের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন যে, আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মুহম্মদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেঃ বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা-নিকায়া'য় উল্লিখিত হয়েছেঃ
"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, তাঁর নাম 'মেত্তেয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি করুণার বুদ্ধ।"
আমরা নিম্নে সিংহল হইতে প্রাপ্ত (from Ceylonese sources) একটি প্রমাণের উল্লেখ করছি। তাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছেঃ
Anandaq said to the Blessed One, "Who Shall teach us when thou art gone?

And the Blessed One replied:
'I am not first Buddha who came on the earth, nor Shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct.... He will proclaim a reigious life. Wholly perfect and pure such as I now proclaim...
Ananda said, 'How shall we know him?
The Blessed One said. He will be known as 'Maitreya'-
(The Gospe of Buddha by Carus, pp. 117-18)

অর্থাৎঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদেরকে উপদেশ দিবে?
বুদ্ধ বললেনঃ

www.pathagar.com

আমি একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত- তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন- আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে আমি চিনব কি করে? বুদ্ধ বললেনঃ তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহম্মদ, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কুরআন শরীফে মুহম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপ আছে। মুহম্মদ সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ তিনি রহমতুল্লিল্ আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।

পার্শী ধর্মশাস্ত্রেঃ পার্শীজাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবেস্তায় হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এমন কি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। আমরা মূল শ্লোক ও তার অনুবাদ দিলামঃ

> Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi
> Spetame Zarathustra yam dahman Vangnim afritim.
> Yunad hake hahi humanaghad hvakanghad
> Hushyanthand hudaenad."
> (Zend-Avesta, Part 1. Translated by Muller, p. 260)

অর্থাৎঃ "আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসবেন, যাঁহার নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।"

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তার সারমর্ম এইরূপঃ "যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন- যাঁর শিষ্যেরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূর্জা না করিয়া তাহার ইব্রাহিমের কাবা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হবে।"

www.pathagar.com

“তার পারশ্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ্‌ প্রভৃতি পারস্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করবে। তাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলবেন।”

Muhammad in world scriptrures (by A. Haq vidyarthi,p.47)

তাওরাতেঃ ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র ‘তওরাত’- এ নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আছেঃ

“The Lord they God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of they brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken.”

(Duet. 15: 18)

অর্থাৎঃ “তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে আমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করবেন; তাঁর কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।”

অন্যত্র আছেঃ

“I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him”.

(Duet, 18 : 18-19)

অর্থাৎঃ “(ঈশ্বর বলছেন) আমি তাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে তোমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করব এবং তাঁর মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করব তাই শুনাবেন। এবং অবশ্যই ঘটবে

www.pathagar.com

যে, তাঁর মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যারা শুনবে না তাদেরকে আমি শুনতে বাধ্য করব।"

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুনঃ

"And this is the bessing wherewith Moses, the man of God, belssed the children of Isreal before his death: And he said, The Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them; he shined from mount Paran and he came with ten thousands of Saints: from his right hand went a fiery law for them."

(Duet, 33 : 1-2)

অর্থাৎঃ "এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলে বনিঈসরাইলদেরকে আশীর্বাদ করলেনঃ
এবং তিনি বললেনঃ প্রভু (মুসা) সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং সিয়ের (seir) পর্বত হতে উঠলেন, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ যিনি আসবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্বত হতে বিকীর্ণ হল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত হতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বের হলো।"

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করবেন।

বাইবেলেঃ হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে বাইবেল হতেও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করছি।

যীশুখ্রীষ্টের সমসময়ে সাধা যোহন (St. Johe) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি যখন সবাইকে বাপ্তাইজ করে বেড়াচিছলেন তখন জেরুজালেম হতে ইহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁর পরিচয় নেওয়ার জন্য পাঠিয়ো দেন। তাঁরা এসে যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তার যে উত্তর দেন, তাতেই হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হয়েছেঃ

"And this is the record of John, when Jews sent Priests and Laits from Jerosaem to ask him, who art thou? And he confessed and denied not- I am not the Christ. And they

www.pathagar.com

asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not Art thou That Prophet? And he answered, No............... And they asked him and said unto him, why baptizest thou them, it thou be not Elias the Christ, not neithet that prophet? John answered them, saying I baptize with water, but there standeth one amongst you whome ye know not. He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose." (John. Chap. 1: 19-27)

অর্থাৎঃ "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়েছে যে, যখন জেরুযালেম হতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী এসে যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করলেন, আমি যীশুখ্রীষ্ট নহ। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন, না।

তখন তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ করছেন? যোহন উত্তর দিলেনঃ আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁকে তোমরা জানই না।

তিনি সেই জন যিনি আমার পরে এসেও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হবেন এবং আমি যাঁর জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নই।"

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচেছ যে, যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী আসবেন, সেকথা ইহুদীরা জানত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই 'হযরত মুহম্মদ (দঃ)'।

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"If you love me, keep my commandments: And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever." (John. Chap. 14: 15-16)

অর্থাৎঃ "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কাজ করো; আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব, যাতে তিনি তোমাদেরকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন- যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।"

অন্যত্র আছেঃ

"Neverthless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the comforter will not come unto you; but if depart. I will send him, unto you."

(John. 17: 7-8)

অর্থাৎঃ যাহোক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে পাঠিয়ো দিব।

"How be it when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth, for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that shall he speak, are he will show you things to come."

অর্থাৎঃ "যাই হোক, যখন সেই সত্য-আত্মা আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সর্বপ্রকার সত্যপথে চালিত করবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হতে) শুনবেন, তাই বলবেন, এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখাবেন।"

এই 'শান্তিদাতা' কে? হযরত মুহম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হচেছ না? যীশু খ্রীষ্টের পরে একমাত্র মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হয় নাই। তা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও 'শান্তি', অথচ 'চরম প্রশংসিত।' এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াতের উল্লেখ করা যায়ঃ

"এবং যখন আল্লহ্ সমস্ত পয়গম্বর সামনে এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি যে-সমস্ত বাণী তোমাদেরকে দিয়েছি তা সত্য, অতঃপর একজন রসুল আসবেন এবং তিনি এসে তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রমাণ করবেন; তোমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করলে তো? তারা বললঃ আমরা স্বীকার করলাম। তখন তিনি বললেনঃ তা হলে সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" (৩ঃ৮০)

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী হতে কি বুঝা যায়? যাঁ প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব হতে যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হয়ে আসছে, আল্লাহ্ যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তিনি কি সাধারণ মানুষ? কখনই না।

অতত্রব, হযরত মুহম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করে বিচার না করি। তাঁর জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখতে পাই, তাঁর অনেক কাজ হয়ত আমাদের কাছে বিসদৃশ বা অলৌকিক বলে মনে হবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
ঈমানের জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য

প্রত্যেক মুসলমানই একথা ভাল করে জানে যে, দুনিয়ায় ইসলাম আল্লাহ তাআলার একটি সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের ন্যায় এত বড় একটা নিয়ামত তাকে দান করেছেন বলে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও ইসলামকে মানুষের সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ

"আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।"

-সূরা আল মায়েদাঃ৩

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি এই যে, অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা তাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচেছ মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার এ বিরাট অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। এখন আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের হক কিভাবে আদায় করা যেতে পারে? তাহলে আমি তার উত্তরে বলব যে, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)- এর উম্মাত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন পূর্ণরূপে ও খাঁটিভাবে তার অনুগামী হতে পারলেই আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহের হক আদায় হবে। আপনাকে যখন আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর এ অনুগ্রহ ও দয়ার হক আদায় করতে হলে আপনাকে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। এছাড়া আপনি অন্য কোন প্রকারেই এবং কোন উপায়েই তাঁর এ মহান উপকারের 'হক' আদায় করতে পারেন না। আর আপনি যদি এই 'হক' আদায় করতে না পারেন বা না-করেন, তাহলে আপনি এই অকৃতজ্ঞতার জন্য মহা অপরাধী হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই এই মহাপাপ হতে রক্ষা করুন, আমীন।

www.pathagar.com

অতঃপর আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পূর্ণ মুসলমান কিভাবে হওয়া যায়? তবে তার উত্তর খুবই বিস্তৃত ও লম্বা। এই পুস্তকে আমি ক্রমশ এর এক একটি অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে থাকবো। সর্বপ্রথম আমি এমন একটি বিষয় বলবো, মুসলমান হতে হলে যা প্রয়োজন সকলের আগে এবং যাকে বলা যায় মুসলমান হওয়ার পথের প্রথম ধাপ।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, আপনারা সদাসর্বদা যে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, এর অর্থ কি? মানুষ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইসলাম ধর্ম সাথে করে নিয়ে আসে? মুসলিম ব্যক্তির পুত্র অথবা মুসলিম ব্যক্তির পৌত্র হলেই কি মুসলমান হওয়া যায়? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যেমন ব্রাহ্মণ, চৌধুরীর পুত্র হলেই যেমন চৌধুরী এবং শূদ্রের পুত্র হলেই যেমন শূদ্র হওয়া যায়, তেমনিরূপে মুসলমান নামধারী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলমান হতে পারে? 'মুসলমান' কি কোন বংশ বা কোন শ্রেণীর নাম? ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্ম হলেই ইংরেজ, চৌধুরী বংশে জন্মিলেই চৌধুরী হয়, তেমনি মুসলমানরাও কি 'মুসলমান' নামক একটি জাতির বংশে জন্মলাভ করেছে বলেই 'মুসলমান' নামে অভিহিত হবে? আমার এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, না, 'মুসলমান' তাকে বলে না। মায়ের গর্ভ হতেই মুসলমান হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করলেই মানুষ আর মুসলমান থাকে না- মুসলিম সমাজ হতে একেবারে খারিজ হয়ে যায়। যে কোন লোক- সে ব্রাহ্মণ হোক কিংবা পাঠান হোক, ইংরেজ হোক অথবা আমেরিকান, অথবা বাঙালী হোক অথবা হাবশী- সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখনই সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি 'মুসলমান' সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পালন করে চলে না, সে মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে না; সে সৈয়দের পুত্রই হোক আর পাঠানের পুত্রই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এছাড়া লেবাস পোশাক, দাড়ী, পাগড়ী হলেই মুসলমান হওয়া যায় না। রবিন্দ্রনাথের দাড়ি আর টুপি লম্বা জামা খেরকা দেখলে ভালই লাগে শুধু লম্বা গোফটা যদি ছেটে দেওয়া যেত তাহলে পূর্ণ ইসলামী বলেই মনে [illegible]তা, কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস সুন্দর দাড়ী ছিল। লেনিনের দাড়িতো দেখতে [illegible] ছিলনা। কার্ল মার্কস আর এঙ্গেলস এর গোফগুলি ছেটে দিলে মন্দ [illegible] বেশ ভালই লাগতো, লেনিনের তো দাড়ি বেশ সুন্দর করে ছেটে

www.pathagar.com

রাখার অভ্যাস ছিল। গোফটা ছেটে রাখতেন বড় জামা হলে কারো বলার উপায় ছিল না যে মুসলমান না নাস্তিক। এরা তিনজনই দাড়ি রেখে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতেন ডারউইনের দাড়ীতো খুবই লম্বা ছিল। তাই দাড়ী টুপি জামাতে রবিন্দ্রনাথ হওয়া যায় অন্যান্য দাড়িতে নাস্তিক হওয়া যায়, দাড়ি টুপি আর জামায় ধর্মের মৌলিক বিষয়ের কিছুই এসে যায় না। তবে হ্যাঁ দাড়ি টুপি আর লম্বা জামা যদি সুন্দর করে আরব দেশের মুসলমানদের মত করে পরা হয়তো সুন্দর লাগে এবং রাসুল (দঃ) আরবে জন্মগ্রহণ করার কারণে ঐ পোশাক পরতেন। সেজন্য খুবই প্রয়োজন ঐ পোশাক পরা। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এর মোহাব্বাতে তার পোশাক তার টুপি তার মত দাড়ি তার মত খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়া সবই ঠিক আছে। এসব পোশাক পরে কার্ল মার্কস এর আদর্শ বাস্তবায়ন করলে অথবা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করলে কি কাজ হবে? না তা হবে না। তাহলে কি করতে হবে? করতে হবে এই যে, রাসুল (দঃ) যা বলেছেন যা করেছেন তাই করতে হবে। তারপর বেশ ভুষা, বেশ ভূষা আগে নয়। ভীতরে নকল জিনিস উপরে সুন্দর কাভার সেটাতো নকল। বোখারী শরীফের হাদিস কিতাব খানার কভার তৈরী করলেন ৪ কালার করে সুন্দর প্রিন্ট করলেন ভীতরে বইটি দিলেন কার্ল মার্কস এর দাশ ক্যাপিটাল অথবা রবিন্দ্রনাথের গিতাঞ্জলী। তাহলে কি নকলের দায়ে ধরা পড়ে শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারে কি না? তাই ভীতরে ইসলামী হতে হবে আগে আর কভারে মোড়াতে হবে অবশ্যই, তবে পরে কাভার দিয়ে বাধাই করলে আদর্শ পুস্তক হবে। ইসলাম বুঝে গ্রহণ এবং নিজের জীবনে প্রথমে এবং পর্যায়ক্রমে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলে দাবি করা যায়, বা তাকে মুসলমান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

আমার পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর এ জবাব হতেই জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত- মুসলমান হওয়ার নিয়ামত- যা আপনি লাভ করেছেন, ওটা জন্মগত জিনিস নয়, তাকে আপনি মায়ের গর্ভ হতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই লাভ করতে পারেন না এবং আজীবন এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করুন আর না-ই করুন তা আপনার সাথে নিজে নিজেই সর্বদা লেগে থাকবে- এমন জিনিসও তা নয়। এটা একটি চেষ্টালভ্য নিয়ামত; তা লাভ করতে হলে আপনাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা সাধনা করে যদি আপনি তা লাভ করেন, তবেই তাকে আপনি পেতে

www.pathagar.com

পারেন। -আর এর প্রতি যদি মোটেই খেয়াল না করেন, তবে এর সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কোরআন পড়ে বুঝে তা নিজের জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়ন করতে হয়। এটা রোগের প্রেসক্রিপশনের মতো কাজ করে। বরং প্রেসক্রিপশন দেখে ঔষধ ক্রয় করে যেভাবে সেবন করতে হয় ঠিক তেমনিই পবিত্র কোরআন পড়ে বুঝে তার বাস্তবায়ন করলেই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাধি বা সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আর এটাই মহান আল্লাহ্ পাকের মকসুদ।

অতত্রব, প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কি? মুখে মুখে যে ব্যক্তি 'আমি মুসলমান' বা 'আমি মুসলমান হয়েছি' বলে চীৎকার করবে, তাকেই কি মুসলমান মনে করতে হবে? অথবা পূজারী ব্রাহ্মণেরা যেমন না বুঝে কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তেমনিভাবে আরবি ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলমান হওয়া যাবে? ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য কি এটাই? উক্ত প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এটা নয়। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)- এর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সত্য বলে বিশ্বাস করা, জীবনের একমাত্র ব্রত ও আদর্শ হিসেবেই এটাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা; ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য এটাই। কাজেই যিনি এরূপ না করবেন তিনি মুসলমান হতে পারবেন না। আপনাদের এ জবাব হতে এটাই প্রকাশ পেল যে, প্রথমত ইসলাম জেনে ও বুঝে নেয়া এবং বুঝে নেয়ার পর তাকে কাজে পরিণত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। কেউ কিছু না জেনেও ব্রাহ্মণ হতে পারে, কারণ সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। অতত্রব সে ব্রাহ্মণ থাকবে, কেউ কিছু না জেনেও চৌধুরী হতে পারে, যেহেতু সে চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে- চৌধুরীই সে থাকবে। কিন্তু ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না; কারণ মুসলমান ব্যক্তির ঔরসে জন্ম হলেই মুসলিম হওয়া যায় না- ইসলামকে জেনে-বুঝে বিশ্বাস করে কাজ করলেই তবে মুসলমান হওয়া যায়। চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থা না জেনে তাকে বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী কাজ কিরূপে সম্ভব হতে পারে? আর না জেনে না বুঝে এবং বিশ্বাস না করেই মানুষ মুসলমান হতে পারে কিরূপে? অতত্রব, বুঝা যাচ্ছে

www.pathagar.com

যে, মূর্খতা নিয়ে মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে, মুসলমান নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় ও মুসলমান বলে দাবি করে তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। যিনি ইসলাম কি তা জানেন এবং বুঝে শুনে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মুসলমান। কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে নামের পার্থক্য নয়। অতএব, একজনের নাম রামপ্রসাদ, এজন্য সে হিন্দু এবং আর একজনের নাম আবদুল্লাহ, অতএব সে মুসলমান- তা হতে পারে না। পরন্তু কাফের ও মুসলমানের মধ্যে শুধু পোশাকের পার্থক্যই আসল পার্থক্য নয়। কাজেই একজন ধূতি পরে বলে সে হিন্দু এবং অন্যজন পায়জামা বা লুঙ্গী পরে বলে সে মুসলমান বিবেচিত হতে পারে না। বরং মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের ইলম বা জ্ঞানের পার্থক্য এবং আমলের পার্থক্য। এক ব্যক্তি কাফের এই জন্য যে, সে জানে না তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কি সম্পর্ক এবং যানেনা বলে সে সম্পর্ক রক্ষা করেও চলেনা। কিন্তু একটি মুসলমান সন্তানের অবস্থাও যদি এরূপ হয়, তবে তার ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে কোন্ দিক দিয়ে পার্থক্য করা যাবে? এবং এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করে আপনি একজনকে কাফের ও অপরজনকে মুসলমান বলবেন কেমন করে? কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং ধীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার যে মহান নিয়ামতের জন্য আপনারা শোকর আদায় করছেন, একে লাভ করা এবং রক্ষা করা এ দু'টি কাজই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইলম বা জ্ঞানের ওপর। ইলম বা জ্ঞান না থাকলে মানুষ তা পেতে পারে না। সামান্য পেলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সবসময়ই তাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ও খুঁতখুঁতে ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। মুসলমান না হয়েও এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মুসলমান মনে করে, এর একমাত্র কারণ তাদের মূর্খতা। যে ব্যক্তি একেবারেই জানে না যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে এবং ইসলাম ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি, সে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিকের মত; সরল রেখার ওপর দিয়ে চলতে চলতে আপনা আপনি তার পা দু'খানা কখন যে পিছলিয়ে যাবে বা অন্য পথে ঘুরে যাবে, তা সে জানতেই পারবে না। জীবনের পথে চলতে চলতে সে সরল পথ হতে কখন যে সরে গিয়েছে, তা সে টেরও পাবে না। এমনও হতে পারে যে, পথিমধ্যে কোন ধোঁকাবাজ শয়তান এসে তাকে বলবে- "মিঞা তুমি

www.pathagar.com

তো অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছ, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেব।" বেচারা অন্ধকারের যাত্রী নিজের চোখে যখন সরল-সঠিক পথ দেখতে পায় না, তখন মূর্খতার দরুনই নিজের হাত কোন দাজ্জালের হাতে সঁপে দিয়ে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করে কোথা হতে কোথায় নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তার নিজের হাতে আলো নেই এবং সে নিজে পথের রেখা দেখতে ও চিনতে পারে না বলেই তো সে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যদি আলো থাকে, তবে সে পথও ভুলবে না, আর অন্য কেউও তাকে গোমরাহ করে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। এ কারণেই ধারণা করে নিতে পারেন যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং পবিত্র কুরআনের উপস্থাপিত বিধান ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রদত্ত শিক্ষা ভাল করে না জানা মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে কত বড় বিপদের কথা। এই অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হতে পারে এবং অপর কোন দাজ্জালও তাঁকে বিপদগামী করতে পারে। কিন্তু যদি তার কাছে জ্ঞানের আলো থাকে, তবে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি ধাপে ইসলামের সরল পথ দেখতে পাবে। প্রতি পদেই কুফরি, গোমরাহী, পাপ, জ্বেনা, হারামী প্রভৃতি যেসব বাঁকা পথ ও হারাম কাজ সামনে আসবে, তা সে চিনতে এবং তা হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আর যদি কোন পথভ্রষ্টকারী তার কাছে আসে তবে তার দু-চারটি কথা শুনেই তাকে চিনতে পারবে। এবং এ লোকটি যে পথভ্রষ্টকারী ও এর অনুসরণ করা যে কিছুতেই উচিত নয়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। জ্ঞানই আলো অজ্ঞতাই অন্ধকার। অন্ধকারে পথচলা যায় না। তাই আমাদের প্রিয় নবী জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে ও গমন করতে বলেছেন।

আমি যে ইসলাম বা জ্ঞানের কথা উল্লেখ করলাম, এর ওপরই আপনাদের ও আপনাদের সন্তান-সন্ততির মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা একান্তভাবে নির্ভর করে। এটা সাধারণ বস্তু নয়, একে অবহেলাও করা যায় না। কৃষক তার ক্ষেত-খামারের কাজে অলসতা করে না, ক্ষেতে পানি দিতে এবং ফসলের হেফাজত করতে গাফলতি করে না, গরু-বাছুরগুলোকে ঘাস-কুটা দিতে অবহেলা করে না; কারণ এসব ব্যাপারে অলসতা করলে তার না খেয়ে মরার ও প্রাণ হারাবারও আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে, তা লাভ করতে মানুষ কেন এত অবহেলা করছে? এতে কি ঈমানের মত

www.pathagar.com

অতি প্রিয় ও মূল্যবান নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই? ঈমান কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নয়? মুসলমানগণ প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে যতটা সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করে, এর দশ ভাগের এক ভাগও কি ঈমান রক্ষার কাজে ব্যয় করতে পারে না? প্রকৃত মুসলমানরাতো ঈমান রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন সে মুসলমানরা গেল কোথায়? তাদেরকে এখন খুঁজে বের করতে হবে।

আপনারা প্রত্যেকে এক একজন মৌলভী হবেন, বড় বড় কিতাব পড়ে এবং জীবনের দশ বারোটি বছর কেবল পড়াশুনার কাজে ব্যয় করে মস্তবড় একজন আল্লামা হবেন, এমন কথা আমি বলছি না। মুসলমান হওয়ার জন্য এত কিছু পড়ার বা বড় কোন ডিগ্রী লাভ করার কোন আবশ্যকতা নেই। আমি শুধু এটকু বলতে চাই যে, আপনারা রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র অল্প কিছু সময় দ্বীনি এলম (ইসলামী বিদ্যা) শেখার কাজে ব্যয় করুন। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক মুসলমান বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই এতটুকু ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যা হতে তারা পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তা ভালরূপে বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) যেসব অন্যায় কুসংস্কার দূর করতে এবং সেই স্থানে যা স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাও উত্তমরূপে জানতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার সাথে তারা ভাল করে পরিচিত হতে পারবে। এটুকু ইলম হাসিল করার জন্য খুব বেশী সময়ের দরকার করে না, আর ঈমান যদি বাস্তবিকই কারো প্রিয় বস্তু হয় তবে এ কাজে এটা ব্যয় করা তার পক্ষে এতটুকুও কঠিন কাজ নয়।

www.pathagar.com

হাসির উদ্রেক হয় না। একথা কেউই ভেবে দেখেন না যে, প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ কিনে নিয়মিত খেতে হবে তাহলেই রোগব্যাধি ভাল হবে তাছাড়া প্রেসক্রিপশন ধুয়ে পানি খাওয়া বা গলায় ঝুলানোর বস্তু নয়। তবে হ্যাঁ পবিত্র কালামে পাকের বরকতে যে কোন কিছুই ভাল হতে পারে তাই বলে ওটা মহান আল্লাহর মকসুদ নয়। মাকসুদ কোরআন বুঝে তা নিজের পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের এবং মানব জাতির কল্যাণে বাস্তবায়ন করবে এটাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাকসুদ।

কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি একখানা ডাক্তারী কিংবা হেকিমী বই নিয়ে পড়তে শুরু করে আর মনে করে যে, এ বইখানা পড়লে সব রোগ আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। তবে আপনারা তাকে কি বলবেন? আপনারা কি বলবেন না যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাকে পাগলখানায় পাঠিয়ে দাও? কিন্তু হায়! একমাত্র মহাচিকিৎসক আল্লাহ তাআলার সাথে আপনাদের ব্যবহার ঠিক এ রকমই হচ্ছে। আপনারা তা পড়েন আর মনে করেন যে, এটা পড়লেই সব রোগ দূর হয়ে যাবে- এর বিধান মত কাজ করার দরকার নেই। আর এ কিতাব যেসব জিনিসকে ক্ষতিকর মনে করে বর্জন করতে বলে তা বর্জন করারও কোন দরকার মনে করেন না। তাহলে রোগ দূর করার জন্য যে ব্যক্তি শুধু বই পড়াই যথেষ্ট মনে করে, তার সম্পর্কে আপনারা যে মত প্রকাশ করে থাকেন, আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে সেরূপ মত প্রকাশ করেন না কেন? শুর দিয়ে যদি ডাক্তারী বই পড়েন তাহলে কি রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব? হ্যা আল্লাহর অশীম রহমতে কালামে পাকের বরকতে রোগও ভাল হতে পারে তাই বলে এটা মকসুদ নয়। কালামে পাক না বুঝে শুনে শুধু সুর দিয়ে তেলত্তিয়াত করলেও পূণ্য আছে। তবে শুধু তেলাওয়াতই মাকসুদ নয়। প্রকৃত মাকসুদ এবং কল্যাণ হচ্ছে বুঝে পড়া এবং কোরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

আপনি জানেন না এমন কোন ভাষায় যদি আপনার কাছে কোন চিঠি আসে তবে আপনি অমনি এর অর্থ জানার জন্য ঐ ভাষা যে ব্যক্তি জানে তার কাছে দৌড়ে যান। এর অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার বিন্দুমাত্র শান্তি থাকে না। সাধারণ কায়-কারবারের চিঠি নিয়ে আপনি এই প্রকার অস্থির হয়ে পড়েন; এতে আপনার হয়ত দু'-চার পয়সারই উপকার হতে পারে,

www.pathagar.com

তার বেশি নয়। কিন্তু সারেজাহানের মালিক আল্লাহর কাছ থেকে যে চিঠি আপনার কাছে এসেছে, আর যার মধ্যে আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে তাকে আপনি অবহেলা করে ফেলে রাখেন, এর অর্থ জানার কোন আগ্রহ বা অস্থিরতাই আপনার মধ্যে জাগে না। এটা কি বাস্তবিকই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? এসব কথা আমি হাসি-তামাশার জন্য বলছি না। আপনারা যদি একথা চিন্তা করে দেখেন তবে আপনাদের অন্তরই বলে দেবে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অবিচার হচ্ছে আল্লাহর এই মহান কিতাবের প্রতি। আর এ অবিচার শুধু তারাই করেছে, যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবি করে এবং এর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত বলে প্রচার করে। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান নিশ্চয়ই আছে এবং তারা এটাকে প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ভালবাসে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এর ওপর যুলুম করার ফল তো সকলেরই জানা আছে। খুব ভাল করে বুঝে নিন, আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে এ জন্য আসেনি যে, এটা পেয়েও সে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-মুসিবতের মধ্যে পড়ে থাকবে। পবিত্র কুরআন তো সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভ করার একমাত্র উৎস; এটা দুর্ভাগ্য ও হীনতা লাভের কোন কারণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, এটা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।" যার কাছে অফুরন্ত হীরকের টুকরা রয়েছে তার তো দরিদ্র থাকার কথা নয়। তার তো অনাহারে অর্ধাহারে ধুকে ধুকে মরার কথা নয়। যাকে বাদশাহী দেওয়া হলো সে অত্যাচারিত নিপীড়িত হবে কেন। এ ক্ষমতা এ সুযোগ ও সাহস তো কারো থাকার কথা নয়। -সূরা ত্ব-হাঃ ১-২

এর দ্বারা মানুষের ভাগ্য খারাপ হওয়ার এবং সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়ার কোনই আশংকা নেই। কোন জাতির কাছে আল্লাহর কালাম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, পরের অধীন হওয়া, অপমানিত ও পদদলিত হওয়া, গোলামীর নাগপাশে বন্দী হওয়া, তার সমস্ত কর্তৃত্ব অপরের হাতে ন্যস্ত হওয়া এবং পরের দ্বারা জন্তু-জানোয়ারের মতো বিতাড়িত ও নির্যাতিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন দুঃখপূর্ণ অবস্থা সেই জাতির ঠিক তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করতে শুরু করে। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। তাদের প্রতি তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিলঃ

www.pathagar.com

"তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।"

কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার এসব কালামের প্রতি যুলুম করেছিল, আর তার ফলেঃ
"লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল।" -সূরা বাকারাঃ ৬১

অতএব, যে জাতি আল্লাহর কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং পরের অধীন ও পরের তুলনায় শক্তিহীন হয়, নিঃসন্দেহে মনে করবেন যে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করছে। আর তাদের ওপর এই যে দুঃখ-বিপদের তুফান আসছে, তার মূল কারণই হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি যুলুম। অতএব, আল্লাহর এ গযব হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর কিতাব আর আল্লাহ্র রজ্জুকে জোরে শোরে ধরতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না। তারা আল্লাহর কালামের প্রতি যুলুম করা ত্যাগ করবে এবং এর ষোলআনা 'হক' আদায় করতে চেষ্টা করবে। আপনারা যদি এই মহাপাপ হতে ফিরে না থাকেন, আপনাদের এ হীন অবস্থার কিছুতেই পরিবর্তন হবে না।

মুসলমান কাকে বলে এবং মুসলিম শব্দের অর্থ কি, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বপ্রথমেই জেনে নিতে হবে। কারণ মনুষ্যত্ব কাকে বলে এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তা যদি মানুষের জানা না থাকে, তবে সে জানোয়ারের মতো কাজ করতে শুরু করবে- সে তার মনুষ্যত্বের মূল্য বুঝতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ একথা জানতে না পারে যে, মুসলমান হওয়ার অর্থ কি এবং মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়, তবে সে তো অমুসলমানের মতো কাজ-কর্ম করতে শুরু করবে এবং তার মুসলমানীর

www.pathagar.com

কোন সম্মানই সে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে এবং মুসলমানের প্রত্যেকটি সন্তানকেই ভাল করে জেনে নিতে হবে যে, সে যে নিজেকে মুসলমান মনে করে এ মুসলমান হওয়ার অর্থ কি? মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন ও পার্থক্য হয়ে যায়? তার ওপর কি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে? ইসলামের কোন্ সীমার মধ্যে থাকলে মানুষ মুসলমান থাকতে পারে এবং কোন্ সীমা অতিক্রম করলেই সে মুসলমান হতে খারিজ হয়ে যায়? এসব কথা না জানলে মুখ দিয়ে সে মুসলমানীর যতই দাবি করুক না কেন, তার মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

ইসলাম অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা ও হুকুম পালন করে চলা। নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দেয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর সম্মুখে নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার নাম ইসলাম। আল্লাহর বাদশাহী এবং আনুগত্যকে মাথানত করে স্বীকার করে নেয়ার নাম ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কারবারকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়, সেই ব্যক্তি মুসলমান। আর যে ব্যক্তি নিজের সব ব্যাপার নিজের ইচ্ছামত সম্পন্ন করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও হাতে তা সোপর্দ করে সে মুসলমান নয়। আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর মারফত যে হেদায়াত ও সৎপথের বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে পুরোপুরি কবুল করবে এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতে পারবে না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং কাজে শুধু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি, দুনিয়ার প্রথা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকেই- পশ্চাতে ফেলে রেখে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের কাছে পথের সন্ধান জানতে চায়- জিজ্ঞেস করে যে, আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, আর সেখান হতে যে নিয়মই পাওয়া যাক না কেন বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়, তার বিপরীত যা তা সবই সে অস্বীকার করে- শুধু সে ব্যক্তিই মুসলমান। কারণ সে তো নিজেকে আল্লাহর কাছে একেবারে সঁপে দিয়েছে। আর এভাবে আল্লাহর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেই মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর বিপরীত- যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ওপর মোটেই নির্ভর করে না, বরং নিজের মন যা বলে তাই করে, কিংবা বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করে চলে, কিংবা

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

যে বিষয়ে মুসলমানদের খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে

বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আল্লাহ তাআলার কালাম সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান আছে। কুরআনের যে শব্দ আল্লাহর নবীর প্রতি নাযিল হয়েছিল, আজ পর্যন্ত অবিকল তা-ই আছে। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার মুসলমানগণ ভাগ্যবান জাতি, তাতে সন্দেহ নেই। আবার দুনিয়ার এ মুসলমানই একমাত্র হতভাগ্য; যাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামের আসল অবস্থায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এর বরকত ও অফুরন্ত নিয়ামত হতে তারা বঞ্চিত। কুরআন শরীফ তাদের ওপর এ জন্য নাযিল হয়েছিল যে, তারা এটা পড়বে, বুঝবে তদানুযায়ী কাজ করবে। এটা এসেছিল তাদেরকে শক্তি এবং সম্মান দান করার জন্য। এটা তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রকৃত 'খলিফা' বানাতে এসেছিল। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন তারা কুরআনের হেদায়েত অনুযায়ী চলেছে, ততদিন এটা তাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজকাল তারা কুরআন দ্বারা জ্বিন-ভূত তাড়ান ছাড়া আর কোন কাজই করছে না। এর আয়াত লিখে তারা গলায় বাঁধে, তা লিখে ও গুলে পানি খায়, আর শুধু পণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না বুঝে পাঠ করে, তারা আজ এর কাছে হিদায়াত চায় না। তাদের ধর্ম বিশ্বাস কি রকম হবে, তা তারা কুরআনের কাছে জিজ্ঞেস করে না। তাদের কাজ-কর্ম কিরূপ হওয়া উচিত তাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার, তারা এ দুনিয়ায় কিরূপে জীবন-যাপন করবে, লেন-দেন করবে, কোন নিয়ম অনুসারে তারা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করবে, আর তা কিভাবেই বা পালন করবে, দুনিয়ায় কার হুকুম মানবে আর কার হুকুম অমান্য করবে, কার সাথে সম্বন্ধ রাখা উচিত, কার সাথে নয়, তাদের মিত্র কে আর শত্রুই বা কে, কিসে তাদের সম্মান ও সফলতা হবে, কোন কাজে ধন-দৌলত লাভ হবে, তাদের ব্যর্থতা এবং ক্ষতিই বা কিসে হতে পারে- কুরআনের নিকট এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব চাওয়া মুসলমানগণ এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা কাফের, মুশরিক, গোমরাহ ও স্বার্থপর লোকদের কাছে এবং নফসরূপ

www.pathagar.com

শয়তানের কাছে এ সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ চায় আর সাথে সাথে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরামর্শও দেয়। আর এদের পরামর্শ অনুযায়ীই তারা কাজ করে। কাজেই আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের হুকুম অনুসারে কাজ করায় যে পরিণাম হতে পারে, তাই হয়েছে। আর সেই ফলই তারা আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও এক এক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। কুরআন শরীফ সমস্ত মঙ্গলের উৎস, লোকেরা যে রকমের এবং যে পরিমাণের মঙ্গল এর কাছে চাবে, কুরআন তাই এবং ততটুকুই দান করবে। জ্বিন-ভূত তাড়ান, সর্দি-কাশির চিকিৎসা, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকরি লাভ স্বামী স্ত্রীর মনমালিন্য দূর করার স্ত্রীর পেটের পীড়া দূর করার জন্য কুরআনের কাছে সাহায্য চায়। আর এ ধরনের সব ছোট ছোট ও নিকৃষ্ট জিনিস যদি তারা এর কাছে চায়, তবে তাই দান করবে। আর যদি দুনিয়ার বাদশাহী এবং সারেজাহানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেতে চায়, তবে তাও তাদেরকে দেবে। এমন কি, যদি আল্লাহর আরশের কাছে পৌঁছতে চায়, তবে কুরআন তাদেরকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। মূলত তা তার পাত্রের যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে। যেমন চাইবে এবং আন্তরিক চেষ্টা সাধনা করবে তেমন ফলই পাবে। তারা আজ মহাসমুদ্রের কাছ থেকে মাত্র দুফোঁটা পানি চাচ্ছেন এবং নিচ্ছেন, অথচ সমুদ্র তাদেরকে বড় বড় নদী দান করতে পারে। রাজা হতে না চেয়ে এখন মুসলমানরা কোরআনের কাছে প্রজা হওয়ার শিক্ষা পেতে চায় মহান আল্লাহর কাছে অমৃত চায় না নর্দমার উচিছষ্ট চায়।

আমাদের মুসলমান ভাইগণ আল্লাহর পাক কিতাবের সাথে যে ধরনের অসংগত ব্যবহার করে থাকে, তা এতই হাস্যকর ব্যাপার যে, এরা নিজেরা যদি দুনিয়ার কোন কাজে অন্য কোন লোককে সে ধরনের ব্যবহার করতে দেখতো তবে তারা তাকে বিদ্রূপ করতে ত্রুটি করতো না, বরং তারা তাকে পাগল মনে করতো। কোন ব্যক্তি যদি ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধের তালিকা লিখে এনে কাপড়ে জড়িয়ে গলায় বেঁধে রাখে, কিংবা পানিতে ধুয়ে তা পান করে, তবে আপনারা তাকে কি বলবেন? আপনারা কি তার কাজ দেখে হাসবেন না এবং তাকে নিতান্ত আহাম্মক মনে করবেন না? কিন্তু সবচেয়ে বড় ডাক্তার আপনাদের রোগের চিকিৎসা করার জন্য ও আপনাদেরকে নিরাময় করার উদ্দেশ্যে যে অতুলনীয় ওষুধের তালিকা লিখে দিয়েছেন, তার সাথে দিন-রাত আপনাদের চোখের সামনেই এ ধরনের ব্যবহার হচ্ছে। অথচ সেই জন্য কারো এতটুকু

www.pathagar.com

দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সে-ও তাই করে, নিজের কোন ব্যাপারেই সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কাছে জিজ্ঞেস করে না যে, তার কি করা উচিত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান জেনে সে বলে ওঠে যে, আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমি তা মানি না, অথবা বাপ-দাদার কাল হতে তার উল্টা নিয়ম চলে আসছে কাজেই তার অনুসরণ করব না; কিংবা দুনিয়ার নিয়ম অনুসারেই চলবো- তবে সেই ব্যক্তি কিছুতেই মুসলমান নয়। যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে মিথ্যাবাদী সন্দেহ নেই।

আপনি যখন কালেমা তাইয়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়েন এবং মুসলমান হওয়ার কথা স্বীকার করেন, তখন আপনি তার মধ্য দিয়ে একথাও স্বীকার করে থাকেন যে, আপনার আল্লাহর আইন, আপনার জন্য একমাত্র আইন; আল্লাহ তাআলাই আপনার প্রভু ও আদেশ কর্তা। তখন আপনার শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে। আপনার কাছে শুধু সেই বিধানই সত্য বিধানরূপে স্বীকৃতি পাবে যা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে, আপনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর সামনে নিজের আযাদী বিসর্জন দিয়েছেন। যার স্বাধীনতা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় সে মুসলমান নয়।

অতপর আপনার নিজের স্বতন্ত্র মত বলতে কিছুই থাকতে পারে না, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রথা বা পারিবারিক নিয়ম-রীতিরও কোনই গুরুত্ব থাকতে পারে না অথবা অমুক মার্কস এবং অমুক বুশ সাহেব কি বলেছেন, আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মোকাবিলায় এ ধরনের কোন কথাই আপনি এখন পেশ করতে পারেন না। আপনার প্রত্যেকটি বিষয়ই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সামনে পেশ করাই এখন আপনার একমাত্র কাজ। যা তার অনুরূপ হবে না আপনি তা উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করবেন- তা যারই প্রথা হোক না কেন। নিজেকে মুসলমান বলা এবং তারপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে নিজের মত, দুনিয়ার প্রথা কিংবা মানুষের কোন কথা বা কাজের অনুসরণ করা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমন নিজেকে চোখওয়ালা বলতে পারে না, কোন নাকহীন ব্যক্তি যেমন নিজেকে নাকওয়ালা বলতে পারে না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম পবিত্র কুরআন হাদীসের

www.pathagar.com

অনুসারে সমাধা করে না, বরং তা পরিত্যাগ করে নিজের বুদ্ধি বা দুনিয়ার প্রথা অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা বা কাজের অনুসরণ করে চলে- সে কিছুতেই নিজেকে মুসলমান বলতে পারে না। যে আল্লাহ্‌র দেওয়া সীমা রেখার মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ না করে লাগামহীন ঘোড়ার মতো স্বাধীনতা ভোগ করে সে মুসলমান নয়। সে মিথ্যাবাদী।

কেউ যদি নিজে মুসলমান থাকতে না চায়, তবে তার মুসলমান থাকার জন্য তার ওপর কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। যে কোন ধর্ম গ্রহণ করা এবং যে কোন নামধারণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকটি মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু কোন মানুষ যখন নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তখন তার একথা খুব ভাল করেই বুঝে নেয়া উচিত যে, সে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকতে পারে, যতক্ষণ সে ইসলামের সীমার মধ্যে থাকবে। আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের হাদীসকে সত্য ও মঙ্গলের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা এবং এর বিরোধী প্রত্যেকটি জিনিসকে বাতিল ও মিথ্যা মনে করাই হচ্ছে ইসলামের সীমা। এ সীমার মধ্যে যে থাকবে সে মুসলমান; এটা যে লঙ্ঘন করবে সে ইসলাম হতে বিচ্যুত-বহির্ভূত হয়ে পড়বে। তারপরও সে যদি নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং মুসলমান বলে দাবি করে, তবে সে নিজেকেও ধোঁকা দিচ্ছে, আর দুনিয়াকেও ধোঁকা দিচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তার ক্ষেত্রে বলা যায় নকল হতে সাবধান! কারণ উপর আর ভীতর সম্পূর্ণ আলাদা। তাই মুসলমানদেরকে সব সময় এইসব মুসলমানদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

"যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না সে কাফের।"

-সূরা আল মায়েদাঃ ৪৪

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কালেমায়ে তাইয়্যেবায় মুসলিম উম্মাহ্ যে নেয়ামত পাবেন

আপনারা জানেন, মানুষ একটি কালেমা পাঠ করে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। সেই কালেমাটি খুব লম্বা-চওড়া কিছু নয় কয়েকটি শব্দ মাত্র। এই কয়টি শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই মানুষ একেবারে বদলে যায়। একজন কাফের যদি এটা পড়ে, তবে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে পূর্বে সে নাপাক ছিল, এখন সে পাক হয়ে গেল। পূর্বে তার ওপর আল্লাহর গযব আসতে পারতো; কিন্তু এখন সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হয়ে গেল। প্রথমে সে জাহান্নামে যাবার যোগ্য ছিল, এখন জান্নাতের দুয়ার তার জন্য খুলে গেল। শুধু এটুকুই নয়, এই 'কালেমার'র দরুন মানুষে মানুষেও বড় পার্থক্য হয়ে পড়ে। এ 'কালেমা' যারা পড়ে তারা এক উম্মাত আর যারা এটা অস্বীকার করে তারা হয় আলাদা এক জাতি। পিতা যদি 'কালেমা' পড়ে আর পুত্র যদি তা অস্বীকার করে তবে পিতা আর পিতা থাকবে না, পুত্র আর পুত্র বলে গণ্য হবে না, পিতার সম্পত্তি হতে সেই পুত্র কোন অংশই পাবে না, তার নিজের মা ও বোন পর্যন্ত তাকে দেখা দিতে ঘৃণা করবে। পক্ষান্তরে একজন বিধর্মী যদি কালেমা পড়ে আর ঐ ঘরের মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে এবং তার সন্তান ঐ ঘর হতে মীরাস পাবে। কিন্তু নিজ ঔরসজাত সন্তান শুধু এই 'কালেমা'কে অস্বীকার করার কারণেই একেবারে পর হয়ে যাবে। এটা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, এই 'কালেমা' এমন জিনিস যা পর লোককে আপন করে একত্রে মিলিয়ে দেয়। আর আপন লোককে পর করে পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ কালেমা এক মহা বিপ্লবাত্মক শব্দ। যা উচচারণ করলে সবকিছুর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে অমানুষ মানুষ হয়ে যায় আর কালেমার বাইরে থাকলে সে শয়তানের আশ্রয়ে অমঙ্গলের আওতার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। কালেমা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র রহমাতের আশ্রয়ে চলে আসে।

একটু ভেবে দেখুন মানুষ মানুষে এতবড় পার্থক্য হওয়ার প্রকৃত কারণ কি? 'কালেমা'তে কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর কি-ই বা রয়েছে? লাম, মীম, আলিফ,

www.pathagar.com

সীন আর এ রকমের কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর তো কিছুই নয়। এ অক্ষরগুলো যুক্ত করে মুখে উচ্চারণ করলেই কোন্ যাদুর স্পর্শে মানুষ এতখানি বদলে যায়! শুধু এতটুকু কথা দ্বারা কি মানুষের পরস্পরের মধ্যে এত আকাশ-পাতাল পার্থক্য হতে পারে? .... একটু চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন- আপনাদের বিবেক-বুদ্ধি বলে ওঠবে যে, কয়েকটা অক্ষর মিলিয়ে মুখে উচ্চারণ করলেই এতবড় ক্রিয়া কিছুতেই হতে পারে না। মূর্তিপূজক মুশরিকগণ অবশ্য মনে করে যে, একটা মন্ত্র পড়লেই পাহাড় টলে যাবে। যমীন ফেটে যাবে এবং তা হতে পানি উথলে ওঠবে!-মন্ত্রের কোন অর্থ কেউ অবগত হোক বা না-ই হোক, তাতে কোন ক্ষতি-লাভ নেই। কারণ অক্ষরের মধ্যেই যাবতীয় শক্তি নিহিত আছে বলে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। কাজেই তা মুখে উচ্চারিত হলেই সকল রহস্যের দুয়ার খুলে যাবে। কিন্তু ইসলামে এরূপ ধারণার কোনই মূল্য নেই। এখানে আসল জিনিস হচ্ছে অর্থ; শব্দের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া বা তা'ছীর আছে, তা অর্থের দরুনই হয়ে থাকে। শব্দের কোন অর্থ না হলে, তা মনের মূলের সাথে গেঁথে না গেলে এবং তার ফলে মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, চরিত্র ও তার কাজ-কর্মে পরিবর্তন না ঘটলে, শুধু শব্দের উচ্চারণ করলেই কোন লাভ নেই। কালেমার অর্থ বুঝে অন্তরে ধারণ করলে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করলে তখনই এর তাৎপর্য বুঝা সম্ভব হবে। রোগী ওষুধ খায় রোগ সারে না এটা হতে পারে না। সঠিক ওষুধ সেবন করলে অবশ্যই রোগ নিরাময় হতে হবে। ২+২ = ৪ হবে পাঁচ বা ছয় হতে পারে না। এখানে সন্দেহের কোন বিষয় নেই।

একথাটি সহজ উদাহরণ দ্বারা আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। মনে করুন, আপনার ভয়ানক শীত লাগছে। এখন আপনি যদি মুখে 'লেপ-তোষক' 'লেপ-তোষক' করে চিৎকার করতে শুরু করেন, তবে শীত লাগা কিছুমাত্র কমবে না। আপনি 'লেপ-তোষক' বলে হাজার তাসবীহ পড়লেও কোন ফল ফলবে না। আপনি লেপ-তোষক যোগাড় করে যদি গায়ে দিতে পারেন তবে শীত লাগা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ মনে করুন, আপনার তৃষ্ণা লেগেছে। এখন যদি আপনি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'পানি' 'পানি' করে চিৎকার করতে থাকেন, অবে তাতে পিপাসা মিটবে না। কিন্তু এক গ্লাস পানি নিয়ে যদি পান করেন, তবে আপনার কলিজা অবশ্যই ঠাণ্ডা হবে। মনে করুন, আপনার অসুখ হয়েছে; এখন যদি

www.pathagar.com

আপনি 'ওষুধ' 'ওষুধ' করে তাসবীহ্ পাঠ শুরু করেন, আপনার রোগ তাতে দূর হবে না। হ্যাঁ যদি ঠিক ওষুধ খরিদ করে তা সেবন করেন, তবে আপনার রোগ সেরে যাবে। কালেমার অবস্থাও ঠিক এটাই। শুধু ছয়-সাতটি শব্দ মুখে বলে দিলেই এত বড় পার্থক্য হতে পারে না, যে মানুষ কাফের ছিল সে এর দরুন একেবারে আল্লাহ্‌র বান্দাহ বা দাস হয়ে যাবে আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে, জাহান্নামী ব্যক্তি একেবারে জান্নাতী হয়ে যাবে। মানুষে মানুষে এরূপ পার্থক্য হয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় আছে। তা এই যে, প্রথমে এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝে এবং বিশ্বাস করে নিতে হবে, সেই অর্থ বিশ্বাস করতে হবে, তার পরই মানুষের মনের মূলে শিকড় গাড়তে পারে, সেই জন্য চেষ্টা করতে হবে। এভাবে অর্থ জেনে ও বুঝে এবং বিশ্বাস করে যখন এটা মুখে উচ্চারণ করবেন, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এই 'কালেমা' পড়ে আপনারা আল্লাহর সামনে কত বড় কথা স্বীকার করেছেন, আর এর দরুন আপনাদের ওপর কত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। এসব কথা বুঝে শুনে এবং বিশ্বাস করে যখন আপনারা 'কালেমা' পড়বেন, তখন আপনাদের চিন্তা এবং আপনাদের সমস্ত জীবনের ওপর এ 'কালেমা'র পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হবে। এরপর এ 'কালেমা'র বিরোধী কোন কথা আপনাদের মন ও মগজে একটুও স্থান পাবেনা। চিরকালের তরে আপনাদের একথাই মনে করতে হবে যে, এই 'কালেমা'র বিপরীত যা তা মিথ্যা- এ 'কালেমা'ই একমাত্র সত্য। আপনাদের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে এ 'কালেমা'ই হবে একমাত্র হুকুমদাতা। এ 'কালেমা' পড়ার পরে কাফেরদের মতো স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন না। এখন এ 'কালেমা'রই হুকুম পালন করে চলতে হবে, এটা যে কাজ করতে বলবে তাই করতে হবে এবং যে কাজের নিষেধ করবে তা হতে ফিরে থাকতে হবে। এভাবে 'কালেমা' পড়লেই মানুষে মানুষে পূর্বোল্লিখিতরূপে পার্থক্য হতে পারে।

এখন 'কালেমার' অর্থ কি, তা পড়ে মানুষ কি কথা স্বীকার করে, আর তা স্বীকার করলেই মানুষ কোন্ বিধান মত চলতে বাধ্য হয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করবো।

কালেমার অর্থঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তাআলার রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।" কালামের মধ্যে যে 'ইলাহ' শব্দটি রয়েছে,

www.pathagar.com

এর অর্থ হচ্ছে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য বিধান রচনাকারী, মানুষের দোয়া যিনি শোনেন এবং গ্রহণ করেন- তিনিই উপাসনা পাবার একমাত্র উপযুক্ত। এখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি প্রথম স্বীকার করলেনঃ এ দুনিয়া আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি হতে পারেনি, এর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন, আর সেই সৃষ্টিকর্তা বহু নয়- মাত্র একজন। তিনি ছাড়া আর কারোও খোদায়ী বা প্রভুত্ব কোথাও নেই; দ্বিতীয়ত 'কালেমা' পড়ে আপনি স্বীকার করলেন যে, সেই এক আল্লাহ-ই মানুষের ও সারে জাহানের মালিক। আপনি ও আপনার প্রত্যেকটি জিনিস তারই সৃষ্টি এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। সৃষ্টিকর্তা তিনি, রেযেকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুম মত হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই তরফ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়- সকল কিছুর দাতা প্রকৃতপক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। শুধু তাঁকেই ভয় করা উচিত, শুধু তারই কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তারই ইবাদত ও বন্দেগী করা কর্তব্য। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই আইন অনুসারে কাজ করা আমাদের আসল ও একমাত্র কর্তব্য। নামায পড়ব আল্লাহ্-র সাহায্য চাইব বুশের কাছে বিচার চাইব ব্লেয়ারের কাছে তাহলে আমি মুসলমান থাকতে পারি না। আমার কালেমার দাবী হচেছ নামাজ রোজা হজ্জ যাকাতসহ সব ইবাদাত আল্লাহ্র করতে হবে এবং বিচার ফায়ছালার জন্য আল্লাহর কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ পুরাপুরি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নাম মুসলমান।

'কালেমা' পড়ে আপনি আল্লাহর কাছে এই ওয়াদা-ই করে থাকেন, আর সারা দুনিয়া এ মৌলিক অঙ্গীকারের সাক্ষী হয়ে থাকে। এর বিপরীত কাজ করলে আপনার জিহ্বা, আপনার হাত-পা, আপনার প্রতিটি পশম এবং আকাশ ও পৃথিবীর এক একটি অণু-পরমাণু যাদের সামনে আপনি এ ওয়াদা করেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দেবে। আপনি সেখানে একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন। আপনার সাফাই প্রমাণ করার জন্য একটি সাক্ষী কোথাও পাবেন না। কোন উকিল কিংবা ব্যারিস্টার আপনার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সেখানে থাকবে না। বরং স্বয়ং উকিল সাহেব কিংবা ব্যারিস্টার সাহেব দুনিয়ার

www.pathagar.com

আদালতে যারা আইনের মারপ্যাঁচ খেলে থাকে, তারা সকলেই সেখানে আপনারই মত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে। দুনিয়ার আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, জাল দলীল দেখিয়ে এবং উকিলের দ্বারা মিথ্যা ওকালতী করিয়ে আপনারা নিজেদের অপরাধ লুকাতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পুলিশের চোখ হতে তা গোপন করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার পুলিশ ঘুষ খেতে পারে, আল্লাহর পুলিশ কখনও ঘুষ খায় না। দুনিয়ার সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে। আল্লাহর সাক্ষী সকলেই সত্যবাদী- তারা মিথ্যা বলে না। দুনিয়ার বিচারকেরা অবিচার করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অবিচারক নন। তারপর আল্লাহ যে জেলখানায় পাপীদেরকে বন্দী করবেন, সেখান হতে পলায়ন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা বড় আহাম্মকি এবং সবচেয়ে বেওকুফি সন্দেহ নেই। যখন আল্লাহর সামনে ওয়াদা করেন, তখন খুব ভাল করে বুঝে শুনে করুন এবং তা পালন করার চেষ্টা করুন, নতুবা শুধু মুখে ওয়াদা করতে আপনাকে কেউ জবরদস্তি করছে না। কারণ মুখে শুধু স্বীকার করার কোন মূল্যই নেই।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর বলতে হয় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর অর্থ এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যস্থতায়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন-একথা আপনারা স্বীকার করছেন। আল্লাহকে নিজেদের মনিব, মালিক ও বাদশাহ স্বীকার করার পর একথা অবগত হওয়ার একান্ত দরকার ছিল যে, সেই বাদশাহে দো-আলমের আইন ও হুকুম কি? আমরা কোন্ কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? কোন আইন অনুসরণ করলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আর কোন্ আইনের বিরোধিতা করলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন? এসব জানার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর দূত নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতায় তিনি আমাদের প্রতি তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর হুকুম মতো কিরূপে জীবনযাপন করতে হয়, তা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কাজেই আপনারা যখন বলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তখন এর দ্বারা আপনারা একথাই স্বীকার করে থাকেন যে, যে আইন এবং যে নিয়ম হযরত মুহাম্মদ (সা)

www.pathagar.com

বলেছেন, আপনারা তা অনুসরণ করে চলবেন। আর যে আইন এর বিপরীত হবে তাকে পদদলিত করবেন। এ ওয়াদা করার পর যদি আপনারা হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর প্রচারিত আইনকেই ছেড়ে দেন, আর দুনিয়ার আইন অনুসরণ করে চলেন তবে আপনাদের চেয়ে বড় মিথ্যবাদী ও বেঈমান আর কেউ নেই। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত আইনকে একমাত্র সত্য আইন মেনে এবং তার অনুসরণ করে চলার অঙ্গীকার করেই আপনারা ইসলামের সীমার মধ্যে এসেছেন। একথা স্বীকার করেই আপনারা মুসলমানদের ভাই হয়েছেন, এরই দরুন আপনারা মুসলমান পিতার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন। এরই দৌলতে আপনারা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এরই কারণে আপনাদের সন্তান ন্যায়ত সন্তান হতে পেরেছে। এরই দরুন মুসলমানগণ আপনাদেরকে সাহায্য করেছে, আপনাদেরকে যাকাত দিয়েছে, আপনাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছে। এতসব হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করেন, তবে এটা অপেক্ষা বড় বেঈমানী দুনিয়ায় আর কি হতে পারে? আপনারা যদি এর অর্থ জানেন এবং জেনে-বুঝেই এটা স্বীকার করেন, তাহলে সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন মেনে চলা আপনাদের কর্তব্য। আল্লাহর আইন জারি হয়ে না থাকলেও আপনাদের এটা জারি করা উচিত। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, আল্লাহর পুলিশ, সৈন্য আদালত এবং জেলখানা কোথাও মজুদ নেই, কাজেই তাঁর আইন লঙ্ঘন করা সহজ, আর গর্ভমেন্টের পুলিশ, ফৌজ, আদালত এবং জেলখানা চারদিকে বর্তমান আছে, কাজেই তার আইন ভঙ্গ করা বড়ই মুশকিল- তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি পরিষ্কার ভাষায়ই বলে দিতে চাই যে কালেমা সে মিথ্যাই পড়েছে। সে এটা দ্বারা তার আল্লাহকে, সারে জাহানকে, সমস্ত মুসলমানকে এবং স্বয়ং নিজের মনকে ধোঁকা দিচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতোপূর্বে কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ আমি বলেছি। এখন সেই বিষয়ে অন্য আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে বলছি।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের এবং প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক একথা আপনারা স্বীকার করছেন। এর অর্থ এই যে, আপনাদের জান-মাল আপনাদের নিজের দেহ আল্লাহর। আপনাদের হাত, পা, নাক, কান এবং সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ আল্লাহ্

www.pathagar.com

দিয়েছেন আপনাদের দেহের কোন একটা অঙ্গও আপনাদের নিজের নয়। যে জমি আপনারা চাষাবাদ করেন, যেসব পশু দ্বারা আপনারা কাজ করান, যেসব জিনিসপত্র আপনারা সব সময় ব্যবহার করছেন, এদের কোনটাই আপনাদের নিজের নয়। সবকিছুই আল্লাহ তাআলার মালিকানা এবং আল্লাহর দান হিসেবেই এগুলো আপনারা পেয়েছেন। একথা স্বীকার করার পর আপনাদের একথা বলার কি অধিকার থাকতে পারে? যে, জান-প্রাণ আমার, শরীর আমার, মাল আমার, অমুক জিনিস আমার, আর অমুক জিনিসটি আমার। অন্য একজনকে কোন জিনিসের মালিক বলে ঘোষণা করার পর তার জিনিসকে আবার নিজের বলে দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীন নয় কি? যদি বাস্তবিকই আল্লাহকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করেন, তবে তা হতে আপনা আপনি দু'টি জিনিস আপনাদের ওপর এসে পড়ে। প্রথমত এই যে, আল্লাহ-ই যখন মালিক আর তিনি তাঁর মালিকানার জিনিস আমানত স্বরূপ আপনাদেরকে দিয়েছেন, তখন সেই মালিকের হুকুম মতই আপনাদের সেই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাঁর মর্জির উলটা কাজ যদি এর দ্বারা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা আমানতের খেয়ানত করছেন। আপনাদের হাত-পা পর্যন্ত সেই মালিকের মর্জির বিপরীত কাজে ব্যবহার করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদের চোখ দ্বারাও তার নিষিদ্ধ জিনিস দেখতে পারেন না, যা তাঁর মর্জির বিপরীত। আপনাদের এই জমি-জায়গাকে মালিকের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার আপনাদের কোনই অধিকার নেই। আপনাদের যে স্ত্রী এবং সন্তানকে নিজেদের বলে দাবি করেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন বলেই তারা আপনাদের আপন হয়েছে, কাজেই তাদের সাথে আপনাদের ইচ্ছামত নয়-মালিকেরই হুকুম মতো ব্যবহার করা কর্তব্য। তার মতের উলটা যদি ব্যবহার করেন, তবে আপনারা ডাকাত নামে অভিহিত হবার যোগ্য। পরের জিনিস হরণ করলে পরের জায়গা শক্তির বলে দখল করলে আপনারা তাকে বলেন, বেঈমান; সেরূপ আল্লাহর দেয়া জিনিসকে নিজের মনে করে নিজের ইচ্ছা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও মর্জিমত যদি ব্যবহার করেন, তবে সেই বেঈমানীর অপরাধে আপনারাও অপরাধী হবেন। মালিকের মর্জি অনুসারে কাজ করলে যদিও আপনাদের কোন ক্ষতি হয় হোক, জান চলে যায় যাক, হাত-পা ভেঙ্গে যায় যাক, সন্তানের লোকসান হয় হোক, মাল ও জমি-জায়গা বরবাদ হয়ে যায় যাক,

www.pathagar.com

আপনারা সেই জন্য কোন পরোয়া করবেন না। জিনিসের মালিকই যদি এই ক্ষয় বা ক্ষতি পছন্দ করেন, তবে তা করার তাঁর অধিকার আছে। তবে হ্যাঁ, মালিকের মর্জির খেলাফ যদি আপনারা করেন, আর তাতে যদি কোন জিনিসের ক্ষতি হয়ে পড়ে, তবে সে জন্য আপনারাই অপরাধী হবেন, সন্দেহ নেই। কারণ পরের জিনিস আপনারা নষ্ট করেছেন। আপনারা আপনাদের জানকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন না। মালিকের মর্জি অনুসারে জান কুরবান করলে মালিকেরই হক আদায় হবে, তাঁর মতের উলটা কাজে প্রাণ দিলে মস্তবড় বেঈমানী করা হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মালিক যে জিনিসই আপনাকে দান করেছেন, তা যদি সেই মালিকের কাজেই ব্যবহার করেন, তবে তার দ্বারা কারোও প্রতি কোন অনুগ্রহ হতে পারে না- মালিকের প্রতিও নয়। এ পথে যদি আপনারা কিছু দান করলেন, কোন খেদমত করলেন, কিংবা আপনাদের প্রিয়বস্তু- প্রাণকে কুরবান করলেন, তবে তা কারোও প্রতি আপনাদের একবিন্দু অনুগ্রহ নয়। আপনাদের প্রতি মালিকের যে 'হক' ছিল এর দ্বারা শুধু তাই আদায় করলেন মাত্র। এতে গৌরব বা অহংকার করার মতো কিংবা তারিফ বা প্রশংসা পাবার মতো কিছু নেই। মনে রাখবেন, মুসলমান ব্যক্তি যদি মালিকের পথে কিছু খরচ করে কিংবা তার কিছু কাজ করে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করে না, বরং সে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে; গৌরব বা অহংকার ভাল কাজকে বরবাদ করে দেয়। যে ব্যক্তি প্রশংসা পাবার আশা করে এবং শুধু সে উদ্দেশ্যেই ভাল কাজ করে সে তার কাজের প্রতিফল এ দুনিয়াতেই পেতে চায়, আর তাই সে পেয়ে থাকে। পরকালের জন্য তার কোন ফলই অবশিষ্ট থাকবে না। নিখিল দুনিয়ার মালিক আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দেখুন, তিনি তাঁর নিজের জিনিস আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন, আর বলেন যে, এ জিনিস তোমাদের কাছ থেকে আমি ক্রয় করলাম এবং তার মূল্যও তোমাদেরকে দেব। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করেছেন এবং বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" -সূরা আত তাওবাঃ ১১১

www.pathagar.com

আপনাদের সাথে মালিকের এরূপ ব্যবহার! কিন্তু আপনি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছেন, তা একবার বিচার করে দেখুন। মালিক যে বস্তু আপনাদেরকে দিয়েছেন, তারপর সেই মালিক সে জিনিস মূল্য দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, সে জিনিসকে আপনারা অন্যের কাছে বিক্রি করছেন, আর খুবই সামান্য ও নিকৃষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করছেন। যার কাছে বিক্রি করছেন সে মালিকের মর্জির উলটা কাজে আপনাদের সেসব জিনিসকে ব্যবহার করে, আর আপনারা তাদেরকে আপনাদের রেযেকদাতা মনে করেই তাদের কাজ করে থাকেন। মূলত আপনাদের দেহের শক্তিগুলো এমনভাবে বিক্রি করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। আল্লাহদ্রোহী শক্তি যা কিছু কিনতে চায়, আপনারা তাই তাদের কাছে বিক্রি করেন, তা অপেক্ষা বড় দুর্নীতি আর কি হতে পারে? একবার বিক্রি করা জিনিসকে পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রি করা আইনত এবং নীতিগতভাবে অপরাধ। দুনিয়ায় এজন্য আপনার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার মামলা চলতে পারে। আপনারা কি মনে করেন আল্লাহর আদালতে এ বিষয়ে মামলা চলবে না? আল্লাহ্র হক এবং মানুষের হক আপনাকে মানতে হবে। মানুষের হক নষ্ট করে রেহাই পাওয়া যাবে না। তবে আল্লাহর হকের ব্যাপারে তিনি কি করবেন তা তিনিই জানেন। তবে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর শানে সব সময় তার নেয়ামতের শোকর করতে থাকুন সময় পেলেই সেজদায় পড়ে থাকুন। আমৃত্যু সেজদায় পড়ে তার নেয়ামতের শোকর করতে থাকলে শেষ হবে না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ইতোপূর্বে বলেছি; এখানে সেই সম্পর্কেই আর একটু ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। কারণ এ কালেমাই ইসলামের মূল ভিত্তি, এরই সাহায্যে মানুষ ইসলামে দাখিল হয়, আর এ কালেমাকেই ভাল করে না বুঝে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন না করে কোন মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে এ কালেমার পরিচয় এভাবে দিয়েছেনঃ

"কালেমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ যেমন কোন ভাল জাতের গাছ, এর শিকড় মাটির নিচে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে। এর শাখা-প্রশাখাগুলো আকাশের শূন্যলোকে বিস্তৃত- আল্লাহর হুকুমে তা অনবরত ফলের পর ফলদান করছে। আল্লাহ এরূপ দৃষ্টান্ত মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য দিয়েছেন। এর বিপরীত

www.pathagar.com

হচ্ছে কালেমায়ে খাবিসাহ অর্থাৎ খারাপ আকিদা ও মিথ্যা কথা। এর উদাহরণ যেমন বন-জঙ্গলের ছোট ছোট আগাছা-পরগাছা। মাটির একেবারে উপরিভাগে তা জন্মে, সামান্য এক টানেই তা উৎপাটিত হয়ে যায়; কারণ এর শিকড় মাটিতে খুব মজবুত হয়ে গাঁথতে পারে না। আল্লাহ সেই পাকা কথার দরুন মু'মিনদেরকে ইহকালে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন এবং যালেমদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" -(সূরা ইবরাহীমঃ ২৪-২৭)

আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা এমন একটা অতুলনীয় উদাহরণ দিয়েছেন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই এটা হতে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেতে পারেন। দেখুন একটি আম গাছের শিকড় মাটির কত নিচে গেঁথে রয়েছে, ওপরের দিকে কতখানি উচ্চ হয়ে ওঠেছে, তার কত ডালপালা চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে, আর তাতে প্রতিবছর কত ভাল ভাল ফল ফলছে। কিন্তু এটা কেমন করে হলো? এর বীজ খুব শক্তিশালী ছিল বলেই এত বড় একটা গাছ হবার তার পূর্ণ হক ছিল। আর সেই 'হক' এত সত্য ছিল যে, যখন এটা নিজের 'হক'-এর দাবি করলো, তখন মাটি, পানি, বায়ু, দিনের গরম, রাতের ঠান্ডা সব জিনিসই তার দাবি মেনে নিয়েছে। আমের সেই বীচি যার কাছে যা চেয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাকে তা দিয়েছে। এভাবে সে নিজের অধিকারের জোরে এত বড় একটা গাছ হয়ে উঠতে পেরেছে। পরে সে মিষ্টি মিষ্টি ফল দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাস্তবিকই এমন একটা গাছ হওয়ার তার অধিকার ছিল। আকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হয়েও যদি তার সাহায্য করে থাকে, তবে তা কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, বরং এদের এরূপ করাই উচিত ছিল। কারণ জমি, পানি, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যে গাছপালার খোরাক যোগাবার ও এদের বড় করে তোলার শক্তি এজন্য নিহিত আছে যে, তা দ্বারা ভাল জাতের গাছগুলোর অনেক উপকার হবে।

এছাড়া বন-জঙ্গলে ছোট ছোট এমন কত গাছ আছে- যা নিজে নিজেই হয়েছে। এদের মধ্যে কি শক্তি আছে? ছোট একটু শিকড় একটা ছোট ছেলে তা টেনে উপড়ে ফেলতে পারে। কিংবা তা এতই নরম ও দুর্বল যে, একটু দমকা হাওয়া লাগলেই তা নত হয়ে পড়ে। তা কাঁটায় ভরা, স্পর্শ করলেই কাঁটাবিদ্ধ হয়। তা মুখে দিলে মুখ নষ্ট করে দেয়। রোজ রোজ কত জন্ম হয়, কত যে উপড়িয়ে

www.pathagar.com

ফেলা হয়, তার হিসেব আল্লাহই জানেন। এগুলোর এরূপ অবস্থা কেন? কারণ এগুলোর মধ্যে আম গাছের মতো অতখানি জোর নেই। জমিতে যখন ভাল জাতের গাছ হয় না, তখন জমি বেকার পড়ে থেকে একেবারে হতাশ হয়ে যায়। কাজেই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব আগাছা পরগাছাকে তার বুকে স্থান দেয়। পানি কিছু সাহায্য করে, বায়ু তার কিছু শক্তি দান করে; কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই এসব পরগাছার কোন স্বত্ব স্বীকার করতে চায় না। এজন্য জমি তার বুকের মধ্যে এদের শিকড় বিস্তৃত হতে দেয় না, পানি ওর খুব বেশি সাহায্য করে না। আর বায়ুও ওকে প্রাণ খুলে বাতাস দান করে না। এভাবে টানাটানির পর যখন ওটা একটু মাথা জাগায়, তখন তা এত তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে যাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিসমূহ মূলত এ আগাছা জন্মাবার জন্য নয়। আগাছাগুলো প্রকৃতির বুক হতে সামান্য কিছু শক্তি যে পেয়েছে এদের পক্ষে এটাই মস্ত ভাগ্যের কথা।

এ দুটি উদাহরণ সামনে রাখুন, তারপর কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে খাবীসার পার্থক্য সম্পর্কে ভাল করে চিন্তা করুন।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা কী? .... একটা সত্য কথা; এমন সত্য কথা যে, এ দুনিয়ায় তা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর একটিও নেই। এক আল্লাহই সারেজাহানের ইলাহ, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষ, জানোয়ার, গাছ, পাথর, বালুকণা, প্রবহমান ঝর্ণা, উজ্জ্বল সূর্য চারদিকে বিস্তৃত সমস্ত জিনিস- এর কোন্‌টাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন নি? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর দয়া ও মেহেরবানী ছাড়া অন্য কারোও অনুগ্রহে কি এগুলো বেঁচে আছে? এদের মধ্যে কোন একটিকেও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবন বা মৃত্যু দান করতে পারে? এই সারেজাহান যখন আল্লা তাআলারই সৃষ্টি তাঁরই দয়ায় যখন এসবকিছু বর্তমান আছে এবং তিনিই যখন এসবের একমাত্র মালিক ও হুকুমদাতা, তখন যে সময়েই আপনি বলবেন এ পৃথিবীতে সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোও প্রভুত্ব বা খোদায়ী নেই, তৎক্ষণাৎই আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসই বলে ওঠবেঃ তুমি সত্য কথাই বলেছো, আমরা সকলেই তোমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। সেই আল্লাহর সামনে যখন আপনি মাথা নত করবেন, বিশ্বভুবনের

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথে তারই সামনে ঝুঁকে পড়বে। কারণ, ... এই সমস্ত জিনিসও একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে। আপনি যখন তাঁরই হুকুম পালন করে চলবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথী হবে, কারণ এসবই যে একমাত্র তাঁরই অনুগত। আপনি যখন তাঁর পথে চলতে শুরু করবেন, তখন আপনি একাকী হবেন না, এ নিখিল জাহানের অগণিত 'সৈন্য' আপনার সাথে চলতে আরম্ভ করবে। কারণ, আকাশের সূর্য হতে শুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা পর্যন্ত সর্বদা তাঁরই নির্ধারিত পথে চলছে। আপনি যখন সেই এক আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন, তখন সামান্য শক্তির ওপর নির্ভর করা হবে না- আপনার ভরসা করা হবে এমন এক বিরাট শক্তির ওপর, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও ধন-সম্পদের একমাত্র মালিক। এই মহাসৃষ্টির কোন একটি বস্তুও সেই মহান কৌশলী মহাপরাক্রমশালী মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহ্পাকের পরিকল্পনা ও কুদরাত ছাড়া সৃষ্টি হয়নি এবং তার অমোঘ নিয়ম ও বিধান ব্যাতিরেকে চলতে পারছে না। তাঁরই উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনায় মহাবৈজ্ঞানিক কৌশলে সৃষ্টিসমূহ তাঁরই প্রদত্ত বিধান ও নিয়মের আওতায় পরিচালিত এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি সৃষ্টির দিকে গভীর মননিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে আপনার মস্তক অবনত হয়ে আসবে যা (পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) দেখে আপনি সেজদায় পড়ে বিনয়ের সাথে তাঁর প্রসংশা করতে বাধ্য হবেন, সেজদায় পড়ে মাথা তুলতে আর ইচ্ছা করবে না। আপনা থেকেই আপনার অন্তর বলে উঠবে, হে মহান আল্লাহ! আপনি বিনা কারণে এই মহাবিশ্বের একটি বস্তুও সৃষ্টি করেননি। আমাদের মত গুনাগার মানুষের কল্যাণের জন্যই এত আয়োজন, এত সৃষ্টি, আমরা আপনার কাছে বিনয়াবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ্, আপনি সত্যিই মহান। একথা আপনার অন্তর থেকে আপনা আপনিই আসবে আপনার মনের অজান্তেই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে – আল্লাহু আকবার। মোটকথা, এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদি অপনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলেন, তবে আপনি ভাল করেই জানতে পারবেন যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করে নেবে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিই তার সাহায্যের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবন হতে পরকাল পর্যন্ত সে কেবল উন্নতিই করতে থাকবে। তার কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হবে না, কোন উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থাকতে

www.pathagar.com

পারবে না। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা একথাই বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ 'এই কালেমা এমন একটা গাছ, যার শিকড় গভীর মাটির তলে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে এবং শাখা প্রশাখা আকাশের মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে আছে। আর সবসময়ই তারা আল্লাহর হুকুমে ফলদান করে থাকে।'

'কালেমায়ে খাবীসাহ' এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ উপস্থিত করে। কালেমায়ে খাবীসাহ অর্থঃ এ দুনিয়ার ইলাহ বা সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই, কিংবা এ দুনিয়ায় একাধিক ইলাহা রয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তা অপেক্ষা বড় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা আর কিছুই হতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই বলে ওঠে, তুমি মিথ্যাবাদী, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন। আমাদেরকে আর তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্ই তো সৃষ্টি করেছেন। আর সে আল্লাহ্ই তোমাকে ঐ জিহ্বা দিয়েছেন যার দ্বারা তুমি এতবড় একটা মিথ্যা কথা বলছ। মুশরিক বলে যে, আল্লাহ্ এক নয়, তাঁর সাথে আরও অনেক দেবদেবী রয়েছে। তারাও রেযেক দেয়, তারাও তোমাদের মালিক, তারাও তোমাদের ভাগ্য গড়তে ও ভাঙ্গতে পারে। উপকার করা কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদেরও আছে। তোমাদের দোয়া তারাও শুনতে পারে। তারাও তোমাদের মকসুদ পূর্ণ করতে পারে, তাদেরকে ভয় করে চলা উচিত। তাদের ওপর ভরসা করা যেতে পারে। দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদেরও হুকুম চলে। আল্লাহ ছাড়া তাদেরও হুকুম পালন করে চলা কর্তব্য। এসবই কালেমায়ে খাবীসাহ। এসব কথার উত্তরে আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস বলে ওঠেঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী, তোমাদের প্রত্যেকটা কথাই সত্যের বিলকুল খেলাফ।' এখন ভেবে দেখুন, এ কালেমা যে ব্যক্তি কবুল করবে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে কেমন করে উন্নতি লাভ করতে পারে? আল্লাহ অনুগ্রহ করে এসব লোককে অবসর ও অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এবং রেযেক দেবারও ওয়াদা করেছেন। কাজেই আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিগুলো কিছু না কিছু পরিমাণে তাদেরকে প্রতিপালন করবে- যেমন বন-জঙ্গল আগাছা-পরগাছাগুলোকে করছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন একটা জিনিসও আগ্রহ করে তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের সহায়তা করবে না। তারা ঠিক জঙ্গলের আগাছার মতই কিছুদিন মাত্র বেঁচে থাকতে পারবে- তার বেশি নয়। সৃষ্টিকর্তা যে আছেন, তার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আছে তিনি

www.pathagar.com

যেসব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সৃষ্টির মহা কৌশলই তার সাক্ষ্য দেয় এসব বিষয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কাজেই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের কাছে কালেমায়ে তাইয়্যেবার মাধ্যমে আত্মসমর্পনের পর অন্যকোন চিন্তা কল্পনার দোলাচলে দোল খাওয়ার আর অবকাশ থাকেনা। যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষই কালেমায় খাবিছাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না।

উক্তরূপ পার্থক্য এ কালেমাদ্বয়ের পরিণাম ফলের ব্যাপারেও বর্তমান রয়েছে। 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' যখন ফল দান করবে, তখন তা ঠিকই মিষ্ট ও সুস্বাদুই হবে। দুনিয়ার বুকে তা দ্বারা শান্তি স্থাপিত হবে। চারদিকে সত্য ও পূর্ণ সুবিচার কায়েম হবে। নিখিল দুনিয়ার মানুষ তা দ্বারা অসাধারণ উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ যতই বৃদ্ধি পাবে, কেবল কাঁটায় ভরা ডাল-পালাই তা হতে বের হবে। নিজেদের চোখ দিয়েই আপনারা তা দেখে নিতে পারেন। দুনিয়ার যেখানেই কুফরি, শিরক এবং নাস্তিকতার জোর বেশি, সেখানে কী হচ্ছে? সেখানে মানুষ মানুষের রক্ত পান করছে। দেশের পর দেশ গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার আয়োজন খুব জোরের সাথেই চলছে। বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হচ্ছে। এক জাতি অন্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। শক্তিমান দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছে- তার ভাগের রুটি কেড়ে নেবার জন্য শুধু দুর্বল মানুষকে সেখানে সৈন্য, পুলিশ, জেল ও ফাঁসির ভয় দেখিয়ে অবদমিত করে রাখার এবং শক্তিশালী জাতির যুলুম নীরবে সহ্য করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। বিনা অপরাধে শুধুমাত্র অজুহাত খাড়া করে তারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে নিরিহ মানুষ পাখীর মত গুলি করে হত্যা করছে। গ্রাম শহর নগর পাহাড় পর্বত নদী নালা গাছপালা কার্পেট বোম্বিং করে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচেছ। মানবতা ডুকরে কেঁদে ফিরছে চারদিকে। কোথাও একটু মানবতার ঠাই হচেছ না। এছাড়া এসব জাতির ভেতরের অবস্থা আরও ভয়ানক খারাপ। তাদের নৈতিক চরিত্র এতই কদর্য যে, স্বয়ং শয়তানও তা দেখে লজ্জা পায়। মানুষ সেখানে জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও হীনতর কাজ করছে। মায়েরা সেখানে নিজেদের হাতেই নিজেদের সন্তানকে হত্যা করছে- যেন এ সন্তান তাদের সুখ-সম্ভোগের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। স্বামীরা সেখানে নিজেদের স্ত্রীদেরকে অন্যের কোলে ঠেলে দিচ্ছে শুধু পরের স্ত্রীকে নিজের বুকে

www.pathagar.com

পাবার উদ্দেশ্যে। উলঙ্গদের ক্লাব ঘর তৈরি করা হয়েছে, সেখানে নারী-পুরুষ পশুর মতো উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করছে। মনে হয়, কেবল তাদেরই খেদমত করার জন্য দুনিয়ায় এদের জন্ম হয়েছে। মোটকথা, এই 'কালেমায়ে খাবীসা'র দরুন সেখানে কাঁটায় চারদিকে ভরে গেছে; আর যে ফলই তাতে ফলছে তা হয়েছে ভয়ানক তিক্ত ও বিষাক্ত। সেখানে নিয়মই অনিয়ম আর অনিয়মই নিয়ম। আইন সেখানে বেআইন, আর বেআইনই আইন। মানবতা ডুকরে কাঁদছে, শক্তিমানের পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। অথচ সেই ভুলুণ্ঠিত মানবতার হাত অসহ নারীর মত হাত ধরে তুলে সান্ত্বনা দেবার মত।

আল্লাহ তাআলা এ দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করার পর বলেছেন, 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'র প্রতি যারা ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মজবুত বাণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন- তারা অটল ও অক্ষয় হবে। আর তার মোকাবিলায় 'কালেমায়ে খাবীসা'কে যারা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল আয়োজন ও চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেবেন। তারা কখনই কোন সহজ কাজ করতে পারবে না। তা দ্বারা দুনিয়া কিংবা আখেরাতে তাদের কিছুমাত্র কল্যাণও সাধিত হতে পারবে না।

'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' ও 'কালেমায়ে খাবীসা'র পার্থক্য ও উভয়ের ফলাফল আপনারা শুনলেন। এখন আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, আমরাও 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'কে মানি; কিন্তু তবু কোন্ কারণে আমাদের উন্নতি হয় না? আর যে কাফেররা কালেমায়ে খাবীসাকে বিশ্বাস করে তারাই বা কোন্ কারণে এত শক্তিমান ও উন্নত হচ্ছে?

আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনেছেন বলে দাবি করেন এবং তবুও আপনাদের উন্নতি হচ্ছে না, প্রথমত একথাটাই মিথ্যা। কারণ কেবল মুখে মুখে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়লেই কোন কাজ হয় না, তা মন দিয়ে পড়তে হবে। মন দিয়ে পড়ার অর্থ বিশ্বাস করা এবং পূর্বের বিশ্বাস এবং কাজ কর্মের পরিবর্তন হওয়া দরকার। এর বিরোধী কোন মতবাদ যেন কালেমা বিশ্বাসী ব্যক্তির মনে স্থান না পায় এবং কালেমার নির্দেশের বিপরীত কোন কাজও যেন সে কখনও না করে। কিন্তু বলুন, আপনাদের প্রকৃত অবস্থা কি এরূপ? আপনাদের মধ্যে কি কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত হাজারও কুফরি ও

www.pathagar.com

মুশরিকী ধারণা এবং কর্মকান্ড বর্তমান নেই? মুসলমানের মাথা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও সামনে নত হয় না? মুসলমান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য লোককে কি ভয় করে না? অন্যের সাহায্যের ওপর কি ভরসা করে না? দাতা সংস্থার সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকা যাবে এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ দাতা সংস্থার মোকাবেলায় বাচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন সে ক্ষমতা আল্লাহ্র আছে? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী বুশ-ব্লেয়ারের সাহায্য ছাড়া এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায়? আপনারা কি আল্লাহ্র পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদীদেরকেই প্রকৃত খোদার আসনে বসান নি? আল্লাহ্র আইনকে ছেড়ে দিয়ে আপনারা খুশী হয়েই কি অন্যের আইন অনুসরণ করে চলে না? মুসলমান হবার দাবিদার লোকেরা আদালতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলে না যে, আমরা শরীয়াতের বিচার চাই না? আমরা দেশের প্রচলিত প্রথামত বিচার চাই? আপনাদের মধ্যে এমন কোন লোক কি নেই, যারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করতে একটুও পরোয়া করে না? আপনাদের মধ্যে এমন লোক কি নেই, যারা কাফেরদের ক্রোধের ভয়ে ভীত; কিন্তু আল্লাহর গজবকে মোটেই ভয় করে না? এমন লোক কি আপনাদের মধ্যে নেই, যারা কাফেরদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করার জন্য সবকিছুই করতে প্রস্তুত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করার জন্য কিছুই করতে রাজী নয়? এমন লোকও কি নেই, যারা কাফেরদের রাজত্বকে 'রাজত্ব' বলে মনে করে, কিন্তু আল্লাহর রাজত্ব যে কোথাও বর্তমান আছে, সেই কথা তাদের একেবারেই মনে পড়ে না? সত্য করে বলুন, এসব কথা কি সত্য নয়? যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে স্বীকার করেন এবং তা সত্ত্বেও আপনাদের উন্নতি হয় না একথা কোন মুখে বলতে পারেন? প্রথমে খাঁটি মনে ঈমান আনুন এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা অনুসারে জীবনকে গঠন করুন। তারপর যদি গভীর মাটির তলে মজবুত শিকড় ও শূন্য আকাশে বিস্তৃত শাখার সেই মহান গাছের জন্ম না হয়, তখন বলতে পারবেন যে, আল্লাহ মিথ্যা ওয়াদা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। পরন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ বিশ্বাসী লোক দুনিয়ায় উন্নতি লাভ করছে বলে মনে করাও সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ কালেমায়ে খাবীসাকে যারা মানবে তারা উন্নতি লাভ করতে পারে না; অতীতে কখনও পারেনি এখনও পারছেনা ভবিষ্যতেও আর এখনও পারবে না। তাদের ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি ও স্ফূর্তির জীবন,

www.pathagar.com

বিলাসিতা ও আনন্দের সাজ-সরঞ্জাম এবং বাহ্যিক শান-শওকত দেখে আপনারা হয়ত মনে করছেন যে, তারা খুবই উন্নতি করছে। কিন্তু আপনারা তারের মনের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাদের মধ্যে কতজন লোক বাস্তবিকই শান্তিতে আছে? বিলাসিতা ও সুখের সরঞ্জাম তাদের প্রচুর আছে; কিন্তু মনের মধ্যে আগুনের উলকাপিণ্ড সব সময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এজন্যই তারা এক আল্লাহকে পেতে পারে না। আল্লাহর আইন অমান্য করার কারণে তাদের প্রত্যেকটি পরিবার জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। খবরের কাগজ খুলে দেখুন, ইউরোপ ও আমেরিকায় আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। কত অসংখ্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক দিন-রাত সংঘটিত হচ্ছে। সেই দেশের সন্তান কিভাবে নষ্ট করা হচ্ছে এবং ওষুধ ব্যবহার করে জন্মের হার কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। নানা প্রকার দূষিত রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কিভাবে টানাটানি ও কাড়াকাড়ি চলছে। হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতা মানুষের মধ্যে কিভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। বিলাসিতার লোভ মানুষের জীবনকে কতখানি তিক্ত করে দিয়েছে। দুনিয়ার এসব বড় বড় চাকচিক্যময় শহরে দূর হতে দেখে যাকে আপনারা স্বর্গের সদস্যের সমান মনে করেন- লক্ষ লক্ষ লোক কি দুঃখের জীবন যাপন করছে, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। .... এটাকে কি কখনও উন্নতি বলে মনে করা যায়? এ 'স্বর্গ' পাবার জন্যই কি আপনারা লালায়িত? কোন মুসলমান কি ঐ জীবন পাওয়ার জন্য লালায়িত হতে পারে? অবশ্যই পারেনা।

মনে রাখবেন, আল্লাহর বাণী কখনও মিথ্যে হতে পারে না। বাস্তবিকই কালেমায়ে তাইয়্যেবা ছাড়া আর কোন 'কালেমা' এমন নেই, যা অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়ায় সুখ এবং পরকালে মহাশান্তি লাভ করতে পারে। যে দিকে ইচ্ছে আপনারা চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, এ সত্যের বিপরীত আপনারা কোথাও দেখতে পাবেন না।

পূর্বেই কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিশদ অর্থ আপনাদের সামনে ব্যক্ত করেছি; এখানে আমি কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

আপনারা সকলে জানেন যে, মানুষ দুনিয়ায় যে কাজই করুক না কেন, তার মূলে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে এবং কিছু না কিছু উপকার পাবার জন্যই মানুষ সে কাজ করে থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কারণে এবং বিনা উপকারিতায় কোন কাজ কেউই করে না। আপনারা পানি পান করেন কেন? পান করেন এ জন্য যে, তাতে আপনাদের পিপাসা নিবারণ হয়। কিন্তু পানি পান করার পরও যদি আপনাদের পিপাসা না মিটত তবে আপনারা কিছুতেই পানি পান করতেন না। কারণ, এ পানি পান করায় কোন ফল নেই। আপনারা খাদ্যদ্রব্য কেন আহার করেন? এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে আপনাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে এবং আপনাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আহার ও অনাহার উভয়েরই ফল যদি একরূপ হয়, তবে খাদ্য ভক্ষণের কাজটাকে আপনারা একটা বাজে কাজ বলে মনে করতেন। কখনও খাদ্য খেতেন না। রোগ হলে আপনারা ওষুধ সেবন করেন এ জন্য যে, তাতে রোগ দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হবেন; কিন্তু ওষুধ সেবন করার পরও যদি রোগ দূর না হয়, বরং পূর্বের মতই অবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ওষুধ সেবন করা সম্পূর্ণ নিস্ফল। কাজেই এ ঔষধ সেবন করা যাবেনা। কৃষি কাজে আপনারা এত পরিশ্রম করেন কেন? করেন এজন্য যে, আপনারা এর দ্বারা শস্য, ফল ও নানারকমের তরিতরকারী পেতে পারবেন। কিন্তু বীজ বপন করার পরও যদি জমিতে কোন শস্য না হয় তবে আপনারা হাল-চাষ, বীজ বোনা এবং তাতে পানি দেয়ার জন্য এতদূর কষ্ট কিছুতেই স্বীকার করতেন না। মোটকথা দুনিয়ায় আপনারা যে কাজই করেন না কেন, তাতে উদ্দেশ্য সফল হলে কাজ ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করা হয়। আর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে আপনারা বলেন যে, কাজ ঠিকমত করা হয়নি। সেই জন্য সে কাজ পুনঃ আর কেউ করতেন না।

এ নিগূঢ় কথাটি মনে রাখুন তারপর আপনারা আমার এক একটা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকুন। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কালেমা পড়া হয় কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আপনি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে, কাফেরের দুটি চোখ, কাজেই মুসলমান কালেমা পড়লে তার চারটি চোখ হবে? অথবা কাফেরের মাথা একটি কাজেই মুসলমানের মাথা দুটি হবে?

www.pathagar.com

.... আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, না এখানে দৈহিক পার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে না। পার্থক্য হওয়ার আসল অর্থ এই যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণাম পার্থক্য হবে। কাফেরের পরিণাম এই যে, পরকালে সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। আর মুসলমানের পরিণাম এই যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে এবং পরকালে সে সফল হবে- মহাসুখে কালযাপন করবে।

আপনাদের এ জবাব শুনে আমি বলবো যে, আপনারা ঠিক জবাবই দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে বলুনঃ পরকাল কাকে বলে? পরকাল বিফল ও সার্থক হওয়ার অর্থ কি? আর সেখানে সফলতা ও কামিয়াবী লাভের তাৎপর্যইবা কি? একথাগুলো ভাল করে বুঝে নিতে না পারলে পরবর্তী আলোচনা শুরু করা যায় না।

এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে না। পূর্বেই এর জবাব দেয়া হয়েছে? বলা হয়েছেঃ "ইহকাল পরকালের কৃষি ক্ষেত।"

দুনিয়া ও আখেরাত দুটি ভিন্ন জিনিস নয়। উভয়ই মানুষের একই পথের দুটি মনজিল। দুনিয়া এ পথের প্রথম মনজিল, আর আখেরাত সর্বশেষ মনজিল। জমি চাষ করা এবং তা হতে ফসল পাওয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক এ দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে ঠিক সেই সম্পর্কই বিদ্যমান। আপনারা জমিতে হাল-চাষ করেন, তার পরে বীজ বপন করেন, দরকার হলে তাতে পানি দেন, তার পরে আপনারা ফসল পেতে পারেন। সেই ফসল ঘরে এনে তা আপনারা সারা বছর নিশ্চিত হয়ে খেতে থাকেন। আপনি জমিতে যে জিনিসেরই চাষ করবেন, ফলও তারই পাবেন। ধান বপন করলে ধান পাবেন, পাট বপন করলে পাট পাবেন, গম বপন করলে গমেরই ফসল পাবেন, কাটার গাছ যদি বপন করেন, তবে কাঁটার গাছই আপনার ক্ষেতে জন্মাবে। আর যদি কিছুই বপন না করেন, তবে আপনার ক্ষেতে কিছুই জন্মাবে না। তারপর হাল-চাষ করতে, বীজ বপন করতে, তাতে দরকার মত পানি দিতে এবং ক্ষেতের দেখাশুনা করতে যে ভুল-ত্রুটি আপনার দ্বারা হয় তার মন্দ ফল ফসল কাটার সময়ই জানতে পারেন। আর এসব কাজ যদি আপনি খুব ভালভাবে করে থাকেন, তবে ফসল কাঁটার সময়ই আপনি এর বাস্তব ফল দেখতে পাবেন। দুনিয়া ও আখেরাতের অবস্থাও ঠিক

www.pathagar.com

এরূপ। দুনিয়াকে মনে করেন একটা ক্ষেত। এখানে নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা নিজের জন্য ফসল উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষকে পাঠান হয়েছে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এ কাজের জন্য সময় দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মানুষ যে ফসলেরই চাষ করে, সেই ফসলই সে মৃত্যুর পর পরকালের জীবনে পেতে পারবে, আর যে ফসলই সেখানে পাবে তার পরকালীন জীবন একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করবে। যদি কেউ দুনিয়ায় জীবন ভরে ভাল ফসলের চাষ করে, তাতে দরকার মত পানি দেয় এবং তার দেখাশুনাও যদি খুব ভালভাবে করে, তবে পরকালের জীবনে সে যখনই পা রাখবে, তখনই তার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একটি ফলেফুলে ভরা শ্যামল বাগিচা দেখতে পাবে। তাকে এ পরকালের জীবনে আর কোন পরিশ্রম করতে হবে না, বরং দুনিয়ার জীবন ভরে শ্রম করে যে বাগান সে তৈরি করেছে, সেই বাগানের অফুরন্ত ফলেই তার জীবন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হবে। এ জিনিসেরই নাম হচ্ছে জান্নাত। এটা লাভ করতে পারলেই বুঝতে হবে যে, পরকালে সে সফল ও কামিয়াব হয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবন কেবল কাঁটা, তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের বীজ বপন করে, পরকালের জীবনে শুধু তারই ফসল পাবে। সেখানে খারাপ ফসল নষ্ট করে দিয়ে ভাল ফসল তৈরি করার এবং নিজের এ নির্বুদ্ধিতার পরিবর্তে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করার কোন সুযোগ বা সময় সে আর পাবে না। সেই খারাপ ফসলের দ্বারাই পরকালের সমস্ত জীবন কাটাতে হবে, কারণ দুনিয়ায় সে শুধু এরই চাষ করেছে। যে কাঁটা সে রোপণ করেছিল, পরকালে তাকে সেই কাঁটার শয্যায়ই শায়িত করা হবে। আর যে তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের চাষ করেছিল, সেখানে তাকে তাই ভোগ করতে হবে। পরকালে ব্যর্থ ও বিফল হওয়ার অর্থ এটাই।

আখেরাতের ব্যাখ্যা এইমাত্র আমি করলাম, কুরআন ও হাদীস হতেও এটাই প্রমাণিত হয়। এ ব্যাখ্যা হতে নিসন্দেহে জানা গেল যে, পরকালের জীবন মানুষের বিফল কিংবা সফল হওয়া এবং তার পরিণাম ভাল কিংবা মন্দ হওয়া প্রকৃতপক্ষে তার এ দুনিয়ার জীবনের ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কাজের ভাল কিংবা মন্দ হওয়ারই একমাত্র ফল এতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

একথাটি বুঝে নেয়ার সাথে সাথে একথাটিও অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, মুসলমান ও কাফেরের পরিণাম ফলের পার্থক্য বিনা কারণে হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরিণামের পার্থক্য প্রথম সূচনার পার্থক্যের ফলমাত্র। দুনিয়ায় যদি মুসলমান এবং কাফেরের জ্ঞান বিশ্বাসে ও কাজের মধ্যে পার্থক্য না হয়, তবে পরকালেও তাদের পরিণামের দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য হতে পারে না। দুনিয়ায় এক ব্যক্তির জ্ঞান বিশ্বাস ও কাজ ঠিক যে রকম হবে পরকালে তার ফলও সেরকম হবে। মুসলমান নামের ব্যক্তির জ্ঞান বিশ্বাস এবং কর্ম যদি কাফেরের মত হয় তাহলে পরকালের ফলাফল কাফেরের মতই হবে। মুসলমান নামের গুণে মুক্তি পাওয়ার কোনই সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকবে না।

এখন আবার সেই গোড়ার প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য কি? প্রথমে আপনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণামে পার্থক্য হওয়াই কালেমা পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপরে আপনি পরিণাম ও পরকালের যে ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন, সেই অনুসারে আপনার প্রদত্ত জবাব সম্পর্কে আপনাকে আবার একটু ভেবে দেখতে হবে এবং আপনাকে এখন একথাই বলতে হবে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষের ইলম বা জ্ঞান বিশ্বাস ও কাজকে ঠিক এমনভাবে করা- যেন পরকালে তার পরিণাম ভাল হয়। পরকাল মানুষকে এ দুনিয়ায় সেই ফলের বাগান তৈরির কাজ শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি এ কালেমাকেই স্বীকার না করে তবে সেই বাগান লাগাবার নিয়ম সে মোটেই জানতে পারবে না। তাহলে সে বাগানই বা তৈরি করবে কি করে, আর পরকালে সে কিসের ফল ভোগ করবে? মানুষ যদি কেবল মুখে মুখে এ কালেমা পড়ে কিন্তু তার জ্ঞান যদি কালেমা না পড়া ব্যক্তির মতো হয় এবং তার কাজ-কর্ম যদি একজন কাফেরের মতো হয়, তাহলে তার বিবেক বলে ওঠবে যে, এভাবে কালেমা পড়ায় কোনই লাভ নেই। এমন ব্যক্তির পরিণাম একজন কাফেরের পরিণামের চেয়ে ভাল হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধু মুখ দিয়ে কালেমা পড়ে আল্লাহর ওপর সে কোন অনুগ্রহ করেনি। কাজেই বাগান বানাবার নিয়ম না শিখে, বাগান তৈরি না করে এবং সারা জীবন কেবল কাঁটার চাষ করে কোন মানুষই পরকালের সবুজ-শ্যামল ও ফুলে-ফলে ভরা বাগান লাভ করতে পারে না। সেরূপ ধারণা করাও আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করেছি, যে কাজ করা এবং না করা

www.pathagar.com

উভয়েরই ফল এক রকম, সেই কাজের কোন দাম নেই, তা একেবারেই অর্থহীন তা না করাই ভাল। যে ওষুধ সেবন করার পরও রুগীর অবস্থা ঠিক সেই রকম থাকে যেমন ছিল ওষুধ পান করার পূর্বে, তা আসলে ওষুধ নয়। ঠিক এ রকমই কালেমা পড়া মানুষের জ্ঞান এবং কাজ যদি ঠিক কালেমা না পড়া লোকদের মতই থাকে তবে এমন কালেমা পড়া একেবারেই অর্থহীন। দুনিয়ায়ই যখন কাফের ও মুসলমানের বাস্তব জীবনধারায় কোনরূপ পার্থক্য হলো না তখন পরকালে তাদের পরিণাম ফল ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন?

এখন কালেমায়ে তাইয়্যেবা মানুষকে কোন্ ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং সেই জ্ঞান শেখার পর মুসলমান ও কাফেরের দৈনন্দিন কাজে কোন্ ধরনের পার্থক্য সূচীত হওয়ার কথা তারই আলোচনা করবো। এ আলোচনা ব্যতিরেকে কালেমা পড়া না পড়ার পার্থক্য তা বুঝা বেশ কঠিন বলেই মনে হবে। তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই সেই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আসুন সেই আলোচনায় আসা যাক।

দেখুন, এ কালেমা হতে আপনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, আপনি আল্লাহর বান্দা, আর কারো বান্দা আপনি নন। একথা যখন আপনি জানতে পারলেন তখন আপনা আপনি একথাও আপনার জানা হয়ে গেল যে, আপনি যার বান্দা দুনিয়ায় তাঁরই মর্জিমতো আপনাকে কাজ করতে হবে। কারণ তাঁর মর্জির খেলাফ যদি আপনি চলেন বা কাজ করেন, তবে আপনার মালিকের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্রোহ করা হবে।

অতএব, এ কালেমা আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। একথা জেনে নেয়ার সাথে সাথে একথাও আপনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহর রাসূল দুনিয়ার ক্ষেতে কাঁটা ও বিষাক্ত ফলের চাষ করার পরিবর্তে ফুল এবং মিষ্ট ফলের বাগান রচনা করার যে নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকেও ঠিক সেই নিয়মেই কাজ করতে হবে। আপনি যদি সেই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহলেই পরকালে আপনি ভাল ফসল পেতে পারবেন। আর যদি তার বিপরীত পন্থায় কাজ করেন, তবে দুনিয়ায় আপনার কাঁটার চাষ করা হবে এবং পরকালে ঠিক কাঁটাই আপনি ফসলরূপে পাবেন, অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.com

এ জ্ঞান লাভের পর আপনার দৈনন্দিন জীবনধারাকেও সেই অনুসারে গঠন করতে হবে। আপনি যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আপনাকে একদিন মরতে হবে, মরার পরে এক ভিন্ন রকমের জীবন যাপন করতে হবে এবং সেই জীবনেও আপনাকে এ দুনিয়ায় অর্জিত ফসলের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে, তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থাপিত নিয়ম ও বিধান অনুসরণ না করে অন্য কোন পন্থা অনুযায়ী চলা আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়ায় আপনি চাষাবাদ করেন কেন? করেন এ জন্য যে, চাষ না করলে ফসল পাওয়া যাবে না। আর ফসল না হলে না খেয়ে মরতে হবে- একথার প্রতি আপনার খুবই বিশ্বাস আছে। আপনি যদি একথা বিশ্বাস না করতেন এবং যদি মনে করতেন যে, চাষ না করলেও ফসল ফলবে কিংবা ফসল ছাড়াও আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন, তাহলে আপনি চাষাবাদের জন্য এত পরিশ্রম কিছুতেই করতেন না। এখন আপনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের প্রভু ও মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহর রাসূল মুখে মুখে স্বীকার করে এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস আছে বলে দাবি করে কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কর্ম আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)- এর হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চলে, তার সম্বন্ধে জেনে রাখুন যে, তার ঈমান প্রকৃতপক্ষে অতিশয় দুর্বল। সে নিজের ক্ষেতের কাজ না করার মন্দ পরিণাম যেরূপ নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস করে, যদি ততটুকু নিশ্চয়তার সাথে আখেরাতের জন্য ফসল তৈরি না করার দুঃখময় পরিণাম বিশ্বাস করতো, তবে কখনই সে পরকালের কাজে এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারতো না। কেউ জেনে শুনে নিজের ভবিষ্যতের জন্য কাঁটা বীজের চাষ করে না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যে, কাঁটা রোপণ করলে তা হতে কাঁটাই জন্মাবে, আর সেই কাঁটাই তাকে কষ্ট দেবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই কাঁটা চাষ করতে পারে অন্য কেউ নয়। আপনি জেনে শুনে আপনার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার কখনই নিতে পারেন না। কারণ আপনি নিশ্চিত জানেন যে, এতে হাত পুড়ে যাবে। কিন্তু একটি অবুঝ শিশু আগুনে হাত দেয়, কেননা তার পরিণাম যে কত কষ্টদায়ক তা সে আদৌ জানে না।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

এখানে আমি মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমূহ উল্লেখ করবো। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্য কমপক্ষে শর্ত কি আর মানুষের মধ্যে কমপক্ষে কি কি গুণ বর্তমান থাকলে তাকে মুসলমান বলা যেতে পারে, এখানে আমি সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

একথাটি ভাল করে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে কুফর ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক এবং সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে মোটামুটি আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহর হুকুম পালন করতে অস্বীকার করাকেই 'কুফর' বা কাফেরী বলা হয়; আর কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করে চলা এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্র কুরআনের বিপরীত যে নিয়ম, যে আইন এবং যে আদেশই হোক না কেন তা মান্য না করাকেই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম এবং 'কুফরে'র এ পার্থক্য কুরআন মাজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ
"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"

আদালত ও ফৌজদারীতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কেবল সেই সবের বিচার-ফায়সালা কুরআন-হাদীস অনুসারে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সময় যে ফায়সালা করে সেই ফায়সালার কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আপনাদের সামনে এ প্রশ্ন ওঠে যে, এ কাজ করা উচিত কি উচিত নয়, অমুক কাজ এ নিয়মে করবো না কোন নিয়মে করবো? এ সময় আপনাদের কাছে সাধারণত দু' প্রকারের নিয়ম এসে উপস্থিত হয়। এক প্রকারের নিয়ম আপনাদেরকে দেখায় আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। আর এক প্রকারের নিয়ম উপস্থিত করে আপনাদের নফস, বাপ-দাদা হতে চলে আ া নিয়ম-প্রথা অথবা মানব রচিত আইন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে কুফরির পথই অবলম্বন করে। যদি সে তার সমস্ত জীবন সম্বন্ধেই এ সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং কোন কাজেই যদি আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুসরণ না করে তবে সে

www.pathagar.com

পুরোপুরিভাবে কাফের। যদি সে কতক কাজে আল্লাহর হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হুকুম মতো কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মতো অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিপ্ত হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের, কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। কারো মধ্যে আছে দশ ভাগের এক ভাগ কুফরী আর কারো মধ্যে আছে কুড়ি ভাগের এক ভাগ। মোটকথা, আল্লাহর আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরী করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুত কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার বান্দাহ হয়ে থাকা এবং নফস, বাপ-দাদা, বংশ-গোত্র, জমিদার, তহশীলদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কারোও আনুগত্য না করার নামই হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাস হবে না। আর কারোও দাসত্ব কবুল করবে না- এটাই হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির কাজ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

"(হে নবী!) আহলে কিতাবদের বলঃ আস, আমরা ও তোমরা এমন একটা কথায় একত্রিত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ তোমাদের নবীরা যা বলেছে, আমিও আল্লাহর নবী হওয়ার কারণে তাই বলছি)। তা এই যে, (১) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোও বান্দাহ হবো না, (২) আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো না এবং (৩) আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও নিজের অভিভাবক ও মালিক বলে মান্য করবো না। এ তিনটি কথা যদি তারা অস্বীকার করে তবে তোমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান- অর্থাৎ আমরা এ তিনটি কথাই পুরাপুরি কবুল করে নিচ্ছি।"-(সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
"তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করছে। আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।"

এ দুটি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তা এই যে, আসল দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ কেবল এটাই

www.pathagar.com

নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদাতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে। বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত বলে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদাত। এজন্য প্রত্যেকটি কাজে এবং প্রত্যেকটি হুকুমের ব্যাপারেই কেবলমাত্র আল্লাহর খোঁজ নিতে হবে। নিজের মন ও বিবেক-বুদ্ধি কি বলে, বাপ-দাদারা কি বলে বা করে গেছেন, পরিবার, বংশ ও আত্মীয়গণের মত কি, সেই দিকে মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ত্যাগ করে এদের কারোও হুকুম পালন করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে এবং যার হুকুম মান্য করা হবে তাকে আল্লাহর মত সম্মান দান করা হবে। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারঃ "আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হুকুম মানতে পারে না।" মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হুকুম পালন করে চলছে। একটি পাথর অন্য পাথরের হুকুম মতো কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোন পশু অন্য পশুর হুকুম পালন করে চলে না। কিন্তু মানুষ কি পশু গাছ ও পাথর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা অন্য মানুষের হুকুম মতো চলা শুরু করবে? মানুষতো শুধু আল্লাহর হুকুমই মেনে চলবে, আনুগত্য করবে। একথাই কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

এ কুফর ও গোমরাহী কোথা হতে আসে এবং মানুষের মধ্যে এটা কিরূপে প্রবেশ করে, অতপর এ সম্পর্কেই আলোচনা করবো। কুরআন শরীফ এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করার ভাব তিনটি পথে প্রবেশ করে।

প্রথম পথ হচ্ছে মানুষের নিজের নফসের খাহেশঃ

"আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? এ ধরনের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনই সৎ পথের সন্ধান দেন না।"

www.pathagar.com

এর অর্থ এই যে, মানুষকে গোমরাহ্ করার মতো যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, আরাম ও সুখ যে কাজে অধিক মিলবে সে কেবল সেসব কাজেরই সন্ধান করবে এবং যেসব কাজে তা দেখতে পাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ্ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে তার খোদা রূপে স্বীকার করেনি এবং তার নফসকেই সে তার একমাত্র খোদার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছেঃ

"(হে নবী!) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত ররং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।"

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন পশুকে আপনারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আর যে জানোয়ারের জন্য যত কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক জানোয়ার সে কাজই করে যায়। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়।

www.pathagar.com

মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই যে, বাপ-দাদা হতে যেসব রসম-রেওয়াজ, যে আকীদা-বিশ্বাস ও মত এবং যে চাল-চলন ও রীতিনীতি চলে এসেছে তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার দরুন মানুষ তার গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও তাকে বেশি সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে। সেই রকম-রেওয়াজের বিপরীত আল্লাহর কোন কোন হুকুম যদি তার সামনে পেশ করা হয়, তবে সে অমনি বলে ওঠে বাপ-দাদারা যা করে গেছে, আমার বংশের যে নিয়ম বহুদিন হতে চলে এসেছে, আমি তার বিপরীত কাজ করতে পারি? পূর্ব-পুরুষের নিয়মের পূজা করার রোগ যার মধ্যে এতখানি, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার বাপ-দাদা এবং তার বংশের লোকেরাই তার খোদা হয়ে বসে। সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করলে তা যে মিথ্যা দাবি হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে বড় কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে চল, তখন তারা শুধু একথাই বলে উঠেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যদি কোন কথা বুঝতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?"

আয়াত নং (   )

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে আস, তখনই তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলে গেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি আসল কথা জানতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎ পথে না চলে থাকে তবুও কি তারা (অন্ধভাবে) তাদেরই অনুসরণ করে চলবে? হে ঈমানদারগণ! তোমাদের চিন্তা করা উচিত। তোমরা যদি সৎপথে চলতে পার, অন্য লোকের গোমরাহিতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজের ভাল-মন্দ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।"-(সূরা আল মায়েদাঃ ১০৪-১০৫)

www.pathagar.com

সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকেরা এ ধরনের গোমরাহীতে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করতে এ জিনিস তাদেরকে বাধা দেয়। হযরত মূসা (আ) যখন সেই যুগের লোকদেরকে আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তারা একথাই বলেছেঃ

"আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তুমি কি সেই পথ হতে আমাদেরকে ভুলিয়ে নিতে এসেছো?"

(সূরা ইউনুসঃ ৭৮)

হযরত ইবরাহিম (আ) যখন তাঁর গোত্রের লোকদেরকে শির্ক হতে ফিরে থাকতে বললেন, তখন তারাও একথাটি বলেছিলঃ

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই দেবতারই পূজা করতে দেখেছি।"

মোটকথা প্রত্যেক নবীরই দাওয়াত শুনে সেই যুগের লোকেরা শুধু একথাই বলেছে, "তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ-দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।"

পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

"এ রকম ঘটনা সবসময়েই ঘটে থাকে যে, যখনই কোন দেশে আমি নবী পাঠিয়েছি, সেই দেশের অর্থশালী ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তখনই একথা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক নিয়মে চলতে দেখেছি এবং আমরা ঠিক সেই নিয়মে চলছি। নবী তাদেরকে বললেন, তোমাদের বাপ-দাদার নিয়ম-প্রথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা যদি আমি তোমাদেরকে বলি, তবুও কি তোমরা তাদের নিয়ম অনুসারে চলতে থাকবে? তারা উত্তরে বললো, আমরা তোমার কথা একেবারেই মানি না। তারা যখন এ জবাব দিল তখন আমিও তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলাম। আর এখন তোমরা দেখে নাও যে, আমার বিধান অমান্যকারীদের পরিণাম কতখানি মারাত্মক হয়েছে।"

আয়াত নং (   )

এসব কথা প্রকাশ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা হয় বাপ-দাদারই নিয়ম-প্রথার অনুসরণ কর, না হয় খাঁটিভাবে কেবল আমারই হুকুম মেনে চল; কিন্তু এ দুটি জিনিস একত্রে ও এক সাথে কখনও পালন করতে পারবে না। দুটি

www.pathagar.com

পথের মধ্যে মাত্র একটি পথ ধরতে পারবে। মুসলমান হতে চাইলে সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার হুকুম পালন করে চলতে থাকঃ

"তাদেরকে যখন বলা হলো যে, তোমরা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ কর; তখন তারা বলল যে, আমরা তো শুধু সেই পথই অনুসরণ করে চলবো, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। কিন্তু শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে, তুবও কি? যে ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে এবং নেককার হয়েছে সে তো মজবুত রশি ধারণ করেছে। কারণ সকল কাজের শেষ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে- হে নবী, তার অস্বীকারের জন্য তোমার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। তারা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন আমি তাদের সকল কাজের পরিণাম ফল দেখিয়ে দেব।"

(সূরা লোকমানঃ ২১-২৩)

মানুষকে গোমরাহ করার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। এরপর তৃতীয় পথ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিয়ে মানুষের হুকুম পালন করতে শুরু করে এবং ধারণা করে যে, অমুক ব্যক্তি খুব বড়লোক তার কথা নিশ্চয় সত্য হবে, কিংবা অমুক ব্যক্তির হাতে আমার রিযক, কাজেই তার হুকুম অবশ্যই পালন করা উচিত অথবা অমুক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশি, এজন্য তার কথা অনুসরণ করা আবশ্যক; কিংবা অমুক ব্যক্তি বদ দোয়া করে আমাকে ধ্বংস করে দিবে অথবা অমুক ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে বেহেশতে যাবে, কাজেই সে যা বলে তা নির্ভুল মনে করা কর্তব্য অথবা অমুক জাতি আজকাল খুব উন্নতি করছে, কাজেই তাদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, তখন সে কিছুতেই আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে।"

অর্থাৎ মানুষ সোজা পথে ঠিক তখনই থাকতে পারে যখন তার আল্লাহ কেবলমাত্র একজনই হবে। যে ব্যক্তি শত শত এবং হাজার হাজার লোককে 'খোদা' বলে স্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি কখনও এক খোদার কথামত আবার কখনও অন্য আর এক খোদার কথামত চলবে সে সোজা পথ কখনই পেতে পারে না।

www.pathagar.com

ওপরের আলোচনায় একথা আপনারা ভাল করেই জানতে পেরেছেন যে, মানুষের গোমরাহ হবার তিনটি বড় বড় কারণ বর্তমানঃ

প্রথম- নফসের দাসত্ব।

দ্বিতীয়- বাপ-দাদা, পরিবার ও বংশের রসম-রেওয়াজের দাসত্ব।

তৃতীয়- সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষের দাসত্ব, ধনী, রাজা, শাসনকর্তা, ভন্ড নেতা এবং দুনিয়ার পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দাসত্ব এর মধ্যে গণ্য।

এই তিনটি বড় বড় 'দেবতা' মানুষের খোদা হবার দাবী করে বসে আছে। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম এই তিনটি 'দেবতাকেই' অস্বীকার করতে হবে এবং যখনই সে তা করবে তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ তিন প্রকারের দেবতাকে, নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখবে এবং এদের হুকুম মতো কাজ করবে, আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন। সে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজে পড়ে, সারাদিন লোক দেখানো রোযা রেখে এবং মুসলমানের মত বেশ ধারণ করে লোককে শুধু ধোঁকাই দিতে পারবে। সে নিজেকেও ধোঁকা দিতে পারবে যে, সে খাঁটি মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এরূপ কৌশল করে আল্লাহকে কখনও ধোঁকা দিতে পারবে না।

ওপরে আমি যে তিনটি 'দেবতার' উল্লেখ করেছি, এদের দাসত্ব করাই হচ্ছে আসল শিরক। আপনারা পাথরের দেবতা ভাংগিয়েছেন, ইট ও চুনের সমন্বয়ে গড়া মূর্তি ও মূর্তিঘর আপনারা ধ্বংস করেছেন; কিন্তু আপনাদের বুকের মধ্যে যে মূর্তিঘর বর্তমান রয়েছে, সেই দিকে আপনারা মোটেই খেয়াল করেননি। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য এ মূর্তিগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারী কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত। যদিও আমি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করেই একথা বলছি এবং আমি জানি যে, দুনিয়ার মুসলমানদের পদে পদে পরাজয়- দেবতার পূজা করাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। কিন্তু এখানে আমি কেবল এ দেশীয় মুসলমান ভাইগণকে বলছি যে, আপনাদের অধপতন আপনাদের নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগ ও বিপদের মূল হচ্ছে উপরোক্ত তিনটি জিনিস। নফসের দাসত্ব, বংশগত ও প্রথার দাসত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য মানুষের দাসত্ব আপনাদের মধ্যে এখনও খুব বেশী

www.pathagar.com

পরিমাণেই আছে। আর এটাই ভিতর হতে আপনাদের শক্তি এবং দ্বীন ও ঈমানকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। আপনাদের মধ্যে আশরাফ-আতরাব, কুলীন-গৃহস্ত এবং ছোটলোক বড় লোকের পার্থক্য আছে। আর এরূপে আপনাদের সমাজের লোকদেরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে এক জাতি ও পরস্পরের ভাই করে একটি মজবুত দেয়ালের মত করতে চেয়েছিল। সেই দেয়ালের প্রত্যেকখানা ইট অন্য ইটের সাথে মজবুত হয়ে গেথে থাকবে, এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। অথচ আপনারা এখনও সেই পুরাতন হিন্দুয়ানী জাতিভেদের ধারণা নিয়ে রয়েছেন। হিন্দুদের এক গোত্র যেমন অন্য গোত্র হতে পৃথক থাকে আর এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে আপনারাও ঠিক তাই করছেন। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আপনারা পরস্পর কোন কাজ করতে পারেন না। সকল মুসলমানকে আপনারা সমানভাবে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেন না। মুখে মুখে ভাই বলে থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় আপনাদের মধ্যে ঠিক সেরূপ পার্থক্য থেকে যায় যেমন ছিল আরব দেশে ইসলামের পূর্বে। এসব কারণে আপনারা পরস্পর মিলে একটা মজবুত দেয়াল হতে পারেন না। ভাঙ্গা দেয়ালের নানা দিকে ছড়ানো ইটের মতো আপনারা এক একজন মানুষ পৃথক হয়ে পড়ে রয়েছেন। এজন্যই না আপনারা এক ঐক্যবদ্ধ্য শক্তিতে পরিণত হতে পারছেন, না কোন বিপদ আপদের মোকাবিলা করতে পারছেন। ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা অনুযায়ী আপনাদেরকে যদি বলা যায় যে, এই সমস্ত ভেদাভেদ ও পার্থক্য চূর্ণ করে দিয়ে ও পরস্পর মিলে-মিশে এক হয়ে যান তাহলে আপনারা তখন ঐ এক কথাই বলবেন যে, আমাদের বাপ-দাদার কাল হতে যে প্রথা চলে এসেছে তা আমরা ভেঙ্গে দিতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে কি বলবেন তা কি আপনারা জানেন? তিনি বলবেন, বেশ তোমরা এ সমস্ত ভেঙ্গ না, আর এ সমস্ত অমুসলমানী আচার ছেড়ো না, ফলে আমিও তোমাদের একেবারে টুকরো টুকরো করে দেব এবং তোমরা দুনিয়ায় বহু লোক হওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অধপতিত করে রাখবো।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই তোমাদের সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু আপনারা এর কি উত্তর দিয়েছেন? আপনারা বলেছেন, আমাদের বাপ-দাদার আইনে মেয়েরা সম্পত্তির

www.pathagar.com

অংশ পেতে পারে না- পেতে পারে একমাত্র ছেলেরাই। কাজেই আমরা বাপ-দাদার আইন মানি আল্লাহর আইন মানতে পারি না। একটু চিন্তা করে দেখুন, এর নাম কি ইসলাম? আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে, বংশগত ও দেশ প্রচলিত আইন পরিত্যাগ কর, উত্তরে আপনাদের প্রত্যেকেই বলে ওঠবেন- সকলে যখন ত্যাগ রবে তখন আমিও করবো। কেননা অন্য লোক যদি তাদের মেয়েকে সম্পত্তির অংশ না দেয়, তাহলে আমার সম্পত্তি তো অন্যের ঘরে চলে যাবে, কিন্তু অন্যের ঘর হতে আমার ঘরে কিছুই আসবে না। ভেবে দেখুন, এই উত্তরের অর্থ কি? অপরে যদি আল্লাহর আইন মানে তবে আপনি মানবেন, এরূপ শর্ত করে কি আপনি আল্লাহর আইনের প্রতি ঈমান এনেছেন? তাহলে কাল আপনি এটাও বলতে পারেন যে, অপরে ব্যভিচার করলে আমিও ব্যভিচার করবো, অপরে চুরি করলে আমি চুরি করবো। মোটকথা অপরে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ্ না ছাড়বে আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ করতে থাকবো। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা উল্লেখিত তিনটি দেবতারই পূজা করানো হচ্ছে। নফসের বন্দেগী করছেন, বাপ-দাদার প্রথারও বন্দেগী করছেন, আর দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর দাসত্বও আপনারা করছেন। অথচ এ তিনটি দেবতার পূজার সাথে সাথে ইসলামের দাবিও আপনারা করছেন। এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ আমি উল্লেখ করলাম। নতুবা একটু চোখ খুলে তাকালে এত প্রকারের বড় বড় রোগ আপনাদের মধ্যে দেখা যাবে যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না এবং লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন যে, কোথাও একটি দেবতার পূজা চলছে, কোথাও দু'টি দেবতার পূজা চলছে। অপর কোথাও তিনটি দেবতারই পূজা চলছে। তিনটি দেবতার পূজা করার সাথে সাথে ইসলামেরও দাবী করা একটা হাস্যকর ব্যাপার এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুসলমানদের ওপর যে অফুরন্ত রহমত নাযিল করার ওয়াদা করেছেন, ঠিক তাই আমাদের ওপর নাযিল হবে- এরূপ আশা করাও কম হাস্যকর ব্যাপার নয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইবাদাতের মৌলিক অর্থ

এখানে আমি 'ইবাদাত' শব্দটির বিস্তারিত অর্থ আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ শব্দটি সর্বসাধারণ মুসলমান প্রায়ই বলে থাকে কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানে না। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেনঃ

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা আয যারিয়াতঃ ৫৬)

এ থেকে নিসন্দেহে বুঝা গেল যে মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত এবং বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন যে, 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কতখানি জরুরি। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনি কিছুতে লাভ করতে পারেন না। আর যে বস্তু তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে না তা ব্যর্থ ও নিস্ফল হয়ে থাকে।

চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় যে, সে চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে, কৃষক ভাল ফসল জন্মাতে না পারলে কৃষিকার্জে তার ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাৎ ইবাদাত করতে না পারেন তবে বলতে হবে যে, আপনাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই আমি আশা করি আপনারা এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবেন এবং তা আপনাদের হৃদয়-মগজে বদ্ধমূল করে নিবেন। কারণ মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এরই ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ইবাদাত শব্দটি আরবি 'আবদ' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ বন্দেগী ও গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন আদায় করে, কিন্তু তবুও সে ঠিক চাকরের ন্যায় কাজ না করে তবে বলতে হবে

www.pathagar.com

যে, সে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করছে। আসলে একে অকৃতজ্ঞতা বলাই বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যায় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে।

বান্দা বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজি দান করেন এবং যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আনুগত্য লাভের অধিকারী নয়। সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর অনুবর্তিতা মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দাহর দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সব সময়ই গোলাম; তার একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মানবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময় আমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দেবেন তাই অনুসরণ করা, সালাম দেয়ার জন্য মনিব যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকারে নিজের প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদাত'। প্রথমত, মনিবের দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয়ত, মনিবের আনুগত্য এবং তৃতীয়ত, মনিবের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন

এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়, কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করবে, এছাড়া অন্য কারো হুকুম অনুসরণ করবে না এবং কেবল তাঁরই সামনে সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য

www.pathagar.com

মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তাআলা বুঝিয়েছেন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'ইবাদাত' দ্বারা। যেসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ এটাই। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছেঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত ক'রো না" অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন- তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা অনুসরণযোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে- তাহলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার পূজা-উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সেই সত্তাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ।

ইবাদাত শব্দের এ অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তাঁর সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে, তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না। বরং সে কেবল সিজদা করতে থাকে। মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চারণ করতে থাকে- 'চোরের হাত কাট' কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীন চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন? আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদাত করছে? আপনার কোন চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কি বলবেন তা আমি জানি না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি 'বড় আবেদ' (ইবাদাতকারী, বুযর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে। আপনি

www.pathagar.com

তার এ ধরনের কার্যাবলি দেখেন, আর বিস্মিত হয়ে বলেনঃ 'ওহ! লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।' আপনাদের এ ভুল ধারণার মূল কারণ এই যে, আপনারা 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না। হ্যা, নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত সহ সমস্ত ফরজ ওয়াজেব পালন করার পর মানুষের হক আদায় করার পর পরিবার প্রতিবেশী সমাজ রাষ্ট্র এবং মানব জাতি তথা সৃষ্টির সব হক আদায় করার ফাকে ফাকে নফল ইবাদাত তসবিহ তাহলিল জিকির আজগার মোরাকাবা মোসাহেদা সবই করবেন বরং করলে ভাল এবং খুব বেশী ভাল কাজ এগুলি। আল্লাহর হুকুম পালন না করে হুকুমের বিরোধীতা করে এগুলি করলে কোন ফায়দা হবে না। বরং মহান আল্লাহ আপনাকে ধোকাবাজ বলে তার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন। সবাইকে ধোকা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আলেমুল গায়েব আল্লাহকে ধোকা দেওয়া সম্ভব নয়।

আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আপনাদের কারো কোন চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন? তার 'সালাম' কি তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করবেন না? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলে ডাকবে তখন আপনি কি তাকে একথা বলবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান; তুই আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াস? এটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা! যারা রাত-দিন আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোন পরোয়া করে না; তাদের নামায-রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদাত বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ 'ইবাদাত' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক

www.pathagar.com

পরিধান করে, বড় আদর যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনামাত্রই মাথা নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশি অনুগত চাকর আর কেউই নয়। 'সালাম' দেয়ার সময় সে একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে; কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ হতভাগা তার সহযোগিতা করে; রাতের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়। এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আপনি নিশ্চয়ই তাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী, নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আল্লাহর কোন চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন? তখন আপনারা কাউকে 'আবেদ', কাউকে 'হযরত', কাউকে 'বড় কামেল', 'পরহেযগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। এর কারণ এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপ মতো লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু'ইঞ্চি উপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন; এদেরকে বড় দীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন। এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদাত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। হ্যা দাড়ি টুপি, পায়জামা, জামা সবই সুন্নাতি হওয়া দরকার কিন্তু আসল কাজটি ঠিকঠাক মত করার পাশাপাশি এগুলো করতে হবে। আল্লাহর শত্রুদের সাথে হাত মিলানো যাবেনা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে না বরং শত্রুদের সাথে শত্রুর মতই আচরন করতে হবে তাহলেই এসব পোশাক আশাক নফল ইবাদাত সোনায় সোহাগা হিসাবে কাজ করবে।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা- শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদাত। হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন

www.pathagar.com

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকূ' পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদাত' মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরিউক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ- নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে। এই ধারণার পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদাত' করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেই ইবাদাত এই যে, আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আপনি একেবারে অস্বীকার করবেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবেন তার সবটুকুই ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জীবনে আপনার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলা-ফিরা, কথা বলা, আলোচনা করাও ইবাদাত বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামিল হবে। যেসব কাজকে আপনরা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকেন তাও 'ইবাদাত' এবং 'দ্বীনদারী' হতে পারে- যদি সকল বিষয় আপনি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে সমাধা করেন; আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখেন যে, আল্লাহর কাছে কোন্‌টা জায়েয আর কোন্‌টা নাজায়েয, কি হালাল আর কি হারাম, কি ফরয আর কি নিষেধ, কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে হন অসন্তুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হন। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আপনার সামনে আসবে। এখন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করেন এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করেন তবে এ কাজে আপনার যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদাত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে

www.pathagar.com

আপনি নিজে খান আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত অন্যান্য হকদারের হকও আদায় করেন, তাহলে এসব কাজেও আপনি অসীম সওয়াব পাবেন। পথ চলার সময় আপনি পথের কাঁটা দূর করেন এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোন বান্দা কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আপনার ইবাদাত বলে গণ্য হবে। আপনি কোন রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রুষা করলেন, কোন ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করলেন, কিংবা কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করলেন তবে এটাও ইবাদাত হবে। কথাবার্তা বলতে আপনি মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করেন এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলেন তবে যতক্ষণ সময় আপনার এ কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদাতে অতিবাহিত হবে।

অতত্রব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এ ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এ ইবাদাত সব সময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর ইবাদাত হতে হবে। আপনি একথা বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহ্র বান্দা আর আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ নই। আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আর অমুক সময় আল্লাহর কোন ইবাদাত করতে হয় না। এ আলোচনা দ্বারা আপনারা 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ ভালরূপে জানলেন একথা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেক মুহুর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদাত। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এ নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? উত্তরে আমি বলবো যে, এসব ইবাদাত বটে, এ ইবাদাতগুলোকে আপনার ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আপনার জীবনের প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা, সেই বিরাট উদ্দেশ্য আপনি এসবের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আল্লাহ তাআলার দাস- তাঁরই বন্দেগী করা তোমার কর্তব্য; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ বন্দেগী করার জন্যই প্রস্তুত করে, যাকাত আপনাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছ তা

www.pathagar.com

আল্লাহর দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মতো ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চরিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর আপনার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত হবার উপযুক্ত হয়, তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকূ-সিজদা, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে এবং চলাফেরা বা কাজ-কর্ম করতে পারলে নিসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটা প্রাণহীন দেহ মাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুই বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুঁতে রাখেন। তদ্রুপ নামাযের আরকান-আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলিও যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু হৃদয় মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে-ঠিক যে জন্য এসব আপনার ওপর ফরয করা হয়েছিল, তবে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যা এসব নিয়ম কানুন অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে বাজ্যিক বা আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সাথে মহান আল্লাহ্-র প্রেমপ্রীতি ভালবাসা হৃদয়ের স্পর্শ থাকতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের রূপ পূর্ণাঙ্গতা পাবে।

আপনাদের ওপর এই যে, বিভিন্ন ইবাদাত ফরয করা হয়েছে, এসব কিভাবে এবং কি উপায়ে আপনাকে সেই আসল ও বৃহত্তম ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে, সেই ইবাদাতগুলোকে যদি আপনি বুঝে শুনে আদায় করেন, তবে তা থেকে আপনার জীবনে কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পরবর্তীতে সে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছি। এ 'ইবাদাতের' উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দাহ হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য ইসলামের কয়েকটি নির্দিষ্ট ইবাদাত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং এবারে কেবল 'নামায' সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই।

আপনারা পূর্বের আলোচনায় জানতে পেরেছেন যে, 'ইবাদাত'-এর আসল অর্থ বন্দেগী বা দাসত্ব করা। তাই আপনাকে যখন শুধু দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আপনি কখনো এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না। 'এত মিনিট কিংবা এত ঘন্টার জন্য আমি আল্লাহর দাস, অন্য সকল সময় তা নই'- একথা আপনি যেমন বলতে পারেন না, তদ্রূপ আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, 'আমি এতক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করবো এবং অন্য সময়ে আমার পূর্ণ আযাদী- তখন যা ইচ্ছা তাই করবো। যেহেতু আল্লাহর গোলাম- আল্লাহর দাস হিসেবেই আপনার জন্ম হয়েছে। কেবল তাঁর গোলামী ও দাসত্ব করার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আপনার সমগ্র জীবনই তাঁর গোলামী ও দাসত্বে অতিবাহিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়, জীবনের কোন একটি মুহূর্তও আপনি তাঁর 'ইবাদাত' ও দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না।

পূর্বে একথাও বলেছি যে দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোণায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করার নাম ইবাদাত নয়। বরং এ দুনিয়ায় আপনি যে কাজই করুন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচেছ ইবাদাত। আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সময় এবং রাত দিন ২৪ ঘন্টা যা কিছু ভাল কাজ করবেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাহলে সবই ইবাদাত বলে গণ্য হবে। সন্তুষ্টির জন্য হলেই এবং সব সময় অন্তরে আল্লাহ্ স্মরণ রাখলেই তার জিকির করা হয়ে যায়। কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকা লাগেনা। রাসুল (দঃ) কাজের মধ্যেই আল্লাহ্কে স্মরণে রেখে জিকিরের ফায়দা হাসিল করতেন। আপনার শয়ন-নিদ্রা, আপনার জাগরণ ও বিশ্রাম, পানাহার, চলাফেরা- মোটকথা সবকিছুই আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে। আপনার স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগ্নি এবং আত্মীয়দের সাথে ঠিক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী

www.pathagar.com

ব্যবহার করবেন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে হাসি-তামাশা ও কথাবার্তা বলার সময়ও আপনার স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত নই। কামাই রোজগারের টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের সময়ও আপনাকে প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কখনো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। রাতের অন্ধকারে কোন পাপের কাজ করা যদি খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তা করলে কেউ দেখতে পাবে না বলে আপনি মনে করেন, ঠিক তখনো আপনি স্মরণ রাখবেন যে, আর কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, আল্লাহ তাআলা সব কিছু দেখছেন এবং আপনার মনে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হওয়া উচিত, মানুষের ভয় নয়। গভীর জঙ্গলে বসেও যদি কোন পাপের কাজ করতে ইচ্ছা করেন এবং যদি মনে করেন পুলিশ বা অন্য কোন লোক তা দেখতে পাবে না, তখনো আপনি কেবল আল্লাহকে ভয় করে পাপ পরিহার করবেন। যখন মিথ্যা কথা, দুর্নীতি, বেঈমানী, জুলুম ও শোষণ করে বহু স্বার্থ লাভ করতে পারেন এবং আপনাকে বাধা দেয়ার কেউ না থাকে, তখনো আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির আংশকায় এ স্বার্থের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। পক্ষান্তরে সততা ও ন্যায়-নীতি রক্ষা করে চলায় আপনাকে যদি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়, তথাপি আপনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই এ ক্ষতি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। অতএব দুনিয়ার বিপুল কর্মজীবন পরিত্যাগ করে মঙ্গলে বসে ধ্যান করার অর্থ 'ইবাদাত' বলা যায় না। দুনিয়ার এ গোলক ধাঁধায় জড়িত হয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই 'ইবাদাত'। মুখে কেবল 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' শব্দ উচ্চারণ করাকেই আল্লাহর 'যিকর' বলা যায় না। দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ঝামেলার কঠিন জালে জড়িত হয়েও আল্লাহকে বিস্মৃত না হওয়াই আসল আল্লাহর যিকর। যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয় তাতে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া, বড় বড় স্বার্থ হাসিলের লোভ এবং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করার যখন সুযোগ এসে যায় তখনও আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে তাঁর আইন অনুসরণ করে চলাই সত্যিকার 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর যিকর। এ যিকরের দিকে ইংগিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতেঃ দুনিয়াতে এই রঙ্গমতে মানুষের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন

www.pathagar.com

এই পরীক্ষার হল ত্যাগ করে হলের বাইরে বসে পরীক্ষা দিলে কি পাশ হবে আবেদ সাহেব? মোটেও হবে না। হলে বসে পরীক্ষা দেওয়াই ইবাদাত।

"নামায পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়; আল্লাহর দান জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং এ প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে আল্লাহকে খুব বেশি করে স্মরণ কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"

(আল জুমআঃ ১০)

'ইবাদাতের' এ অর্থ মনে জাগরুক রাখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, এ বৃহত্তম 'ইবাদাত' যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কি কি জিনিস অপরিহার্য এবং নামায সেসব জিনিসকে মানুষের মধ্যে কিভাবে সৃষ্টি করে। আল্লাহর খাঁটি 'বান্দা' হওয়ার জন্য বার বার একথা স্মরণ করা আবশ্যক যে, আপনি আল্লাহর বান্দা এবং প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সেই আল্লাহর বন্দেগী করাই হচেছ আপনার কাজ। একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া এজন্য আবশ্যক যে, মানুষের মনে একটি 'শয়তান' সব সময়ই উপস্থিত থাকে; সে সব সময়ই মানুষকে নিজের 'দাস' বানাতে চেষ্টা করে। শয়তানের এ প্ররোচনায় ও গোলক ধাঁধার জাল ছিন্ন করার জন্য মানুষকে প্রত্যহ বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া একান্ত আবশ্যক যে, "তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার দাস, তিনি ছাড়া তুমি আর কারো দাস নও- না শয়তানের, না কোন মানুষের।" একথারই অনুভূতি মানুষের মনে জাগরুক করে দেয় নামায। সকাল বেলা ঘুম ভাংতেই তা সর্বপ্রথম এবং সকল কাজের আগে আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দিনের বেলা যখন নানা প্রকার কাজে আপনি মশগুল থাকেন তখনো তিন-তিনবার আপনার মনে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং রাত্রিকালে যখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন শেষবারের মত এই পুনরাবৃত্তি করে। এরূপে আল্লাহর 'দাস' হওয়ার কথা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া নামাযের প্রথম উপকার। এজন্যই কুরআন মজীদে নামাযকে 'যিকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।

তারপর আপনাকে এ জীবনের পদে পদে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলতে হবে, কাজেই কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ আপনার মনে সদা জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা পালন করার অভ্যাসও আপনার থাকা দরকার। 'কর্তব্য' কাকে

www.pathagar.com

বলে এটা যে জানে না সে কখনও আল্লাহর বিধান পালন করতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্তব্যের অর্থ যে জানে কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সেই কর্তব্য পালন করার কোন আগ্রহ উদ্যোগ তার না থাকে তবে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তাকে যে শত সহস্র আইন বিধান দেয়া হবে তা যে সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করবে, এমন ভরসা কিছুতেই করা যায় না।

যারা পুলিশ কিংবা সৈন্য বিভাগে কাজ করছে তারা জানেন যে, এ দু'টি বিভাগে কর্তব্যানুভূতি এবং যথাযথভাবে কর্তব্য পালনের ট্রেনিং কত কঠোরতার সাথে দেয়া হয়। রাত-দিনের মধ্যে একাধিকবার বিউগল বাজানো হয়। সৈনিকদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের দ্বারা কুচকাওয়াজ করানো হয়। এসব কেবলমাত্র কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত করার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে যারা অক্ষম, নিষ্কর্মা ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়, যারা 'বিউগলের' আওয়াজ শুনেও ঘরে বসে থাকে কিংবা যারা কুচকাওয়াযের সময় নির্দেশ অনুসারে সাড়া না দেয় তাদেরকে প্রথমেই বরখাস্ত করা হয়। তদ্রূপ নামাযও দিন-রাত পাঁচবার 'বিউগল' বাজায়; সেই 'বিউগল' শুনা মাত্র আল্লাহর সৈনিকগণ দৌড়িয়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে যে, তারা সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন পালন করতে প্রস্তুত। এ 'বিউগল' শুনেও যারা বসে থাকে, নিজ স্থান হতে একটুও নড়তে যারা প্রস্তুত না হয়, তারা 'কর্তব্যের' অর্থই জানে না, কিংবা কর্তব্যের অর্থ বুঝা সত্ত্বেও আল্লাহর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এ কারণেই হযরত (সা) বলেছেনঃ "যারা আযানের আওয়াজ শুনেও নিজেদের ঘর হতে বের হয় না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়।" এবং এজন্যই হাদীস শরীফে নামায পড়াকেই কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামায পড়ার জন্য যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির না হতো হযরত (স) এবং সাহাবাদের যুগে তাকে নামাযের জামায়াতে শামিল হতে বাধ্য করার জন্য কথা বলা হতো। এজন্যই কুরআন শরীফে মুনাফিকদেরকে এরূপে তিরস্কার করা হয়নি যে, তারা নামায পড়ে না বরং বলা হয়েছে যে, তারা মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে নামাযে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় নেহায়েত অবহেলা, অনিচ্ছা ও উপেক্ষা সহকারে।

www.pathagar.com

এসব কথা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বে-নামাযীকে 'মুসলমান মনে করার কোনই অবকাশ নেই। কারণ, ইসলাম এক নিছক বিশ্বাসমূলক ধর্ম নয় যে, 'কতগুলো কথা' মনে মনে বিশ্বাস করলেই কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। বরং এটা সম্পূর্ণ কর্মময় বাস্তব ধর্ম। এমন বাস্তব যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা এবং কুফরী ও ফাসেকির বিরূদ্ধে অনবরত লড়াই করা অবশ্য কর্তব্য। এরূপ বিরাট কর্মময় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা অপরিযার্য। যে ব্যক্তি সেরূপ প্রস্তুত থাকে না, সে ইসলামের জন্য একেবারে নিষ্কর্মা। ঠিক এ কারণেই দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান কিনা এবং বাস্তব কর্মজীবনে সে আল্লাহর হুকুম পালন করতে প্রস্তুত কিনা, এর বাস্তব পরীক্ষা এবং প্রমাণ নেবার জন্যই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা। আল্লাহর প্যারেডের 'বিউগল' শুনে কোন মুসলমান যদি বিন্দুমাত্র সাড়া না দেয়, তবে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে যে, সে ইসলামের বিধান মত কর্মজীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। এরপর যদি সে আল্লাহকে ও রাসূলকে বিশ্বাস করে তবে তা একেবারেই অর্থহীন। এ জন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় কেবল সেই শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নামায কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর যাদের কাছে নামায পড়া কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত নয় এটাই প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত, আল্লাহর ভয়। প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে এ ভয় সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকা একান্ত আবশ্যক, মুসলমান ইসলাম অনুসারে কখনই কাজ করতে পারে না, যদি না তার মনে একই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সবসময়ই এবং সকল স্থানেই দেখছেন, তার গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আল্লাহ অন্ধকারেও তাকে দেখছেন, নিতান্ত সংগহীন অবস্থায়ও আল্লাহ তার সাথী, সমগ্র দুনিয়া হতে আত্মগোপন করা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়ার সর্বপ্রকার শাস্তি ও শাসন হতে মানুষ বেঁচে যেতে পারে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি ও শাসন হতে

www.pathagar.com

রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হতে বিরত রাখতে পারে। এ বিশ্বাসের কারণেই জীবনের যাবতীয় কার্যে আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা রক্ষা করে চলতে মানুষ বাধ্য হয়। এ বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে মুসলমান কিছুতেই খাঁটি ইসলামী জীবনযাপন করতে পারে না। এ বিশ্বাসকে বার বার স্মরণ করার জন্য এবং ক্রমাগত স্মরণের মাধ্যমে মানব মনে এ বিশ্বাস খুব দৃঢ়তার সাথে বদ্ধমূল করার জন্যই আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা নিজেই নামাযের এ স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

"নামায মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং লজ্জাহীনতার কাজ হতে বিরত রাখে।" একথার সত্যতা আপনি নিজে চিন্তা করলেই বুঝতে পারেনঃ আপনি যখন নামায পড়তে যান, তখন পবিত্র হয়ে এবং অযু করে যান, আপনার শরীর যদি নাপাক হয় এবং গোসল না করেই নামাযে হাজির হন, কিংবা আপনি যদি নাপাক কাপড় পরে নামায পড়তে যান, অথবা অযু না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি বলেন যে, আমি অযু করে এসেছি, তাহলে দুনিয়ার কোন লোকই আপনাকে ধরতে পারে না। তবুও তা কখনই করেন না। কিন্তু কেন? এজন্য যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন গোনাহ লুকানো সম্ভব নয়, একথা আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন। এমনকি নামাযে যেসব দোআ সূরা নিশব্দে পড়তে হয়, আপনি যদি তা না পড়েন তবে তাও কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এরূপ কাজ আপনি এজন্য করেন না যে, আল্লাহ সব কিছুই শুনতে পান, তিনি আপনার একান্ত কাছে অবস্থিত। তদ্রূপ নিবিড় জঙ্গলে গিয়েও আপনি নামায পড়েন, রাতের অন্ধকারেও নামায পড়েন, নিজের ঘরে যখন একেবারে একাকী থাকেন তখনও আপনি নামায পড়েন। অথচ এসব সময় আপনাকে কেউ দেখতে পায় না এবং কেউ জানতে পারে না যে, আপনি নামায পড়েছেন, কি পড়েননি। এর কারণ কি? কারণ এই যে, গোপনে সমস্ত লোক চক্ষুর আড়ালেও আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করতে আপনি ভয় পান এবং আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন অপরাধ গোপন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারাই আপনি অনুমান করতে পারেন যে, নামায মানব মনে আল্লাহর ভয় কিভাবে জাগ্রত রাখে এবং আল্লাহ যে হাযের-নাযের, সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, এ বিশ্বাস খুবই দৃঢ়তার সাথে

www.pathagar.com

মানব মনে বদ্ধমূল করে দেয়। বস্তুত এ ভয় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মনে বদ্ধমূল ও সদাজাগ্রত না থাকলে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি আল্লাহর ইবাদাত ও বন্দেগী করতে পারেন না? আপনার মনে এ ভয় যদি না থাকে তবে রাত-দিনের অসংখ্য কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করে ন্যায় ও পুণ্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সকল প্রকার পাপ ও নাফরমানি হতে দূরে থাকা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

চতুর্থত, ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর আইন পূর্ণরূপে জেনে নেয়া আপনার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ আইন না জানলে আপনি তা অনুসরণ করবেন কিরূপে? নামাযই আপনার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে। নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে। এর সাহায্যে দিন-রাত আপনি আল্লাহর আইন ও বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। জুমআর নামাযের পূর্বে 'খোতবা'র নিয়মও এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এর দ্বারা আপনি ইসলামের বিধান জানতে পারেন। জামায়াতের সাথে নামায ও জুমার নামায পড়ার আর একটি উপকারিতা এই যে, এ উদ্দেশ্যে আলেম ও অশিক্ষিত লোকদের এক স্থানে বারবার একত্র হতে হয় এবং সকলের পক্ষেই আল্লাহর বিধান জানার অপূর্ব সুযোগ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নামাযে যা কিছু পড়েন তা থেকে আল্লাহর হুকুম জানতে চেষ্টা করেন না, জুমার খোতবা এমনভাবে দেয়া হয় যে, বারবার শোনার পরও ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান হয় না এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য একত্র হওয়া সত্ত্বেও না আলেমগণ অশিক্ষিতকে কিছু শিক্ষা দেন, না অশিক্ষিত লোকেরা আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেন, একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? নামায আপনাদেরকে এ বিষয়ে অবাধ সুযোগ করে দেয়। আপনারা যদি তা থেকে এ উপকার লাভ না করেন, তবে নামাযের অপরাধ কি?

পঞ্চমত, জীবনের এ বিরাট কর্মক্ষেত্রে মুসলমান নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। বরং সমস্ত মুসলমানদের একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা, মিলিতভাবে আল্লাহর বিধান পালন করা তাঁর বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারী করার জন্য একে অপরের সহযোগিতা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। আপনি জানেন যে, এ জীবন ক্ষেত্রে একদিকে মুসলমান- আল্লাহর

www.pathagar.com

আদেশানুগত বান্দা এবং অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী ও কাফের লোকদের দল রয়েছে। রাত-দিন আল্লাহর আদেশ পালন এবং আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলছে। কাফেররা আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করছে এবং এর বিরুদ্ধে দুনিয়ার শয়তানের আইন জারী করছে, এদের মোকাবিলায় এক একটি 'মুসলমান' বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে কখনও জয়লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহর বান্দাদের পক্ষে একত্র হয়ে একটি মিলিত ঐক্য শক্তির বলে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারীর চেষ্টা করা আবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নামায ভিন্ন আর কিছুই এ বিরাট ঐক্য শক্তি গঠন করতে পারে না। দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত, সাপ্তাহিক জুমআর নামাযের বড় জামায়াত, তারপর বছরে দু' ঈদের নামাযের বিরাট সম্মেলন- এসব কিছু মিলে মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় দেয়ালের মত গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে চিন্তা, ভাব, মত ও কর্মের সেই ঐক্য জাগিয়ে তোলে যা মুসলমানদেরকে নিত্য নৈমত্তিক কাজে পরস্পরের সাহায্যকারী রূপে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ নামাজকে জামাতের সাথে পড়তে বলেছেন। নামাজ কায়েম হলে ইসলাম কায়েম হয়ে যায়। নামাজে যে কত শিক্ষা কত ফায়দা রয়েছে তা বর্ননা করে শেষ করা যাবেনা।

নামায মানুষকে আল্লাহর ইমাদাত, দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে চলার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করে, তা পূর্বে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে যা কিছু লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, একজন মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম এবং ফরয মনে করে রীতিমতো নামায আদায় করে, তবে সে নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর কোন অর্থ বুঝতে না পারলেও এ নামায তার মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর হাযের-নাযের হওয়ার কথা এবং তাঁর আদালতে একদিন উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস নিঃসন্দেহে সবসময়ই জাগরুক রাখবে। সব সময় সে মনে করবে যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দাস নয়। আল্লাহই তার প্রকৃত বাদশাহ এবং প্রভু। এরই ফলে তার মধ্যে কর্তব্য পালনের অভ্যাস হবে এবং সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহর বিধান পালন করে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর অধীনে যাপন করতে এবং গোটা জীবনকে ইবাদাতে পরিণত করতে হবে যেসব গুণ-সিফাত অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও এ নামাযের সাহায্যে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়। নামায দ্বারা এ উপকার কিরূপে লাভ করা যায় তাও আপনারা পূর্বের আলোচনায় ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

এখন বুঝে দেখতে হবে যে, নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ না বুঝে নামায পড়লে যদি এতবড় উপকার লাভ করা যায়, তাহলে কেউ যদি নামায ভালভাবে বুঝে-শুনে পড়ে, সে যা পড়ছে তা যদি সে হৃদয়-মন দিয়ে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে তবে তার বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা এবং অভ্যাস ও স্বভাবের কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং তার গোটা জীবন কিরূপ আদর্শে গঠিত হতে পারে, এখানে আমি এ বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম আযান সম্বন্ধে ভেবে দেখুন। দৈনিক পাঁচবার আপনাকে কি বলে ডাকা হয়? বলা হয়ঃ

'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সকলের বড়।'

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই। বন্দেগীর যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।'

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

'নামাযের জন্য আস।'

'যে কাজে কল্যাণ ও মঙ্গল সেই কাজের দিকে আস।'

'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

'আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই।

ভেবে দেখুন, এটা কত বড় শক্তিশালী ডাক। এ ডাক প্রত্যেক দিন পাঁচবার আপনাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, "পৃথিবীতে যত বড় খোদায়ীর দাবিদার দেখা যাচ্ছে, তারা সকলেই মিথ্যাবাদী, আকাশ ও পৃথিবীর মাত্র একজনই খোদায়ী ও প্রভুত্বের অধিকারী এবং কেবল তিনি ইবাদাতের যোগ্য। আসুন আমরা সকলে মিলে তাঁরই ইবাদাত করি। ইবাদাতেই আমাদের সকলের জন্য ইহকালের ও পরকালের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।"

এ মর্মস্পর্শী আওয়ায শুনে কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে? যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, এতবড় নির্ভীক সাক্ষ্য এবং এত স্পষ্ট আহ্বান শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয় এবং প্রকৃত প্রভু-মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাথা নত না করেও সে কিছুতেই থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

এ ডাক শুনেই আপনি উঠে পড়েন এবং সর্বপ্রথমেই আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমি কি পবিত্র, না অপবিত্র? আমার জামা-কাপড় পাক কিনা? আমার অযু আছে কি নেই? অন্য কথায় আপনার সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকে যে, উভয় জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজিরা দেয়ার বিষয়টি পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অন্যান্য কাজ তো সকল অবস্থাতেই করা যায়, কিন্তু এ মহান দরবারে শুধু দেহ ও কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয় অতিরিক্ত (বিশেষ) পবিত্রতাও (অর্থাৎ অযু) একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পবিত্রতা ছাড়া এখানে হাজিরা দেয়া ভীষণ বেয়াদবী। এ অনুভূতির সাথেই আপনি প্রথমে পবিত্র হওয়ার কথা চিন্তা করেন এবং তারপরে অযু করা আরম্ভ করেন। এ অযুর সময়ে যদি আপনি প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ ধোয়ার সময় এবং অযু শেষ করার পর হযরত নবী করীম (স)-এর শিখানো দোআসমূহ পাঠ করেন এবং আল্লাহকে যথাযথরূপে স্মরণ করেন, তাহলে শুধু যে আপনার অংগ-প্রত্যংগই ধোয়া হবে তা নয়, বরং আপনার অন্তরকেও ধৌত (পবিত্র) করা হবে। অযু শেষ করার পর নিম্ন দোআ পড়তে হবেঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারী বানাও।"

এরপর আপনি নামাযের জন্য দাঁড়ান। আপনার মুখ থাকে পবিত্র কেবলার দিকে। আপনি পাক-পবিত্র হয়ে সমগ্র জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজির হন।

সর্বপ্রথমেই আপনার মুখ থেকে বের হয় 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

মনে ও মুখে এ বিরাট অঙ্গীকার উচ্চারণ করে আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দু' হাত তোলেন এবং আপনার বাদশার সামনে হাত বেঁধে দন্ডায়মান হন। এরপরে নিরতিশয় বিনয় সহকারে আপনি আরজ করেনঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার নামের বরকত ও মাহাত্ম্য সত্যই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তুমি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই।"

www.pathagar.com

"অভিশপ্ত মরদুদ শয়তানের কবল হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"
"মেহেরবান-দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

- "সারাহাজানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র ও সর্বপ্রকার তারীফ-প্রশংসা।
- তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও মেহেরবান।
- তিনি বিচার দিনের একমাত্র মালিক। যেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মের বিচার করা হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।
- হে মালিক! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।
- আমাদেরকে সহজ, সোজা, সঠিক পথ দেখাও।
- তাদের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রাপ্ত।
- আর যারা অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত নয়।
- হে আল্লাহ! আমাদের দোআ কবুল কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

এরপর কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই অমৃতে পরিপূর্ণ। তাতে অমূল্য উপদেশ, শিক্ষা এবং সত্য পথের দিকে আহ্বান রয়েছে। সূরা ফাতেহায় যে সহজ ও সোজা পথের জন্য দোআ করা হয়, তাতে সেই সোজা পথেরই হেদায়াত ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি সূরার উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

"কালের শপথ! সমগ্র মানুষ ধ্বংসের মুখে। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমানদার এবং (ঈমানের দাবি অনুযায়ী) সৎকর্মশীল এবং যারা পরস্পর পরস্পরকে সত্য পথে চলতে উপদেশ ও পরামর্শ দেয় এবং সত্য পথে দৃঢ় ও মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে (কেবল তারাই ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা পেতে পারে)।"

এ ছোট সূরাটি হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ধ্বংস ও ব্যর্থতা হতে মানুষ কেবল একটি মাত্র উপায়ে বাঁচতে পারে। তা এই যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী আমল করাই যথেষ্ট নয়, বরং সাথে সাথে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের এমন একটা সুসংগঠিত দলও থাকা আবশ্যক, যে দল পরস্পরকে এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে সত্যের পথে- ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সর্ব প্রকার দুঃখ-বিপদে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের ওপর সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

www.pathagar.com

পবিত্র কালেমা পাকে বলা হয়েছে

"হিসাব-নিকাশের দিন- কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি কি রকম হয়, তা তুমি দেখেছ কি? এ ধরনের মানুষই এতিমকে বিতাড়িত করে এবং গরিব মিসকীনকে নিজেরা তো আহার দান করেই না- এমনকি অন্য লোকদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করার জন্য এতটুকু কষ্টও স্বীকার করে না। এমন সব নামাযীর জন্য ধ্বংস (পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করার কারণে) যারা নামাযে গাফলতি করে, এরা নামায পড়লেও তা কেবল লোক দেখানোর জন্যই পড়ে এবং তাদের মন এত সংকীর্ণ যে, অতি সামান্য ও ছোট-খাটো জিনিসও অভাবীদেরকে দিতে কুণ্ঠিত হয়।" এই সুরার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পরপারে বিশ্বাসী ব্যক্তি এতিমদের দয়া করে গরীবকে সাহায্য করে। মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। বড় কিছু দিতে বলা হয়েছে কিন্তু ছোটখাটো জিনিসও যে অভাবিকে দেয়না তাকে পরকালে বিশ্বাসের ভান করার কোন প্রয়োজন নেই। আর খোদাকে ফাকি দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা, খোদা তা বুঝেন।

এ সূরাটির মূল শিক্ষা এই যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের প্রাণ স্বরূপ। (এটা না থাকলে ইসলামের কাজই প্রাণহীন দেহের মতই অর্থহীন)। এছাড়া কোন মানুষই আল্লাহর দেখানো সহজ সরল পথে চলতে পারে না। আর একটি সূরাঃ

"অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং পরকে হীন প্রতিপন্ন করে অপমানসূচক কথা বলাই যাদের অভ্যাস তাদের সকলের জন্য আফসোস। তারা কেবল টাকা পয়সা জমা করে এবং (তা কি রকম বাড়ছে) বার বার গুণে দেখে। তাদের ধারণা এই যে, তাদের ধন-সম্পত্তি তাদের কাছে চিরদিন থাকবে। তা কখনই নয়। একদিন তারা নিশ্চয় মরবে এবং হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান হুতামা কি? তা আল্লাহর জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড; তার লেলিহান শিখা কলিজা পর্যন্ত ভস্ম করে। তা বড় এবং সুউচ্চ স্তম্ভের ন্যায় অগ্নিশিখা যা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।"

এভাবে নামাযে কুরআন শরীফের যেসব সূরা এবং আয়াত পাঠ করা হয় তাদের মধ্যে কোন না কোন মূল্যবান শিক্ষা এবং উপদেশ থাকে। তা মানবকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, মানুষের প্রতি আল্লাহর এ হুকুম অনুসারে দুনিয়াতে কাজ

www.pathagar.com

করতে হবে। এসব হেদায়েত ও উপদেশের আয়াত পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যান। হাঁটুর ওপর হাত রেখে দুনিয়া জাহানের আল্লাহ্ তাআলার সামনে মাথা নত করে বারবার বলতে থাকেনঃ

"অতি পবিত্র আমার মহান পালনকর্তা পরওয়ারদেগার।" তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলো, তার কথা আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন।" এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাটির সাথে মাথা মিশিয়ে সেজদা করেন এবং বলেনঃ "আমি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

তা পড়ে মাথা উঠান এবং আদবের সাথে বসে পাঠ করেনঃ

- আমাদের সব সালাম-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে।
- হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহ্র রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।
- আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রভু ও মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তাআলার বান্দা এবং রাসূল।"

এভাবে আপনি যখন সাক্ষ্য দেন তখন আপনাকে আঙ্গুল ওঠাতে হয়। কেননা এ অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা নামাযের মধ্যেই আপনার আকীদা ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা হয় এবং এ সাক্ষ্যের কথাটি মুখে বলার সময় বিশেষভাবে মনোযোগ স্থাপন করতে এবং মন-মগজের ওপর বিশেষ জোর দিতে হয়। এরপর আপনাকে নিচের দরূদ পাঠ করতে হয়ঃ

"হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছো হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের ওপরে করেছো। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।"

www.pathagar.com

দরূদ পড়ার পরে আল্লাহর কাছে এভাবে দোআ করেনঃ

"হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচার জন্য তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। সেই পথভ্রষ্টকারী দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! অন্যায় কাজ এবং ঋণ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এ দোআ পাঠ করার পর নামায পূর্ণ হয়ে যায়। রাব্বুল আলামিনের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে সর্বপ্রথম ডান ও বাম দিকে ফিরে উপস্থিত সকলের এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য রহমত ও শান্তি প্রার্থনা করে বলেনঃ "আপনাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।" এটা যেন একটি শুভ সংবাদ; নামাযের পর আল্লাহর দরবার থেকে এ নিয়েই আপনি ফিরে এসেছেন এভাবেই নামায আদায় করেন অতি ভোরে উঠে দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বেই। তারপর অনেক ঘণ্টা যাবত দুনিয়ার নানা কাজে লিপ্ত থাকেন। হরের একটু পরেই আবার আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে নামায আদায় ন- তার কয়েক ঘণ্টা পরেই বেলা তৃতীয় প্রহরেও আবার এ নামায আদায় । আবার কয়েক ঘন্টা কাজ-কর্ম করার পর সূর্যাস্ত হলেই আল্লাহর দরবারে হয়ে এ নামায আদায় করেন। তারপর দুনিয়ার কাজ-কর্ম শেষ হয়ে বার পূর্বে শেষবারের মতো আল্লাহর সামনে হাজির হন। এ শেষ ষ তিন রাকাতের নাম 'বেতেরের নামায'। এর তৃতীয় রাকআতে ছ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন। এ প্রতিজ্ঞার নাম 'দোআয়ে আর মারফতে নামাযী আল্লাহর সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার ত্য ও দাসত্বের শপথ গ্রহণ করে। তাঁর অনুগত হয়ে চলার তিজ্ঞায় আপনি কি বলেন মনোযোগ সহকারে শুনুনঃ

তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে গোনাহের জন্য মার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার মার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার ছে ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদের

www.pathagar.com

সাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখবো না- তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি, কেবলমাত্র তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা সাধনা ও সকল কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমারই রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেররাই নিক্ষিপ্ত হবে।"

একটু ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার আযানের ধ্বনি শুনে এবং চিন্তা করে দেখে যে, কত বড় কথা সেই আযানেই ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তা দ্বারা কত বড় মহান বাদশাহর কাছে হাজির হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রতিবার আযান শুনে যে ব্যক্তি তা মনে মনে অনুভব করে নিজের সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে সারাজাহানের মালিক ও প্রভুর দরবারে হাজির হয়, প্রতি নামাযের পূর্বে অযু করে নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র করে নেয় এবং বার বার নামাযে উল্লেখিত রূপে সূরা ও দোয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করে প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়-মনে আল্লাহর ভয় না জেগে পারে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে তার লজ্জা না হয়ে পারে না। পাপ ও অন্যায় কাজের কালো চিহ্ন নিয়ে আল্লাহর দরবারে বারবার হাজির হতে তার অন্তরাত্মা নিশ্চয় কেঁপে ওঠবে। নামাযে আল্লাহর দাসত্ব এবং তাঁর আনুগত্য করে চলার কথা বলা এবং আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলে বারবার স্বীকার করার পর কোন মানুষ বাহির দুনিয়ায় নিজের কাজ-কর্মের মধ্যে ফিরে এসে মিথ্যা কথা বলা, বেঈমানী করা, পরের হক আত্মসাৎ করা, ঘুষ খাওয়া ও দেয়া, সুদ খাওয়া ও দেয়া, অন্য মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার, অন্যায় প্রভৃতি কাজ কিছুই করতে পারে না কিংবা এগুলো করার পর পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এ কথা মুখে স্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারে না। আপনি জেনে বুঝে দৈ অসংখ্যবার আল্লাহর সামনে স্বীকার করেন, "হে আল্লাহ! আমি কেবল তে দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" এটা স্বীকার আপনার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করা এবং অন্য কারো প্রার্থনা করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? একবার এসব স্বীকার কা বিরোধিতা করলে পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হতে আপনার মন ত তিরস্কার করবে, লজ্জায় আপনার মাথা নত হয়ে পড়বে। আবার f

www.pathagar.com

করলে আরো বেশী লজ্জা হবে এবং বিবেক আপনাকে আরো বেশি দংশন করবে। সমস্ত জীবন ভরে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া সত্ত্বেও আপনার কাজ-কর্ম ও চরিত্র ঠিক না হওয়া এবং আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত না হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা নামাযের এ সুফল দান প্রসংগে বলেছেনঃ

"নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপকার্য হতে বিরত রাখে।"

কিন্তু মানুষের মন ও চরিত্র সংশোধন করার এতবড় উপায় থাকা সত্ত্বেও এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কারো চরিত্র ঠিক না হয়, যদি কেউ পাপ পথ থেকে বিরত না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, আসলে তারই স্বভাব খারাপ। সে জন্য নামাযের কোন ত্রুটি নেই। পানি ও সাবান কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে বটে; কিন্তু তাতে কয়লার ময়লা দূর না হলে সে জন্য পানি ও সাবানের কোন দোষ দেয়া যায় না- দোষ কয়লারই হবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা নামাযে যা কিছু পড়ি তা মোটেই বুঝি না বা বুঝেও পড়ি না। আমাদের নামাযে এটা একটি অতি বড় অভাব। এটা শেখার জন্য কিছু সময় ব্যয় করলেই অভাব পূরণ হতে পারে- নিজেদের মাতৃভাষায় নামাযের সব দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ ও ভাব অনায়াসেই আপনারা শিখতে পারেন। আমি মনে করি, এতে আপনাদের বড়ই উপকার হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলিতে বর্তমানে নামাজ শিক্ষা পাওয়া যায় তার মধ্যে এসবই পাওয়া যায় তার থেকে বুঝে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

আগের আলোচনয়া শুধু নামাযের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার কথাই বলেছি তা দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ নামায মানুষের মধ্যে জীবন ব্যাপী বন্দেগীর ভাবধারা কেমন করে জন্মায় এবং কেমন করে তাকে এ বন্দেগীর হক আদায়ের যোগ্য করে তোলে- সে কথাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এক্ষণে আমি জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উপকারিতার কথা বলব তা দ্বারা আপনারা খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করে এ একই জিনিসের মধ্যে সবরকমের নিয়ামত কিভাবে জমা করে রেখেছেন। শুধু নামাযই আমাদের পক্ষে কম ছিল

www.pathagar.com

না; কিন্তু সেই সাথে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের আদেশ করে আল্লাহ পাক এটাকে দ্বিগুণ উপকারিতার ভাণ্ডার করে দিয়েছেন এবং তাতে এমন এক অপূর্ব শক্তি দান করেছেন, যা মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত, আর নামায মানুষকে এ ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে। এরূপ ইবাদাতের জন্য মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' বলে স্বীকার করা, তাকে সব সময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা, আল্লাহর হুকুমগুলো ভাল করে জানা, নামায এসব এবং এ ধরনের বহু গুণই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং তাকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দারূপে গড়ে তোলে।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন যে, মানুষ নিজে যতই গুণসম্পন্ন হোক না কেন, অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী না হবে ততক্ষণ সে আল্লাহর বন্দেগীর 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করতে পারবে না। মানুষ যাদের সাথে দিন-রাত জীবনযাপন করে, সবসময় যাদের সাথে একত্রে কাজ করে, আল্লাহর ফরমাবরদারী করার ব্যাপারে তারা যদি সহযোগিতা না করে, তবে সে কিছুতেই আল্লাহর হুকুম পালনে সমর্থ হয় না।

মানুষ দুনিয়ায় একাকী আসেনি। একাকী থেকে সে কিছু করতেও পারে না। সে পাড়া-প্রতিবেশী ও সহকর্মী এবং জীবন পথের সঙ্গী-সাথীদের সাথে নানাভাবে জড়িত। আল্লাহর হুকুম আহকামও কোন নিসঙ্গ একটি মানুষের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্যে- জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যই তা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এখন আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে যদি সবাই পরস্পরকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে, তবেই তারা এক সাথে আল্লাহর হুকুম পালনকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে সকলে মিলে

www.pathagar.com

যদি আল্লাহর নাফরমানী শুরু করে কিংবা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, আল্লাহর আদেশ পালনে পরস্পর সহযোগিতা না করে, তবে একজন লোকের পক্ষে সঠিকভাবে নিয়মিত আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা যদি বিশেষ লক্ষ্যের সাথে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল আপনাকেই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হতে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে বলেননি। বরং সেই সাথে আপনাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, আপনি সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত করে দিবেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আইন জারী করবেন। দুনিয়ার যেখানে 'শয়তানের' আইন চলছে, তা বন্ধ করবেন এবং সে স্থানে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলার আইনের হুকুমাত কায়েম করবেন। আপনার প্রতি আল্লাহ এই যে, বিরাট খেদমতের আদেশ দিয়েছেন একজন লোকের পক্ষে এ কাজ সমাধা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ মতে বিশ্বাসী কোটি কোটি মুসলমানও যদি হয় আর তারা বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে- তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে তবে তারাও 'শয়তানের' সুশৃংখলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। এজন্যই মুসলমানদের দলবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরের সাহায্য করা, একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং সকলে মিলে একই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম-সাধনা করা অপরিহার্য।

একটু গভীরভাবে দেখলে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতবড় বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের কেবল মিলিত ও একতাবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাদের মিলিত হতে হবে ঠিক পন্থা অনুসারে অর্থাৎ এমনভাবে মুসলমানদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে, যেন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকে। তাদের মত, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির পূর্ণ ঐক্য বর্তমান থাকা চাই। তাদের একজন নেতা হওয়া দরকার, তাদের মধ্যে সেই নেতার ইশারা অনুসারে কাজ করার অভ্যাস ও স্পৃহা থাকা চাই। তাদেরকে নেতার হুকুম পালন করতে হবে আর তা কত দূরইবা করতে হবে এবং কোন্ কারণ ঘটলে নেতার বিরোধিতাও করা যেতে পারে- তাও তাদের ভাল করে

www.pathagar.com

বুঝে নেয়া আবশ্যক। একথাগুলো মনে রাখুন এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়লে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা নামাযীদের মধ্যে কেমন করে জেগে উঠে তা চিন্তা করে দেখুন।

আযান শোনা মাত্রই সব কাজ-কর্ম ছেড়ে মসজিদের দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই আযানের সাথে সাথেই মুসলমানদের নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করা এবং একই কেন্দ্রের (মসজিদ) দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়াজ হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাব হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের প্রতি স্বচেতনতা। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে সকলে একই কাজ করে, অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান হতে সে আওয়াজ শোনা মাত্রই নির্দিষ্ট স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যদের জন্য এ পন্থা কেন গ্রহণ করা হয়েছে? প্রথম এজন্য যেন আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হুকুম পালন করার এবং হুকুম পালনের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থাকার অভ্যাস হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সাথে এ ধরনের সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠিত হবে এবং সেনাপতির আদেশে একই সময় একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যাস হবে। এ অভ্যাসটি এজন্য দরকার যে, হঠাৎ কোন ঘটনা যদি দেখা দেয় তখন যেন সকল সিপাহী একই আওয়াযে একই স্থানে হাজির হয়ে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে যদি খুব বড় বাহাদুর হয়, কিন্তু কাজের সময় ডাকলে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে যদি লড়াই করতে না পারে, তাহলে তাদের বাহাদুরীর কোন মূল্যই থাকে না। ডাক দেয়া মাত্র সৈন্যরা যদি একত্র না হয় বরং নিজ নিজ ইচ্ছামত এক এক দিকে চলে যায়, তবে এ ধরনের হাজার বীর সৈনিককে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশটি সৈনিকের একটি শৃংখলাবদ্ধ দল নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে। জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে সদা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থেকে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং জামাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান অভিযোগ শুনা ও তা পূরণ করার মাধ্যমে একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ গঠনেব শিক্ষা দিয়েছে। এইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এলাকা ভিত্তিক মুসলিম সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ করে

www.pathagar.com

রাখে। সপ্তাহে একদিন জুম্মার নামাজ আরও ব্যাপক এলাকা নিয়ে ঐক্য সৃষ্টি করে তা ধরে রাখে। এরপর বছরে ২ (দুই) বার ঈদের নামাজের জামাত আরো বৃহৎ এলাকার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া হজ্জের জামাত বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন হিসাবে কাজ করে বিশ্ব মুসলিমের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে দিয়ে বিশ্বের ইসলামী শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করে দেয়। উল্লেখিত জামাতগুলি পর্যায়ক্রমে সমাজ দেশ ও দুনিয়ার ইসলামী হুকুমাত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৈরী করে দেওয়ার পর যদি এই জামাতগুলি তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট তৈরী করে দেখতে হবে কেন এমন হচেছ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠিক এ নিয়মেই আযান শুনা মাত্রই কাজ-কর্ম ছেড়ে নিকটস্থ মসজিদে হাজির হবার জন্য মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে যেন সব মুসলমান মিলে আল্লাহর একটি সৈন্যদলে পরিণত হতে পারে। এভাবে দৈনিক পাঁচবার আযান শুনামাত্র হাজির হওয়ার অভ্যাস করানো হয় এজন্য যে, দুনিয়ার সকল প্রকার সৈনিকের তুলনায় এ খোদায়ী সেনাদের কর্তব্য অনেক বেশি, অনেক কঠোর। অন্যান্য ফৌজের পক্ষে বহুকাল পরে হয়ত যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে এবং কবে কোন্ সময় যুদ্ধ বাঁধবে সে জন্য বহু পূর্ব থেকেই এত সব ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু এ খোদায়ী ফৌজকে প্রত্যেক মুহূর্তেই শয়তানী শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্য মুসলমানদের দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল'- আযানের আওয়াজে আল্লাহর শিবির অর্থাৎ মসজিদের দিকে ছুটতে হয়, বলতে হবে যে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের তুলনায় তাদের প্রতি এটাকে অনেক অনুগ্রহ করা হয়েছে সন্দেহ নেই।

এ যাবত শুধু আযানের সৌন্দর্য ও সার্থকতার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আযান শুনে সকল মুসলমান মসজিদে হাজির হয়। কেবল এ জমাগেত হওয়ার মধ্যেই অনেক সৌন্দর্য-সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এখানে মিলিত হয়ে মুসলমানগণ পরস্পরকে দেখতে পান, চিনতে ও পরিচয় লাভ করতে পারেন।

কিন্তু আপনারা পরস্পরের সাথে এই যে মিলিত ও পরিচিত হন, তা কোন্ সূত্রে? এই সূত্রে যে, আপনারা এক আল্লাহ তাআলার বান্দা, এক রাসূলের অনুসরণকারী, এক কুরআন শরীফই আপনাদের সকলেরই কিতাব- জীবন

www.pathagar.com

বিধান এবং আপনাদের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য এক। সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য আপনারা মসজিদে একত্র হয়েছেন এবং এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরও আপনারা প্রত্যেকেই সে একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করবেন; বস্তুত এ ধরনের পরিচয় এবং এরূপ সাহচর্য স্বাভাবিকভাবে আপনাদের মনে এ খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, আপনারা একে অপরের ভাই। দুনিয়ায় আপনাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, আপনাদের লাভ-লোকসান একই সূত্রে গাঁথা। আপনারা সকলে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, একই ফৌজের সিপাহী। আপনারা একে অপরের ভাই। আপনাদের পরস্পরের জীবন একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আপনারা যখন পরস্পরের দিকে তাকাবেন তখন ঠিক চোখ-মন অন্তর খুলে উদার দৃষ্টিতে তাকাবেন। শত্রু যে দৃষ্টিতে শত্রুকে দেখে থাকে আপনারা কারো প্রতি সেভাবে তাকান না বরং বন্ধু যেরূপ বন্ধুর দিকে তাকায়, ভাই যে চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টিতেই একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। এভাবে তাকাবার ফলে আপনি যখন কোন ভাইকে পুরাতন ও ছেড়া কাপড় পরিহিত দেখতে পাবেন, কাউকে বিশেষ চিন্তিত বিপদগ্রস্ত বা ক্ষুধার্ত দেখবেন, কাউকে দেখবেন অক্ষম-পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ তখন আপনার অন্তরে আপনা আপনিই সহানুভূতি ও দয়ার উদ্রেক হবে। আপনারা ধনী লোকেরা গরিব ও অসহায় দুঃস্থদের দুঃখ অনুভব করবেন, ফকীর-মিসকীন লোকেরা ধনীদের কাছে পৌঁছে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলার সাহস পাবেন। কারো সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, সে অসুস্থ কিংবা বিপদগ্রস্ত বলে মসজিদে আসতে পারেনি তখন তাকে দেখতে যাবার জন্য আপনার মনে আগ্রহ হবে। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে জানাযা পড়তে যেতে পারেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুত এ কাজই আপনাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে থাকে জামাত পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে দেয়।

আর একটু ভেবে দেখুন- আপনারা যেখানে একত্র হন তা একটি পাক-পবিত্র স্থান। এ পাক স্থানে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা একত্র হয়ে থাকেন। চোর-ডাকাত, শরাবী আর জুয়াড়ী দলও একস্থানে একত্র হয় বটে; কিন্তু তাদের

www.pathagar.com

সকলের মন অসৎ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু আপনাদের সবমেত হওয়াকে এদের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণই একত্র হয়ে থাকেন- আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আপনাদের এ সম্মেলন আল্লাহর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহর সামনে বন্দেগী ও দাসত্বের কথা খালেছ মনে স্বীকার করার জন্যই, নিজ নিজ গুনাহের জন্য লজ্জার অনুভূতি জেগে উঠে। অন্যদিকে যদি কোন মানুষ অন্য কারো সামনে কোন গুনাহের কাজ করে থাকে, আর সেই ব্যক্তি যদি মসজিদে হাজির হয়, তাহলে কেবল এতেই গুনাহগার ব্যক্তি লজ্জায় নতজানু হয়ে যায়। উপরন্তু মুসলমানদের মনে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার ভাবও যদি বর্তমান থাকে এবং সে যদি দরদ ভালবাসা ও সহানুভূতির সাথে একজনের দোষক্রটি কেমন করে দূর করা যায়, তা ভাল করে জেনে নেয়, তবে তাদের এ সম্মেলনের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে- তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এভাবে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষ-ক্রুটি সংশোধন করতে পারবেন- একজন অন্যজনের অভাব পূরণ করবেন। ফলে ধীরে ধীরে গোটা সমাজই সৎ ও নেককার হতে পারবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়লে আমাদের বিরূদ্ধে ইসলামের ন্যায় সত্য ও সুন্দরের আহবানকে কার্যকরি করার ব্যাপারে পরস্পর দলবদ্ধ হয়ে করতে পারেন। এ পথে বাধা আসলে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করতে পারেন।

মসজিদে কেবল মিলিত হওয়ার মধ্যেই এ বিরাট বরকত রয়েছে। এরপর জামায়াতের সাথে নামায পড়ার উপকারিতা ও বরকত যে কত অসীম তাও ভেবে দেখুন। নামাযীগণ সকলে একই সারিতে সমানভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ উচ্চ নয়, কেউ নিচু নয়- আল্লাহর দরবারে, আল্লাহর সামনে সকল মানুষ একেবারে সমান। কারো গায়ে হাত লাগলে বা কারো স্পর্শ লাগলে তাদের কেউ নাপাক হয়ে যায় না। এখানে অস্পৃশ্যতার কোন অবকাশ নেই। তাদের সকলেই পাক এবং পবিত্র; কারণ এরা সকলেই মানুষ, সকলেই এক আল্লাহর বান্দাহ; একই দ্বীন ইসলামের অনুগামী। এ নামাযীদের মধ্যে বংশ, পরিবার, গোত্র, দেশ ভাষা ও রং এর কারণে আদৌ কোন পার্থক্য নেই। ব্যক্তিগতভাবে এদের কেউ সাইয়েদ, কেউ পাঠান, কেউ খাঁ সাহেব, কেউ হাওলাদার আর কেউ চৌধুরী সাহেবও হতে

www.pathagar.com

পারেন। আবার এদের একজন হয়ত এক দেশের অধিবাসী আর একজন অন্য দেশের অধিবাসী। কেউ এক ভাষায় কথা বলে, কেউ অন্য ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে একই সারিতে দাঁড়িয়ে মিলিতভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। এর অর্থ এই যে, তারা সকলেই এক জাতির লোক। এখানে বংশ-গোত্র, দেশ-অঞ্চল ও জাতীয়তার প্রভেদ পার্থক্য একেবারে মিথ্যে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী আল্লাহর ইবাদাত। এ ব্যাপারে আপনারা সকলেই যখন এক তখন অন্যান্য ব্যাপারেও আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না বা কোন অবকাশ নেই। মুসলিম জাতীয়তা কি? ভাষা না আঞ্চলিকতা? এর জবাব নামাজের জামাতের মাধ্যমেই খুঁজে পাবেন আপনাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। বরং জাতীয়তাবাদীদের সুন্দরভাবে জবাব দিতেও সক্ষম হবেন। মুসলিম জাতীয়তা হচেছ বিশ্বজনিন। মুসলিম উম্মাহ্ই হচেছ এর আওতাভূক্ত। একে খন্ডখন্ড টুকরো টুকরো করার কোন সুযোগ নেই। সবগুলি জামাত আপনাকে সেই শিক্ষাও দিয়ে থাকে। জামাতের শিক্ষা এবং নেয়ামতের শেষ নেই।

আপনারা যখন সারি বেঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, তখন মনে হয় যেন একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী বাদশাহের সামনে কর্তব্য পালনের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কাতার বেঁধে দাঁড়ানোর এবং একত্রে মিলে ওঠাবসা করায় নামাযীদের মনে পরম ঐক্যভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে নামাযের ভেতর দিয়ে সকলকে আল্লাহর বন্দেগী করার অভ্যাস করানো হয়- তাদের সকলের হাত একত্রে ওঠবে, সকলের পা এক সাথে চলবে। তাতে পরিষ্কার মনে হবে যে, নামাযীরা বিশজন বিশজন কিংবা একশজন নয়- তারা একত্রে মিলে একটি অখন্ড মানুষে পরিণত হয়েছে।

জামায়াত ও কাতারবন্দী হওয়ার পরে কি করা হয়? সকল নামাযী একই ভাষায় আল্লাহর সামনে একই আরয জানায়ঃ “হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।” “হে আল্লাহ! আমাদেরকে সহজ সঠিক পদ দেখাও।” “হে আল্লাহ! সব তারীফ প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য।” “আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরও।” তারপরে নামায শেষ করে একে অপরকে এ বলে

www.pathagar.com

সালাম করে- এর অর্থ এই যে, নামাযীদের প্রত্যেকেই পরস্পর কল্যাণকামী এবং সকলে মিলে একই মালিকের কাছে সকলের মঙ্গল দাবী করছে। কোন নামাযী একাকী নয়, তাদের কেউই কেবলমাত্রই নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করে না। বরং সকলের মুখে এ দোআ যে, হে আল্লাহ! আমাদের সকলেরই প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, সকলকে একই সহজ ও সোজা পথে চলার তৌফিক দাও, সকলের ওপরেই শান্তি বর্ষিত হোক। নামায এভাবে সকল নামাযীর দিলকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেয়। সকলের মনে একই খেয়াল ও একই চিন্তাধারা জাগরিত করে, তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা, ঐক্য ও মংগলাকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। যে সমাজে পরস্পরের মধ্যে মঙ্গলাকাঙ্খার সৃষ্টি হয় সেখানে কেউ কারো অমঙ্গল করতে পারে না। কেউ কারো অমঙ্গল চিন্তাও করতে পারে না। তাই জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মঙ্গলময় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় সৃষ্টি হয় বা মঙ্গলময় সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

কিন্তু মনে রাখবেন, জামায়াতের সাথে নামায ইমাম ছাড়া পড়া যায় না। দু'জন মিলে পড়লেও তাদের মধ্যে একজনকে ইমাম ও অপরজনকে মোকতাদী হতে হয়। জামায়াত শুরু হলে তা থেকে আলাদা হয়ে একাকী নামায পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং হুকুম রয়েছে যে, জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পর যেই আসবে, তাকে সেই ইমামের পিছনেই (একেতেদা করে) দাঁড়াতে হবে। এসব কাজ কেবল নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আসলে এটা দ্বারা একটি বড় শিক্ষা এই দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে এভাবে জামায়াতবন্দী হয়ে থাকতে হবে। আর আপনাদের মধ্যে একজনকে যদি ইমাম না করা হয় তাহলে আপনাদের সেই জামায়াত গঠনই হতে পারে না। জামায়াত গঠন হওয়ার পরেও তা থেকে আলাদা হয়ে থাকলে আপনাদের জীবন মোটেই ইসলামী জীবন নয়। মুসলিম জীবনের সাথে এর আদৌ সম্পর্ক নেই। জামাতে নামাজ আদায় করলে নেতার হুকুম পালন করার গুরুত্ব শিক্ষা দেয়।

এখানেই শেষ নয়। জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমে ইমাম ও মোকতাদীদের মধ্যে একটা বিরাট মযবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়- যার সাহায্যে প্রত্যেকটি মুসলমানই জানতে পারে যে, এ ছোট্ট মসজিদের বাইরে পৃথিবী নামক বিরাট মসজিদে 'ইমামের' মর্যাদা কি? তাঁর কর্তব্য কি? তাঁর কি কি 'হক'

www.pathagar.com

আছে? সেই 'বড় মসজিদের' ইমামের অনুসরণ আপনাকে কিভাবে করতে হবে, সে ভুল করলে আপনি কি করবেন? তার ভুলকে আপনি কতক্ষণ বরদাশত করবেন? কখন আপনি তার ভুল ধরতে পারবেন? আর তা শোধরাবার দাবি করতে পারবেন? আর কোন অবস্থায় ইমামকে পদচ্যুত করতে পারবেন? এ সমস্ত কথা ছোটখাটোভাবে প্রত্যেক মুসলিমকে মসজিদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এক কথায় মসজিদে একটি ছোটখাট রাজ্য চালাবার নিয়ম-কানুন দৈনিক পাঁচবার শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাকে অভ্যাস করানো হয়। মসজিদ হচেছ একাধারে এবাদাত করার স্থান সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহ রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যালয়।

একথাগুলো বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখছি।

শরীয়াতের আদেশ এই যে, সমাজের লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পরহেযগার হবে, ইলম যার বেশি হবে, কুরআন শরীফ যে সকলের অপেক্ষা ভাল করে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং সেই সাথে যার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, ঠিক তাকেই নামাযের ইমাম বানাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যারা জাতির নেতা হবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা অবশ্য উক্ত জামাত দ্বারা পরিষ্কারভাবে তারই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের গুণাবলিতে মহিমান্বিত ব্যক্তিই নেতা নির্বাচিত হবেন সেই শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে।

শরীয়াত আদেশ করেছে যে, জামায়াতের অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম বানাতে রাজী নয়, তাকে ইমাম নিযুক্ত করা অনুচিত। অল্পসংখ্যক লোকের অসম্মতি ধর্তব্য নয়, কারণ তা হয় না এমন লোক কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু জামায়াতের অধিকাংশ লোক যদি কোন ব্যক্তিকে অপছন্দ করে, তবে তাকে কিছুতেই ইমাম নিযুক্ত করা যেতে পারে না। এর দ্বারা জাতির ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই নির্বাচন পদ্ধতি শিক্ষার জন্য কোন ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন নেই। ইমাম কোন চাকরি নয় তা এলাকার অর্থশালী সম্পদশালী শক্তি মসজিদ কমিটির নেতাদের মুসলিমদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। এটা মুসল্লিদের বিষয়। তাদের মতামতের উপরই

www.pathagar.com

ইমাম নিযুক্ত হতে হবে। সমাজ দেশ এবং দুনিয়া পরিচালনার ইসলামী পদ্ধতি ঐ একই। মুসল্লিগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বের গুণাবলীতে মহিমান্বিত ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে সম্মানের আসনে বসিয়ে সমাজ দেশ এবং দুনিয়া পরিচালনা করবেন। জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।

শরীয়াতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, নামাযের ইমাম এমন ব্যক্তিকে বানাতে হবে, যে সকল নামাযীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়বে। কারণ নামাযীদের মধ্যে অনেক রুগ্ন, বৃদ্ধ, অসুস্থ আর দুর্বল লোকও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কেবল যুবক, শক্তিমান আর অবসর বিশিষ্ট মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে লম্বা লম্বা কেরাত পড়লে এবং লম্বা লম্বা রুকূ'- সেজদা করতে থাকলে অন্যের পক্ষে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা হতে পারে। তাই ইমামের মনে রাখতে হবে যে, নামাযীদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ আছে, রুগ্ন ও দূর্বল ব্যক্তি আছে এবং এমন অনেক লোক আছে যারা তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিজ নিজ কাজে ফিরে যেতে চায়। হযরত নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে অনেক সহানুভূতি দেখিয়েছেন। নামায পড়াবার সময় কোন শিশুর কান্নার আওয়ায শুনতে পেলেও তিনি নামায অনেক সংক্ষেপ করতেন। কারণ শিশুর মাতা (কিংবা পিতা) এ জামায়াতে শরীক থাকলে তার মনে কষ্ট হতে পারে- তাই নামাযের ব্যাঘাত হতে পারে। এ নিয়ম দ্বারা জাতির নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাকে যখন 'নেতা' বানান হয়েছে, তখন প্রত্যেক কাজেই জাতির সকল প্রকার লোকের প্রতি তার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। শরীয়াতের ব্যবস্থা এই যে, নামায পড়াবার সময় ইমামের যদি এমন কোন অবস্থা হয়, যাতে সে আর নামায পড়াতে পারছে না, তাহলে অবিলম্বে তার সরে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ইমাম করে দেয়া আবশ্যক। এ থেকে এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, জাতির নেতা যখন নিজ কর্তব্য পালনে অক্ষম হবে, তখন সে নিজেই পদত্যাগ করে অন্য কোন উপযুক্ত লোককে সেখানে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করবে। এটা করা তার পক্ষে ফরয। এ কাজে তার কোন লজ্জা হওয়া উচিত নয়, এতে স্বার্থপরতাও নেই। এর মাধ্যমে নেতা পরিবর্তনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

শরীয়াতের আদেশ এই যে, ইমাম যা করবে মোকতাদীগণও তার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। ইমামের কোন কাজ করার আগে মোকতাদি তা করা একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইমামের আগে কেউ রুকূ' বা সিজদা করলে কিয়ামতের দিন তাকে গাধা বানিয়ে ওঠানো হবে।" নেতাকে কিভাবে অনুসরণ করে চলা অবশ্য কর্তব্য এখানে মুসলিম জাতিকে তাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে মুসলিম জাতিকে ইমামের হুকুম পালন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নামাযের মধ্যে ইমাম কোন ভুল করলে অর্থাৎ যখন দাঁড়ান দরকার তখন বসলে, কিংবা যখন বসা দরকার তখন দাঁড়ালে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার ভুল ধরে দেয়া মোকতাদিগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। 'সুবহানাল্লাহ' অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ তাআলা পাক ও মহান'। ইমামের ভুল ধরার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলার তাৎপর্য এই যে, কেবল আল্লাহ তাআলাই সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র; তুমি মানুষ, তোমার ভুল হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইমামের ভুল ধরার জন্য ইসলামে এটাই নিয়ম করা হয়েছে। নেতার ভুল কিভাবে সুধরে দিতে হবে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ নিয়মে যখনই ইমামের ভুল ধরা হবে, তখন কোন প্রকার লজ্জা-শরমের প্রশ্রয় না দিয়ে তার নিজ ভুল সংশোধন করে নেয়া উচিত। অবশ্য ভুল ধরে দেয়ার পরেও ইমাম যদি নিঃসন্দেহে মনে করে যে, তার কোন ভুল হয়নি- সে ঠিক কাজ করেছে, তখন সে নিজ বিশ্বাস অনুসারে যথারীতি নামায সমাধা করবে। এমতাবস্থায় জামায়াতের লোকদের পক্ষে ইমামের ভুলকে ভুল মনে করেও তার অনুসরণ করা কর্তব্য। নামায শেষ হওয়ার পরে ইমামের সামনে তার ভুল প্রমাণ করে পুনরায় নামায পড়াবার দাবি করার অধিকার সকল নামাযীরই আছে।

ইমামের সাথে জামায়াতের লোকদের এরূপ ব্যবহার মাত্র ছোটখাট ভুলের ব্যাপারে হবে। কিন্তু ইমাম যদি নবীর সুন্নাতের খেলাফ নামায পড়াতে শুরু করে কিংবা নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে কুরআন শরীফ ভুল পড়ে অথবা নামায পড়াবার সময় কোন কুফরী, শিরকী বা প্রকাশ্য গুনাহের কাজ করে বসে- তখন নামায ছেড়ে দিয়ে সেই ইমাম পরিত্যাগ করা প্রত্যেক নামাযীর পক্ষেই ফরয। ইমামকে কখন ত্যাগ করতে হবে এখানে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজকে জাতীয় জীবনে তাদের নেতাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, নামায সম্পর্কে শরীয়াতের এসব হেদায়েত দ্বারা তা চমৎকারভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার যেসব সার্থকতা ও সুফলের কথা এখানে বলা হলো- তা দ্বারা আপনারা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলার এ একটি কথা মাত্র ইবাদাত- যা দিন ও রাতে পাঁচবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য করতে হয়- তাতে মুসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সকল স্থানেই বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, মাত্র এ একটি জিনিস মুসলমানকে যথার্থ ভাগ্যবান করে দিতে পারে এবং এটা কেমন করে মুসলমানকে আল্লাহর গোলামী এবং দুনিয়ায় নেতৃত্ব করার জন্য তৈরি করে দেয় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নামায যখন সকল কল্যাণে পরিপূর্ণ তখন বর্তমান সময় এর এতসব কল্যাণ কোথায় গেল? এ প্রশ্নের জবাব পরবর্তী আলোচনায় দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

পূর্বের আলোচনাতে নামাযের যে উপকারিতা ও সুফল দানের কথা আমি নানাভাবে ব্যক্ত করেছি, সেই নামায থেকে বর্তমানে লোকেরা সেই রকম সুফল লাভে সক্ষম হচ্ছে না কেন, এখানে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করবো। বর্তমান যুগে নামায পড়ার পরেও মুসলমান এত লাঞ্ছিত ও দুর্বল কেন, তাদের উন্নতি হচ্ছে না কেন, একটি অপরাজেয় শক্তিধর আল্লাহর সেনাবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে না কেন, দুনিয়ার মধ্যে কাফেরদের বিপক্ষে তারা এত শক্তিহীন ও অবহেলিত কেন? এটা সত্যিই একটি কঠিন প্রশ্ন। একথার একটি যৌক্তিক উত্তর রয়েছে।

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এ হতে পারে যে, মুসলমানগণ আসলে নামাযই পড়ে না, আর পড়লেও ঠিক সেভাবে এবং সেই নিয়মে পড়ে না, যেভাবে আর যে নিয়মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পড়তে আদেশ করেছেন। কাজেই নামায ঈমানদার ব্যক্তিকে উন্নতির চরম সীমায় পৌছাতে পারে, অথচ আজকের দিনের মুসলমানগণ বর্তমানের এ নামায হতে সেরূপ সুফল লাভের আশা করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, এতটুকু সংক্ষিপ্ত জবাবে আপনারা পরিতৃপ্ত হবেন না। কাজেই বিস্তারিতভাবেই এর জবাব দেয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

এই যে (মসজিদ) একটি দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে, আপনি জানেন যে, এতে অনেক যন্ত্রাংশ একটি অন্যটির সাথে জড়িত রয়েছে। এতে যখন চাবি দেয়া হয়, তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ নিজ নিজ কাজ শুরু করে এবং সেই সাথে বাইরের কাঁটায় ঘুরে ঘুরে সেকেন্ডের পর সেকেন্ড মিনিটের পর মিনিট বানিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বানাতে থাকে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ঘড়ি বানাবার উদ্দেশ্য কি? ঠিকভাবে সময় জানানই যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা সকলেই জানেন। এজন্য যাতে করে সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারে এমন সব ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এর মধ্যে একত্র করা হয়েছে। তারপর সেগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেন সবগুলো মিলে যথারীতি চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি অংশ যেন সঠিক সময় জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার ঠিক ততটুকু কাজ করে- বেশি নয়, কমও নয়। পুনরায় তাতে চাবি দিবার নিয়ম করা হয়েছে। কেননা, চাবি না দিলে যন্ত্রাংশগুলো থেমে যাবে, তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পর চাবি দিয়ে তাকে গতিশীল করে দেয়া হয়। ফলে সবগুলো যন্ত্রাংশ চলতে শুরু করে। এগুলোকে যখন ঠিকভাবে জুড়ে দেয়া হয় এবং তাতে চাবি দেয়া হয়, ঠিক তখনই যে উদ্দেশ্যে তা তৈরি হয়েছে তা এ ঘড়ি দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ঠিকমত চাবি দেয়া না হয়, তবে তা ঠিকভাবে সময় নির্দেশ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ বর্তমানে ব্যাটারী সিষ্টেমের ঘড়িগুলিতে চাবি দেওয়া লাগেনা ব্যাটারী ফুরিয়ে গেলে তখন নূতন ব্যাটারী বদল করে দিতে হয় না হলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনিই যদি এর কোন কোন অংশ বের করে দিয়ে চাবি দেয়া হয়। আর যদি এর অংশ বের করে সেখানে অন্য কোন মেশিনের অংশ লাগিয়ে দেয়া হয় এবং ব্যাটারী বদলানো হয়, তথাপি তা সময় নির্দেশ করতে পারবে না। এর সবগুলো যন্ত্রাংশ যদি একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে এর মধ্যে রাখা হয়, তবে চাবি দিলেও তা চলবে না বা ব্যাটারী বদলালেও চলবেনা। প্রকাশ্যভাবে দেখতে গেলে তো বলতে হবে যে, ঘড়ির সব যন্ত্রাংশই এর মধ্যে আছে, কিন্তু যন্ত্রাংশ থাকলেই তো আর এর উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। কারণ, এদের পরস্পরের সাথে কোন যোগ নেই এবং শ্রেণীবিন্যাস করে সেগুলোকে ঠিকমত সাজানও হয়নি। তাই সেগুলো পরস্পর চলতে পারছে না। এখানে যেসব অবস্থার কথা বলা হলো তাতে যদিও ঘড়িটি কোন কাজ করবে না এবং তাতে চাবি দেয়া নিস্ফল হবে তবুও বাইরের লোক

www.pathagar.com

তা দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না যে, এটা ঘড়ি নয় বা এতে রীতিমত চাবি দেয়া হচ্ছে না বা ব্যাটারী বদলানো হচেছ না। তারা তো বলবে যে, এটা দেখতে ঠিক ঘড়ির মতোই এবং সে জন্য ঘড়ি দ্বারা যে উদ্দেশ্য লাভ হয়, তাই পাওয়ার আশা করবে এজন্যই দূর থেকে তারা যখন দেখবে যে, আপনি ঘড়িতে ঠিক মত চাবি দিচ্ছেন, কাজেই ঘড়ি দ্বারা যে সুফল লাভ করা যায়, তা হতেও সে ঠিক তাই পাওয়ার আশা করবে। কিন্তু এর ভেতরে যখন ঘড়ির ঠিক অবস্থা বর্তমান নেই তখন বাহির থেকে ঘড়ির মত দেখালে কি হবে? এর দ্বারা আসল ঘড়ির কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অথবা মটর গাড়ী এবং মটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ মিশিয়ে যদি গাড়ির মত করে সাজানো হয় তাহলে সেই গাড়ি কি রাস্তায় চলবে? জবাব হচেছ চলবে না।

ঘড়ির যে উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম, তা দ্বারা আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন। ইসলামকে এ ঘড়ির মত মনে করুন, ঘড়ির উদ্দেশ্য যেমন সঠিক সময় নির্দেশ করা, তেমনি ইসলামেরও উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা- আল্লাহর সৈনিকরূপে বসবাস করবে। নিজেরা আল্লাহর হুকুম অনুসারে চলবে, অন্যকেও আল্লাহর বিধানের অধীন পরিচালিত করবে। কুরআন শরীফে একথাটি পরিষ্কার বলা হয়েছেঃ

"তোমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা সকল মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ করবে, সকল অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরাবে এবং আল্লাহর প্রতি মযবুতভাবে ঈমান রাখবে।"

(সূরা আলে ইমারানঃ ১১০)

"আর এরূপে আমরা তোমাদেরকে (সর্বশ্রেষ্ঠ) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা সকল মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৪৩)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের যমীনের বুকে তার খলীফা বানাবেন।"

(সূরা আন নূরঃ ৫৫)

www.pathagar.com

"এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো যেন শেষ পর্যন্ত ফেত্‌না খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে।"

(সূরা আনফালঃ ৩৯)

এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় ইসলামেও অনেক কলকব্জা জমা করা হয়েছে। ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেগুলো যেমন দরকারী, তেমনি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণও। ইসলামের মৌলিক মতবাদ, আকায়েদ, নৈতিক চরিত্রের নিয়ম-নীতি, কাজ-কারবার, আদান-প্রদানের কায়দা-কানুন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, নিজের হক আর দুনিয়ার অন্য যেসব জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোর হক, কামাই-রোযগার এবং খরচ করার রীতিনীতি, যুদ্ধ-জিহাদের নিয়ম-পন্থা, সন্ধি-সমঝোতার নিয়ম কানুন, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে বসবাস করার নিয়ম- এসবগুলোই ইসলামের অঙ্গ- ইসলামের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এবং এগুলোকে ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় একটির সাথে অন্যটিকে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, চাবি দিলেই বা ব্যাটারী বদলানো হলেই তার সবগুলো ঠিকভাবে চলতে শুরু করে- আর এগুলো মিলিতভাবে চলার ফলে এর আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব এবং দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা- এমন সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে লাভ হতে থাকে, যেমন ঘড়ির যন্ত্রগুলো চলার ফলে বাইরের সময় নির্দেশকারী কাঁটা সঠিক সময় জ্ঞাপন করে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেবার জন্য কয়েকটি লোহার পাত ও ছোট ছোট লোহার কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ইসলামের বিভিন্ন কাজকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রাখার জন্য এবং সেগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণী বিন্যাস করার জন্য জামায়াত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলমানদের এ জামায়াতের এমন একজন নেতা হবে যার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বোধশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে; জামায়াতের কর্মীগণ তার কথা মেনে চলবে, তার কথা অনুসারে কাজ করবে। নেতা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে লোকদের ওপর ইসলামী আইন জারী করবে এবং তাদের ইসলামী আইনের বিরোধিতা হতে বিরত রাখবে। এভাবে ইসলামের সবগুলো অংশ যখন পরস্পর যুক্ত হবে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস কায়েম করা হবে,

www.pathagar.com

তখন তাতে গতি আনার জন্য সেগুলোকে ঠিকমত চালাবার জন্য তাতে চাবি দেয়া বা ব্যাটারী বদলানো আবশ্যক হয়। বস্তুত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নামায সেই চাবির বা ব্যাটারী বদলানোর কাজ করে থাকে। দিন-রাত পাঁচবার করে এ চাবি দেয়ার কাজ করতে হয়। তারপর এ ঘড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাও দরকার। সেই জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। বছরে একবার করে ত্রিশ দিনের জন্য এটা সেই কাজ সমাধা করে। এ ঘড়িতে তেল দেয়া আবশ্যক, বছরে একবার যাকাত আদায় করে এ তেল দেয়ার কাজ করা হয়। এ তেল বাইরে থেকে আমদানি করা হয় না, এ ঘড়িরই কোন অংশ এটা তৈরি করে এবং অন্যান্য শুকনা অংশগুলোকে চলাবার যোগ্য করে দেয়। ঘড়িকে মাঝে মাঝে 'ওভারহল' করারও দরকার হয়, জীবনে একবার হজ্জ করলে এ 'ওভারহলিং'-এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এখন সকলেই বুঝতে পারেন, এ চাবি দেয়া, পরিষ্কার করা, তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করা ঠিক তখনি সার্থক হতে পারে, যখন এ ঘড়ির মধ্যে কেবল ঘড়িরই অংশগুলো পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত থাকবে, যেভাবে ঘড়ির নির্মাতা তা সাজিয়ে দিয়েছে। ঠিক এমন অবস্থায় চাবি দিলেই তা সঠিকভাবে চলতে পারে এবং ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে। একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান সময় ইসলামের অবস্থা এদিক দিয়ে বড়ই খারাপ। প্রথমত যে জামায়াত গঠনের সাহায্যে ইসলামের সমস্ত অংশ পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছিল, সেই জামায়াতের অস্তিত্ব এখন নেই। এখানে শিয়া জামাত সুন্নি জামাতসহ মসজিদ আলাদা ইমাম আলাদা হয়েছে। এক জামাত আর এক জামাতের সহযোগিতা তো করছেইনা বরং শত্রুর থেকেও ভয়ানক আকারের বিরোধিতা করছে। ইসলামের একটি হুকুম যদি সুন্নি সম্প্রদায় বাস্তবায়ন করতে যায় শিয়া সম্প্রদায় সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইহুদী নাছারা পোত্তালিকদের আর বাধা দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনা কারণ এ প্রয়োজন পূরণের জন্য বুদ্ধি করে আমরা তাই রোজ কেয়ামত পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করতে থাকব, আমাদের সর্বনাশ করার জন্য শত্রুদের আর কষ্ট করা লাগবেনা। এমনকি রক্তও দিতে হবেনা। মুসলমানদের রক্ত ইসলামী কাজের বিরূদ্ধে ব্যবহারের জন্য দাবার ঘুটি হিসাবে পাতিয়ে দিয়েছে শত্রুরাই। ফলে সব অংশগুলোই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ঐক্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন যার যা ইচ্ছা সে তাই করে যাচ্ছে। কেউ বাধা দেবার নেই, সঠিক পথ দেখাবার কেউ নেই। ইচ্ছা হলে ইসলামের

www.pathagar.com

আইন মেনে চলে, না হয় ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। আজকের মুসলমান এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তারা এ ঘড়ির অনেকগুলো অংশ বের করে নিজ নিজ ইচ্ছামত অনেক অংশ এতে যোগ করেছে, যা কোনক্রমেই এ ঘড়ির অংশ হতে পারে না। কেউ অন্য মেশিনের অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেউ 'আখ মাড়াই করা কলের' এক অংশ তাতে লাগিয়ে দিয়েছে, আবার কেউ কেউ মোটর সাইকেলের কতক অংশ নিজের পছন্দ অনুসারে সন্ধান করে এনে এতে জুড়ে দিয়েছে। এখন এরা একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে সুদী কারবার চালাচ্ছে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে জীবন বীমা করছে, ইংরেজি আইনের ভিত্তিতে গড়া আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। কাফেরদের অনুগত হয়ে তাদের খেদমত করছে। নিজের মেয়ে, বোন আর স্ত্রীদেরকে স্কার্ট পরিয়ে প্যান্ট আর গেঞ্জি পরিয়ে পাশ্চাত্য অসভ্যতা শিক্ষা দিয়ে দায়ুছ বানাচেছ। নিজেদের সন্তানদেরকে জড়বাদী শিক্ষা দান করছে। এদিকে মার্কস ও লেনিনের অনুকরণ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে শ্রেণী শত্রু বলে মসজিদের মুসল্লিদের গলা কাটছে এবং অন্যদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকার নীতি অনুযায়ী ধনতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ পরদেশ দখল গণহত্যা তেল সম্পদ জবর দখল নারী হত্যা, নারী ধর্ষনের কাজ ও অবাদে সমর্থন করে যাচেছ। মোটকথা ইসলাম বিরোধী অসংখ্য জিনিস এনে স্বয়ং মুসলমানগণই ইসলামের এ ঘড়ির সাথে জুড়ে দিয়েছে।

এসব অবাঞ্ছনীয় কাজ করার পরও যদি কেউ আশা করে যে, চাবি দিলেই ঘড়ি ঠিকমত চলবে, আর যে উদ্দেশ্যে ঘড়ি বানানো হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যও এটা দ্বারা হাসিল হবে, আর পরিচ্ছন্ন করে তেল দেয়া এবং ওভারহোলিং করায় যে ফল পাওয়া উচিত তাও যদি কেউ এটা দ্বারা পেতে চায় তবে তাকে চরম নির্বোধ ছাড়া কিই-বা বলা যেতে পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনায়াসে বুঝা যায় যে, বর্তমানে এ ঘড়ির (ইসলামের) যে দশা হয়েছে তাতে জীবনভর চাবি দিলে, সাফ করলে এবং তেল দিতে থাকলেও এর আসল উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য মেশিনের অংশগুলো এর মধ্যে থেকে বের করা না হবে এবং সেই স্থানে এর আসল অংশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে সাজিয়ে দেয়া না হবে- (প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত করার সময় যেমন সাজান হয়েছিল) ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করার কোন আশাই করা যায় না।

www.pathagar.com

বিষয়টি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। মুসলমানদের নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হওয়ার কারণ এটাই। প্রথমত তাদের মধ্যে খুব কম লোকই রীতিমত নামায আদায় করে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় ও হজ্জ করে। জামায়াতী বন্ধন ও শৃংখলা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছে। ইসলামের এ ফরযগুলো কেউ আদায় করছে কিনা তা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। অতপর যারা তা আদায় করে তারাই বা কিভাবে আদায় করে। আজ জামায়াতের সাথে নামায পড়ার প্রচলন প্রায় নেই, কোথাও জামায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানকার মসজিদ কমিটির লোকজনগুলো এমন একজন ইমাম নামের কর্মচারী নিয়োগ করেন অনেক ক্ষেত্রে যার সমাজের পিওন হওয়ারও যোগ্য নয়। তবে কখনও কখনও ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে কোন কোন মসজিদে যোগ্য ইমামও নিযুক্ত হয়ে থাকে। যার দ্বারা দুনিয়ার ভাল কাজের নেতৃত্ব দেওয়াও সম্ভব। যারা মসজিদের রুটি খায়, দ্বীনি ফরয পালন করাকে যারা একটি রোযগারের উপায় বলে মনে করে, যারা জ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, নৈতিক শক্তিহীন এবং চরিত্রের দিক দিয়ে বড় অনগ্রসর, অধিকাংশ সেই শ্রেণীর লোকদেরকেই ধরে মসজিদের ইমাম বানিয়ে দেয়া হয়। অথচ সকল মুসলমানকে আল্লাহর খাঁটি খলীফা আর দুনিয়ায় আল্লাহর সৈনিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই এ ইমাম নিযুক্তির নিয়ম করা হয়েছিল। এভাবে নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের যে অবস্থা আজকাল হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। এমনও দেখা যায় যে সবচেয়ে অপদার্থ লোকটিকেই ইমাম করা হয়েছে।

এতসব সত্ত্বেও অনেকে বলতে পারে যে, আজকাল অনেক মুসলমান ফরয আদায় করছে, আপন আপন কর্তব্য যথারীতি পালন করছে। কিন্তু ওপরে যেমন বলা হয়েছে, ঘড়ির কতক অংশ বের করে দিয়ে সেই স্থানে অন্য মেশিনের কতকগুলো অংশ জুড়ে দেয়ার পর তাতে চাবি দেয়া না দেয়া, সাফ করা না করা এবং তেল দেয়া না দেয়া একই কথা- সবই একেবারে নিস্ফল এবং অর্থহীন। দূর হতে দেখলে তো এটাকে 'ঘড়ি' বলেই মনে হবে। বাহির থেকে কেউ দেখে অবশ্যই বলবে যে, এটাই ইসলাম এবং আপনারা মুসলমান। আপনারা যখন এ ঘড়িতে চাবি দেন বা তা সাফ করেন, তখন দূর থেকে দেখে লোকজন মনে করে যে, আপনারা ঠিক মতই 'চাবি' দিচেছন আর 'সাফ' করছেন। কেউ বলতে পারে

www.pathagar.com

না যে, এটা নামায নয়, এটা রোযা নয় কিন্তু এর ভিতরে যে কি আছে, তা বাহির থেকে যারা দেখবে তারা কেমন করে বুঝবে? কিছুই বুঝা যাবেনা। তাই প্রথমে ইমাম নিযুক্তির সময় খাটি ইমাম বানাতে হবে এটা প্রথম কাজ। তখন ইমামই বাকী কাজগুলির আনজাম দিতে পারবেন। ইমাম নামের পিওন মার্কা কর্মচারী নিয়োগের পদ্ধতিবাদ দিতে হবে।

আজ মুসলমানদের দ্বীনি কাজ-কর্ম নিস্ফল হচেছ কেন? তার মূল কারণ আমি আপনাদের সামনে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলাম। একথাও বুঝিয়ে দিলাম যে মুসলমানগণ নামায পড়ে আর রোযা রেখেও আল্লাহর সৈনিক হতে পারছে না কেন; বরং তারা কাফেরদের খাদেম ও অন্ধভাবে তাদের পদাংক অনুসরণকারী এবং নানাভাবে মযলুম হচেছ কেন? যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এটা অপেক্ষাও অনেক দুঃখের কথা আমি বলতে পারি। বর্তমান দুরবস্থার জন্য মুসলমানদের দিলে নিশ্চয়ই দুঃখ বা কষ্ট আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন বরং তার চেয়েও বেশি লোক এমন রয়েছে যারা এ দূরাবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে মোটেও রাজি নয়। ইসলামের এ 'ঘড়ির' ভেতরের কলকজা পরস্পর বিচিছন্ন হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মর্জিমত একটা নতুন অংশ এতে লাগিয়ে দিয়েছে, একে সংশোধন করতে অর্থাৎ অন্য মেশিনের অংশগুলো বের করে এবং এর আসল অংশগুলো যথাযথ সাজিয়ে একে ঠিক করতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নারাজ। এমন কি, কেউ তা করতে চাইলেও এরা তাকে বরদাশত পর্যন্ত করতে পারে না। কারণ অন্য মেশিনের জিনিসগুলো যখন এর মধ্য থেকে বের করা হবে, তখন প্রত্যেকেরই প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে। কিন্তু অপর লোকদের প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে, "আর নিজে বাইরের যে অংশ এতে জুড়ে দিয়েছে তা তাদের থাকতে দেয়া হবে, এটাতো হতে পারে না। এভাবে তার আসল অংশগুলো যখন ঠিকমত সাজিয়ে মজবুত করে বাঁধা হবে তখন সেই সাথে নিজেরাও বন্দী হয়ে পড়বে বলে এদের ভয় হয়। কেননা, সকলকে শক্ত করে বাঁধলে একজনকেও নিশ্চয়ই মুক্ত ও অবাধ রাখা যেতে পারে না। আর এটা এমন কষ্টকর ব্যাপার, যা ইচ্ছা করে সহ্য করা এদের পক্ষে সম্ভব না। এজন্য তারা চায় যে, এ ঘড়ি যেমন আছে তেমনি ঝুলতে থাকুক, আর দূর হতে লোকেরা দেখে এটাকে ঘড়ি মনে করে প্রতারিত হতে থাকুক। পক্ষান্তরে যারা

www.pathagar.com

এহেন অকর্মন্য ঘড়িকে অত্যন্ত ভালবাসে, তারা এতে খুব ঘন ঘন চাবি দিতে আর একে সাফ করতেই মশগুল। কিন্তু কোনদিন ভুলক্রমে এর অংশগুলো ঠিকমত সাজাতে এবং অন্য মেশিনের জিনিসগুলো বের করে ফেলতে প্রস্তুত হবে না, এটা সত্যই দুঃখের কথা। আর এ ঘড়ির অংশগুলোর মধ্যে কিছু বের করে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে ইসলামের চির শত্রু ইহুদীবাদীরা। তাই এই ভেজাল অংশ অবিকল রেখে ধুয়া মুছা নিষ্ফল যেনেও যারা তা করছেন অর্থাৎ মুসলমানদের ধোকা দিচেছন বা ধোকার কাজে সহায়তা করছেন তারা ইসলামের মূল শত্রু ইহুদীবাদীদের সাহায্য সহযোগিতা করছেন, ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করছেন।

আমি যদি আপনাদের এরূপ মতে সায় দিতে পারতাম তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু আমি তা পারছি না। যে সত্য আমি জানতে পেরেছি, তার বিরূদ্ধে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, বর্তমান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামযের সাথে তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশদ প্রভৃতি নামাযও যদি পড়া হয়, পাঁচ ঘণ্টা করে দৈনিক কুরআন শরীফ মধুর সুরে তেলাওয়াত করা হয়, রমযান শরীফ ছাড়াও বছরে অবশিষ্ট ১১ মাসের সাড়ে পাঁচ মাসও যদি রোযা রাখা হয় তবুও কোন ফল হবে না। কারণ ঘড়ির পার্টসহ তো ঠিক নেই। ঘড়ি, গাড়ী, মটর সাইকেল, হেলিকপ্টার, এ্যারোপ্লেন জঙ্গিবিমান, কামান বন্দুক আর আনুবিক অস্ত্র ঠেলাগাড়ী আর রিক্সার পার্টস একত্র হয়ে একটি খিচুড়ি তৈরী হয়েছে যা চাবি দিলে চলার কথা ভাবাও পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। গাড়তবে ঘড়ির মধ্যে তার আসল কলকজা রেখে ঠিকমত সাজানোর পরে সামান্য একটু চাবি দিলেই তা চলতে থাকবে, আর সঠিকভাবে সময়ও নির্দেশ করতে পারবে। তখন খানিকটা সাফ করা আর কয়েক ফোঁটা তেল দিলেও খানিকটা সুফল লাভ করা যাবে। অন্যথায় সারাজীবন ভরে চাবি দিলেও এ ঘড়ি কখনো চলবে না এবং এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য ও লাভ করা যাবে না। ভেজাল অংশ বের করার কোন বিকল্প নেই। যা ইহুদীবাদীদের সুকোশলে ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া কৃতকর্ম।

নামাযের পরেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার যে ইবাদাত ফরয করেছেন তা হচ্ছে রমযান মাসের রোযা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী

www.pathagar.com

সহবাস বন্ধ রাখার নামই রোযা। নামাযের ন্যায় এ রোযাকেও আবহমানকাল থেকে সকল নবীর শরীয়াতেই ফরয করা হয়েছে। অতীতের সকল নবীর উম্মতগণ এমনিভাবেই রোযা রাখতো, যেমন রাখছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর উম্মাতগণ। অবশ্য রোযার হুকুম আহকাম, রোযার সংখ্যা এবং রোযার সময় ও মুদ্দতের ব্যাপারে বিভিন্ন নবীগণের শরীয়াতে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক ধর্মেই রোযা রাখার প্রথা কোন না কোন প্রকারে বর্তমান আছে। অবশ্য তারা এতে নিজেদের ইচ্ছামত অনেক কিছু যোগ করে নিয়েছে এবং নানাভাবে এর রূপ বিকৃত করে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর তরফ থেকে যত শরীয়াত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা রাখার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। চিন্তা করার বিষয় এই যে, রোযার মধ্যে এমন কি বস্তু নিহিত আছে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা সকল যুগের শরীয়তেই এর ব্যবস্থা করেছেন।

ইতোপূর্বে আরো কয়েকবার বলেছি যে, মানুষের সমগ্র জীবনকে ইবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগীতে পরিণত করাই হচ্ছে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। মানুষ জন্মগতভাবেই আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর বন্দেগী তার প্রকৃত স্বভাব। কাজেই ইবাদাত অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর বন্দেগী পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এবং সকল সময় চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহর সন্তোষ কিসে, আর কোন্ জিনিসে তার অসন্তোষ। তারপর যে দিকেই এবং যে কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা যাবে, মানুষের সে দিকেই যাওয়া উচিত এবং যেদিকে তাঁর অসুন্তষ্টি সেদিক থেকে ঠিক তেমনি দূরে থাকা উচিত, যেমন আগুন থেকে প্রত্যেকটি মানুষ দূরে থাকে। যে পথ আল্লাহ পছন্দ করেন সেই পথে চলা, যে পথ তিনি পছন্দ করেন না সেই পথে না চলাই মানুষের কর্তব্য। এভাবে মানুষের সমগ্র জীবন যখন গঠিত হবে তখন প্রমাণিত হবে যে, সে যথাযথভাবে আল্লাহর

www.pathagar.com

বন্দেগী করছে এবং "মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" এই ভাবে মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে পারবে তখন আল্লাহর এ ঘোষণা অনুসারে সে নিজের জন্মের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারবে।

একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নামে পরিচিত যে ইবাদাতগুলো মানুষের প্রতি ফরয করা হয়েছে, মানুষকে সেই আসল ইবাদাতের জন্য তৈরি করাই হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এগুলো ফরয সাব্যস্ত করার অর্থ এ নয় যে, গুণে গুণে দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়লেই, রমজান মাসে ত্রিশ দিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট সহ্য করলেই, মালদার হলে বছরে একবার যাকাত এবং জীবনে একবার হজ্জ আদায় করলেই আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য পুরোপুরি পালন হয়ে গেল এবং তারপর মানুষের পূর্ণ আযাদী- যা ইচ্ছে তাই করতে পারে- বরং এ ইবাদাতগুলোর ভিতর দিয়ে মানুষকে ঠিকভাবে গঠন করা এবং তার গোটা জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর যোগ্য করে তোলাই হচ্ছে এ ইবাদাতগুলোকে ফরয করার আসল উদ্দেশ্য। এখন উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিচার করতে হবে যে, রোযা মানুষকে কেমন করে সেই আসল ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে।

রোযা ছাড়া অন্যান্য যেসব ইবাদাত আছে, তা পালন করার জন্য কোন না কোন রূপে বাহ্যিক প্রকাশের আশ্রয় নিতে হয়। নামায পড়ার সময় নামাযীকে ওঠা-বসা ও রুকূ'- সিজদা করতে হয়। এটা অন্য লোকে দেখতে পারে। হজ্জ করার জন্য দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়, আর সেই সফরও করতে হয় হাজার হাজার মানুষের সাথে মিলে। যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও অন্ততপক্ষে দু'জনকে জানতে হয়- একজন দেয়, আর একজন তা গ্রহণ করে। এসব ইবাদাতের কথা কারো কাছে গোপন থাকতে পারে না। এটা আদায় করলেই অন্য লোকে জানতে পারে। কিন্তু 'রোযার' কথা আল্লাহ এবং রোযাদার ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি সকলের সামনে সেহরী খায় ইফতারের সময় সকলের সাথে মিলে ইফতার করে আর দিনের বেলায় গোপনে কিছু খায় বা পান করে, তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যভাবে সকল লোকই তাকে রোযাদার বলে মনে করবে একথা ঠিক; কিন্তু আসলে সে মোটেই রোযাদার নয়।

www.pathagar.com

রোযাদারের এ দিকটা সামনে রেখে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে রোযা রাখে লুকিয়ে কিছু পানাহার করে না, কঠিন গরমের সময় পিপাসায় কলিজা যখন ফেটে যাবার উপক্রম হয় তখন যে এক ফোঁটা পানি পান করে না- অসহ্য ক্ষুধার দরুন চোখে তারা ফুটতে শুরু করলেও কোন কিছু খাওয়ার ইচছা করে না- সেই ব্যক্তির ঈমান মজবুত? আল্লাহ তাআলা যে আলেমুল গায়েব সেই কথা সে কতখানি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। কত নিঃসন্দেহে সে জানে যে, তার কাজ দুনিয়ার লোকদের কাছে অজানা থাকলেও সারাজাহানের মালিকের কাছে কিছু অজানা নয়। তার মনে আল্লাহর ভয় কত তীব্র, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে এমন কাজ করে না যাতে তার রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে। পরকালের বিচারের প্রতি তার আকীদা বিশ্বাস কত দৃঢ়। এক মাস সময়ের মধ্যে সে কমপক্ষে তিনশত ষাট ঘন্টাকাল রোযা থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে তার মনে কখনো কোন সন্দেহ জাগে না। এ ব্যাপারে তার মনে যদি এতটুকু সন্দেহ হতো যে, পরকাল আছে কিনা, কিংবা সেখানে আযাব বা সওয়াব হবে কিনা বলে কোন দ্বন্দ্ব যদি তার মনে থাকতো তাহলে সে কিছুতেই তার রোযা পূর্ণ করতে পারতো না। এ সন্দেহ সৃষ্টি হলে কেবল আল্লাহর হুকুম বলে মানুষ কিন্তু পানাহার না করার সংকল্পে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বছর এক মাসকাল মুসলমানদের ঈমানের ধারাবাহিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ পরীক্ষায় মানুষ যতই মজবুত হয়, ততই তার ঈমান দৃঢ় হয়। বস্তুত এটা পরীক্ষার ওপরে পরীক্ষা, ট্রেনিং-এর ওপর ট্রেনিং। কারো কাছে যখন কোন আমানত রাখা হয় তখন তার ঈমান বড় পরীক্ষায় পড়ে যায়। যদি সে এ পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং সে যদি আমানতের খেয়ানত না করে, তখন তার মধ্যে আমানতের বোঝা বহন করার আরও বেশি ক্ষমতা হয়। ক্রমে সে আরও আমানতদার হতে থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও ক্রমাগতভাবে এক মাসকাল পর্যন্ত দৈনিক বারো চৌদ্দ ঘণ্টা ধরে মুসলমানদের ঈমানকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এ পরীক্ষায় সে যখন পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে অন্যান্য গুনাহ হতে ফিরে থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে জাগ্রত হয়। তখন সে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করে গোপনেও আল্লাহর আইন ভঙ্গ

www.pathagar.com

করতে পারে না। প্রত্যেকটি কাজে সে সেই কিয়ামতের দিনকে মনে করবে যেদিন সবকিছুই খুলে যাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাল কাজ ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেয়া হবে। একথা বলা হয়েছে কুরআন পাকে নিম্নলিখিত আয়াতেঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবত তোমরা পরহেযগার হবে।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৮৩)

রোযার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মুসলমানকে দীর্ঘকাল শরীয়াতের হুকুম ধারাবাহিকভাবে পালন করতে বাধ্য করে। নামাযের এক ওয়াক্তে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাকাত বছরে একবার মাত্র আদায় করতে হয়। হজ্জে অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগে, কিন্তু তার সুযোগ সমগ্র জীবনে মাত্র একবারই এসে থাকে। তাও আবার সকল মুসলমানের জন্য নয়, কেবল মালদার লোকেরাই সেই সুযোগ পায়। কিন্তু রোযা এসব ইবাদাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তা প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস ধরে দিন-রাত প্রত্যেক (সমর্থ) মুসলমানকে ইসলামী শরীয়াত পালনের অভ্যাস করায়। সেহরী খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট, সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়- একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারের পরে খানাপিনা ও আরাম করার অনুমতি আছে। কিন্তু তার পরেই তারাবীহ নামাযের জন্য দৌড়াতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানকে ক্রমগতভাবে সিপাহীদের ন্যায় একটি মাস মজবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। তারপর এগারো মাসের জন্য তাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ট্রেনিং সে পায়, পরবর্তী এগারো মাস তার কাজ-কর্মের ভেতর তা যেন প্রতিফলিত হয় এবং তারপরও কোন বিষয় অসম্পূর্ণ থাকলে পরবর্তী বছর তা যেন পূর্ণ করে দেয়া হয়।

মুসলমান সমাজের এক এক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে এ ট্রেনিং নেয়ার ব্যবস্থা করা হলে তা মোটেই ফলপ্রসূ হতো না। সৈনিকদেরকে কখনও এক একজন করে প্যারেড করানো হয় না, গোটা সৈন্যবাহিনীকে একত্রে এক সাথে তা করান হয়। সকলকে একই সময় 'বিউগলের' আওয়ায শুনে উঠতে হয় এবং 'বিউগলের'

www.pathagar.com

আওয়াজ অনুসারে নির্দিষ্ট কাজে লেগে যেতে হয়। ফলে সৈন্যদের মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস হয়। সেই সাথে একজনের ট্রেনিং এ অন্যজন সহযোগিতা করে থাকে। একজনের ট্রেনিং কোনরূপ অসম্পূর্ণ থাকলে দ্বিতীয়জন এবং দ্বিতীয়জনের অসম্পূর্ণ থাকলে তৃতীয়জন তা পূর্ণ করে থাকে। ঠিক এজন্য ইসলামে রমযান মাসকে রোযা পালন করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমগ্র মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে, তারা সকলে মিলে এ সময়ে রোযা রাখতে শুরু করবেন। বস্তুত এ হুকুমটি মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদাতকে সামগ্রিক ইবাদাতে পরিণত করে দিয়েছে। এক সংখ্যাকে লক্ষ দ্বারা গুণ করলে যেমন লক্ষের একটি বিরাট সংখ্যা হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এক এক ব্যক্তির আলাদাভাবে রোযা রাখায় যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় লক্ষ কোটি মানুষ একত্রে রোযা রাখলে লক্ষ কোটি গুণ বেশি উন্নতি লাভ করা সম্ভব। রমযানের মাস সমগ্র পরিবেশকে নেকি আর পরহেযগারীর পবিত্র ভাবধারায় উজ্জ্বল করে তুলে। গোটা জাতীয় জীবনে তাকওয়া পরহেযগারীর সবুজ তাজা ফসল বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজেকেই গুনাহ হতে বাঁচাতে চেষ্টা করে না বরং তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকলে তার জন্য অন্য সব রোযাদার ভাই তার সাহায্য ও সহযোগিতা করে। রোযা রেখে গুনাহ করতে প্রত্যেকটি মানুষের লজ্জাবোধ হয়; পক্ষান্তরে প্রত্যেকের মনে কিছু ভাল ও সওয়াবের কাজ করার ইচ্ছা জাগে। সম্ভব হলে গরিবকে একবেলা খাবার দেয়, উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় দান করে, বিপন্নের সাহায্য করে। কোথাও নেক কাজ হতে দেখলে তাতে অংশগ্রহণ করে। আর কোথাও প্রকাশ্যভাবে পাপ অনুষ্ঠান হতে থাকলে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। এভাবে চারদিকে নেকি ও তাকওয়ার একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বস্তুত দুনিয়াতে সকল ফসল নির্দিষ্ট মৌসুমে ফলে থাকে। তখন চারদিকে কেবল সেই ফসলেরই চমৎকার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্যই শেষ নবী (স) এরশাদ করেছেনঃ

"মানুষের প্রত্যেকটি কাজের ফল আল্লাহর দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়; একটি নেক কাজের ফল দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন রোযাকে এর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কারণ রোযা খাচ করে কেবল আমারই জন্য রাখা হয়। আর আমিই এর প্রতিফল দান করবো।"

www.pathagar.com

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নেক কাজ যে করে তার নিয়ত অনুসারে নেক কাজের ফল অত্যধিক বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু সেই সবের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু রোযার ফল বৃদ্ধির কোন শেষ সীমা নির্দিষ্ট নেই। রমযান মাস যেহেতু মঙ্গল, কল্যাণ ও নেকি বৃদ্ধি পাবার মৌসুম, এ মৌসুমে কেবল একজন মুসলমানই নয়, লক্ষ্য কোটি মুসলমান মিলে এ নেকীর বাগিচায় পানি ঢালে। এজন্য তা সীমা সংখ্যাহীন ফল দান করতে পারে। এ মাসে যত ভাল নিয়তের সাথে ভাল কাজ করা যাবে, যত বরকত রোযাদার নিজে লাভ করবে এবং অন্য রোযাদার ভাইকে দিতে চেষ্টা করবে- তারপর এটা ততবেশি সুফল দেবে। এটা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে যার কোন শেষ সীমা পরিসীমা থাকবে না। এখন মুসলমান নিজেরাই যদি এটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

রোযার এ আশ্চর্যজনক সুফল এবং বরকতের কথা শুনে প্রত্যেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আজ তা কোথায় গেল? মুসলমান আজ রোযা রাখে নামায পড়ে। কিন্তু এর সুফল যা বর্ণনা করা হয় তা তারা আদৌ লাভ করছে না কেন? এর একটি কারণ আমি পূর্বেই বলেছি। তা এই যে, ইসলামের ব্যাপক বিধানের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে ফেলার পর এবং তাতে বাইরের অনেক নতুন জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তা থেকে আসল ফল লাভের আশা করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইবাদাত সম্পর্কে বর্তমান মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা এখন মনে করছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খানাপিনা না করার নামই ইবাদাত। আর এ কাজ কোন লোক করলেই তার ইবাদাত পূর্ণ হলো, এরূপ মনে করা হয়। এভাবে অন্যান্য ইবাদাতেরও কেবল বাইরের কাঠামো ও অনুষ্ঠানকেই ইবাদাত বলে মনে করা হয়। এজন্যই ইবাদাতের আসল ভাবধারা যা মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদের শতকরা ৯৯ জন বরং তার চেয়েও বেশি লোক তা থেকে বঞ্চিত। ঠিক এজন্যই ইবাদাতসমূহের পূর্ণ ফল দেখাতে পারে না। কারণ ইসলামে নিয়ত, বুদ্ধি বিবেচনা এবং আন্তরিকতার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে।

www.pathagar.com

মানুষ যে কাজই করে না কেন, তাতে দু'টি জিনিস অবশ্যই থাকবেঃ একটি তার উদ্দেশ্য- যে জন্য সেই কাজ করা হয়। অন্যটি সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য গৃহীত পন্থা বা পদ্ধতি। উদারহণ স্বরূপ ভাত খাওয়ার কথা বলা যেতে পারে। ভাত খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং দৈহিক শক্তির স্থায়িত্ব। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'গ্রাস' বানাতে হয়, মুখে দিতে হয়, চিবাতে হয় এবং গিলতে হয়। খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও সর্বাপেক্ষা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থা এটাই। এজন্য খাওয়ার কাজ সমাধার জন্যই এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, এ ব্যাপারে আসল জিনিস হচ্ছে এর উদ্দেশ্য- যে জন্য খাওয়া হয়- খাওয়ার এ পন্থাটি আসল বস্তু নয়। এখন কোন ব্যক্তি যদি মাটি, ছাঁই বা বালি মুঠি ভরে মুখে দেয় এবং চিবিয়ে গিলে ফেলে; তবে তাকে কি বলা যাবে? বলতেই হবে যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? এজন্য যে, খাওয়ার এ চারটি নিয়ম পালন করলেই তো আর খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, তেমনি যে ব্যক্তি ভাত খাওয়ার সাথে সাথে বমি করে ফেলে, তারপরও সে যদি অভিযোগ করে যে, ভাত খাওয়ার যে উপকারিতা বর্ণনা করা হয়, তা আমি মোটেই পাচ্ছি না। বরং আমি তো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। এ নির্বোধ ব্যক্তি নিজের এ দুর্বলতার জন্য খাওয়ার ওপরে দোষারোপ করছে, অথচ আসলে এটা তারই নির্বুদ্ধিতার ফল মাত্র। সে নির্বোধের ন্যায় মনে করেছেঃ যে কয়টি নিয়ম পালনের দ্বারা খাওয়ার কাজ সমাধা করা হয়, ব্যাস, শুধু সেই কয়টি সম্পন্ন হলেই জীবনী শক্তি লাভ করা যাবে। এজন্যই সে মনে করেছে যে, এখন পেটে ভাতের বোঝা রেখে লাভ কি, তা বের করে ফেলাই উচিত। এভাবে পেট হালকা হয়ে যাবে। খাওয়ার বাহ্যিক নিয়ম তো পালন করা হয়েছে। এ নির্বোধ ব্যক্তি এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছে এবং কার্যত তাই করছে। সুতরাং তার দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। একথা তার জানা উচিত ছিল যে, ভাত যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে গিয়ে হযম না হবে এবং রক্তে পরিণত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে না পড়বে- ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনী শক্তি কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। খাওয়ার কাজের বাহ্যিক নিয়মগুলো যদিও অপরিহার্য, কারণ তা ছাড়া ভাত পেটের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এ বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই খাওয়ার আসল উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। এ বাহ্যিক অনুষ্ঠানে এমন কোন যাদু নেই যে, এগুলো সম্পন্ন

www.pathagar.com

হলেই ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হবে। রক্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন, তা সেই নিয়ম অনুসারেই হতে পারে। বহির্ভূত পন্থায় আদৌ তা হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে যে উদাহরণটি বিস্তারিত বললাম, তা একটু চিন্তা করলেই বর্তমান মুসলমানদের ইবাদাত নিস্ফল হয়ে যাওয়ার কারণ সহজেই বুঝতে পারা যায়। পূর্বে যেমন একাধিকবার বলেছি মুসলমানগণ নামায রোগার আরকান (অভ্যন্তরিণ জরুরি কাজ) এবং তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই আসল ইবাদাত বলে মনে করে। অথচ এটা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। তারা মনে করে যে, এ অনুষ্ঠানসমূহ যে ব্যক্তি ঠিকভাবে আদায় করলো, সে আল্লাহর ইবাদাত সুসম্পন্ন করলো। এদেরকে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি ভাতের মুঠি বানাল, মুখে রাখল, চিবালো এবং গিলে ফেললো। আর এ চারটি কাজ করাকেই খাওয়া এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য এটা থেকেই হাসিল হলো বলে মনে করলো। সে এভাবে মাটি খেলো কিংবা বালি খেলো অথবা বমি করে ফেললো। আর এ চারটি কাজ করাকেই খাওয়া এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য এটা থেকেই হাসিল হলো বলে মনে করলো। সে এভাবে মাটি খেলো কিংবা বালি খেলো অথবা তা বমি করে ফেললো তাতে কিছু যায় আসে না। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, মুসলমানদের এ ভ্রান্তি যদি না হয়ে থাকে তাহলে রোযাদার ব্যক্তি কেমন করে মিথ্যা কথা বলতে পারে ও কেমন করে পরের 'গিবত' করতে পারে, কথায় কথায় তারা লড়াই-ঝগড়া কেমন করে করতে পারে? তাদের মুখ থেকে গালি-গালায ও অশ্লীল কথা কেমন করে বের হয়? পরের হক তারা কিভাবে কেড়ে নেয়? হারাম খাওয়া ও অন্যকে হারাম খাওয়ানোর কাজ কেমন করে করতে পারে যারা আল্লাহর ইবাদাত করছে। বালি কিংবা মাটি খেয়ে যারা মনে করে যে, তারা খাওয়ার কাজ সমাধা করছে, এরা ঠিক তাদেরই মতো।

বিশেষভাবে ভেবে দেখার বিষয় এই যে, গোটা রমযান মাস ভরে ৩৬০ ঘন্টাকাল আল্লাহর ইবাদাত করার পরে যখন মুসলমানগণ অবসর গ্রহণ করে তখন শাওয়ালের প্রথম তারিখেই এ বিরাট ইবাদাতের সকল প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় কেন? হিন্দু জাতি তাদের মেলা-উৎসবে যা কিছু করে. মুসলমানগণ ঈদের উৎসবে ঠিক তাই করে। এমনকি শহর অঞ্চলে ঈদের দিন ব্যভিচার, নাচ-গান,

www.pathagar.com

মদ পান আর জুয়া খেলার তুফান বইতে শুরু করে। অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যে, দিনের বেলা রোযা রেখে সারারাত মদ খায়, যেনা করে। সাধারণ মুসলমান আল্লাহর ফযলে এতটা পথভ্রষ্ট এখনো হয়নি; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, রমযান খতম হওয়ার পরেই তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রভাব কতজন লোকের ওপর বর্তমান থাকে? আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করতে কতজন লোক ভয় পায়? নেক কাজ করতে কতজন লোক অংশগ্রহণ করে? স্বার্থপরতা কতজনের দূর হয়ে যায়?

ভেবে দেখুন, এর প্রকৃত কারণ কি হতে পারে? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এর একমাত্র কারণ এই যে, অধিকাংশ মুসলমানদের মনে ইবাদাতের অর্থ এবং সেই সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তারা মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু না খাওয়া, কিছু পান না করাকেই রোযা বলে। আর এটা করার নামই ইবাদাত। এজন্য দেখা যায় যে, মুসলমান রোযার খুব সম্মান করে, খুব যত্নের সাথে রক্ষা করে চলে- তাদের মনে আল্লাহর ভয় এতবেশি হয় যে, যেসব কাজে রোযা ভঙ্গ হবার আশংকা হয়, তা থেকে তারা দূরে সরে থাকে। এমনকি প্রাণের আশংকা দেখা দিলেও কেউ রোযা ভাংগতে রাজী হয় না। কিন্তু মুললমানগণ একথা জানে যে, কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামই আসল ইবাদাত নয়, এটা ইবাদাতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। এ অনুষ্ঠান পালন করার উদ্দেশ্য হচেছ মুসলমানদের মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা মাত্র। তাদের মধ্যে যেন এতদূর শক্তি জেগে ওঠে যে, তারা বড় বড় লাভজনক কাজকেও কেবল আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে (নিজের মনকে শক্ত করে) তা পরিত্যাগ করে। আর কঠিন বিপদের কাজেও যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের মনকে শক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ শক্তি মুসলমানদের মধ্যে তখনি আসতে পারে, যখন রোযার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে এবং রমযানের পুরা মাস আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায় নিজের মনকে নফসের খাহেস হতে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান অধিকাংশ মুসলমান রমযানের পরেই এ অভ্যাসকে এবং এ অভ্যাসলব্ধ গুণগুলোকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন কেউ ভাত খেয়েই অমনি বমি করে ফেলে। উপরন্তু অনেক মুসলমান ইফতার করার সাথে সাথে সারাদিনের পরহেযগারী ও তাকওয়াকে উগরিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় রোযার আসল উদ্দেশ্য যে কোন মতেই হাসিল হতে পারে না তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। রোযা কোন যাদু নয়, এর কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই তা দ্বারা বড় কোন উদ্দেশ্য লাভ করা যেতে পারে না। ভাত হতে ততক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পাকস্থলিতে গিয়ে হযম হয় এবং রক্ত হয়ে শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। তদ্রূপ রোযা দ্বারাও কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যেতে পারে না-যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদার রোযার আসল উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝতে না পারে এবং তার মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে তা অঙ্কিত না হয় এবং চিন্তা-কল্পনা, ইচ্ছা ও কর্ম সবকিছুর ওপর তা একেবারে প্রভাবশীল হয়ে না যায়।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা রোযার হুকুম দেয়ার পর বলেছেনঃ অর্থাৎ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে সম্ভবত তোমরা মোত্তাকি ও পরহেযগার হতে পারবে। আল্লাহ পাক একথা বলেন নি যে, রোযা রেখে তোমরা নিশ্চয়ই পরহেযগার ও মোত্তাকি হতে পারবে। কারণ রোযা হতে যে সুফল লাভ করা যায় তা রোযাদারের নিয়ত, ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও আগ্রহের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য জানতে ও ভাল করে বুঝতে পারবে এবং তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা করবে সে তো কমবেশি মোত্তাকি নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যে এর উদ্দেশ্যই জানবে না এবং তা হাসিলের জন্য চেষ্টা করবে না, রোযা দ্বারা তার কোন উপকারই হবার আশা নেই।

হুজুর পাক (স) নানাভাবে রোযার আসল উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনই সার্থকতা নেই। তিনি বলেছেনঃ
"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও খারাব কাজ পরিত্যাগ করবে না তার শুধু খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।"

অন্য হাদীসে রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেনঃ
"অনেক রোযাদার এমন আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যার ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদাতকারী অনেক মানুষও এমন আছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।"

www.pathagar.com

এ দুটি হাদীসের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা দ্বারা ভালরূপে জানা যায় যে, শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কাতর থাকাই ইবাদাত নয়, এটা আসল ইবাদাতের উপায় অবলম্বন মাত্র। আর আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আইন ভঙ্গের অপরাধ না করা এবং যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, আর যতদূর সম্ভব নিজের আমিত্বকে নষ্ট করা যায়; আল্লাহকে ভালবেসে সেসব কাজ ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে পালন করা আসল ইবাদাত। এ ইবাদাত যে করতে পারবে না, সে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে নিজের পেটকে কষ্ট দিয়ে তার বার-চৌদ্দ ঘন্টা উপবাস থেকে কোনই লাভ নেই। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করিম (স) এরশাদ করেছেনঃ
"ঈমান ও আন্তরিকতা ও শতর্কতার সাথে রোজার শর্তসমূহ পূরণ করে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার অতীতের গুনাহ-অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে।"

ঈমান-অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে একজন মুমিনের যে ধারণা ও আকীদা হওয়া উচিত তা স্মরণ থাকা চাই আর এহতেসাব এর অর্থ এই যে, মুসলমান সব সময়েই নিজেও চিন্তা-কল্পনা করবে, নিজের কাজ-কর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ও ভেবে দেখবে যে, আল্লাহর মর্জির খেলাফ চলছে না তো। এ দুটি জিনিসের সাথে যে ব্যক্তি রমযানের পূর্ণ রোযা রাখবে, সে তার অতীতের সব গুণাহ অপরাধ মাফ করিয়ে নিতে পারবে। অতীতে সে কখনও নাফরমান আর আল্লাহদ্রোহী বান্দা থাকলেও এভাবে রোযা রাখলে প্রমাণিত হবে যে, এখন সে প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন করেছে। হাদীসে উল্লেখিত রয়েছেঃ

"গুনাহ থেকে যে তাওবা করে, সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ
"রোযা একটি ঢালের ন্যায় (ঢাল যেন দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তেমনি রোযাও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ)। সুতরাং যে ব্যক্তি রোযা রাখবে, তার (এ ঢাল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়) কিংবা তার বন্ধুর সাথে লড়াই-ঝগড়া করলেও পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, ভাই, আমি রোযা রেখেছি, তোমার সাথে এ অন্যায় কাজে আমি যোগ দেব এমন আশা করতে পারি না।"

www.pathagar.com

অন্য কয়েকটি হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী (স) বলেছেন যে, রোযা রেখে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে নেক কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেকটি ভাল কাজেই অংশগ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে রোযা রাখা অবস্থায় রোযাদারের মনে তার অন্যান্য ভাইয়ের প্রতি খুব বেশি পরিমাণে সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হওয়ার দরুন খুব ভাল করেই অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহর গরিব বান্দাগণ দুঃখ ও দারিদ্রে কেমন করে দিন কাটায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রমযানে অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতেন। এ সময় কোন প্রার্থী তাঁর দুয়ার হতে বঞ্চিত হতে পারতো না। কোন কয়েদীও এ সময় বন্দী থাকতো না। একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

"রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে; তার এ কাজ তার গুনাহ্ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার কারণ হবে। রোযাদারের রোযা রাখায় যত সওয়াব হবে, তাতে তারও ঠিক ততখানি সওয়া হবে। কিন্তু তাতে রোযাদারের সওয়াব একটুও কম হবে না।"

রোযার অসংখ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সুফল রয়েছে। মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি সৃষ্টি করা তার অন্যতম। রোযা মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি কিরূপে জাগ্রত করে, তা সম্যকরূপে বুঝার জন্য সর্বপ্রথমে 'আত্মসংযম'-এর অর্থ জানা আবশ্যক। ইসলাম কোন্ ধরনের আত্মসংযমের পক্ষপাতী এবং রোযা মানুষের মধ্যে সেই শক্তি কিরূপে বিকশিত করে, তাও জেনে নেয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

মানুষের নিজস্ব সত্তা ও আত্মজ্ঞান যখন তার দেহ এবং অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করে নিতে পারে এবং মনের যাবতীয় কামনা-বাসনা ও আবেগ উচ্ছাসকে নিজের সিদ্ধান্তের অধীন ও অনুসারী করে তুলতে পারে, ঠিক তখনই হয় আত্মসংযম। একটি রাষ্ট্রে প্রধান শাসনকর্তার মর্যাদা যেরূপ হয়ে থাকে মানুষের নিজস্ব সত্তার মর্যাদা ও তদরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নফসের উপর। মানুষের দৈহিক ও মস্তিষ্কের শক্তি বিবেকের অধীন ন্যস্ত করতে হয়। নফস বা প্রবৃত্তি নিজের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করে বিবেক ও মনুষত্বের গুণাবলির দ্বারা শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে

www.pathagar.com

এবং নফসের আবেদনকে মঞ্জুর করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র বিবেকের। এখন কোন বিবেক যদি দুর্বল হয়, দেহ রাজ্যে নিজের ইচ্ছামত শাসন চালাবার ক্ষমতা যদি তার না-ই থাকে এবং নফসের আবেদন যদি নির্দেশের অনুরূপ হয় তবে সেই বিবেক বড় অসহায়, পরাজিত ও নিস্ক্রিয়। যে অশ্বারোহী নিজের অশ্বকে কাবু করতে পারে না, বরং সে নিজেই অশ্বের আয়ত্তাধীন হয়; মানুষের এ বিবেক ঠিক তারই মত অক্ষম। এ ধরনের দুর্বল মানুষ দুনিয়ায় কোনদিনই সফল জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে যাঁরাই নিজেদের কোন প্রভাব ও স্মৃতি চিহ্ন উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিকে বল প্রয়োগ করে হলেও- নিজের অধীন ও অনুগত করে নিয়েছেন। তাঁরা কোন দিনই নফসের লোভ-লালসার দাস এবং আবেগ-উচছাসের গোলাম হননি, তাঁরা সব সময়ই তার মনিব বা পরিচালক হিসেবেই রয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা-বাসনা অত্যন্ত মজবুত এবং সংকল্প অটল ছিল।

কিন্তু যে বিবেক নিজেই খোদা হয়ে বসে এবং যে বিবেক আল্লাহর দাস ও আদেশানুগামী হয়ে থাকে, এ দু প্রকার বিবেকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। সফল জীবনযাপনের জন্য স্বচেতন বিবেক একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু যে বিবেক সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, বিশ্ব মালিকের অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যে বিবেক কোন উচ্চতর নৈতিক বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, কোন হিসেবে গ্রহণকারীর কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত নয় সে কোন বিবেকবান নয় তা দিয়ে মানুষের কল্যান হতে পারে না। প্রথমে মানুষের বিবেক নিজ আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হবে, আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, তাঁর সন্তোষ লাভের জন্য চেষ্টা করা এবং তাঁর আইনের আনুগত্য করাকেই নিজের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে, তাঁরই সামনে নিজেকে দায়ী মনে করবে- ইসলাম এরূপ বিবেককেই সমর্থন করে। এরূপ অনুগত ও বিশ্বস্ত বিবেক স্বীয় দেহ ও শক্তি নিচয়ের ওপর নিজের প্রভুত্ব ক্ষমতা এবং তার মন ও কামনা-বাসনার ওপর স্বীয় শক্তি-আধিপত্য কায়েম করবে- যেন তা দুনিয়ায় সংস্কার সংশোধন করার জন্য এক বিরাট শক্তিরূপে মাথা তুলতে পারে।

•

www.pathagar.com

বস্তুত এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসংযমের প্রকৃত ও মূল কথা। রোযা মানুষের মধ্যে এরূপ আত্মসংযমের প্রবল শক্তি কিরূপে সৃষ্টি করে, এখন আমরা তাই আলোচনা করবো। নফস ও দেহের যাবতীয় দাবি দাওয়া যাচাই করে দেখলে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, তার মধ্যে তিনটি দাবি হচ্ছে মূল এবং ভিত্তিগত। বস্তুত এ তিনটিই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন দাবী। প্রথমেই হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবি। জীবন রক্ষা একমাত্র এরই ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়, যৌন আবেগের দাবি। মানুষের বংশ তথা মানব জাতির স্থিতির এটাই একমাত্র উপায় এবং তৃতীয়, শক্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবি। কর্মশক্তিকে নতুন করে জাগ্রত এবং বলিষ্ঠ করে তুলার জন্য এটা অপরিহার্য। মানুষের এ তিনটি দাবি যদি নিজ নিজ সীমার মধ্যে থাকে, তবে তা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার অনুরূপ হবে, সন্দেহ নেই। অন্যদিকে নফস ও দেহের কাছে এ জিনিসই হচ্ছে বড় ফাঁদ। একটু ঢিল-একটু সুযোগ পেলেই এ তিনটি ফাঁদ মানুষের বিবেককে বন্দী করে নিজের গোলাম- নিজের দাসানুদাস বানিয়ে নেয়। ফলে এর প্রত্যেকটি দাবিই সম্প্রসারিত হয়ে অসংখ্য দাবির একটি সুদীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে পড়ে। একটি দুর্বল বিবেক যখন এসব দাবির কাছে পরাজিত হয়, তখন খাদ্যের দাবি তাকে পেটের দাস বানিয়ে দেয়, যৌনক্ষুধা তাকে পশু অপেক্ষাও নিম্নস্তরে ঠেলে দেয় এবং দেহের বিশ্রামপ্রিয়তা তার ইচ্ছাশক্তিকে বিলোপ করে। অতপর সে আর তার নফস ও দেহের শাসক বা পরিচালক থাকে না, বরং সে তখন এর অধীন আদেশানুগত দাসে পরিণত হয় এবং এর নির্দেশসমূহকে- ভাল-মন্দ, সংগত, অসংগত সকল উপদেশ- পালন করে চলাই তার একমাত্র কাজ হয়।

রোযা নফসের এ তিনটি লালসা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে- নিয়মানুগ করে তোলে এবং বিবেককে তার ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে অভ্যস্ত করে দেয়। যে বিবেক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এ রোযা তাকে সম্বোধন করে বলেঃ আল্লাহ আজ সারাটি দিন পানাহার করাকে তোমার ওপর নিষেধ বা হারাম করেছে, এ সময়ের মধ্যে কোন পবিত্র খাদ্য এবং সদুপায়ে অর্জিত কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাও জায়েজ নয়।

সে বলেঃ আজ তোমার মালিক মহান আল্লাহ তোমার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিতান্ত

www.pathagar.com

হালাল উপায়েও নফসের লালসা-বাসনা পূর্ণ করা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সে আরও বলে দেয় যে, সারা দিনের দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার পর যখন তুমি ইফতার করবে, তখন তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে আরাম করার পরিবর্তে ওঠ এবং অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশি ইবাদাত কর।

বস্তুত এতেই তোমার রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ নিহিত আছে। রোযা তাকে এটাও জানিয়ে দেয় যে, বহু রাকাআতের নামায সমাপ্ত করে যখন বিশ্রাম করবে, তখন সকাল পর্যন্ত বেঁহুশ হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও শেষ রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য জাগো এবং সুবহে সাদেকের আলোকচ্ছটা ফুটে ওঠার পূর্বেই তোমার দেহকে খাদ্য দ্বারা শক্তিশালী করে তোল। নিজেই রোযার এসব হুকুম-আহকাম মানুষকে শুনিয়ে তদানুযায়ী আমল করার সম্পূর্ণ ভার তার ওপরেই ন্যস্ত করে। তার পিছনে কোন পুলিশ কোন সি.আই.ডি. কিংবা প্রভাব বিস্তার করার মত শক্তি নিযুক্ত করা হয় না। সে যদি গোপনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করে, তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পায় না। তারাবীহ নামায পড়া থেকে বাঁচার জন্য সে যদি কোন শরীয়াতী কৌশল অবলম্বন করে তবে কোন পার্থিব শক্তিই তার প্রতিরোধ করতে পারে না। সবকিছু তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মু'মিন ব্যক্তির বিবেক যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হয়ে থাকে, তার ইচ্ছাশক্তিতে যদি নফসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত ক্ষমতা রাখে, তবে সে নিজেই আহারের তীব্র আগ্রহ, যৌনক্ষুধা ও লালসাকে এবং বিশ্রাম প্রিয়তাকে রোযার উপস্থাপিত অসাধারণ নিয়ম-নীতির বাঁধনে নিজেই মজবুত করে বেঁধে দেবে।

এটা কেবল একদিনেরই অনুশীলন নয়, এ ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য মাত্র একটি দিন মোটেই যথেষ্ট নয়। ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ ৩০টি দিন মানুষের বিবেককে এমনি ট্রেনিং ও অনুশীলনের মধ্যেই অতিক্রম করতে হয়। বছরে একটি বার পুরো ৭২০ ঘণ্টার জন্য এ প্রোগ্রাম রচনা করা হয় যে, শেষ রাতে জেগে সেহরী খাও, ঊষার শুভ্রচ্ছটার সূচনা হলেই পানাহার বন্ধ কর। সমগ্র দিন ভর সকল প্রকার খানাপিনা পরিহার কর। সূর্যাস্তের ঠিক পর মুহূর্তেই যথাসময়ে ইফতার কর। তারপর রাতের একটি অংশ তারাবীর নামাযে- যে নামায

www.pathagar.com

সাধারণত পড়া হয় না- অতিবাহিত কর। তারপর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার নতুন করে কার্যসূচি অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও। এভাবে পুরো এক মাস ধরে ক্রমাগত নফসকে তার তিনটি সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিশালী দাবী ও লালসাকে এক কঠিন নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে বিবেকের মধ্যে একটি বিরাট শক্তি স্ফুরিত হয়, তা আল্লাহর মর্জি অনুসারে নিজের নফস ও দেহের ওপরে শাসন ক্ষমতা চালাতে সমর্থ হয়। পরন্তু সারা জীবনভর মাত্র একবারের জন্য এ প্রোগ্রাম করা হয় নি। বালেগ হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক বছর দীর্ঘ একটি মাস এ কাজেই ব্যয়িত হয়। ফলে নফসের ওপর বিবেকের বাঁধন বার বার নতুন এবং শক্ত হয়ে যায়।

এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কেবল এটাই নয় যে, মু'মিনের বিবেক তার ক্ষুধা, পিপাসা, যৌনবৃত্তি এবং বিশ্রাম অভিলাষকেই আয়ত্তাধীন করে নিবে আর কেবল রমযান মাসের জন্যই এরূপ হবে, এ উদ্দেশ্য তার নয়। মানুষের তিনটি সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে বেশি জোরদার ও শাণিত হাতিয়ারের সাথে মুকাবিলা করে তার বিবেক অন্যান্য সমগ্র আবেগ-উচ্ছ্বাস, হৃদয়বৃত্তি এবং সকল প্রকার লোভ-লালসাকে নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করে দেয়। তাতে এমন এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয় যে, কেবল রমযান মাসেই নয় অতপর বাকি এগারোটি মাস ধরে তা বলিষ্ঠ ও শাণিত থাকে এবং রীতিমত কাজ করে। সত্যিকার মানুষ হিসাবে আল্লাহ্‌র খাটি বান্দা বানিয়ে তবে ছেড়ে দেয়। এ সময় আল্লাহর নির্ধারিত প্রত্যেকটি কাজেই সে তার দেহ ও যাবতীয় শক্তি নিযুক্ত করতে পারে, আল্লাহর সন্তোষ লাভ হয় এমন প্রত্যেকটি ভাল কাজের চেষ্টা করতে পারে, আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অমনোনীত প্রত্যেকটি পাপ কাজকে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং তার যাবতীয় লোভ-লালসাকে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও হৃদয় বৃত্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়। তার নফসের হাতে ছেড়ে দেয় না, তাই যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই টেনে নিতে পারে না। প্রভুত্বের রজ্জু তার নিজের হাতেই ধরে রাখে। নফসের যেসব লালসাকে যে সময় যতখানি এবং যেভাবে পূর্ণ করার অনুমতি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সে তাকে সেই নিয়ম অনুসারেই পূর্ণ করে। তার ইচ্ছাশক্তিও এতখানি দুর্বল হয় না যে, সে ফরযকে ফরয জেনে এবং তা পালন করার ইচ্ছা সত্ত্বেও পালন করতে পারে না। শুধু এজন্য দেহ রাজ্যের ওপরে সে প্রবল পরাক্রমশালী এক শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বস্তুত এ শক্তি মানুষের অভ্যন্তরে মানুষের আত্মায় সৃষ্টি করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রোযা রেখেও এ শক্তি লাভ করতে পারে না, সে নিজেকে ক্ষুৎ-পিপাসায় পরিশ্রান্ত ও জর্জরিত করে। তার উপবাস ও পানাহার পরিত্যাগ একেবারে নিস্ফল।

কুরআন এবং হাদীস- দুটিতে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কাজ করা পরিহার করতে পারলো না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই আবশ্যকতা নেই। তিনি আরো বলেছেন যে, অনেক রোযাদার এমন আছে, যারা রোযা হতে ক্ষুৎ-পিপাসার ক্লান্তি ভিন্ন আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

আমাদের হাতের আসল অস্ত্র যদি শত্রু পক্ষ সুকৌশলে নিয়ে গিয়ে খেলনা অস্ত্র আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয় আর সেই খেলনা অস্ত্র দিয়ে যদি শত্রুর সাথে যুদ্ধের সময় ব্যবহার করি তাহলে কি শত্রু নিধন করা সম্ভব হবে? না। কারণ খেলনা অস্ত্র মানুষ মারার উপযোগী করে তৈরিই করা নয়। ওটা তৈরির কারণই হচেছ খেলার কাজে ব্যবহারের জন্য। বর্তমানে আমাদের এবাদাতের অবস্থা তদরূপ। আসল এবাদাত ছেড়ে এবাদাতের নকল রূপ নিয়ে আসল ফলাফল আশা করছি।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

যাকাতের মৌলিক শিক্ষা

নামাযের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। সাধারণত নামাযের পরই রোযার উল্লেখ করা হয় বলে অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, নামাযের পরই বুঝি রোযার স্থান। কিন্তু কালামে পাক থেকে জানা যায় যে, নামাযের পর যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরূত্বপূর্ণ কাজ। এই দুটি ইসলামের প্রধান স্তম্ভ- এটা বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ইসলামের প্রাসাদও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

'যাকাত' অর্থ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা। নিজের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব-মিসকীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে 'যাকাত' বলা হয়। কারণ এর ফলে সমগ্র ধন-সম্পত্তি এবং সেই সাথে তার নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে না, তার সমস্ত ধন সম্পদ অপবিত্র এবং সেই সাথে তার নিজের মন ও আত্মা পংকিল হতে বাধ্য। তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার নাম মাত্র বর্তমান নেই। তার দিল এত দূর সংকীর্ণ, এতদূর স্বার্থপর এবং এতদূর অর্থ পিশাচ যে, আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক তাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও তার মন কুণ্ঠিত হয়। এমন ব্যক্তি দুনিয়ায় খালেছভাবে আল্লাহর জন্য কোন কাজ করতে পারবে, তার দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে কোনরূপ আত্মত্যাগ ও কুরবানী করতে প্রস্তুত হতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে না। কাজেই একথা বলা যায় যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার দিল নাপাক, আর সেই সাথে তার সঞ্চিত ধন মালও অপবিত্র, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'যাকাত' ফরয করে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি মানুষকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-মাল হতে আল্লাহ নির্দিষ্ট হিস্যা আদায় করে এবং আল্লাহর বান্দাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে, বস্তুত সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাজ করার উপযুক্ত, ঈমানদার লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা তারই রয়েছে। পক্ষান্তরে যার দিল এতদূর সংকীর্ণ যে, আল্লাহর জন্য এতটুকু কুরবানী করতে প্রস্তুত হয় না, তার দ্বারা আল্লাহর কোন

www.pathagar.com

কাজই সাধিত হতে পারে না- সে ইসলামী জামায়াতে গণ্য হবার যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাকে মানব দেহের একটি পচা অংগ মনে করা যেতে পারে, আর পচা অংগকে যত শীঘ্র কেটে বিচ্ছিন্ন করা যায় শরীরে অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের পক্ষে ততই মংগল। অন্যথায় সমগ্র দেহেই পচন শুরু হবে। এ জন্যই হযরত রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর যখন আরবের কোন এক গোত্রের লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল, তখন (প্রথম খলীফা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাদের বিরুদ্ধে যেমন করা উচিত ঠিক তেমনি- যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তারা নামায পড়তো, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানও বর্তমান ছিল। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আদায় না করলে নামায- রোযা ইত্যাদি তার কোণ কাজই আল্লাহর কাছে গৃহিত হতে পারে না, আর এরূপ ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার দাবি করার আদৌ কোন মূল্য নেই।

কুরআন মজীদ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক নবীর উম্মাতের প্রতিই সমানভাবে নামায ও যাকাত আদায় করার বিষয়ে কঠোর আদেশ করা হয়েছিল- দ্বীন ইসলামের কোন অধ্যায়েই কোন নবীর সময়ে কোন মুসলমানকেই নামায ও যাকাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশের নবীদের কথা আলোচনা করার পর কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ

"আমরা তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদেরই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে- পথপ্রদর্শন করে। আমরা ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করেছি, তারা খাঁটিভাবে আমার ইবাদাত করতো- হুকুম পালন করতো।" (সূরা আল আম্বিয়াঃ ৭৩)

হযরত ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"তিনি তাঁর লোকদেরকে নামায এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করতেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন।"

(সূরা মরিয়মঃ ৫৫)

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ) তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন- "হে আল্লাহ! এ দুনিয়ায় আমাদের মঙ্গল দাও, পরকালেও কল্যাণ দান কর।" এর উত্তরে আল্লাহ সূরা আল আরাফের ১৫৬ আয়াতে বলেছিলেনঃ

"যাকে ইচ্ছা হবে, তাকে আমার আযাবে নিক্ষেপ করবো। যদিও আমার রহমত সকল জিনিসের ওপরই পরিব্যাপ্ত আছে; কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো যারা আমাকে ভয় করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর যারা আমার বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"

(সূরা আল আরাফঃ ১৫৬)

হযরত মূসা (আ) এর জাতির লোকদের দিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। ধন সম্পদ লাভের জন্য প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। বর্তমান কালের ইয়াহুদীরাই তার বাস্তব উদাহরণ। এজন্য আল্লাহ তাআলা এ মহান সম্মানিত পয়গাম্বরের প্রার্থনার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, তোমার উম্মাত যথারীতি যাকাত আদায় করলে আমার রহমত পেতে পারবে অন্যথায় পরিষ্কার জেনে রাখ, তারা আমার রহমাত হতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে এবং আমার আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। হযরত মূসা (আ) এর পরেও বনী ইসরাঈলগণকে বার বার এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বার বার তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছেঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং রীতিমত নামায ও যাকাত আদায় করবে (সূরা আল বাকারা, রুকূ ১০)। শেষ পর্যন্ত তারেদকে সুস্পষ্ট নোটিশ দেয়া হয়েছে এই বলেঃ

"মহান আল্লাহ বললেন, হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আন, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি তোমাদের সাথী এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করে দেবো (অন্যথায় রহমাত লাভের কোন আশাই তোমরা করতে পার না)"।

(সূরা মায়েদাঃ ১২)

হুজুর পাক (সা)- এর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-ই সর্বশেষ নবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকেও একই সাথে নামায এবং যাকাতের হুকুম দিয়েছিলেন। সূরা মরিয়ামে বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহ আমাকে মহান করেছেন- যেখানেই আমি থাকি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততদিন নামায পড়া ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দশ করেছেন।"

(সূরা মরিয়ামঃ ৩১)

এ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায় যে, দ্বীন ইসলাম প্রত্যেক নবীর সময়ই নামায ও যাকাত এ দু'টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েছিল। আল্লায় বিশ্বাসী কোন জাতিকেই এ দুটি কর্তব্য থেকে কখনও নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি।

আমাদের প্রিয়নবী (সা)- এর উপস্থাপিত শরীয়াতে এ দুটি ফরযকে কিভাবে পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে, তা প্রণিধান যোগ্য। কুরআন পাকের প্রথমেই যে আয়াতটি উল্লেখিত রয়েছে, তা এইঃ "এই কুরআন আল্লাহর কিতাব- এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা পরহেযগার, আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের সঠিক ও সোজা পথপ্রদর্শন করে। পরহেযগার তারাই যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" (সূরা আল বাকারাঃ ২-৩)

অতপর বলা হয়েছেঃ
"বস্তুত এরাই রব প্রদত্ত হেদায়াত লাভ করেছে এবং এরাই সফলকাম। অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই এবং নামায ও যাকাত আদায় করে না তারা শুধু আল্লাহর হেদায়াত থেকেই বঞ্চিত নয়, কল্যাণ ও সাফল্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।" (সূরা আল বাকারাঃ ৫)

তারপর এই সূরা আল বাকারা পড়তে পড়তে সামনে এগিয়ে যান, কয়েক পৃষ্ঠা পরই আদেশ হয়েছেঃ
"নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর (জামায়াতের সাথে নামায আদায় কর)।"

অতপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এই সূরায় বলা হয়েছেঃ
"পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেই কোন পুণ্য লাভ হয় না বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহর প্রেমে তার অভাবী আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, পথিক

www.pathagar.com

ও প্রার্থীকে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে, অন্য লোকদের তাদের ঋণ, দাসত্ব কিংবা কয়েদ থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে এবং নামায কায়েম করেও যাকাত আদায় করে, বস্তুত একমাত্র তারাই পুণ্য লাভ করতে পারে। আর যারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, বিপদ, ক্ষতি-লোকসান এবং যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সত্য পথে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, তারাই পুণ্যবান। তারাই খাঁটি মুসলমান, মুত্তাকী ও পরহেযগার।" (সূরা আল বাকারাঃ ১৭৭)

এরপর সূরা আল মায়েদায় এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্যঃ "মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু সাহায্যকারী হচেছ শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ মাত্র। ঈমানদার লোক বলতে তাদেরই বুঝায়, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। অতএব যারা আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা আল্লাহর দল বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর দলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হবে।" (সূরা মায়েদাঃ ৫৫-৫৬)

এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এই আয়াত থেকে জানা গিয়েছে যে, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তারাই মুসলমান। ইসলামের এ দুটি 'রুকন'কে যে ব্যক্তি যথাযথরূপে আদায় করবে না, তার ঈমানদার হওয়ার দাবি মূলত মিথ্যা। দ্বিতীয়ত, এ আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ একটি দলভুক্ত। অতএব ঈমানদার ব্যক্তিগণের অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে এই দলে শামিল হতে হবে। এই দলের বাইরের কোন ব্যক্তিকে সে পিতা হোক, ভাই হোক, পুত্র হোক, প্রতিবেশী, স্বদেশবাসী কিংবা অন্য যে কেউ হোক না কেন- কোন মুসলমান যদি তাকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তার সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা যে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন, এমন আশা কিছুতেই করা যেতে পারে না। সর্বশেষে এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, ঈমানদার লোকগণ দুনিয়ায় কেবল তখনই জয়ী হতে পারে যখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু সাহায্যকারী এবং সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে সূরা তাওবায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফের ও মুশরিকদের বিরূদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্রমাগত কয়েক রুকূ' পর্যন্ত এই যুদ্ধ সম্পর্কে হেদায়াত দিয়েছেন। এই প্রসংগে বলা হয়েছেঃ

"তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে 'তাওবা' করে খাঁটিভাবে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাইয়ে পরিণত হবে।"

(সূরা আত তাওবাঃ ১১)

অর্থাৎ শুধু কুফর ও শিরক থেকে 'তাওবা' করা এবং ঈমান আনার কথা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, সে যে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করেছে এবং প্রকৃতপক্ষেই ঈমান এনেছে, তার প্রমাণের জন্য যথারীতি নামায আদায় করা এবং যাকাত দেয়াও অপরিহার্য। অতত্রব, তারা যদি তাদের এরূপ বাস্তব কাজ দ্বারা একথার প্রমাণ পেশ করে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, অন্যথায় তাদেরকে 'ভাই' মনে করা তো দূরের কথা, তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধও বন্ধ করা যাবে না। এ সূরায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ

"ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই পরম করুণাময় আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করবেন।" (সূরা আত তাওবাঃ ৭১)

অন্য কথায় কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান এনে কার্যত নামায ও যাকাত আদায় না করবে, ততক্ষণ সে মুসলমানদের দ্বীনি ভাইরূপে পরিগণিত হতে পারবে না। বস্তুত ঈমান, নামায ও যাকাত এ তিনটি জিনিসের সমন্বয়েই ঈমানদার লোকদের জামায়াত গঠিত হয়। যারা এ কাজ যথারীতি করে, তারা এই পাক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর যারা এ তিনটি কাজ করে না, তারা এ জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের নাম মুসলমানদের ন্যায় হলেও ইসলামী

www.pathagar.com

ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করলে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করা এবং তাতে আল্লাহর পার্টির শৃংখলা নষ্ট করা হবে। তাহলে এসব লোক দুনিয়ায় জয়ী হয়ে থাকার আশা কি করে করতে পারে?

আরও সামনে অগ্রসর হলে সূরা হজ্জ-এ দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

"যে আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজয়ী। (আল্লাহর সাহায্য তারাই করতে পারে) যাদেরকে রাষ্ট্রে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায আদায়ের (সামাজিক) ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং সামগ্রিকভাবে যাকাত আদায় করবে, লোককে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত সকল জিনিসের পরিণাম আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে।"

(সূরা আল হজ্জঃ ৪০-৪১)

বনী ইসরাঈলদের ইতোপূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বনী ইসরাঈলদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা যতদিন নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে এবং নবীদের কাজে সাহায্য করতে থাকবে অর্থাৎ আল্লাহর আইন জারি করবে, ততদিন আল্লাহ তাদের সাথী ও সাহায্যকারী থাকবেন। আর যখন এ কাজ তারা ত্যাগ করবে, তখনই আল্লাহ তাদের প্রতি সকল সাহায্য বন্ধ করে দেবেন। ঠিক একথাই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় শক্তি লাভ করে যদি তারা নামায আদায়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং যাকাত আদায়ের সামগ্রিক পন্থা প্রতিষ্ঠা করে আর ভাল কাজের প্রচার ও আদেশ মন্দ কাজে নিষেধও প্রতিরোধ করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী হবেন। বস্তুত, আল্লাহ অপেক্ষা শক্তিমান সাহায্যকারী আর কেউ হতে পারে না। তিনি যাকে সাহায্য করবেন, তাকে আর কেউ পরাভূত করতে পারে না। কিন্তু মুসলমান যদি নামায ও যাকাত আদায় করা পরিত্যাগ এবং দুনিয়ার শক্তি লাভ করে সৎকাজের পরিবর্তে অসৎকাজের প্রচার করে, অন্যায়কে নির্মূল না করে সৎকাজের পথ বন্ধ করতে থাকে, আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার পরিবর্তে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে শুরু করে আর কর আদায় করে নিজেদের জন্য দুনিয়ার বুকে 'স্বর্গ' রচনা করাকে রাজত্বের একমাত্র

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য তাদের ভাগ্যে কখনো জুটার কথা নয়। তারপর শয়তানই হবে তাদের সাহায্যকারী। ভাবতে অবাক লাগে, এটা কত বড় শিক্ষার কাজ! বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বাণীকে অমূলক মনে করেছিল। ফলে তার বিপরীত কাজ করে তাদেরকে দুনিয়ার দিকে দিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে মরতে হচেছ। বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হচেছ, কোথাও তারা স্থায়ীভাবে আশ্রয় লাভ করতে পারছে না। এরা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী সম্প্রদায়, কোটি কোটি টাকা তাদের ভাণ্ডারে স্তুপীকৃত হয়ে আছে, কিন্তু এ টাকা তাদের কোন কাজেই লাগছে না। নামাযের পরিবর্তে অসৎকাজ এবং যাকাতের বদলে সুদখোরীর অভিশপ্ত পন্থাকেই অবলম্বন করে তারা একদিকে নিজেরা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত হচেছ, অপরদিকে তারা প্লেগের ইঁদুরের ন্যায় দুনিয়ার দিকে দিকে এ অভিশাপ সংক্রমিত করে ফিরছে। গোটা বিশ্বে বনি ইসরাইলীরা অভিশপ্ত জীবনযাপন করছে। নামায তো কায়েম করেই নাই যাকাতের ধারে কাছেও নেই সূদী কারবার মানুষ হত্যা আর সন্ত্রাসই হচেছ তাদের পেশা। অস্ত্র তৈরী এবং তার ব্যবহারের জন্য গোটা পৃথিবীতে মানব জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আর সংঘাত সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের প্রধান কাজ হিসাবে বেছে নিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার শাস্তি তারা ভোগ করেই চলেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের কাছে অপমানিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জাতির উপর অভিশাপ হয়ে আজ ২০০৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে চলেছে এবং পৃথিবীর মানুষের কাছে ঘৃনিত শয়তান জাতি হিসাবে পরিচয় বহন করে চলেছে। মুসলমানদেরকেও এ হুকুমই দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমানগণ সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নামায আদায় ও যাকাতদানের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়েছে এবং দায়িত্ব পালন করা ভুলে বসেছে। আর এর তিক্ত ফলও তারা নানাভাবে ভোগ করছে। (দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ও মহাশক্তিধর ইহুদীবাদী জালিমদের নির্যাতনের শিকার হচেছ। তারা দুর্বল ও পরাভূত হচেছ। নামায ও যাকাত ত্যাগ করার কুফল প্রতিনিয়ত দেখছে। এখন এদের (বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) এমন একটি দল সৃষ্টি হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা এবং কুৎসিত কাজের প্রবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। তারা মুসলমানদেরকে বলছে,

www.pathagar.com

"তোমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করতে হলে ব্যাংক ও ইনসুরেন্স কোম্পানী খুলে পেট ভরে সুদ খাও।" কিন্তু সত্য কথা এই যে, মুসলমানগণও এতেই লিপ্ত হয়ে ইয়াহুদীদের ন্যায় চরম লাঞ্চনার এক কঠিন বিপদে নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং চিরন্তন অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছে।

যাকাত কি জিনিস এতে আল্লাহ্ তাআলা কত বড় শক্তি নিহিত রেখেছেন, যদিও মুসলমানগণ এটাকে একটি অতি সাধারণ জিনিস বলে মনে করছে, অথচ তাতে যে কত বিরাট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এসব বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে, নামায ও যাকাত ইসলামের বুনিয়াদী স্তম্ভ। ইসলামে এই দুটির গুরুত্ব এত অধিক যে, এটা যেখানে নেই সেখানে আর যাই থাক, ইসলাম যে নেই তা সন্দেহাতীত। অথচ অনেক 'মুসলমান' আজ নামায কায়েম না করে এবং যাকাত আদায় না করেও 'মুসলমান' হিসেবে গণ্য হতে চায় এবং তাদের তথাকথিত কিছু ধর্মগুরুও এ বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চয়তা দান করছে। কিন্তু কুরআন তাদের দাবির তীব্র প্রতিবাদ করে। মানুষ যদি কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য নামায এবং যাকাত আদায় না করে, তাহলে কুরআনের দৃষ্টিতে তার এ কালেমা পড়া একেবারেই অর্থহীন। এজন্যই হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের কাফের মনে করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মানে এবং নামাযও পড়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয কিনা সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন এই সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু যখন হযরত আবু বকর (রা) যাকে আল্লাহ তাআলা নবুয়াতের কাছাকাছি সম্মান দান করেছিলেন- সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেনঃ আল্লাহর শপথ, রাসূলে করীম (সা)- এর জীবনে যারা যাকাত দিত, আজ যদি কেউ তার উট বাঁধার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো। শেষ পর্যন্ত সকল সাহাবীই একথার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সকলে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা যাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য। কুরআন শরীফ সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, যাকাত না দেয়া কেবল পরকালে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরই কাজঃ

"যেসব মুশরিক যাকাত দেয় না, যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।"

(সূরা হা-মীম-আস-সিজদাঃ ৬-৭)

www.pathagar.com

পূর্বে বলা হয়েছে যে, নামাযের পর ইসলামের সর্বপ্রধান 'রুকন' হচেছ যাকাত। আর তার গুরুত্ব এতবেশি যে, নামাযকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হতে হয়, অনুরূপভাবে যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাকে শুধু কাফেরই হতে হয় না, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়ে তার বিরুদ্ধে জিহাদও করেছেন।

এখানে আমি যাকাতের প্রকৃত রূপ এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। যাকাত মূলত কি জিনিস এবং ইসলাম এর এতবেশি গুরুত্ব দেয় কেন তা আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

আমাদের মধ্যে অনেক লোকই যার তার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। অথচ কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করার সময় সে বাস্তবিকই বন্ধুত্বের উপযুক্ত লোক কিনা তা পরীক্ষা এবং যাচাই করে দেখে না। এ কারণে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তারা প্রায়ই প্রতারিত হয়ে থাকে। পরে তাদের বড় দুঃখ এবং অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা বুদ্ধিমান তারা যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকে খুব ভাল করে যাচাই বাছাই বা পরীক্ষা করে নেয় এবং পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাদেরকে তারা খুব ভাল লোক, নির্ভরযোগ্য, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসভাজন বলে মনে করে, কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে, আর অন্যান্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও সর্বাভিজ্ঞ। তিনি যাকে তাকে নিজের বন্ধু বানাবেন, নিজের দলভুক্ত করে নিবেন এবং তাঁর দরবারে সম্মান ও নৈকট্যের মর্যাদা দান করবেন তা কি করে আশা করা যেতে পারে? সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ যখন পরীক্ষা ও যাচাই না করে কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে রাজী হয় না, তখন সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির একচছত্র অধিকারী আল্লাহ তাআলা খুব ভালভাবে যাচাই ও পরীক্ষা না করে কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে পারেন না। দুনিয়ায় এই যে কোটি কোটি মানুষ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সকল প্রকার মানুষই রয়েছে, নির্বিচারে ও নির্বিশেষে এদের সকলকেই আল্লাহর দলে শামিল করে নেয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা যাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বানাতে এবং আখেরাতে তাঁর নৈকট্য দান করতে চান, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে বিশেষ পরিস্থিতি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচাই করে নিতে চান। যাঁরাই সেই পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই আল্লাহর দলে গণ্য হতে

www.pathagar.com

পারবেন, আর যারা তা পারবে না তারা নিজেরাই তা থেকে দূরে সরে যাবে এবং তারা পরিষ্কাররূপে জানতে পারবে যে, তারা আল্লাহর দলে শামিল হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়নি।

মানুষকে পরীক্ষা করার সেই কষ্টি পাথরটি কি? আল্লাহ নিজে যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাই তিনি সর্বপ্রথম মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞানকেই পরীক্ষা করতে চান। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা কিছু আছে কিনা, না নিরেট নির্বোধ তা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকেন। কারণ নির্বোধ লোকেরা কখনও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বন্ধু হতে পারে না। (আর মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা তো কিছুতেই এবং কখনই আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না)। আল্লাহর অস্তিত্বের নিশানা দেখে যে বুঝতে পারে যে, তিনিই আমার মালিক ও সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ কোন পরোয়ারদিগার, দোয়া শ্রবণকারী এবং সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আল্লাহর কালাম দেখে যে তাকে আল্লাহর কালাম বলেই চিনতে পারে এবং তা অন্য কারো কালাম হতে পারে না বলে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, সত্য নবী এবং মিথ্যা নবীদের জীবনচরিত, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক পার্থক্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং নবী হওয়ার দাবিদারগণের মধ্যে প্রকৃত নবীকে আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং সত্যের পথ নির্দেশকারী নবী বলে চিনতে পারে, আর মিথ্যা নবীকে দাজ্জাল ও প্রতারক বলে চিহ্নিত করতে পারে সেই ব্যক্তিরই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে লক্ষ কোটি লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নিজের দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে গণ্য করেন। অবশিষ্ট যারা প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তাদেরকে তিনি পরিত্যাগ করেন।

এই প্রথম পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে অতপর দ্বিতীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয়বারে মানুষের বুদ্ধির সাথে সাথে তার নৈতিক চরিত্র বলেরও যাচাই করা হয়। সত্য এবং পুণ্য কাজের পরিচয় লাভ করে তা গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যায় ও পাপ কাজের পরিচয় লাভ করার পর তা পরিত্যাগ করার যোগ্যতা ও শক্তি তার আছে কিনা তা জেনে নেয়া এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। যাচাই করে দেখা হয় যে, এই ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির দাস, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসারী এবং পারিবারিক প্রথা ও দুনিয়ার সাধারণ রীতিনীতির গোলাম কিনা? একটি কাজকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত জেনে এবং তাকে

www.pathagar.com

খারাপ মনে করেও তার মধ্যে লিপ্ত থাকার মত দুর্বলতা তার মধ্যে আছে কিনা। পক্ষান্তরে একটি জিনিসকে আল্লাহর মনোনীত এবং সত্য জেনে তা গ্রহণ করার মনোবল আছে কিনা তাও যাচাই করা হয়। এ পরীক্ষায়ও যারা বিফল হয় তাদেরকে আল্লাহর দলভুক্ত করা হয় না। আল্লাহর দলভূক্ত কেবল তারাই হতে পারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ
অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের বিরোধী বিধান ও পথ এবং বিধানদাতাকে যারা সাহসের সাথে পরিত্যাগ করে- সেই ব্যাপারে কারো পরোয়া করে না এবং নির্ভীকভাবে কেবল আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়- তাতে কেউ খুশী হোক আর নারায হোক সেই দিকে মাত্রই ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা একটি মজবুত জিঞ্জির দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে নিয়েছে যা কখানো ছিড়বে না।

এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে তৃতীয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এবার পরীক্ষা হয় আল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকারের প্রবণতার। এই সময়ে হুকুম দেয়া হয় যে, আমার তরফ থেকে যখনই কোন নির্দেশ দেয়া হবে, তখনই তোমরা নিদ্রা ত্যাগ করে আমার সামনে হাজির হবে; কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে, নিজের স্বার্থ ও মনঃপুত কাজ ছেড়ে, আনন্দ আর খুশী ত্যাগ করে আসবে এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে, গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, শীত হোক- যাই হোক না কেন, সকল সময়েই ডাক শোনা মাত্র হাজির হবে- সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আমার দরবারে উপস্থিত হবে এবং কর্তব্য পালন করবে। আবার যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার না করতে বলবো এবং নফসের খাহেশ পূরণ করতে নিষেধ করবো, তখন তোমাকে এই হুকুম পুরোপুরি পালন করতে হবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যত দুঃসহ কষ্টই হোক না কেন; আর যত সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য তোমার সামনে স্তূপীকৃত হোক না কেন। এই পরীক্ষায় যারা অনুত্তীর্ণ হয় তাদেরকেও বলে দেয়া হয়, ‘তোমাদের দ্বারা আমার কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আর তৃতীয় পরীক্ষায়ও যারা উত্তীর্ণ হয় কেবল তাদেরকেই নির্বাচন করা হয়।’ কারণ এদের সম্পর্কেই এই আশা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর তরফ থেকে যে বিধান নাযিল করা হবে তাই তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বার্থ এবং লাভ, সুখ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সব অবস্থায়ই যথাযথরূপে পালন করতে পারবে।

www.pathagar.com

অতপর চতুর্থ পরীক্ষা নেয়া হয় মানুষের ধন-সম্পদ কুরবানী করার। তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকগণও আল্লাহর 'কর্মচারী' পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হতে পারেনি। কেননা তাদের দিল ছোট, সংকীর্ণ, হীন সাহস ও বীর্যহীন এবং নীচ বা কৃপন কিনা- মুখে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বড় বড় দাবি করার লোক তো অসংখ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বন্ধুর খাতিরে পকেটের পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত কিনা, তার পরীক্ষা নেয়া হয়। কোন সংকীর্ণম না কৃপণকে পরম করুণাময় পরম দয়ালু ও দাতা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় বান্দাদের তালিকায় বা তার বন্ধুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। যে মহান আল্লাহর ধনভান্ডার প্রতিটি মুহূর্ত সর্বসাধারণ বা সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত এবং বিপুলভাবে তা দান করা হয় তিনি এমন কৃপণ ব্যক্তিকে কেমন করে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেন, যে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ আল্লাহরই পথে খরচ করতে প্রস্তুত নয়? আর যে আল্লাহ এতবড় বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ তিনি কেমন করে এমন ব্যক্তিকে নিজের দলভুক্ত করতে পারেন, যার আসল জ্ঞানের অভাব এবং বন্ধুত্ব ও ভালবাসা মৌখিক জমা-খরচ মাত্র এবং যার ওপর কোন কাজেই বিন্দুমাত্র ভরসা করা যায় না? কাজেই এ চতুর্থ পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয় তাদেরকেও পরিষ্কার বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহর দলে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরাও অকর্মণ্য- আল্লাহর খলীফার ওপর যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা পালন করার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এ দলে কেবল তাদেরকেই শামিল করা যেতে পারে যারা আল্লাহর ভালবাসায় জীবন-প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বংশ-পরিবার, সবকিছুর ভালবাসাকে অকুণ্ঠ চিত্তে কুরবান করতে পারে।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেনঃ
"তোমরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্য ও মহত্ত্বের উচ্চতম মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"

(সূরা আলে ইমরানঃ ৯২)

আল্লাহর এই দলে সংকীর্ণমনা লোকদের কোনই স্থান নেই, কেবল উদার উন্নত হৃদয়বান ব্যক্তিরাই এই দলে শামিল হতে পারে।

www.pathagar.com

"মনের সংকীর্ণতা এবং কৃপণতাকে যারা অতিক্রম করতে পেরেছে কেবল তারাই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে পারে।"

(সূরা আত তাগাবুনঃ ১৬)

আল্লাহর দলে কেবল এমন লোকদের ভর্তি করা যেতে পারে, যারা কেউ তাদের শত্রুতা করলেও, তাদেরকে দুঃখ দিলেও, তাদের ক্ষতিসাধন করলেও এবং তাদের কলিজাকে টুকরো টুকরো করলেও- কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা পেটের খাদ্য এবং পরণের কাপড় দিতে অস্বীকার করবে না এবং বিপদের সময় তার সাহায্য করতেও কুন্ঠিত হবে নাঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা বড় এবং সংগতি সম্পন্ন লোক তারা যেন নিজেদের প্রিয়জনদের, নিকটাত্মীয়দের, গরিব-দুঃখীদের এবং আল্লাহর পথে হিযরতকারীদের (কোন অপরাধের জন্য বিরক্ত হয়ে তাদেরকে) সাহায্য দান বন্ধ না করে। বরং তাদেরকে মাফ করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেন তা কি তোমরা চাও না? অথচ আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।" (সূরা আন নূরঃ ২২)

এখানে এমন মহৎ লোকদের প্রয়োজন, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"খালেছভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারা ইয়াতিম, মিসকীন এবং বন্দীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় এবং তারা বলে যে, আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই খাওয়াচ্ছি, তোমাদের কাছে আমরা কোনরূপ বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চাই না।"

(সূরা দাহরঃ ৮-৯)

এই দলে এমন লোকদের আবশ্যক, যারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে বেছে ভাল ভাল জিনিস আল্লাহর জন্যই খরচ করেঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা যে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ভাল ভাল সামগ্রী (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো। খারাপ দ্রব্য থেকে কিছু সেই পথে খরচ করো না।"

(সূরা আল বাকারাঃ ২৬৭)

এখানে এমন বড় আত্মার লোকদের আবশ্যক, যারা নিজেদের অভাব-অনটন, দারিদ্র ও রিক্ততার দুঃসহ অবস্থায় নিজেদের অপরিহার্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীনের খেদমত এবং নেক বান্দাদের সাহায্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে কুন্ঠিত হয় নাঃ

www.pathagar.com

"তোমাদের রবের ক্ষমার আশায় এবং আকাশ ও পৃথিবী সমান বিশাল বেহেশতের দিকে অগ্রসর হও, যা সেসব মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যারা আর্থিক দুর্গতি ও স্বচছলতা উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর জন্য খরচ করে।"

(সূরা আলে ইমারনঃ ১৩৩-১৩৪)

আল্লাহর দলের লোকদের ঈমান এতটুকু মজবুত হওয়ার দরকার যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাকে তারা নিস্ফল মনে করবে না। বরং তারা একান্তভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করা হয়, দুনিয়া এবং আখেরাতে তিনি তার উত্তম ফল দান করবেন। এজন্য তারা কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই খরচ করে। তাদের এ দানশীলতার কথা দুনিয়ায় প্রচার হোক বা না হোক কিংবা কেউ তার দানের শুকরিয়া আদায় করুক বা না করুক সেই দিক কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে নাঃ

"তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করবে তা তোমাদেরই কল্যাণ সাধন করবে- অবশ্য যদি তোমরা সেই খরচের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টি পেতে না চাও। এভাবে তোমরা ভাল কাজে যা কিছু দান করবে তার পূর্ণ ফল তোমরা লাভ করবে। সে দিক দিয়ে তোমাদেরকে প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"

(সূরা আল বাকারাঃ ২৭২)

ধনী হয়ে সুখের মধ্যে ডুবে থেকেও যারা আল্লাহকে ভুলে যায় না, আল্লাহর দলে এ ধরনের ধীর প্রকৃতির লোকদেরই দরকার। তারা বড় বড় প্রাসাদে সুখ ও সম্ভোগের ভেতরে থেকেও এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ভুলে যাবে না।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ আর সন্তান যেন তোমাদেরকে কখনও আল্লাহর যিকর থেকে বিরত না রাখে। এসবের জন্য যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

(সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)

ওপরে বর্ণিত গুণাবলি আল্লাহ তাআলার দলের লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকা অপরিহার্য। এছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। বস্তুত এটা মানুষের শুধু নৈতিক চরিত্রেরই নয়, তার ঈমানেরও বড় কঠিন এবং

www.pathagar.com

তিক্ত পরীক্ষা। আল্লাহর পথে খরচ করতে যে ব্যক্তি কুণ্ঠিত হবে, এরূপ খরচকে যে নিজের ওপরে জরিমানা বলে মনে করবে, কৌশল ও শঠতা করে তা থেকে যে 'আত্মরক্ষা' করতে চায়, আর কিছু খরচ করলেও সে জন্য লোকের প্রতি নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করে মনের ঝাল মিটাতে চায় কিংবা নিজের বদান্যতার কথা দুনিয়ায় প্রচার করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এমন লোকদের আদৌ ঈমান থাকতে পারে না। সে মনে করে, আল্লাহর জন্য সে যা কিছু করেছে, তা একেবারে নিস্ফল হয়েছে। তার নিজের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, নিজের স্বার্থ ও খ্যাতিকেই সে আল্লাহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অপেক্ষাও বেশি প্রিয় বলে মনে করে। তার মতে এ দুনিয়াটাই সবকিছু। টাকা-পয়সা খরচ করলেও এ দুনিয়ায়ই সে জন্য সুনাম ও খ্যাতি লাভ হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহলে সে টাকার বিনিময় এখানেই পাওয়া যেতে পারে। নতুবা টাকাও খরচ করলো আর কেউ জানতেও পারলো না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ভাল কাজে এতগুলো টাকা দিয়ে দিয়েছে, তবে তো সবই অর্থহীন হয়ে যায়। কুরআন মজীদে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের মানুষ আল্লাহর কোন কাজেই আসতে পারে না। সে যদি নিজেকে ঈমানদার বলে প্রচার করে তথাপি সে ঈমানদার তো নয়ই বরং সে মুনাফিক। নিচের আয়াতগুলো তার প্রমাণ।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দানকে অন্যের ওপরে নিজের অনুগ্রহ প্রচার করে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে তার মত নিস্ফল করে দিও না, যে ব্যক্তি শুধু অন্যকে দেখাবার জন্য কিংবা সুনাম কিনার জন্য অর্থ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখে না।

"যারা 'স্বর্ণ' এবং 'রৌপ্য' সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ দাও।"

-সূরা তাওবাঃ ৩৪

"হে নবী! যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তারা নিজেদের জানমাল সহ জিহাদে যোগদান করার কর্তব্য থেকে দূরে সরে থাকার জন্য কখনও অনুমতি চাইবে না। আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুত্তাকী বান্দাগণকে খুব ভাল করেই জানেন। অবশ্য সেসব লোক ওজর আপত্তি করতে পারে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

www.pathagar.com

যাদের আদৌ বিশ্বাস নেই- যাদের মনের মধ্যে সন্দেহ জমাট বেঁধে রয়েছে এবং নিজেদের সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেই ইতস্তত করে।"

(সূরা আত তাওবাঃ ৪৪-৪৫)

"আল্লাহর পথে তাদের দান শুধু এ জন্যই কবুল করা যায় না যে, মূলত আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান নেই; নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে; আর টাকা-পয়সাও তারা দান করে, কিন্তু বড়ই বিরক্তি সহকারে।"

(সূরা আত তাওবাঃ ৫৪)

"মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক স্ত্রী সব একই দলের লোক- একে অন্যের সাহায্যকারী। এরা সকলেই মিলে অন্যায়ের আদেশ করে, ন্যায় ও সত্যকে নির্মূল করার চেষ্টা করে। আর আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। এরা সকলেই আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেছেন। এসব মুনাফিক যে ফাসেক (আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী) তাতে সন্দেহ নেই।" -সূরা আত তাওবাঃ ৬৭

"এই (মুনাফিকদের) অনেকেই আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করলেও তা করে একান্তভাবে ঠেকে- যেন জরিমানা আদায় করছে।"

"জেনে রাখ, তোমাদের অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদের আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করতে বললে তোমরা সেই জন্য মোটেই প্রস্তুত হও না বরং তোমাদের অনেকেই তখন কৃপণতা করতে থাকে। অথচ যে ব্যক্তি এসব কাজে কৃপণতা করে সেই কৃপণতায় তার নিজেরই ক্ষতি হয়। মূলত আল্লাহ একমাত্র ধনশালী আর তোমরা সকলেই দরিদ্র- তাঁরই মুখাপেক্ষী। আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমরা আদৌ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত না হও তবে এ অপরাধের অনিবার্য ফলস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্থানে এক ভিন্ন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মত (কৃপণ) হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ৩৮)

মোটকথা, যাকাত ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং এটাই তার মূল কথা। একে প্রচলিত সরকারি ট্যাক্সের মত মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ আসলে এটা ইসলামের প্রাণ, ইসলামের জীবনী শক্তি। যাকাত ফরয করার মূলে ঈমানের পরীক্ষা করাই হচেছ প্রধান লক্ষ্য। ক্রমাগত পরীক্ষা দিয়ে এক একজন মানুষ

www.pathagar.com

যেমন উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং সর্বশেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী লাভ করে, অনুরূপভাবে আল্লাহও মানুষের ঈমান যাচাই করার জন্য কতগুলো পরীক্ষা নির্দিষ্ট করে দেন; প্রত্যেক মানুষকেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। একজন মানুষ যখন এরূপ পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ পরীক্ষা- অর্থাৎ অর্থদানের পরীক্ষায়ও সাফল্য লাভ করে, তখনই সে খাঁটি মুসলমান হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এটা নিশ্চয়ই সর্বশেষ পরীক্ষা নয়।

এরপর আসে প্রাণের পরীক্ষা। সেই সম্পর্কেও আমি পরে আলোচনা করবো। কিন্তু ইসলামের সীমার মধ্যে আসার জন্য- অন্য কথায় আল্লহর দলভুক্ত হবার যে কয়টি 'প্রবেশিকা পরীক্ষা' নির্দিষ্ট করা হচেছ, তার মধ্যে যাকাত হচেছ সর্বশেষ পরীক্ষা। বর্তমানে অনেকেই বলে বেড়াচেছ যে, টাকা-পয়সা খরচ বা দান করার অনেক ওয়াযই মুসলমানকে শুনান হয়েছে, বর্তমানে এই অভাব ও দারিদ্রের কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে খানিকটা উপার্জন ও সঞ্চয় করার ওয়ায শুনানো উচিত; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, যে জিনিসটির প্রতি তারা নাক ছিটকাচেছ তা হচেছ ইসলামের এই প্রাণ বস্তুটি। আর এ জিনিসটির অভাবই মুসলমানকে নৈতিক ও আর্থিক অধঃপতনের চরম সীমায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে। এই প্রাণ বস্তুটিকে তাদেরকে অধঃপতিত করেনি। তাদের সর্বব্যাপী পতন হয়েছে শুধু এজন্য যে, এই প্রাণ বস্তুটিই তাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে গেছে।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে যাকাত-সদকা ইত্যাদির কথা বুঝার জন্য 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা) বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে আবার বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা-ই খরচ করবে তা আল্লাহর কাছে 'করযে হাসানা' (ধার) হিসেবে মওজুদ থাকবে। এক কথায় এটা দ্বারা ঠিক আল্লাহকেই ধার দেয়া হয়, আর আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণী হন। অনেক স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যা কিছু দেবে তার বিনিময় দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর; তিনি তোমাদের শুধু ততটুকু পরিমাণই ফিরিয়ে দেবেন না; তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ দান করবেন।

কুরআন মজীদের উল্লেখিত কথাগুলো বাস্তবিকভাবেই প্রণিধানযোগ্য। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক কি কখনও মুখাপেক্ষী হতে পারে? মানুষের কাছ থেকে সেই মহান আল্লাহ্‌র 'টাকা' ধার নেয়া কি প্রয়োজন থাকতে পারে? সেই রাজাধিরাজ

www.pathagar.com

সীমাসংখ্যাহীন ধন ভাণ্ডারের একচছত্র মালিক আল্লাহ্ কি মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজনে ধার চান? কখনও নয়, তা হতেই পারে না। তাঁর দানেই দুনিয়ার জীব-জন্তু বস্তুনিচয় জীবন ধারণ করছে, তাঁর দেয়া জীবিকা দ্বারাই মানুষ বাঁচে। দুনিয়ার প্রত্যেক ধনী ও গরিবের কাছে যা কিছু আছে, তা সব তাঁরই দান। একজন অসহায় গরীব থেকে শুরু করে কোটিপতি পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানুষের কাছে ধার চাবেন এবং নিজের জন্য মানুষের সামনে হাত প্রসারিত করবেন- তার কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? না মূলত মানুষেরই কল্যাণের জন্য, মানুষের কাজে ব্যয় করার জন্যই তিনি আদেশ করেন। আর সে ব্যয়টাকেই তিনি তাঁর পথে খরচ কিংবা 'ধার' বলে গণ্য করেন। বস্তুত এটাও তাঁর আর এক কল্যাণ কামনার বাস্তব প্রকাশ- এটাও তাঁর এক প্রকার বড় অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদেরই সমাজের অভাবগ্রস্ত গরিব এবং মিসকিনদেরকে অর্থ দান কর, এর বিনিময় দেয়ার দায়িত্ব আমার। কারণ তোমরা যেসব লোককে অর্থ সাহায্য কর, এর বিনিময় তারা কোথা থেকে দেবে? এর প্রতিদান আমিই দান করবো। তোমরা ইয়াতীম, বিধবা, অসহায়, বিপদগ্রস্ত এবং নিস্বম্বল পথিক ভাইদেরকে যা কিছু দান করবে তার হিসেব আমার নামে লিখে রেখো এর তাগাদা তাদের কাছে নয় বরং আমার কাছে করো। আমি তা পরিশোধ করবো। তোমরা তোমাদের গরিব ভাইদের ধার দাও কিন্তু তাদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করো না, এর তাগাদা করে তাদেরকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত করো না। তারা ঋণ শোধ করতে না পারলে সে জন্য তাদেরকে 'সিভিল জেলে' পাঠিয়ো না, তাদের কাপড়-চোপড় এবং ঘরের আসবাবপত্র ক্রোক করো না, তাদের অসহায় সন্তানদেরকে ঘর থেকে বের করে আশ্রয়হীন করে দিওনা। কারণ তোমাদের ঋণ আদায়ের দায়িত্ব তাদের নয়- আমার, তারা যদি মূল টাকা আদায় করে দেয়, তবে তাদের পক্ষ থেকে লাভ আমি আদায় করবো আর তারা যদি আসল টাকাও না দিতে পারে, তাহলে আসল ও লাভ সবই আমি শোধ করবো। এভাবে নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে মানুষের উপকারার্থে তোমরা যা খরচ করবে, তার লাভ যদিও তোমরাই পাবে; কিন্তু সেই অনুগ্রহ আমার ওপর করা হবে, আমিই তার লাভসহ পূর্ণ হিসেব করে তোমাদেরকে ফেরত দেব।

www.pathagar.com

একমাত্র দয়াময়, রাজাধিরাজ বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের যথার্থতা এখানেই। মানব জাতির কাছে যা কিছু আছে, তা সব তাঁরই দান- অন্য কোথাও থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে তোমরা তা পাওনা। তাঁরই ভাণ্ডার থেকে তোমরা নিয়ে থাক, কিন্তু যা কিছু দাও, তাঁকে নয়- তোমাদেরই আত্মীয়, এগানা, ভাই, বন্ধু ও নিজ জাতির লোকদেরকেই দিয়ে থাক। কিংবা নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর, যার ফলও শেষ পর্যন্ত তোমরাই পেয়ে থাক। কিন্তু সেই মহান দাতার অসীম বদান্যতা লক্ষ্য কর, তিনি এই সকল দান সম্পর্কে বলেন যে, এটা তাঁকে ঋণ দেয়া হয়েছে, তাঁরই পথে খরচ করা হয়েছে, তাঁকে দেয়া হয়েছে- এর ফল আমিই তোমাদেরকে দেব। বস্তুত বদান্যতার এই অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষে শোভা পায়, কোন মানুষ এর ধারণাও করতে পারে না। পরম দয়ালু ও দাতা মহান আল্লাহ্ মানুষকে কতটুকু ভালাবাসেন এ থেকেই তা সহজে বুঝা সম্ভব।

ভাবার বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে দানশীলতা ও বদান্যতার উৎসাহ সঞ্চার করার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করলেন কেন? এই বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায়, ইসলামের উন্নত শিক্ষার অন্তর্নিহিত পবিত্র ভাবধারা ততই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়; মন উত্তাদ কণ্ঠে বলে ওঠে- এই অতুলনীয় শিক্ষা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতে পারে না। সংকীর্ণ একটি মানুষের দ্বারা এ শিক্ষার পথ করে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

মানুষ যে স্বভাবতই কিছুটা যালেম এবং জাহেল হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তা সকলেরই জানা কথা। তার দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ- বেশি দূর পর্যন্ত তা পৌঁছায় না। তাদের দিল খুবই ক্ষুদ্র, তার মনে বড় এবং উচচ ধারণার স্থান খুব কমই সংকুলান হয়ে থাকে। মানুষ ভয়ানক স্বার্থপর, কিন্তু সেই স্বার্থপরতা সম্পর্কেও কোন ব্যাপক ও বিরাট ধারণা তার মন-মস্তিস্কে স্থান পায় না। মানুষ অবিলম্বেই সবকিছু পেতে চায়ঃ প্রতিটি কাজের ফল এবং পরিণাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাভ করতে সে প্রয়াসী। যে ফল তার সামনে অবিলম্বে আসে এবং নিজের চোখ দ্বারা দেখতে পায়, তাই তার কাছে একমাত্র ফল ও পরিণাম। সুদূরপ্রসারী ফলাফল পর্যন্ত তার দৃষ্টি মোটেই পৌঁছায় না। উপরন্তু সে ফল খুব বড় অনুভব পর্যন্ত করতে পারে না। বস্তুত এটা মানুষের এক স্বাভাবিক দুর্বলতা বিশেষ। এ

www.pathagar.com

দুর্বলতার কারণে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। আর তাও আবার যেসব স্বার্থ ছোট আকারে এবং খুব দ্রুত লাভ করা যায়, তারই প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে। সে বলে আমি যা উপার্জন করেছি বা আমার বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তা একান্তভাবে আমার, অন্য কারো কোন অংশ বা অধিকার তাতে নেই। কাজেই আমি কেবল নিজের প্রয়োজনে নিজের ইচছায় এবং নিজের আরাম আয়েশের কাজে খরচ করবো। কিংবা যেসব কাজের ফল অবিলম্বে আমার হাতে পাব কেবল সেই কাজে বিনিয়োগ করবো। আমি যদি টাকা খরচ করি তবে এর বিনিময়ে আমার কাছে হয় বেশি টাকা আসতে হবে- নয়ত আমার বেশি করে আরামের ব্যবস্থা কোথাও থেকে হতে হবে। কিছু না হলেও অন্তত আমার বেশি করে আরামের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে। কিছু না হলেও অন্তত আমার খ্যাতি বা আমার মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় কিংবা কোন 'খেতাব' লাভ করা যায় এমন ব্যবস্থা একান্তই আবশ্যক। মানুষ যেন আমার সামনে মাথা নত করে, লোকের মুখে যেন আমার নামের চর্চা হয়। এসব জিনিসের কোনটাই যদি আমি না পাই, তবে আমি টাকা খরচ করবো কেন? আমার নিকটবর্তী কোন গরীব-দুঃখী বা ইয়াতীম মিসকিন যদি না খেয়ে মরে যায়, কেন তাঁকে খাদ্য যোগাড় করে দেব। তার প্রতি তার পিতার কর্তব্য ছিল নিজের সন্তানের জন্য কিছু রেখে যাওয়া। আমার পাড়ার কোন বিধবার যদি দুঃখে দিন কাটে তবে আমার তাতে কি আসে যায়? তার জন্য তার স্বামীর চিন্তা করা উচিত ছিল। কোন প্রবাসী যদি সম্বলহীন হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? সে পথের ব্যবস্থা না করেই ঘর থেকে বের হয়ে বড় বির্নুদ্ধিতার কাজ করেছে। অন্য কোন ব্যক্তি যদি দূরবস্থায় পড়ে তবে তার প্রতি আমার কী করণীয় থাকতে পারে? আমার ন্যায় তাকেও আল্লাহ তাআলা হাত-পা দিয়েছেন। নিজের প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করা তার নিজেরই কর্তব্য। আমি তার সাহায্য করবো কেন? আর একান্তই আমি তাকে যদি কিছু টাকা-পয়সা দেই তবে ঋণ হিসেবেই দেব এবং আসল টাকার সাথে এর সুদও নিশ্চয়ই আদায় করবো। কারণ, বিনা পরিশ্রমে তো টাকা উপার্জিত হয়নি। সেই টাকা আমার কাছে থাকলে কত কাজেই না লাগাতে পারতাম- দালান-কোঠা তৈরি করতে পারতাম, মোটর গাড়ি কিনতে পারতাম কিংবা অন্য কোন লাভজনক কাজে খাটাতে পারতাম। সে যদি আমার টাকা

www.pathagar.com

দিয়ে কোন উপকার লাভ করতে পারে, তবে আমি আমার টাকা দ্বারা কিছু না কিছু লাভ করতে পারব না কেন? তা থেকে আমার অংশই বা আমি আদায় করবোনা কেন?

এরূপ স্বার্থপর মনোবৃত্তির কারণে মানুষ প্রথমত ধনপিশাচে পরিণত হয়। সে তা খরচ করলে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই করবে। যে কাজে কোন স্বার্থ দেখতে পাবে না, সেখানে এক পয়সাও খরচ করবে না। কোন গরিবের সাহায্য যদি সে করেও, তবে মূলত তা দ্বারা সেই গরিবের কোন সাহায্য হবে না, বরং তাকে আরো বেশি করে শোষন করবে এবং তাকে যা দেবে তদপেক্ষা অনেক বেশি আদায় করবে। কোন মিসকীনকে কিছু দান করলে সে এই ব্যক্তির প্রতি বেশি আদেশ করবে। কোন মিসকিনকে কিছু দান করলে সে এই ব্যক্তির প্রতি নিজের অনুগ্রহ দেখিয়ে তাকে কাতর করে ছাড়বে এবং তাকে এতদূর অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে যে, তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধটুকুও অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। কোনো জাতীয় কাজে অংশগ্রহণ করলে এ ধরনের মানুষ সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেবে। যেসব কাজে নিজের স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা থাকবে না, সেই কাজে একটি পয়সাও দিতে প্রস্তুত হবে না। স্বার্থপর সংকীর্ণমনা মানুষ একটুও চিন্তা করে না যে, আমার সমস্ত যোগ্যতা, আমার অর্থ, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ মহান আল্লাহ প্রদত্ত। তাঁরই জিনিস তারই নির্দেশে প্রদান করে তাঁকেই আবার ঋণ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এমন মহানুভব অবিভাবক আল্লাহ্‌র সাথে সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সুযোগও গ্রহণ করতে চায় না এই কম রক্ত মানুষ, হায় আফসোস ঐ সার্থপর মানুষের জন্য!

এ ধরনের মনোবৃত্তির পরিণাম কত ভয়াবহ তা ভেবে দেখেছেন কি? এর ফলে গোটা সমাজ জীবনই যে চুরমার হয়ে যাবে তাই নয়, বরং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির অবস্থাও অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে পড়বে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তারা অতীব মূর্খ বলে এটা থেকেও তাদের নিজেদেরই উপকারিতার আশা করে থাকে। এ ধরনের হীন মনোবৃত্তি যখনই মানুষের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সমাজের খুব অল্প সংখ্যক লোক একেবারে নিরুপায় ও উপার্জনহীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অর্থশালী লোক অর্থের বলে আরও বেশি পরিমাণ অর্থ শোষণ করে, গরীব লোকদের জীবন ক্রমশ আরও বেশি খারাপ

www.pathagar.com

হয়ে যায়। যে সমাজে দারিদ্র একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেই সমাজ নানাবিধ জটিল সমস্যায় সর্বব্যাপী ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়ায়। সামাজিক স্বাস্থ্য-ধৈর্য্য চূর্ণ হয়, নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজ দেহে আক্রমণ করে, ফলে তারা কাজের ও উৎপাদনের শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অপরাধ প্রবণ হতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত লুটতরাজ করতেও পশ্চাৎ পদ হয় না। সমাজে এক সর্বব্যাপী বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, ধনী লোক গরীবদের হাতে নিহত হতে শুরু করে তাদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয়, অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তারা চিরতরে ধ্বংস হতে বাধ্য হয়। এই অবস্থা সমাজ বিপ্লবের পূর্বের স্তর। সমাজ বিপ্লব তখন অবস্বম্ভাবী হয়ে দাড়ায়। যে সম্পদ নিজে খরচ না করে অতিযত্নে জমা করে রাখে যে সম্পদে গরীবের হক অধিকার রয়েছে সেই গরীবকে মোটেও তার ন্যায্য অধিকার পরিমান না দিয়ে কারুনের মত তুলে রাখে সেই সম্পদই তার বা তাদের জীবনের বড় কাল হয়ে দাড়ায়। তখন ঐ সঞ্চিত সম্পদের সাথে ঘরবাড়ী নিজের জীবন পরিবারের প্রিয়জনদের জীবন সবই দিতে হয় কিন্তু সব দিয়েও শেষ রক্ষা হয়না। তখন যদি এ কারণগুলি বলে যে সব দিচিছ শুধু জীবনটা ফিরিয়ে দাও কিন্তু তাও তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। সময়ের এক ফোড় আর অসময়ের দশ ফোড় বলে কথা আছেনা? তাই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে না খেতে দিয়ে অল্পসংখ্যক লোক বেশী খেতে চাইলে তার ফলাফল কখনও ভাল হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবেনা। তাই ইসলামের মহান ভারসাম্যপূর্ণ যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ তার সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজনের কাছে যে অর্থ আছে তা যদি অন্য এক ভাইয়ের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয় তবে এ অর্থই আবর্তিত হয়ে অভাবিতপূর্ব কল্যাণ নিয়ে পুনরায় তার হাতেই ফিরে আসে। পক্ষান্তরে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে যদি সে তা নিজের কাছেই সঞ্চয় করে রাখে, কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত কাজে ব্যয় করে, তবে ফলত সে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ইয়াতীম শিশুকে আপনি যদি লালন-পালন করতে এবং তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে আপনি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি তার সাহায্য করবো কেন, তার পিতারই কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত ছিল, তবে সে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে, ছন্নছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশে

www.pathagar.com

হাতড়িয়ে মরবে, অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করার মত কোন যোগ্যতাই সে লাভ করতে পারবে না। বরং সে অপরাধ প্রবণ হয়ে একদা স্বয়ং আপনার ঘরেই সিঁদ কাটতে প্রস্তুত হবে। আজকের দিনের জঙ্গিবাদের কথাই যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ইহুদীবাদী চক্রান্তে মানবতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি সমাজেরই এক ব্যক্তিকে অকর্মন্য ও অপরাধ প্রবণ বানিয়ে কেবল তারই নয়- আপনার নিজেরও ক্ষতি সাধন করবেন। এই একটি মাত্র উদাহরণ সামনে রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করলে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে যে, নিস্বার্থভাবে যে ব্যক্তি সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অর্থ খরচ করে, বাহ্য দৃষ্টিতে তা তার নিজ পকেট থেকে নির্গত হয় বটে; কিন্তু বাইরে এসে তাই বৃদ্ধি পেয়ে স্ফীত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাই অসংখ্য রূপ উপকার ও স্বার্থকতা নিয়ে আবার তার পকেটেই ফিরে যায়। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও দৃষ্টি সংকীর্ণতার দরুন টাকা-পয়সা কেবল নিজের হাতেই জমা রাখে- সামাজিক কল্যাণের কাজে মোটেই খরচ করে না, বাহ্য দৃষ্টিতে তার অর্থ তার নিজের বাক্সে থেকে যায় বা সুদ খেয়ে তাকে আরও স্ফীত করে তোলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের নির্বুদ্ধিতার দরুনই নিজের সম্পদ নষ্ট করে- নিজেরই ধ্বংসের ব্যবস্থা করে মাত্র।

আল্লাহ তাআলা এ তত্ত্ব কথাই বলেছেন নিম্নলিখিত আয়াতেঃ
"আল্লাহ সুদ নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দানকে ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন।"
"মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, মূলত আল্লাহর কাছে তাতে সম্পদ মোটেই বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তোমরা যে যাকাত আদায় কর- একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে তা অবশ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আর রূমঃ ৩৯)

কিন্তু এ গভীর তত্ত্ব কথা বুঝতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণতা এবং চরম মূর্খতা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরা ইন্দ্রিয়ের দাস। যে টাকা তাদের পকেটে আছে তা দিয়ে তারা তা অনুভব করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, তা নিশ্চয়ই আছে। তাদের হিসেবের খাতায় যে পরিমাণ টাকা বেড়ে

www.pathagar.com

চলেছে তা ক্রম বৃদ্ধি সম্পর্কেও তারা নিঃসন্দেহ; কিন্তু যে টাকা তাদের কাছ থেকে চলে যায়; তা যে বাড়ছে এবং তাদের হাতে যে ফিরে আসতে পারে; সে কথা মোটেই বুঝতে ও দেখতে পায় না। তারা শুধু বুঝে এত টাকা আমার হাত থেকে চলে গিয়েছে এবং চিরকালের জন্যই চলে গিয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাবে মানুষ মূর্খের হিসাব নিকাশে অভ্যস্ত।

মূর্খতার এ বন্ধনকে মানুষ নিজের বুদ্ধি বা চেষ্টার দ্বারা অদ্যাবধি ছিন্ন করতে পারেনি। সারা দুনিয়ার অবস্থাই এরূপ। একদিকে পুঁজিবাদীদের দুনিয়া- সকল কাজই সেখানে সুদ প্রথার ওপর চলছে এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেই দেশে দুঃখ দারিদ্র আর অভাব অনটন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচেছ। অন্যদিকে এদের বিরোধী আর একটি দল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। তাদের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরা পুঁজিবাদীদের ধন-ভান্ডার লুট করে তো নেবেই সেই সাথে মানুষের তাহযীব-তামাদ্দুনের গোটা ইমারতকেও ধূলিসাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে এবং তার পরিনাম যে ভয়াবহ তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাই যদি উদাহরন হিসেবে তুলে ধরি যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল যা এখন টিকে নেই এবং না টিকার পিছনেও বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত ছিল। এ সবই ছিল ধনীর প্রতি এক প্রকার প্রতিহিংসার আগুন যা একদিন জ্বলে পুড়ে সব কিছু ছারখার করে দিয়েছিল। মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধির কারণে দরিদ্রকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দেয়নি আবার মানুষেরই সংকীর্ণ বুদ্ধিতে সমাধান করতে গিয়ে মানুষ খুন করে তার সমাধান করতে চেয়েছে, তাই সে ব্যবস্থাও স্থায়ী হয়নি। ইসলাম এই দুই অবস্থার মাঝে এক ভারসাম্য পূর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।

মানুষ এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এর সুষ্ঠু সমাধান করেছে মানুষের স্রষ্টা- মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাআলা। তিনি এসব মানুষের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানসহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার নাম কুরআন মজীদ। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে মানুষকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনতে হবে। মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং সন্দেহাতীতরূপে জেনে নেয় যে, আকাশ ও

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই। এই মহাসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কৌশল পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে আর মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলে ইহকাল-পরকাল বেহেস্ত-দোযখ খুঁজতে বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। প্রত্যেকে নিজেই খুঁজে বের করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে (যা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনার অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। সমগ্র ধন-ভান্ডারের প্রকৃত মালিক হচেছন আল্লাহ তাআলা; আর মানুষের সকল কাজের ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার কাছে প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু হিসেবে বর্তমান আছে; মানুষের ভাল কাজের পুরস্কার বা শাস্তি আখেরাতে ঠিক তদানুযায়ী হবে। আর মন্দ কাজের শাস্তিও আখেরাতে দিবেন তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাহলে নিজের স্থুলদৃষ্টির ওপর নির্ভর না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যয়-ব্যবহার করা এবং লাভ-ক্ষতি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া মানুষের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়বে। এরূপ ঈমান নিয়ে সে যা কিছু খরচ করবে তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যই খরচ করা হবে। তার হিসেবও আল্লাহর দফতরে যথাযথভাবে লিখিত হবে। তার এই খরচের খবর দুনিয়ার কোন মানুষ জানতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা সেই সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত থাকেন। আর দুনিয়ার মানুষ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেও আল্লাহ তার অনুগ্রহের কথা নিশ্চয়ই জানবেন এবং স্বীকার করবেন। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই যখন তার প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা করেছেন তখন পরকালেই হোক কিংবা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হোক- সেই ওয়াদা যে পূর্ণ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি এ দুনিয়াতেও এমন কাজের সুযোগ করে দিয়ে থাকেন যা দিয়ে প্রভূত আয় উপার্জন করা সম্ভব আবার পরকালের অন্তত সুখের জন্যও সেই দান রেখে দিয়ে শতগুণে বৃদ্ধি করে ফিরত দিতে পারেন। যা পরকালের মহা সংকটের দিনে কাজে আসবে।

আল্লাহ তাআলা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়ম করেছেন যে, প্রথমে তিনি ভাল এবং পুণ্য কাজের একটা সাধারণ হুকুম জারী করেছেন, যেন মানুষ নিজের জীবনে সাধারণভাবে ভাল ও কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তারপর সেই ভাল কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য একটি বিশেষ পন্থা নির্দেশ করা হয়। সেই

www.pathagar.com

বিশেষ পন্থাটি সকলেরই যথাযথ রূপে পালন করা কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহকে স্মরণ করা একটি অত্যন্ত ভাল কাজ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল কাজ। শুধু তাই নয়- বস্তুত সমস্ত ভাল কাজেরই মূল উৎস এটাই। সেজন্য আল্লাহকে সকল সময় ও সকল অবস্থায়ই স্মরণ করা এবং এক মুহূর্তও তাকে ভুলে না যাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ রয়েছেঃ

"দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সকল সময় ও সকল অবস্থায়ই) আল্লাহকে স্মরণ কর।"

(সূরা আন নিসাঃ ১০৩)

"খুব বেশি করে তাঁর স্মরণ করতে থাক, কারণ একাজেই তোমাদের কল্যাণ হবে বলে আশা করা যায়।" (সূরা আনফালঃ ৪৫)

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (আল্লাহর অস্তিত্বের) বহু নিদর্শন রয়েছে, বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল লোকদের জন্য- যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে এবং (গভীরভাবে চিন্তা করার পর প্রত্যেকটি জিনিসের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে উদাত্ত কণ্ঠে) বলে উঠে- হে আল্লাহ! তুমি এর কোন একটিও নিরর্থক সৃষ্টি করনি।"

(সূরা আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১)

"যাদের দিলে আল্লাহর স্মরণ নেই, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যারা প্রত্যেকটি কাজের নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তোমরা তাদের আনুগত্য বা অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল কাহাফঃ ২৮)

এ আয়াতসমূহে এবং এ ধরনের আরও অনেক ও অসংখ্য আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমরা সকল সময় সকল অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ কর। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণই মানুষের সকল কাজ-কর্ম সুষ্ঠু এবং সুন্দর করে দেয়। মানুষ যখনই এবং যে কাজেই তাঁকে ভুলে যাবে; সেখানেই প্রবৃত্তি (নফসের খাহেস) এবং শয়তানের প্রতারণা তাকে পরাভূত করবে। এর অনিবার্য পরিণামে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের জীবন যাপনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করবে।

www.pathagar.com

এটা ছিল আল্লাহকে স্মরণ করার একটি সাধারণ নির্দেশ। অতপর আল্লাহকে স্মরণ করার একটি বিশেষ উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সে জন্য দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি সময় অতিবাহিত হয় না। এর অর্থ এই নয় যে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট সময়টুকুতেই আল্লাহর স্মরণ করবে। আর অন্যান্য সময় তাঁকে একেবারে ভুলে যাবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ এই যে, অন্ততপক্ষে এতটুকু সময়ের জন্য তো মুসলমানকে আল্লাহর স্মরণের কাজে আত্মনিমগ্ন হতেই হবে। তারপর তারা নিজ নিজ কাজ করে যাবে এবং সেই অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। আল্লাহকে স্মরণ রেখেই সে দুনিয়ার সব কাজ সমাধা করবে। এই ভাবে কাজ করতে থাকলে সে মানুষের সমাজের রাষ্ট্রের ও দুনিয়ার কোন ক্ষতি করতে পারবে না বরং সৃষ্টির কল্যান করতে থাকবে।

ইসলামে যাকাতের ঠিক এই অবস্থা। এখানেও একটি বিশেষ হুকুম এবং একটি সাধারণ হুকুম রয়েছে। এদিকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, কৃপণতা ও মনের সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাক, কারণ এটাই সকল অনর্থের মূল এবং সকল বিপর্যয়ের উৎস। তোমাদের নৈতিক জীবনে আল্লাহর রং ধারণ কর। কারণ তিনি প্রতিটি মুহূর্তে গোটা সৃষ্টিজগতের ওপর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমাত বর্ষণ করে থাকেন, যদিও তাঁর ওপরে কারো বিশেষ কোন অধিকার বা দাবি নেই। আবার বলা হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যত এবং যা কিছুই খরচ করতে পার, তা করতে থাক, নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে যা উদ্বৃত্ত রাখতে পার রাখ এবং আল্লাহর অন্যান্য অভাবগ্রস্ত বান্দাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যত পার দান কর। দ্বীনের খেদমত এবং আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জান মাল দিয়ে চেষ্টা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আল্লাহর প্রতি যদি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে ধন-সম্পত্তির প্রেমকে সে জন্য উৎসর্গ কর।

আল্লাহর পথে অর্থ দান করার জন্য এটা সাধারণ হুকুম। কিন্তু সেই সাথে বিশেষ নির্দেশ এই যে, এত পরিমাণ অর্থ তোমাদের কাছে সঞ্চিত হলে তা থেকে কমপক্ষে এত পরিমাণ অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। তোমাদের ক্ষেতে এত পরিমাণ ফসল হলে তা থেকে এত পরিমাণ আল্লাহর পথে অবশ্যই দান করবে। নির্দিষ্ট কয়েক রাকাআত মাত্র নামায ফরয করার অর্থ যেমন এই নয়

www.pathagar.com

যে, ঐ কয় রাকাআত মাত্র আদায় করলেই আল্লাহকে স্মরণ করার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেল, অতত্রব তা ভিন্ন অন্যান্য সময় আল্লাহকে ভুলে যেতে পারবে। অনুরূপভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করা যে ফরয করা হয়েছে, তার অর্থও এটা নয় যে, যাদের কাছে এত পরিমাণ অর্থ আছে কেবল তারাই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বাধ্য। আর যারা তদপেক্ষা কম অর্থের মালিক, তাদের মুঠি বন্ধ করে রাখবে। এমনকি, তার অর্থ এটাও নয় যে, ধনীদের ওপর যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয়েছে, তারা কেবল সেই পরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, অতপর কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আসলে তাকে তাড়িয়ে দেবে- দ্বীন ইসলামের কোন বৃহত্তর কাজের তাগিদ আসলে বলবে, একমাত্র যাকাতই আমার প্রতি ফরয হয়েছিল, আমি তা আদায় করেছি। অতত্রব এখন আর আমার কাছে কিছুই পেতে পারে না। বস্তুত যাকাত ফরয করার অর্থ মোটেই এটা নয়। যাকাত ফরয করার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি অন্ততপক্ষে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবশ্যই আল্লাহর পথে খরচ করতে বাধ্য। আর তার অধিক ব্যয় করার সামর্থ থাকলে তাও তাকে অবশ্যই করতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ করার সাধারণ হুকুম এবং তার বিশ্লেষণ এখানে করা যাচ্ছেঃ

"কুরআন মজীদ কোন কাজের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতাও স্পষ্ট করে বলে দেয়। এটা কুরআন মজীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর সাহায্যে মানুষ আল্লাহর আদেশের মূল লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে।

কুরআন মজীদের শুরুতে যে আয়াতটি চোখে পড়ে তা হলোঃ

"এই কুরআন আল্লাহর কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা সেই সব সত্যনিষ্ঠ মুত্তাকী লোকদেরকে সত্য পথের সন্ধান করে দেয়, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে (আমার পথে) খরচ করে।"

(সূরা আল বাকারাঃ ২-৩)

www.pathagar.com

এ আয়াতে একটি মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। পার্থিব জীবনে সোজা পথে চলার জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য। প্রথম, ঈমান বিলগায়েব- অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন; দ্বিতীয়, নামায কায়েম করা এবং তৃতীয়, আল্লাহ তাআলা যে রিযক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
"তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলো আল্লাহর পথে অকাতরে খরচ না করা পর্যন্ত পুণ্যশীলতার উচ্চ মর্যাদা তোমরা কিছুতেই লাভ করতে পারো না।"

আবার বলা হয়েছেঃ
"টাকা-পয়সা খরচ করলে শয়তান তোমাদেরকে গরিব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে লজ্জাকর কাজ- কৃপণতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।"

এরপর ইরশাদ হয়েছেঃ
"আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করলেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।)"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৯৫)

সর্বশেষ বলা হয়েছেঃ
"মনের সংকীর্ণতা হতে যারা বাঁচতে পারবে তাঁরাই পরম কল্যাণ লাভ করবে।"
(সূরা আল হাশরঃ ৯)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের দুটি মাত্র পথ বিদ্যমান। একটি আল্লাহর পথ- যার পরিণামে চিরন্তন সুখ-শান্তি এবং পরম কল্যাণ রয়েছে। এ পথে মানুষের দিল উদার-উন্মুক্ত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাকে কম কিংবা বেশি যে পরিমাণ রিযেক দান করেছেন, তা থেকে সে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবে, অন্যান্য ভাইদেরকেও যথাসম্ভব সাহায্য করবে এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা বা আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার কাজেও ব্যয় করবে। অপরটি হচ্ছে শয়তানের পথ। এ পথে বাহ্য দৃষ্টিতে মানুষ খুব আনন্দ এবং সুখ দেখতে পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ পথ ধ্বংস এবং বিপর্যয় ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় না। এ পথে স্বাভাবিকভাবেই অর্থ-সম্পদ শোষণ করে সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে

www.pathagar.com

এবং অর্থের জন্য মন ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি খরচ করে, তবে তা কেবল নিজের প্রয়োজন এবং নিজের মনের লালসা চরিতার্থ করার জন্য মাত্র।

আল্লাহর পথের যাত্রীদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার যে নিয়ম ও পন্থা বলে দেয়া হয়েছে, এখানে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

একঃ সর্বপ্রথম কথা এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করবে, কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বা দুনিয়ায় নাম ও খ্যাতি লাভ করার জন্য খরচ করবে না।
"তোমরা যা কিছু খরচ কর, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া তোমাদের যেন আর কিছুই লক্ষ্য না থাকে।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৭২)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনঃকষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করে দিও না- যে ব্যক্তি কেবল পরকে দেখাবার জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না। তার দান-খয়রাত ঠিক তেমনি করে যেমন প্রস্তর খণ্ডের ওপরে মাটি পড়ে আছে, এমতাবস্থায় তার ওপর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তবে সমস্ত মাটিই ধুয়ে-মুছে প্রস্তর খণ্ডটি একেবারে সাফ ও মাটিহীন পরিষ্কার হয়ে যাবে।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৬৪)

দুইঃ কাউকে কিছু দান করলে তার কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং এমন কোন কাজ করতে পারবে না যাতে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট লাগতে পারেঃ
"আল্লাহর পথে যারা খরচ করে এবং খরচ করার পর নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং কাউকে মনঃকষ্ট দেয় না, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বড়ই 'সওয়াব' আছে এবং কোন প্রকার ভয় ও ক্ষতির আশংকা তাদের নেই। কিন্তু যেসব দানের পর কষ্ট দেয়া হয় সেসব দান অপেক্ষা প্রার্থীকে নম্রতার সাথে ফিরিয়ে দেয়া এবং 'ভাই, ক্ষমা কর' বলে বিদায় করাই উত্তম।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৬২-২৬৩)

তিনঃ আল্লাহর পথে সব সময়ই ভাল জিনিস দান করা উচিত। বেছে বেছে কেবল খারাপটাই যেন দেয়া না হয়। গরিবকে দেয়ার জন্য যারা ছিন্ন জামা-

www.pathagar.com

কাপড় তালাশ করে এবং কোন দরিদ্রকে খাওয়াবার জন্য নিকৃষ্টতর খাদ্য প্রদান করে, আল্লাহর কাছ থেকে তারা অনুরূপ নিকৃষ্ট ফলই পাবেঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য মাটির বুক থেকে যা নির্গত ও উৎপন্ন করেছি, তা থেকে ভাল ভাল জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর- আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য নিকৃষ্ট মাল তালাশ করে ফিরো না।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৬৭)

চারঃ যতদূর সম্ভব আল্লাহর রাস্তায় গোপনভাবেই খরচ করতে হবে, লোক দেখানোর বিন্দুমাত্র ভাব যেন তাতে স্থান না পায়। প্রকাশ্যভাবে খরচ করায় যদিও দোষের কিছু নেই কিন্তু তবুও গোপনে খরচ করা উত্তমঃ

"প্রকাশ্যভাবে খরচ করলে তা ভাল; কিন্তু লুকিয়ে গরিবদের দান করলে তোমাদের পক্ষে অতি ভাল এবং তাতে তোমাদের গুনাহ দূর হয়ে যাবে।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৭১)

পাঁচঃ নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনতারিক্ত সম্পদ কখনও দেয়া যাবে না। কারণ অধিক অর্থ পেয়ে তাদের বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার এবং তাদের হাতে সম্পদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহর ইচছা এটা যে, খাদ্য ও বস্ত্র সকল মানুষকেই দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সে যত বড় পাপী আর আল্লাহদ্রোহী হোক না কেন। কিন্তু মদপান, গাঁজা, আফিম খাওয়া এবং জুয়া খেলার জন্য কাউকে এক পয়সাও দেয়া যেতে পারে না।

"তোমাদের ধন-সম্পত্তিকে আল্লাহ তাআলা জীবনযাপনের উপায় করে দিয়েছেন, কাজেই তা কখনও অজ্ঞ-মূর্খদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা দ্বারা তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিতে হবে।"

ছয়ঃ কারো প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাকে ধার দেয়া হলে বার বার তাগাদা করে তাকে বিরক্ত করো না। তা আদায় করার জন্য তাকে যথেষ্ট অবকাশ দিতে হবে। আর তা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার অক্ষমতা যদি নিসন্দেহে জানা যায় এবং ঋণদাতারও যদি ক্ষমা করার মতো সঙ্গতি থাকে, তবে তাকে মাফ করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়ঃ

www.pathagar.com

"ঋণী ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে সচছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই সময় দিতে হবে। আর তাকে ক্ষমা করে দেয়া আরও ভাল- অবশ্য যদি তোমরা এর স্বার্থকতা বুঝতে পার।"

(সূরা আল বাকারাঃ ২৮০)

সাতঃ মানুষকে দান করারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা কখনও লংঘন করা যেতে পারে না। নিজেকে এবং নিজের সন্তান-সন্ততিকে বঞ্চিত করে পরকে দান করার আদেশ আল্লাহ তাআলা করেননি- তাঁর উদ্দেশ্যও তা নয়। আল্লাহর ইচছা এই যে, সহজ ও সাধারণভাবে জীবন যাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন হবে তা তো খরচ করতেই হবে, তারপরে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা হতেই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবেঃ

"তারা জিজ্ঞেস করেঃ কি খরচ করবো? (হে নবী। আপনি) বলে দিন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, তাই খরচ করবে।" (সূরা বাকারাঃ ২১৯)

"আল্লাহর নেক বান্দা তারাই- যারা খরচ করে; কিন্তু অনর্থক খরচ করে না এবং খুব বেশী কার্পণ্যও করে না। বরং এই দু প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী পন্থাই হয় তাদের আদর্শ।" (সূরা আল ফুরকানঃ ৬৭)

"তোমাদের (দানের) হাত গুটিয়ে একেবারে গলার সাথে বেঁধে নিও না এবং তা বেশি ছড়িয়েও দিও না, কারণ তার ফলে তোমাকে অনুতপ্ত এবং লোকদের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯)

আটঃ এ দানের উপযুক্ত পাত্র কে? সর্বশেষে একথাও জেনে নেয়া আবশ্যক। তার এক পূর্ণ তালিকাও আল্লাহর তাআলা পাক কালামে পেশ করেছেন। কে কে আপনার সাহায্য পেতে পারে এবং আপনার উপার্জনে আল্লাহর তরফ থেকে কার কার অধিকার নির্ধারিত হয়েছে, এ তালিকা দৃষ্টে তা পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারা যায়।

"গরিব নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও গরিব প্রবাসীকেও।"

(বনী ইসরাঈলঃ ২৬)

www.pathagar.com

"তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক ও প্রার্থীকে এবং দাস ও কয়েদীদের মুক্তি বিধানের জন্য যে অর্থ দান করে তারা আল্লাহর প্রিয়।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৭৭)

"নিজের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, চলার সাথী, প্রবাসী এবং নিজের দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।"

(সূরা আন নিসাঃ ৩৬)

"আল্লাহর নেক বান্দাগণ ইয়াতীম, মিসকীন এবং কয়েদীকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রেম লাভ করার উদ্দেশ্যে খাদ্যদান করে। তারা বলে যে, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্য খানা খাইয়ে থাকি। আমরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা কেবল আল্লাহর কাছে সেই দিনের ভয় করছি, যে দিনের কঠিন বিপদে মানুষের মুখ শুকিয়ে যাবে এবং কপালে ভাঁজ পড়ে যাবে।"

(সূরা আদ দাহরঃ ৮-১০)

"এবং তার ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনের অধিকার রয়েছে।"

"যারা সকল সময়ে আল্লাহর কাজে লিপ্ত থাকে বলে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন কাজ করতে পারে না, দান-খয়রাত তাদেরই প্রাপ্য। তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান দেখে অন্তত মূর্খ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলে মনে করে। কিন্তু তোমরা তাদের বেশ ও রূপ দেখেই বুঝতে পার, তারা কত কষ্ট করছে। তোমাদের নিজেদেরই অগ্রসর হয়ে তাদের দান করা উচিত। কারণ, তারা মানুষকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য চাওয়ার মত লোক নয়, গোপনভাবে তোমরা তোমাদের যা কিছু দেবে আল্লাহ তা নিশ্চয় জানবেন এবং তিনি তার বিনিময় নিশ্চয়ই দেবেন।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৭৩)

এখানে অর্থনৈতিক বণ্টন, সুবিচার, পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সাম্যসহ সুসম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

হজ্জের মৌলিক শিক্ষা

আরবি ভাষায় 'হজ্জ' অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা'বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'হজ্জ'। কখন কিভাবে হজ্জের সূচনা হয়েছিল, সেই ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। গভীর মনোযোগের সাথে সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করলে হজ্জের কল্যাণকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা পাঠকের জন্য সহজ হবে।

কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান- হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম কারো অজানা নয়। দুনিয়ায় তিন ভাগের দু' ভাগেরও বেশি লোক তাঁকে 'নেতা' বলে স্বীকার করে। হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)- এই তিনজন শ্রেষ্ঠ নবীই তাঁর বংশজাত, তাঁর প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা থেকে সমগ্র দুনিয়ায় সত্যের জ্যোতি বিস্তার করেছে। চার হাজার বছরেরও বেশিকাল পূর্বে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন সমগ্র দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসেছিল। পৃথিবীর একজন মানুষও তাঁর প্রকৃত মালিক ও প্রভুকে জানতো না এবং তাঁর সামনে বন্দেগী ও আনুগত্যের ভাবধারায় মস্তক অবনত করতো না। যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে জাতির লোকেরা যদিও তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি ছিল; কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার দিক দিয়েও তারাই ছিলেন অগ্রনেতা। সৃষ্ট জীব কখনও মা'বুদ বা উপাস্য হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-ভাস্কর্যে চরম উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও এ সহজ কথাটি তারা বুঝতে পারতো না। তাই তারা আকাশের তারকা এবং (মাটি বা পাথর নির্মিত) মূর্তির পূজা করতো। জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভাল-মন্দ জানার জন্য 'ফাল' গ্রহণ, অজ্ঞাত কথা বলা, যাদুবিদ্যা প্রয়োগ এবং দোআ তাবীয ও ঝাড়-ফুঁকের খুবই প্রচলন ছিল। বর্তমানকালের হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের মতো তখনকার সমাজে ঠাকুর-পুরোহিতেরও একটি শ্রেণী ছিল। তারা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতো, অপর লোকের পক্ষ থেকে পূজা করে দিত, বিপদ-আপদে বা আনন্দে-খুশীতে তারা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতো এবং 'অজ্ঞাত' কথা বলে লোকদেরকে প্রতারিত করতো। সাধারণ লোকেরা এদেরকেই ভাগ্য নির্ধারক বলে মনে

www.pathagar.com

করতো। তারা এদেরই অঙ্গুলি নির্দেশে ওঠা-বসা করতো এবং চুপচাপ থেকে নিতান্ত অন্ধের ন্যায় তাদের মনের লালসা পূর্ণ করে যেতো। কারণ তারা মনে করতো যে, দেবতাদের ওপরে এসব পূজারীর কর্তৃত্ব রয়েছে। এরা খুশী হলে আমাদের প্রতি দেবতাদের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ পূজারী দলের সাথে তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের গোপন যোগাযোগ ছিল। জনসাধারণকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও পূজারীগণ পরস্পর সাহায্য করতো। একদিবে সরকার পূজারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অন্যদিকে পূজারীগণ জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিত যে, রাজা-বাদশাহরাও 'আল্লাহর' মধ্যে গণ্য; তারা দেশ ও প্রজাদের একচছত্র মালিক, তাদের মুখের কথাই আইন এবং প্রজাদের জানমালের ওপর তাদের 'যা ইচছা' করার অধিকার আছে। শুধু এতটুকুই নয়, রাজা-বাদশাহের সামনে (সিজদায় মাথা নত করা সহ) তাদের বন্দেগীর যাবতীয় অনুষ্ঠানই পালন করা হতো- যেন প্রজাদের মন-মগজের ওপর তাদের প্রভুত্বের ছাপ স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যায়।

এহেন পরিবেশের এবং জাতির কোন এক বংশে হযরত ইবরাহীম (আ)- এর জন্ম। আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই বংশটাই ছিল পেশাদার ও বংশানুক্রমিক পূজারী। তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন আপন বংশের পণ্ডিত-পুরোহিত ব্রাক্ষ্মণ। কাজেই একজন ব্রাক্ষ্মণ সন্তানের পক্ষে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা সম্ভব, হযরত ইবরাহীম (আ)- ও ঠিক তাই লাভ করলেন। সেই ধরনের কথা-বার্তা শৈশবকাল হতেই তাঁর কানে প্রবেশ করতো। তিনি তার ভাই-ভগ্নীদের মধ্যে পীর ও আড়ম্বর এবং বড়লোকী চাল-চলন দেখতে পেতেন। স্থানীয় মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই গদিতে বসলে তিনি অনায়াসেই 'জাতির নেতা' হয়ে বসতে পারতেন। তাঁর গোটা পরিবারের জন্য চারদিক থেকে যেসব ভেট-বেগাড় আর নযর-নিয়াজ এসে জড়ো হতো, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যও তার ব্যবস্থা ছিল। দেবতার সাথে সম্পর্ক পেতে অজ্ঞাত কথা বলার ভান করে তিনি সাধারণ কৃষক থেকে তদানীন্তন বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। এই অন্ধকারে যেখানে সত্য জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ কোথাও ছিল না সেখানে একদিকে তাঁর পক্ষে সত্যের আলো লাভ করা যেমন সম্ভবপর ছিল

www.pathagar.com

না তেমনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উভয় দিক দিয়েই এ বিরাট স্বার্থের ওপর পদাঘাত করে নিছক সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হওয়াও কোন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে 'স্বতন্ত্র মাটি' দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন চন্দ্র, সূর্য, তারকা নিতান্ত গোলামের মতই উদয়-অস্তের নিয়ম অনুসরণ করছে, মূর্তি তো মানুষের নিজের হাতে পাথর দিয়ে গড়া, দেশের বাদশাহ আমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ, এরা রব হতে পারে না। যেসব জিনিস নিজের ইচ্ছায় একটুও নড়তে পারে না, নিজের সাহায্য করার ক্ষমতাও যেসবের মধ্যে নেই, জীবন ও মৃত্যুর ওপর যাদের বিন্দুমাত্র হাত নেই, তাদের সামনে মানুষ কেন মাথা নত করবে? মানুষ কেন তাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করবে? প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা কেন করবে? তাদের শক্তিকে কেন ভয় করবে? এবং তাদের গোলামীই বা কেন করবে? আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছুই আমরা দেখতে পাই, যেসব জিনিস সম্পর্কে কোন না কোন ভাবে আমরা ওয়াকিফহাল, তার মধ্যে একটি জিনিসও স্বাধীন নয়, নিরপেক্ষ নয়, অক্ষয়-চিরস্থায়ীও নয়। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থা যখন এরূপ তখন এরা মানুষের 'রব বা প্রভু' কিরূপে হতে পারে? এদের কেউই যখন আমাকে সৃষ্টি করেনি, আমার জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির এখতিয়ার যখন এদের কারো হাতে নেই, আমার রিযক ও জীবিকার চাবিকাঠি যখন এদের কারো হাতে নয়, তখন এদের কাউকেও আমি 'রব' বলে স্বীকার করতে পারি না এবং তার সামনে মাথা নত করে দাসত্ব ও উপাসনাই বা কেন করবো? বস্তুত আমার 'রব' কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, সকলেই যার মুখাপেক্ষী এবং যার হাতে সকলেরই জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির উৎস নিহিত রয়েছে। এসব কথা ভেবে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে বরং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছেই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ

"তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

www.pathagar.com

"আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

এ বিপ্লবাত্মক ঘোষণার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর বিপদ মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। পিতা বললেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো, বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেব। সমগ্র জাতি বলে ওঠলো, আমরা কেউ তোমাকে আশ্রয় দেব না। স্থানীয় সরকারও তার বিরুদ্ধে সমূচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো। বাদশাহর সামনে মামলা দায়ের করা হলো, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) একাকী একং নিঃসঙ্গ হয়েও সত্যের জন্য সকলের সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। পিতাকে বিশেষ সম্মানের সাথে বললেনঃ "আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি তা আদৌ জানেন না। কাজেই আমি আপনাদের কথা শুনবো না, তার পরিবর্তে আমার কথা আপনাদের সকলের শোনা উচিত।"

জাতির লোকদের হুমকির উত্তরে নিজ হাতে সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। বাদশাহর প্রকাশ্য দরবারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেনঃ "তুমি আমার 'রব' নও, আমার 'রব' তিনিই যাঁর মুষ্টিতে তোমার আমার সকলেরই জীবন ও মৃত্যু নিহিত রয়েছে এবং যাঁর নিয়মের কঠিন বাঁধনে চন্দ্র, সূর্য সবই বন্দী হয়ে আছে।" রাজ দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো, ইবরাহীম (আ)-কে জীবন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করা হবে। কিন্তু ইবরাহীম (আ)- এর দিল ছিল পর্বত অপেক্ষা অধিকতর শক্ত- একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ছিল তাঁর ভরসা। তাই এ ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতেও তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রস্তুত হলেন। অতপর আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে কাফেরদের অগ্নিকুণ্ড হতে মুক্তি দিয়েছিলেন তখন তিনি জন্মভূমি, জাতি, আত্মীয়-বান্ধব সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাথে নিয়ে পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যাঁর জন্য ঘরে পৌরোহিত্যের গদি অপেক্ষা করছিলো, সেই গদিতে বসে যিনি গোটা জাতির পুরহিত হয়ে যেতে পারতেন এবং সেই গদিকে যিনি বংশানুক্রমিকভাবে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিতে পারতেন তা না করে তিনি নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির জন্য নির্বাসন, সহায়-সম্বল হীনতার নিদারুণ দুঃখ-মুসিবতকেই শ্রেয় মনে করে গ্রহণ

www.pathagar.com

করলেন। কারণ দুনিয়াবাসীকে অসংখ্য 'মিথ্যা রবের' দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে সুখের জীবন যাপন করা তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। বরং তার পরিবর্তে তিনি একমাত্র প্রকৃত রবের দাসত্ব কবুল করে সমগ্র দুনিয়াকে সেই দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং এ 'অপরাধে' (?) তিনি কোথাও একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারলেন না।

জন্মভূমি থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর এবং আরব দেশসমূহে ঘুরতে-ফিরতে লাগলেন। এই ভ্রমণ ব্যাপদেশে তাঁর ওপর অসংখ্য বিপদ এসেছে, ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা তাঁর সাথে কিছু ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি রুযি-রোযগার করার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করেন নি। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কিরূপে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যেতে পারে। এই খেয়াল ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত মানুষটিকে যখন তাঁর পিতা এবং নিজ জাতি মোটেই সহ্য করলো না, তখন তাঁকে আর কে বরদাশত করতে পারে? কোন্ দেশের লোক তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা জানাবে? সকল স্থানে সেই একই ধরনের মন্দিরের পুরোহিত আর খোদায়ীর দাবিদার রাজা-বাদশাহরাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং সর্বত্র একই ধরনের অজ্ঞ-মূর্খ জনসাধারণ বাস করতো, যারা এই 'মিথ্যা খোদাদের' গোলামীর জালে বন্দী হয়েছিল। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি করে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে, যিনি নিজের রব ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি অন্য লোকদেরও বলে বেড়াতেন যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ মালিক, মনিব ও প্রভু নেই, সকলের প্রভুত্ব ও খোদায়ীর আসন চূর্ণ করে কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দারূপে জীবনযাপন কর। ঠিক এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারেন নি। বছরের পর বছর ধরে তিনি উদভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও কেনানের জনপদে, কখনও মিসরে এবং কখনও আরবের মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। এভাবেই তাঁর গোটা যৌবনকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কালো চুল সাদা হয়ে গেল।

জীবনের শেষ ভাগে নব্বই বছর বয়স পূর্ণ হতে যখন মাত্র চারটি বছর বাকি ছিল এবং সন্তান লাভের কোন আশাই যখন ছিল না তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে

www.pathagar.com

সন্তান দান করলেন। কিন্তু তখনও এই আল্লাহর বান্দা এতটুকু চিন্তিত হয়ে পড়েন নি যে, নিজের জীবনটা তো আশ্রয়হীনভাবে কেটে গেছে, এখন অন্তত ছেলে-পেলেদেরকে একটু রুজী-রোযগারের যোগ্য করে তুলি। না, এসব চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়নি। বরং এই বৃদ্ধ পিতার সামনে একটি মাত্র চিন্তাই জেগেছিল, তা এই যে, যে কর্তব্য সাধনে তিনি নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কর্তব্য পালন করার এবং তাঁর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করার মতো লোকের বিশেষ অভাব রয়েছে। ঠিক এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন তাঁকে সন্তান দান করলেন, তখন তিনি তাকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এই 'পূর্ণ মানুষ'টির জীবন একজন সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ জীবন ছিল। যৌবনের সূচনাতেই- বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই যখন তিনি তাঁর রবকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেনঃ ইসলাম গ্রহণ কর- স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, আমার দাসত্ব স্বীকার করো। তিনি তখন উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেনঃ "আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারাজাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করলাম।" সমগ্র জীবন ভরে একথা ও এ ওয়াদাকে সাচ্চা মানুষটি সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং তার যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আকীদা- বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন। পৌরহিত্যের গদিতে বসলে তিনি যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারতেন তা সবই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের বংশ-পরিবার, নিজের জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে আগুনের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, নিজের জীবনের এক একটি মুহূর্তকে রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব আনুগত্যের কাজে এবং তাঁর দ্বীন ইসলামের প্রচারে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সন্তান লাভ হলো তখন তাঁর জন্যও এ ধর্ম এবং এ কর্তব্যই নির্ধারিত করলেন। কিন্তু এসব কঠিন পরীক্ষার পর আর একটি শেষ ও কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফায়সালা হতে পারতো না। সেই কঠিন এবং কঠোর পরীক্ষাও

www.pathagar.com

সামনে এসে পড়লো। বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি যে সন্তান লাভ করেছিলেন সেই একমাত্র সন্তানকেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কিনা, তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। হযরত ইবরাহীম (আ) এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ লাভ করার সাথে সাথে যখন তিনি নিজের পুত্রকে নিজের হাতে যবেহ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করেছ। আল্লাহর কাছেও তাঁর এই কুরবানী কবুল হলো এবং তা সত্য বলে প্রমানিত হলো। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাকে জানিয়ে দিলেন এখন তুমি সেই জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছ। কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতে একথাই বলা হয়েছেঃ

"এবং যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সেই পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলো তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম (অগ্রবর্তী নেতা) নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের প্রতিও কি এই হুকুম? আল্লাহ তাআলা বললেনঃ যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১২৪)

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো এবং তাঁকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের 'নেতা' নিযুক্ত করা হলো। এখন এ আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁর কয়েকজন সহকর্মী একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তিন ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 'দক্ষিণ হাত' স্বরূপ কাজ করেছেন। একজন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ), দ্বিতীয় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) যিনি- আল্লাহ তাঁর জীবন চান জানতে পেরে অত্যন্ত খুশী ও আগ্রহের সাথে- যবেহ হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় হচেছন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ)।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি 'সাদুম' (ট্রান্স জর্দান) এলাকায় বসালেন। এখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা ইতর-লম্পট জাতি বাস করতো। সেখানে একদিকে সেই জাতির নৈতিকতার সংস্কার সাধন এবং সেই সাথে দূরবর্তী এলাকাসমূহেও ইসলামের

www.pathagar.com

দাওয়াত পৌঁছানোই ছিল তাঁর কাজ। ইরান, ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ী দল এই এলাকা দিয়েই যাতায়াত করতো। কাজেই এখানে বসে উভয় দিকেই ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ)-কে তিনি কেনান বা ফিলিস্তিন এলাকায় রাখলেন। এটা সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থান, তদুপরি এটা সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা বলে এখান থেকেই অন্যান্য দেশ পর্যন্ত ইসলামের আওয়াজ পৌঁছানো সহজ ছিল। এ স্থান থেকেই হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ) যার নাম ছিল ইসরাঈল এবং পৌত্র হযরত ইউসুফ (আ) এর মারফতে ইসলামী আন্দোলন মিসর পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজাযের মক্কা নগরীতে বসালেন এবং দীর্ঘকাল যাবত নিজেই তাঁর সাথে থেকে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। তারপর এখানেই পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কা'বা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন, নিজেই এটা গড়ে তোলার স্থান ঠিক করেছিলেন। খানায়ে কা'বা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটা দ্বীন ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এই কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হলো 'হজ্জ'। এই ইবাদাত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কি করে হলো, কোন সব পূত ভাবধারা এবং দোআ প্রার্থনা সহকারে পিতা-পুত্র মিলে এ ইমারত তৈরি করেছিলেন আর 'হজ্জ' কিভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

"মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা মক্কার ঘর তাতে সন্দেহ নেই। এটা অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। এতে আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বর্তমান রয়েছে, 'মাকামে ইবরাহীম' রয়েছে এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে সে-ই নিরাপদ থাকবে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৬-৯৭)

www.pathagar.com

"আমরা মানুষের জন্য কিরূপে বিপদশুন্য ও শান্তিপূর্ণ হেরেম তৈরি করেছি তা কি তারা দেখতে পায়নি? অথচ তার চারপাশে লোক লুণ্ঠিত ও ছিনতাই হয়ে যেতো।"

(সূরা আল আনকাবূতঃ ৬৭)

অর্থাৎ আরবের চারদিকে যখন লুঠ-তরাজ, মার-পিট এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তির সয়লাব বয়ে যেত তখনও এই হেরেমে সর্বদা শান্তি বিরাজ করতো। এমন কি দুর্ধর্ষ মরু বেদুঈন যদি এর সীমার মধ্যে তার পিতৃহন্তাকে দেখতে পেত, তবুও এর মধ্যে বসে তাকে স্পর্শমাত্র করতে সাহস পেত না।

এবং স্মরণ কর, যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলাম এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থানকে 'মুসাল্লা' (জায়নামায) বানাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী এবং নামাযীদের জন্য আমার ঘরকে পাক ও পরিচছন্ন রাখার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, হে পালনকর্তা! আপনি এই শহরকে শান্তিপূর্ণ জনপদে পরিণত করুন এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের জন্য ফল-মূল দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে দিন।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১২৫-১২৬)

"এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদিগার! আমাদের এই চেষ্টা কবুল কর, তুমি সবকিছু জান এবং সবকিছু শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের দু'জনকেই মুসলিম- অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলি থেকে এমন একটি জাতি তৈরি কর যারা একান্তভাবে তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পন্থা বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দিবে এবং তাদের চরিত্রকে সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিজ্ঞ।" (সূরা আল বাকারাঃ ১২৭-১২৯)

www.pathagar.com

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ হে আল্লাহ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তিপূজার শিরক থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীত চলবে- তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এই মহান ঘরের নিকট, এ ধূসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি- এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি লোকদের মনে এতদূর উৎসাহ দাও যেন তারা এদের দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। হয়ত এরা তোমাদের কৃতজ্ঞ বান্দা হবে।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৫-৩৭)

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এই ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম- একথা বলে যে, এখানে কোন প্রকার শিরক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোকদের হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও- তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃষক উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে।"

(সূরা আল হজ্জঃ ২৬-২৮)

'হজ্জ' শুরু হওয়ার এটাই গোড়ার ইতিহাস। এটাকে ইসলামের পঞ্চম রোকন (স্তম্ভ) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, দুনিয়ায় যে নবী বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, মক্কা-ই ছিল তাঁর প্রধান কার্যালয় পবিত্র কা'বাই ছিল এর প্রধান কেন্দ্র- যেখান থেকে ইসলাম দুনিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হতো। আর দুনিয়ায় যারাই এক আল্লাহর বন্দেগী করতে চাবে এবং বাস্তব কর্মজীবনে তাঁর আনুগত্য করে চলবে, তাঁরা যে জাতি আর যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন, সকলেই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে

www.pathagar.com

প্রতি বছর এসে সমবেত হবে, এজন্য 'হজ্জ' করার পন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া যাবে যে, চাকা যেমন নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে, মুসলমানদের জীবনও তেমনি আপন কেন্দ্রেরই চতুর্দিকে আবর্তিত হয়- এই গূঢ় রহস্যেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে হজ্জ।

কিভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে হজ্জ শুরু হয়েছিল সে কথা পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এখানে বসিয়েছিলেন, যেন তার পরে তিনি এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন, একথাও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরে তার বংশধরগণ কতকাল দ্বীন ইসলামের পথে চলেছে তা আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা যে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে গিয়েছিল এবং অন্যান্য 'জাহেল' জাতির ন্যায় সর্বপ্রকার গুমরাহী ও পাপ প্রথার প্রচলন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে এককালে এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত ও প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই কা'বা ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা হলো। এমনকি, মূর্তি পূজা করার বিরুদ্ধে সারা জীবন যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) সাধনা ও আন্দোলন করে অতিবাহিত করেছিলেন তাদের মূর্তি নির্মাণ করেও কা'বা ঘরে স্থাপন করা হয়েছিল। তাওহিদী ধর্মের অগ্রনেতা হযরত ইবরাহীম (আ)- এর পরবর্তী বংশধরগণ লাত, মানাত, হুবাল, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা, আসাফ, নায়েলা আরও অসংখ্য নামের মূর্তি প্রস্তুত করে তাদের পূঁজা করতো। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রেরও পূজা করতো। ভূত-প্রেত, ফেরেশতা এবং মৃত পূর্বপুরুষদের 'আত্মা'র পূজাও করতো। তাদের মূর্খতা এতদূর প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদের বংশের মূর্তি না পেলে পথ চলার সময় যে কোন রঙীন পাথর দেখতে পেতো তারা তারই পূজা শুরু করতো। পাথর না পেলে পানি ও মাটির সংমিশ্রণে একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার ওপর ছাগ দুগ্ধ ছিটিয়ে দিলেই তাদের মতে সেই নিষ্প্রাণ পিণ্ডটি খোদা হয়ে যেত এবং এরই পূজা করতো। যে পৌরোহিত্য ও ঠাকুরবাদের বিরুদ্ধে তাদের 'পিতা' হযরত ইবরাহীম (আ) সমগ্র ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তা-ই আবার তাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল, কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার আড্ডাখানা

www.pathagar.com

বানিয়ে নিজেরাই সেখানকার পুরোহিত সেজেছিল। হজ্জকে তারা 'তীর্থযাত্রা'র অনুরূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর থেকে মূর্তিপূজার প্রচার শুরু করেছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকদের কাছ থেকে 'নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড়' আদায় করতো। এভাবে ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘোর জাহেলী যুগে হজ্জের যে চরম দুর্গতি হয়েছিল একটি ব্যাপার থেকে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। মক্কায় একটি বার্ষিক মেলা বসতো, আরবের বড় বড় বংশ ও গোত্রের কবি কিংবা 'কথক' নিজ নিজ গোত্রের খ্যাতি, বীরত্ব, শক্তি, সম্মান ও বদান্যতার প্রশংসায় আকাশ-বাতাস মুখরিত প্রতিযোগিতা করতো। এমন কি অপরের নিন্দার পর্যায়ও এসে যেত। সৌজন্য ও বদান্যতার ব্যাপারেও পাল্লা দেয়া হতো। প্রত্যেক গোত্র-প্রধান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ডেগ চড়াতো এবং একে অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে উটের পর উট যবেহ করতো। এ অপচয় ও অপব্যয়ের মূলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল; তা এই যে, এ সময় কোন বদান্যতা করলে মেলায় আগত লোকদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং কোন্ গোত্রপতি কতটি উট জবেহ করেছিল এবং কত লোককে খাইয়েছিল ঘরে ঘরে তার চর্চা শুরু হবে। এসব সম্মেলনে নাচ-গান, মদপান, ব্যভিচার এবং সকল প্রকার নির্লজ্জ কাজ-কর্মের অনুষ্ঠান বিশেষ জাঁক-জমকের সাথে সম্পন্ন হতো। এ উৎসবের সময় এক আল্লাহর দাসত্ব করার কথা কারো মনে জাগ্রত হতো কিনা সন্দেহ। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো। কিন্তু তার পদ্ধতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষ সকলেই উলংগ হয়ে একত্রে ঘুরতো আর বলতো আমরা আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় যাব, যেমন অবস্থায় আমাদের মা আমাদেরকে প্রসব করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)- এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে এই ধরনের বিকৃত 'ইবাদাত' করা হতো, বাঁশি বাজান হতো, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হতো। আল্লাহর নামও যে সেখানে নেয়া হতো না, এমন নয়। কিন্তু কিরূপে? তারা বলতোঃ

www.pathagar.com

“আমি এসেছি, হে আমার আল্লাহ! আমি এসেছি, তোমার কেউ শরীক নেই; কিন্তু যে তোমার আপন, সে তোমার অংশীদার। তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানারও মালিক।”

আল্লাহর নামে সেখানে কুরবানীও দেয়া হতো। কিন্তু তার পন্থা ছিল কত নিকৃষ্ট ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কুরবানীর রক্ত কা’বা ঘরের দেয়ালে লেপে দিত এবং এর গোশত কা’বার দুয়ারে ফেলে রাখতো। কারণ, তাদের ধারণা মতে আল্লাহ এসব রক্ত ও গোশত তাদের কাছ থেকে কবুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ই হজ্জের সময় ৪ মাস রক্তপাত হারাম করে দেয়া হয়েছিল এবং এ সময় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালের লোকেরা এ নিষেধ অনেকটা মেনে চলেছে বটে; কিন্তু যুদ্ধ করতে যখন ইচছা হতো, তখন তারা এক বছরের নিষিদ্ধ মাসগুলোকে ‘হালাল’ গণ্য করতো এবং পরের বছর তার ‘কাযা’ আদায় করতো।

এছাড়া অন্যান্য যেসব লোক নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল তারাও নিতান্ত মূর্খতার কারণে আশ্চর্য রকমের বহু রীতিনীতির প্রচলন করেছিল। একদল লোক কোন সম্বল না নিয়ে হজ্জে যাত্রা করতো এবং পথে পথে ভিক্ষা মেগে দিন অতিবাহিত করতো। তাদের মতে এটা খুবই পুণ্যের কাজ ছিল। মুখে তারা বলতো- “আমরা আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করেছি, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য যাচ্ছি- দুনিয়ার সম্বল নেয়ার প্রয়োজন কি?” হজ্জে গমনকালে ব্যবসা করে কিংবা কামাই-রোযগারের জন্য শ্রম করাকে সাধারণত নাজায়েয বলেই ধারণা করা হতো। অনেক লোক আবার হজ্জের সময় পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিত এবং এরূপ করাকেও তারা ইবাদাত বলে মনে করতো। কোন কোন লোক হজ্জে যাত্রা করলে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিত। এর নাম ছিল ‘হজ্জে মুছমিত’ বা ‘বোবা হজ্জ’। এভাবে আরও যে কত প্রকার ভ্রান্ত ও কুপ্রথার প্রচলন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না।

এরূপ ঘোর অন্ধকারাচছন্ন অবস্থা কম-বেশি দু’ হাজার বছর পর্যন্ত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে আরব দেশে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি, আর কোন নবীর প্রকৃত শিক্ষাও সেই দেশে পৌঁছেনি। অবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলো। তিনি কা’বা ঘর প্রতিষ্ঠার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া

www.pathagar.com

করেছিলেন, "হে আল্লাহ! এ দেশে একজন নবী এ জাতির মধ্য থেকেই প্রেরণ কর, যে এসে তাদেরকে তোমার বাণী শুনাবে; জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করবে।" এ দোয়া আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়েছিল, তাই তাঁরই অধস্তন পুরুষে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটলো।

হযরত ইবরাহীম (আ) যেরূপ পূজারী ও পুরোহিতের বংশে জন্মলাভ করেছিলেন, এই হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও অনুরূপ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন- শতাব্দীকাল ধরে যারা কা'বা ঘরের পৌরোহিত্য করে আসছিল। একচছত্রভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) যেরূপ আপন বংশের পৌরোহিত্যবাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন নিজ বংশীয় পৌরোহিত্য ও পাণ্ডিতের ওপর। শুধু তাই নয়, তাঁর আঘাতে তা একেবারে মূলোৎপাটিত হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যেমন বাতিল মতবাদ ও সমগ্র মিথ্যা খোদায়ী ধ্বংস করা এবং এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও তাই করেছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত প্রকৃত দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একুশ বছরের চেষ্টায় তার এসব কাজ যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে কা'বা ঘরকেই তিনি সমগ্র দুনিয়ায় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের কেন্দ্ররূপে স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন এবং দুনিয়ার সকল দিক থেকেই মুসলিম জাতিকে হজ্জ করার জন্য কা'বা ঘরে এসে জমায়েত হওয়ার আহবান জানান পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ হচেছঃ

"মানুষের ওপর আল্লাহর হক এই যে, এ কা'বা ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ যাদের আছে তারা হজ্জ করার জন্য এখানে আসবে। যারা কুফরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে আসবে না), তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"

(সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

এভাবে নব পর্যায়ে হজ্জ প্রবর্তন করার সাথে সাথে জাহেলী যুগে দু'হাজার বছর যাবত প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার একেবারে বন্ধ করা হলো। কা'বা গৃহের

www.pathagar.com

মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হলো। আল্লাহ ছাড়া মূর্তির যে পূজা সেখানে হতো তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হলো। মেলা এবং সকল প্রকার তামাশা ও উৎসব নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। আল্লাহর ইবাদাত করার সঠিক এবং স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলন করা হলো, পবিত্র কোরআনুল করিমে এরশাদ হলোঃ

"(আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদাত করার) যে পন্থা আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তদনুযায়ী আল্লাহর স্মরণ (ও ইবাদাত) কর যদিও এর পূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে (অর্থাৎ স্মরণ ও ইবাদাত করার সঠিক পন্থা জানতে না)।" (সূরা আল বাকারাঃ ১৯৮)

সকল অন্যায় ও বাজে কর্মতৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলোঃ

"হজ্জ উপলক্ষে কোনরূপ ব্যভিচার, অশ্লীলতা, আল্লাহদ্রোহিতা, ফাসেকী কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না।"

কাব্য আর কবিত্বের প্রতিযোগিতা, পূর্ব পুরুষদের কাজ-কর্মের কথা নিয়ে গৌরব-অহংকার এবং পরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা বা গালাগাল দেয়া বন্ধ করা হলো। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হলোঃ

"হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যেভাবে বাপ-দাদার স্মরণ করতো ঠিক অনুরূপ কিংবা তদপেক্ষা বেশি করে তোমরা আল্লাহর স্মরণ কর।"

(সূরা আল বাকারাঃ ২০০)

শুধু লোকদের দেখাবার জন্য বা খ্যাতি অর্জন করার যেসব বদান্যতা ও দানশীলতার গৌরব করা হতো তা সবই বন্ধ হলো এবং তদস্থলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলের পশু যবেহ করার রীতি প্রচলিত হলো। কারণ এর ফলে গরিব হাজীদেরও কুরবানীর গোশত খাওয়ার সুযোগ হলো।

"খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেকে ভালবাসেন না।" (সূরা আল আরাফঃ ৩১)

www.pathagar.com

"খালেছ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এবং তারই নামে এ জন্তুগুলোকে যবেহ কর। যবেহ করার পর যখন প্রাণ একেবারে বের হয়ে যাবে, তখন নিজেরাও তা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকেও খেতে দাও।"

(সূরা আল হাজ্জঃ ৩৬)

কুরবানীর পশুর রক্ত খানায়ে কা'বার দেয়ালে মর্দন করা এবং গোশত নিক্ষেপ করার কুপ্রথা বন্ধ হলো। পরিষ্কার বলে দেয়া হলোঃ

"এসব পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তোমাদের তাকওয়া এবং পরহেযগারীই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে।"

(সূরা আল হাজ্জঃ ৩৭)

উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেলঃ

"হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস (অর্থাৎ পোশাক-পরিচছদ) মনোনীত করেছেন, তা কে হারাম করলো?"

(সূরা আল আরাফঃ ৩২)

"হে নবী! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ কখনও নির্লজ্জতার হুকুম দেন না।"

(সূরা আল আরাফঃ ৬৮)

"হে আদম সন্তান! সকল ইবাদাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ (পোশাক পরিধান) কর।"

(সূরা আল আরাফঃ ৩১)

হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া এবং নিষিদ্ধ মাসকে যুদ্ধের জন্য 'হালাল' মনে করাকে বিশেষ কড়াকড়ির সাথে বন্ধ করা হলোঃ

"নাসী কুফরীকে অধিকতর বাড়িয়ে দেয় (কুফরীর সাথে স্পর্ধাকে যোগ করে।) কাফেরগণ এভাবে আরও অধিক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। এক বছর এক মাসকে হালাল মনে করে আবার দ্বিতীয় বছর তার বদলে আর একটি মাসকে হারাম বেঁধে নেয়- যেন আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা কমানো ও বাড়ানোর ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরূপ কাজ করলে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকেই হালাল করা হয়।"

(সূরা আত তাওবাঃ ৩৭)

www.pathagar.com

সম্বল না নিয়ে হজ্জ যাত্রা করা নিষিদ্ধ হলো এবং পরিষ্কার বলে দেয়া হলোঃ

"হজ্জ গমনকালে সম্বল অবশ্যই নেবে। কারণ, (দুনিয়ার সফরের সম্বল না নেয়া আখেরাতের সম্বল নয়) আখেরাতের উত্তম সম্বল তো হচেছ তাকওয়া।" (সূরা আল বাকারাঃ ১৯৭)

হজ্জের সময় ব্যবসা করা বা অন্য কোন উপায়ে রুজি-রোযগার করা নিতান্ত অপরাধের কাজ, আর এসব না করাকেই বড় পুণ্যের কাজ মনে করা হতো। আল্লাহ তাআলা এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে নাযিল করলেনঃ

"(হজ্জে গমনকালে) ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ কিছু কামাই রোযগার করলে তাতে কোন অপরাধ নেই।"

(সূরা বাকারাঃ ১৯৮)

'বোবা' হজ্জ এবং 'ক্ষুধার্ত- পিপাসার্ত' হজ্জ হতেও মানুষকে বিরত রাখা হলো। শুধু তাই নয়, এছাড়া জাহেলী যুগের আরও অসংখ্য কুসংস্কার নির্মূল করে দিয়ে তাকওয়া, আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা এবং অনাড়ম্বরতাকে মানবতার পূর্ণাঙ্গ আদেশ বলে ঘোষণা করা হলো, হজ্জযাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদেরকে সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে নেয়, নফসের খাহেশ ও লালসা যেন ত্যাগ করে, হজ্জগমন পথে স্ত্রী-সহবাসও যেন না করে, গালাগাল, কুৎসা রটানো, অশ্লীল উক্তি প্রভৃতি জঘন্য আচরণ থেকে যেন দূরে সরে থাকে। কা'বায় পৌছার যত পথ আছে, প্রত্যেক পথেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। সেই স্থান অতিক্রম করে কা'বার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এহরাম বেঁধে গরিবানা পোশাক পরিধান করে নেবে। এতে আমীর গরীব সকলেই সমান হবে, পৃথক পৃথক কওম, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে যাবে। এবং সকলেই এক বেশে- নিতান্ত দরিদ্রের বেশে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাবে। রক্তপাত করা তো দূরের কথা, পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ। মানুষের মধ্য থেকে পশু স্বভাব দূর করে শান্তিপ্রিয়তার গুণ সৃষ্টি এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় মহীয়ান করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। হজ্জের চার মাসকালের মধ্যে যেন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, এজন্য এ চারটি মাসকে 'হারাম' করে দেয়া হলো। এর ফলে কা'বা গমনের সমস্ত পথ নিরাপদ হলো। হজ্জ যাত্রীদের পথে কোনরূপ বিপদের আশংকা রইল না। এরূপ পবিত্র ভাবধারা

www.pathagar.com

সহকারে 'হেরেম শরীফে' প্রবেশ করার নির্দেশ হলো। কোনরূপ রং-তামাশা, নাচ-গান এবং মেলা আর খেলা দেখার উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রতি পদে পদে আল্লাহর স্মরণ- আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কা'বা ঘরের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এখানে একটি মাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, 'হেরেম শরীফের' প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পদে উচচারিত হয়ঃ

"তোমার ডাকেই হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। সকল তা'রীফ প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। সব নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউ তোমার শরীক নেই।"

এরূপ পূত-পবিত্র এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ হজ্জ সম্পর্কে বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেনঃ
"যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা এবং ফাসেকী থেকে দূরে থাকে, সে সদ্যজাত শিশুর মতই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে।"

অতপর হজ্জের কল্যাণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করার পূর্বে হজ্জ কি রকমের ফরয, তা বলা আবশ্যক। আল্লাহ কালামে পাকে বলেনঃ
"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মত সামর্থ যার আছে, হজ্জ করা তার ওপর আল্লাহর একটি অনিবার্য নির্দিষ্ট 'হক'। এতদসত্ত্বেও যে তা অমান্য করবে সে কাফের এবং আল্লাহ দুনিয়া জাহানের মুখাপেক্ষী নন।"

এ আয়াতেই হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে পরিষ্কার কুফরী বলা হয়েছে। নবী করীম (সা) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার মধ্যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছেঃ
"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে।"

www.pathagar.com

"যার কোন প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, কোন যালেম বাদশাও যার পথ রোধ করেনি এবং যাকে কোন রোগ অসমর্থ করে রাখেনি- এতদসত্ত্বেও সে যদি হজ্জ না করেই মরে যায়, তবে সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মরতে পারে।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) এর ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ "সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করতে ইচছা হয়; কারণ তারা মুসলমান নয়, মুসলমান নয়।"

আল্লাহ তাআলার উল্লিখিত ইরশাদ এবং রাসূলে করীম (সা) ও তাঁর খলিফার এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয় তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচছাধীন করে দেয়া হয়নি। বস্তুত যেসব মুসলমানদের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ আছে, শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই। দুনিয়ার যে কোণেই বাস করুক না কেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান যদি হজ্জকে এড়াতে চায় এবং অসংখ্য ব্যস্ততার অজুহাতে বছরের পর বছর তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়- সময় থাকতে আদায় না করে, তবে তার ঈমান আছে কিনা সন্দেহ। আর যারা দিকে দিকে, দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়ায়- ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতকালে হেজাযের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে- কা'বা ঘর যেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ, তবুও হজ্জ আদায় করার খেয়ালও তাদের মনে জাগ্রত হয় না- তারা কিছুতেই মুসলমান নয়; মুসলমান বলে দাবি করার কোনই অধিকার তাদের নেই, দাবি করলেও সেই দাবী হবে মিথ্যা। আর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা কুরআন শরীফের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহেল। এসব লোকের মনে যদি মুসলিম জাতির জন্য দরদ থাকে তবে থাকতে পারে; কিন্তু তার কোনই সার্থকতা নেই। কারণ তাদের হৃদয়-মনে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের প্রতি ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

যেসব মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরয হয় অর্থাৎ যারা কা'বা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে এমন লোক দু' একজন নয়। প্রত্যেক এলাকায় তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। বলতে গেলে প্রত্যেক বছরই এদের অধিকাংশ লোকই হজ্জ করার ইচছা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। দুনিয়ার যেসব জায়গায়

www.pathagar.com

মুসলমান বসবাস করে, তথায় হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী যিন্দেগীর এক নতুন চেতনা কিরূপ জেগে ওঠে, তা সত্যই লক্ষ্য করার মত। প্রায় রমযান থেকে শুরু করে যিলকদ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত লোক হজ্জ যাত্রায় আয়োজন করে রওয়ানা হয়। আর ওদিকে মহররম মাসের শেষ দিক থেকে সফর, রবিউল আউয়াল তথা রবিউস্‌সানী পর্যন্ত হাজীদের প্রত্যাবর্তনের ধারা চলতে থাকে। এ ছয় মাসকাল পর্যন্ত সকল মুসলিম লোকালয় এক প্রকার ধর্মীয় ভাবধারায় সরগরম হয়ে থাকে। যারা হজ্জে গমন করে আর হজ্জ করে ফিরে আসে, তারা তো ধর্মীয় ভাবধারায় নিমগ্নই হয়ে থাকে; কিন্তু যারা হজ্জে গমন করে না, হাজীদের রওনা করাতে, এক একটি স্টেশন থেকে তাদের চলে যাওয়া আবার ফিরে আসার সময় তাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের কাছে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনার ব্যাপারে তারাও কিছুটা হজ্জে গমনের আনন্দ লাভ করে থাকে। এর থেকে ইসলামী বিশ্বে হজ্জে আগে ও পরে প্রায় ৬ মাস যাবত হজ্জের আনন্দ চলতে থাকে।

এক একজন হাজী যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তাওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে ওঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের কাছে বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কারবারের চূড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এতে মনে হয় যে, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় দিল পবিত্র হয়ে গেছে। এভাবে এক একজন হাজীর এ পরিবর্তনে তার চারপাশের লোকদের ওপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এরূপ প্রত্যেক বছরই দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তাদের এ গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো লক্ষ লক্ষ লোকের চরিত্রের ওপর না পড়ে পারে না। তারপর হাজীদের কাফেলা যে স্থান অতিক্রম করে, তাদেরকে দেখে তাদের সাথে সাক্ষাত করে 'লাব্বাইকা' আওয়ায শুনে সেখানকার কত মানুষের দিল অলৌকিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কত মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে ওঠে। এসব লোক যখন আবার নিজ নিজ দেশের দিকে- দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে হজ্জের প্রাণস্পর্শী ভাবধারা বিস্তার করে প্রত্যাবর্তন করে এবং দলে দলে মানুষ

www.pathagar.com

তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরের আলোচনা শুনে কত অসংখ্য মানুষের মনে এবং অসংখ্য পরিমণ্ডলে ইসলামী ভাবধারা জেগে ওঠে। যার প্রভাব হাজীদের গোটা পরিবেশের উপরই প্রভাব বিস্তার করে।

এ জন্যই আমি বলতে চাই যে, রমযান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম তেমনি হজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের মৌসুম। মহান আল্লাহ এ ব্যবস্থা এ জন্য করেছিলেন যেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কা'বাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বন্ধ হয়ে না যায় ততদিন যেমন মানুষের মৃত্যু হয় না সেরূপ হজ্জের এ সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনও চলতে থাকবে। মুসলিম জাতির প্রাণ স্পন্দনের মত হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্ কে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্যের কেন্দ্র হিসাবে কাবা শরীফ ও হজ্জ মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাবে।

একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেই আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, পৃথিবীর দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচছদ খুলে ফেলে এবং সকলে একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। এহরামের এ 'ইউনিফরম' ধারণ করার পর পরিষ্কার মনে হয় যে, দুনিয়ার হাজার হাজার জাতির মধ্য থেকে এই যে লক্ষ লক্ষ ফৌজ আসছে, এরা বিশ্বের বাদশাহ ও যমীন-আসমানের রাজাধিরাজ এক আল্লাহ তাআলারই ফৌজ। এরা দুনিয়ার হাজার হাজার জাতি ও কাওম থেকে ভর্তি হয়েছে। এরা সকলে একই বাদশাহর ফৌজ। এদের সকলের ওপর একই সম্রাটের আনুগত্য ও গোলামীর চিহ্ন লেগে আছে, একই বাদশার আনুগত্যের সূত্রে এরা সকলেই পরস্পর বিজড়িত রয়েছে এবং একই রাজধানীর দিকে, মহাসম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার জন্য ছুটে চলেছে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এ সিপাহী জাতি অতিক্রম করে যখন

www.pathagar.com

সামনে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ থেকে এ একই প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেঃ

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যত নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয় এবং সকলেই একত্রিত হয়ে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে, সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, রুকূ'-সিজদা করে, সকলে একই আরবি ভাষায় কুরআন পড়ে এবং শুনে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তারপর এ বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই উৎরাইয়ে যখন এ আওয়াজ উত্থিত হয়, যখন নামাযের সময়ে এবং প্রভাতে এ শব্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যখন কাফেলাসমূহ পরস্পর মিলিত হবার সময় এ শব্দই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখন চারদিকে এক আশ্চর্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে পরিবেশে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, এক অচিন্তনীয় ভাবধারায় সে মত্ত হয়ে পড়ে, 'লাব্বাইকা' ধ্বনির আকর্ষণে সে এক ভাবজগতে ছুটে যায়। অতঃপর কা'বায় পৌঁছে দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সমাগত জনসমুদ্রের একই পোশাকে নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা, সকলের মিনায় উপস্থিত হয়ে তাঁবু জীবনযাপন করা এবং তথায় এক ইমামের কণ্ঠে ভাষণ (খোতবা) শ্রবণ করা, তারপর মুযদালিফায় তাঁবুর নিচে রাত্রি যাপন করা, আবার মিনার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করা, সকলে মিলে আকাবায় পাথর দ্বারা চাঁদমারী করা, তারপর সকলের কুরবানী করা, সকলের একই সাথে কা'বায় ফিরে এসে তার তাওয়াফ করা, সকলের একই কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে নামায পড়া- এসব কাজে যে পবিত্র পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় তার তুলনা নেই।

তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে আগত অসংখ্য মানুষের একই কেন্দ্রে সম্মিলিত হওয়া এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ঐক্যভাবের সাথে একত্রিত হওয়া এমন পবিত্র উদ্দেশ্য ও ভাবধারা এবং নির্মল কাজ-কর্ম সহকারে সমস্ত কাজ

www.pathagar.com

সম্পন্ন করা প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের জন্য এটা এক বড় নিয়ামত। আল্লাহ্‌র এ নিয়ামত ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই দিতে পারেনি। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলত হওয়ার কোন নতুন কথা নয় চিরকালই এরূপ হয়েছে। কিন্তু তা'দের এ সম্মেলন হয় যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের গলা কাটার জন্যে। অথবা সন্ধি সম্মেলনে বিজিত দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্যে কিংবা বিশ্বজাতি সম্মেলনে এক একটি জাতির বিরুদ্ধে ধোঁকা ও প্রতারণার ষড়যন্ত্র, যুলুম এবং বেঈমানীর জাল ছড়াবার জন্য; অথবা পরের ক্ষতি সাধন করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সমগ্র জাতির জনসাধারণের নির্মল মন, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে এবং প্রেম ভালবাসা, নিষ্ঠা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব সহকারে একত্রিত হওয়া, চিন্তা, কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে মিলিত হওয়া- তাও আবার একবার মিলিত হয়েই ক্ষান্ত না হওয়া বরং চিরকালের জন্য প্রত্যেক বছর একই কেন্দ্রে একত্রিত হওয়া। এছাড়া আজ যিনি আসছেন পরের বছর হয়তো তিনি আসতেও পারেন অথবা নাও আসতে পারেন সে ক্ষেত্রে নতুন এসে সে যায়গা পূরন করার মাধ্যমে সামর্থবান বিশ্ব মুসলিমের একত্রিত হওয়ার এ প্রক্রিয়া রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার মত বড় নেওয়ামত অন্য কোন জাতিকে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন দেননি। যা মুসলিম উম্মাহ্‌কে দিয়েছেন। বিশ্বমানবতার প্রতি এতবড় নিয়ামত দুনিয়ায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম ব্যবস্থাই দিতে পারেনি। বিশ্ব শান্তি স্থাপনে জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে দেয়া এবং লড়াই ঝগড়ার পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কেউ পেশ করতে পারে নি। ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি; সে আরো অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বছরের চারটি মাস হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম কা'বা যাতায়াতের এ চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হজ্জ ও ওমরার কারণে একটি বছরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত থেকে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে একটি হেরেম দান করেছে। এই হেরেম কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে মানুষ মারা তো দূরের কথা, কোন জন্তুও শিকার করা যেতে পারে না। এমনকি এখানকার ঘাসও কেটে ফেলার অনুমতি নেই। এখানকার কোন কাঁটাও চূর্ণ করা যায় না, কারো কোন জিনিস এখানে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। ইসলাম পৃথিবীর বুকে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শহরে কারো কোন হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহিতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে আল্লাহ পাক এই বলে সাবধান করে দিয়েছেনঃ আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।"

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারিত করেছে। পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এ কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে।" আমেরিকার বাসিন্দা হোক কি আফ্রিকার, চীনের বাসিন্দা হোক কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, রাশিয়া ইউরোপ অথবা জাপানের, সে যদি মুসলমান হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। সমগ্র হারাম শরীফের এলাকা মসজিদের ন্যায়। মসজিদে গিয়ে যে মুসলমান নিজের জন্য কোন স্থান করে নেয়, সে স্থান তারই হয়ে যায়; কেউ তাকে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারে না, কেউ তার কাছে ভাড়া চাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি সারা জীবনও সেই স্থানে বসে থাকে, তবুও সেই স্থানকে নিজের মালিকানা স্বত্ব বলে দাবি করতে এবং তা বিক্রি করতে পারে না। এর জন্য সে ভাড়াও চাইতে পারে না। এভাবে সেই ব্যক্তি যখন সেই স্থান থেকে চলে যাবে তখন অন্য কেউ এসে সেখানে আসন করে নিতে পারে, যেমন পূর্বের লোকটি পেরেছিল। 'হারাম শরীফের' অবস্থাও ঠিক এরূপ।

হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "মক্কা নগরের যে স্থানে এসে যে ব্যক্তি প্রথমে অবতরণ করবে সেই স্থান তারই হবে।" এখানকার বাড়ি-ঘরের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। হযরত উমর ফারুক (রা) এখানকার লোকদের

www.pathagar.com

ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনের দুয়ার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে লোকেরা তাদের প্রাঙ্গণে এসে অবস্থান করতে পারে। কোন কোন ফকীহ্ এতদূরও বলেছেন যে, মক্কা নগরীর বাড়ি ঘরের কেউ মালিক নয়, তা উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে বন্টনও হতে পারে না। এসব সুযোগ-সুবিধা এবং আযাদীর মূল্যবান নিয়ামত দুনিয়ার মানুষ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পেতে পারে না।

এই পবিত্র হজ্জ সম্পর্কেই বলা হয়েছিলঃ তোমরা এটা করে দেখ এতে তোমাদের জন্য কত বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সমস্ত কল্যাণকে গুণে গুণে বলার শক্তি আমার নেই। কিন্তু তবুও এ পর্যন্ত তার যে কিঞ্চিত বিবরণ ওপরে পেশ করেছি তা থেকে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

কিন্তু এসব কথা শুনার পর আমার নিজের মনের দুঃখের কথাও খানিকটা শুনুন। বংশানুক্রমিক মুসলমান হীরক খনির অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত। এ শিশু যখন জন্ম মুহূর্ত থেকেই চারদিকে কেবল হীরক দেখতে পায় এবং হীরক খণ্ড নিয়ে খেলা করতে থাকে, তখন তার দৃষ্টিতে হীরকের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদও সাধারণ পাথরের মতই মূল্যহীন বলে মনে হয়। বংশীয় মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক এরূপ। সমগ্র জগৎ যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং যা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা নানা প্রকার দুঃখ-মুসবিতে নিমজ্জিত রয়েছে আর মানব জাতি যার সন্ধান করতে ব্যাকুল রয়েছে, সেই মূল্যবান নিয়ামতসমূহ বর্তমান মুসলমানরা বিনামূল্যে লাভ করেছে, এজন্য অনুসন্ধান এবং খোঁজাখুঁজির জন্য একবিন্দু পরিশ্রমও তাদের করতে হয় নি। এসব ছাড়াই তারা এটা পেয়েছে শুধু এ জন্য যে, সৌভাগ্যবশত তারা মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেছে। যে কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমগ্র জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিতে পারে, শিশুকাল থেকেই তা তাদের কানে প্রবেশ করছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং লোকদের পরস্পরের ভাই ও দরদী বন্ধুতে পরিণত করার জন্য নামায-রোযা স্পর্শমণি অপেক্ষাও বেশি মূল্যবান। এরা জন্মলাভ করেই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে এটা লাভ করেছে। যাকাত ইসলামী সমাজের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা, এদ্বারা শুধু মনের 'নাপাকিই' দূর হয় না, দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাও সুষ্ঠুতা লাভ করে- যা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার মানুষ একে অপরের বুকের রক্ত শুষে নিচেছ। এটা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু

www.pathagar.com

মুসলমানরা তা বিনাব্যয়ে এবং বিনাশ্রমে লাভ করেছে। এটা ঠিক তেমনিভাবে, যেমন খুব বড় চিকিৎসকের সন্তান ঘরে বসেই বড় বড় রোগের তালিকা এবং ওষুধের তালিকাও বিনামূল্যে লাভ করে থাকে। অথচ এর জন্য অন্যান্য মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সন্ধান করে বেড়ায়। হজ্জও একটি বিরাট ব্যবস্থা, সমগ্র দুনিয়ায় এর কোন তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামী আন্দোলনের আওয়ায পৌঁছাবার জন্য এবং আন্দোলনকে চিরকালের তরে জীবিত রাখার জন্য এটা অপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লায় বিশ্বাসী, সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেবার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোন পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর সব অঞ্চলের বাস্তব সমস্যা সমূহ মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর যেনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় তার সমাধান করার জন্য মুসলিম উম্মাহ যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। মুসলিম উম্মাহ্-র ইহুদী শত্রুদের দ্বারা প্রণীত ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয়ভাবে মোকাবেলার পথ তৈরী করা যেতে পারে। হজ্বের এ নেয়ামতকে কাজে লাগিয়ে এই বিশ্ব সম্মেলন থেকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যেতে পারে। মুসলিম উম্মাহ্র বড় সমস্যা গুলির সমাধান করা যেতে পারে হজ্ব এর বিশ্ব সম্মেলন থেকেই। যুগ-যুগান্তর থেকে জীবন্ত ও প্রচলিত এ ব্যবস্থাও মুসলমানগণ নিজেদের সম্পদ হিসেবে লাভ করেছে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা শ্রমে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, মুসলমান বিনাশ্রমে প্রাপ্ত এ মূল্যবান সম্পদের কোন কদর বুঝেনি, বরং তারা এটা নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে খেলা করছে, যেমন হীরকখণ্ড নিয়ে খেলা করে হীরক খনিতে প্রসূত শিশু সন্তান। আর তাকে সে মনে করে সাধারণ পাথরের ন্যায় মূল্যহীন। মুসলমান নিজেদের মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে এ বিরাট মূল্যবান সম্পদ ও শক্তির উৎস নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে খেলা করছে। এর অপচয় করছে- এটাকে নষ্ট করছে- এসব দেখে বড় কষ্ট লাগে। পাথর চূর্ণকারীর হাতে মূল্যবান হীরক খণ্ড বরবাদ হতে দেখে সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। কোন এক কবি সত্যিই বলেছিলেনঃ

www.pathagar.com

"যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কা ভূমি
হেথাও থাকবে গাধা জেনে রাখ তুমি।"

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)- এর ন্যায় মহান পয়গাম্বারের গাধা হলেও পবিত্র মক্কার দর্শন দ্বারা তার কোন উপকার হতে পারে না। সে যদি সেখানে থেকেও যায় তথাপি সে যেমন গাধা তেমন গাধাই থেকে যায়। হিরক এবং মনি-মুক্তার কদর যেমন বুঝতে পারে না কোন মুদি দোকানদার। তেমনি মুসলিম উম্মাহ্ কোরআন ও ইসলামের নেয়ামাত হাতে পেয়েও এর মহামূল্য বুঝতে না পেরে এর কদর করছে না বরং অমর্যাদা করছে।

নামায-রোযা হোক, কিংবা হজ্জ হোক, এগুলোর উদ্দেশ্য হচেছ মানুষের প্রশিক্ষণ। কিন্তু যারা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না, এর উপকার ও কল্যাণ লাভ করার কথা এতটুকুও ভাবে না; বরং যারা এ ইবাদতসমূহের যে কোন মকসুদ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তৎসম্পর্কেও বিন্দুমাত্র কোন ধারণা রাখে না। তারা যদি পূর্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি শুধু ওগুলোর নকলই করতে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা সেই সুফল কখনো আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণত আজকের মুসলমানগণ এভাবেই ঐ ইবাদতগুলো করে চলেছে। সকল ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ তারা ঠিকই বজায় রাখছে; কিন্তু (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) এতে কোন প্রাণশক্তি সৃষ্টি হচেছ না। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন কাম্য ছিল, তা যেমন দেখা যায় না তেমন হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও তার মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সকল এলাকা অতিক্রম করে হজ্জে গমন করা হয়, সেখানকার মুসলমান-অমুসলমান অধিবাসীদের ওপরেও তার কোন উত্তম চতিত্রের প্রভাব পতিত হয় না। বরং অনেকের অসৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অশালীন ব্যবহার ও চারিত্রিক দুর্বলতা ইসলামের সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়। বস্তুত এসব কারণেই আমাদের অনেক মুসলিম যুবকও প্রশ্ন করেন যে, 'হজ্জের উপকার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।' অথচ হজ্জ তো ছিল এমন এক জিনিস যে তাকে প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করা হলে কাফেররাও এর উপকার প্রকাশ্যে দেখে ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করতো। যদি কোন আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ সদস্য প্রতি বছর বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে এক স্থানে সমবেত হয় এবং আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় বিভিন্ন দেশ ও নগর হয়ে যাওয়ার সময়ে নিজেদের পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তাধারা ও পবিত্র নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়, যেখানে যেখানে অবস্থান করে কিংবা যে যে স্থান অতিক্রম করে সেখানে নিজেদের আন্দোলনের যাবতীয় মৌলিক নীতির শুধু মৌখিক আলোচনা না করে আপন আচরণ ও কর্মতৎপরতায়ও তাকে বাস্তবায়িত করতে থাকে, আর এটা শুধু দশ-বিশ বছরই নয় বরং বছরের পর বছর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেই চলতে থাকে তাহলে বলুন তো, এটা কোন নিষ্ক্রিয় জিনিস থেকে হতে পারে কি? প্রকৃতপক্ষে হজ্জ হলে তার উপকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনই হতো না। তখন অন্ধ ব্যক্তিও এর উপকার দেখতে পেত। বধির ব্যক্তিও এর কল্যাণ শুনতে পারতো। প্রতি বছরের হজ্জ কোটি কোটি মুসলমানকে নেক বান্দায় পরিণত করতো, হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করতো, লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল করে দিত। কিন্তু আফসোস। আমাদের মূর্খতার কারণে কত বড় মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

হজ্জের অন্তর্নিহিত এই বিরাট সার্থকতা ও উপকারিতা পুরোপুরি লাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্রস্থলে কোন বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব বর্তমান থাকা উচিত। যা এই মহান বিশ্ব শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে এমন একটি হৃদপিণ্ড (দিল) থাকা উচিত ছিল যা প্রত্যেক বছর সমগ্র বিশ্ব দেহে তাজা রক্তের ধারা প্রবাহিত করতে সক্ষম। এমন একটি মস্তিষ্ক থাকারও দরকার ছিল যা এই লক্ষ লক্ষ আল্লাহর দূতের মারফতে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম পৌঁছাতে চেষ্টা করতো। আর কিছু না হোক, অন্তত এই কেন্দ্রভূমিতে খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবরূপ যদি বর্তমান থাকতো, তবুও দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যেক বছরই সেখান থেকে খালেস ইসলামী জিন্দেগী এবং দ্বীনদারীর শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখানে তেমন কিছু নেই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরব দেশে মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে ওসমানী যুগ পর্যন্ত সকল অনুপযুক্ত শাসক ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অধিবাসীগণকে উন্নতি

www.pathagar.com

লাভের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ফলে আরব দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি- সকল দিক দিয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এ কারণে যে ভূখণ্ড থেকে একদা ইসলামের বিশ্বপ্লাবী আলোক ধারা উৎসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ তাই ইসলামের পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধ কূপে পতিত হয়েছে। এখন সেখানে ইসলামের জ্ঞান নেই, ইসলামী জীবনধারা নেই। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বুকভরা আশা ও ভক্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর পাক 'হারামে' আগমন করে; কিন্তু এ এলাকায় পৌঁছে তার চারদিকে যখন কেবল মূর্খতা, মলিনতা, লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, আত্মপূজা, চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃংখলতা এবং জনগণের নির্মম অধঃপতিত অবস্থা দেখতে পায় এবং শাসক গোষ্ঠীর ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বের বড় শয়তানদের নির্লজ্জ দালালী করতে দেখে অল্পকিছু ব্যক্তিক্রম ছাড়া তখন তাদের আশা-আকাঙ্খার স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অনেক লোক হজ্জ করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে অধিকতর দুর্বলই করে আসে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)- এর পরে জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে যে পৌরোহিত্যবাদ ও ঠাকুর পূজার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং যা শেষ নবী হযরত রাসূলে করীম (সা) নির্মূল করেছিলেন, আজ তা-ই প্রবলরূপে পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। 'হারামে কা'বার' ব্যবস্থাপক পূর্বের ন্যায় আবার সেবায়েত হয়ে বসেছে। আল্লাহর ঘর তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ঘরের প্রতি এজেন্ট নিযুক্ত রয়েছে, তারা ভক্তদেরকে চারদিক টেনে টেনে নিয়ে আসে। কুরআনের আয়াত আর হাদীসের নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে তাদেরকে হজ্জ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। বরং এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আদেশ শুনলে তারা অবশ্যই হজ্জ করতে যাবে এবং তাতে তাদের যথেষ্ট আমদানী হবে। এসব দেখে পরিষ্কার মনে হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ বিরাট ব্যবস্থা করেছিলেন যে উদ্দেশ্যে তার উলটাটাই এখন হচেছ। তারপর হজ্জ যাত্রায় বাধ্য হয়ে মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সফরের শুরু থেকে হজ্জ করে বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় ধর্মীয় মজুর এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা জোকের ন্যায় তাদের সামনে উপস্থিত হয়। মুয়াল্লেম, তাওয়াফ শিক্ষাদাতা, কা'বার কুঞ্জিকা বাহক এবং স্বয়ং হেজায সরকার- সকলেই এ ধর্ম ব্যবসায়ে সমানভাবে অংশীদার।

www.pathagar.com

হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই পয়সা দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এমনকি পবিত্র কা'বা গৃহের দরযাও পয়সা ব্যতীরেকে কোন মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। ইসলামের এ তথাকথিত খাদেমগণ এবং কেন্দ্রীয় উপাসনাগারের সেবায়েতগণও শেষ পর্যন্ত বেনারস ও হরিদ্বারের পণ্ডিত পুরোহিতদের পেশা অবলম্বন করে নিয়েছে, অথচ এটাই একদা এই পুরোহিতবাদের মূলোচ্ছেদ করেছিল। যেখানে ইবাদাত করানোর কাজ বিশেষ ব্যবসায় এবং ইবাদাতের স্থান উপার্জনের উপায়ে করানোর কাজ, সেখানে আল্লাহর আয়াত কেবল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে, লোক তা শুনে হজ্জ করতে বাধ্য হবে এবং এ সুযোগে তার পকেট মেরে টাকা নিয়ে যাবে। যেখানে ইবাদাতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্য দিতে হয় এবং দ্বীনি কর্তব্য ব্যবসায়ের পণ্য হয়- এমতস্থানের ইবাদাতে ইসলামের প্রাণ শক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে? হাজীগণ যে এ ইবাদাতের প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভ করবেন তার সুযোগ এখানে নেই। সমস্ত কাজ যখন একটা কেনা-বেচার মাল হয়ে রয়েছে- তখন এমন আশা কিছুতেই করা যায় না।

এ আলোচনা দ্বারা কারো ওপর দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই হজ্জের ন্যায় একটি বিরাট শক্তিকে কোন্ কোন্ জিনিস প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন করে দিয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মসমূহে কোন ত্রুটি রয়েছে, এরূপ ধারণা কারোই মনে যেন না জাগে। কারণ তাতে আসলে কোনই ত্রুটি নেই- ত্রুটি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে পূর্ণ ইসলামের অনুসরণ করে চলে না। অতত্রব, এ অবস্থার জন্য দায়ী বর্তমান মুসলমানরাই। তাই যে ব্যবস্থা তাদেরকে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শে পরিচালিত করতে পারতো এবং যা অনুসরণ করে তারা নেতা হতে পারতো, তা থেকে আজ কোন ভাল ফল লাভ করা যাচ্ছে না। এমন কি অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গেছে যে, এ ব্যবস্থাই মানবতার পক্ষে সত্যই কল্যাণকর কিনা আজ সে সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক যদি কয়েকটি অব্যর্থ ওষুধের তালিকা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তার অকর্মণ্য ও নির্বোধ উত্তরাধিকারীগণের হাতে তা একেবারেই 'অকেজো' হয়ে যায়। ফলে সেই তালিকারও যেমন কোন

www.pathagar.com

মূল্য হয় না, অনুরূপভাবে স্বয়ং চিকিৎসকের দুর্নাম হয়- আসল তালিকা যতই ভাল, সঠিক এবং অব্যর্থ হোক না কেন। অতত্রব এ নির্ভুল তালিকাকে কার্যকর করে তুলতে হলে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অপরিহার্য। অপটু ও অজ্ঞ লোকরা সেই তালিকা অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করলে বা রোগীর প্যাথলজিক্যাল টেস্ট সঠিকভাবে করতে না পারলে ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর জীবনের ঝুকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা হয়েছেও তাই। মুসলিম দেশগুলির শাসক শ্রেণী কম্পাউন্ডারের মত যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা শত্রুদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সুদক্ষ ডাক্তার যার কাজই ঔষধ প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহকে হত্যা করা। এমন একটি সমস্যার মধ্যে মুসলিম উম্মাহ হজ্জব্রত পালন করে যাচেছ। এ হজ্জব্রত এমন যা এইভাবে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন রাস্তার মধ্যে হীরক খন্ড নিয়ে মাথায় করে পথিক রওনা করলো গন্তব্যের দিকে, দির্ঘ মরুভূমির পথ অতিক্রম করতে যেয়ে ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে রাতের অন্ধকারে এ তাবুর পার্শ্বে মরুভূমির মধ্যেই সুয়ে বিশ্রাম নেয়, ক্লান্ত পথিকের চোখে ঘুম এসে যায়। পথিক গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সকালে মাথার কাছের বস্তাটি আবার মাথায় নিয়ে পথচলা শুরু করে। এক সময় বাড়ী এসে মাথার বস্তাটি নামিয়ে খুলে দেখে একখন্ড সাধারন পাথর তার মধ্যে রয়েছে। ব্যাপার কি বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক চিন্তা করে যা তার বুঝে আসে তা হলো রাতে তাবুর মধ্যে থাকা বস্তার হিরক খন্ডটি যে কোন অসৎ লোকই পথিকের ঘুমের মধ্যে বস্তা চেক করে নিয়ে নুড়ি পাথর বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পথিকের উচিৎ ছিল মহামূল্যবান হীরক খন্ড অত্যন্ত যত্ন সহকারে সতর্কতার সাথে আনা, তা না করায় এইভাবে হীরক খন্ড হারাতে হয়েছে পথিককে। ঠিক তেমনি ভাবেই মুসলমানদের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত হজ্জের নেয়ামতের হীরক খন্ড পরিচালনা এবং পাহারায় (বন বিড়াল আর পাতি শিয়ালের কাছে মুরগী পাহারার দায়িত্বের মত) ইহুদী দালালদের কে নিয়োগ করা হয়েছে। আর এটা খোলাফায়ে রাশিদিনের অব্যবহিত পর থেকেই এই অবস্থা পরিকল্পিত ভাবে ইহুদী বিশ্ব ব্যবস্থাপকরা সৃষ্টি করে অব্যাহত বেখেছে। তাই মুসলমানরা আর হীরক খন্ড নিয়ে ঘরে ফিরতে পারছে না। তাই এ অবস্থার অবসান ঘটতে হবে। তা দ্বারা যেমন কোন উপকার পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

www.pathagar.com

ফলে জাহেল লোকেরা যারা তালিকার যথার্থতা যাচাই করতে নিজেরা অক্ষম- তারাই শেষ পর্যন্ত মনে করতে শুরু করবে যে, মূলত তালিকাটাই ভুল। বর্তমান মুসলমানদের সর্বাত্মক অধঃপতনের ব্যাপারে ইসলামেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে। ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রকারী মোনাফেকরা ইসলামের আসল জিনিসগুলো সুকৌশলে চুরি করে নিয়ে অবিকল নকল তৈরি করে নকশা ব্যাখ্যা ও নকল বাস্তবায়নের পদ্ধতি সহ আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা তাই নিয়ে আসল ফলাফল আশা করছি। যুক্তিযুক্ত কারণেই ফল পাচিছনা। তাই আসল ইসলাম খুঁজে বের করে তার বাস্তবায়ন করলেই যুক্তিযুক্ত কারণেই ফলাফল পাওয়া যাবে বা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা

বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণাঃ

বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের মৌলিক চিন্তাধারার উপরই তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের রাজনৈতিক মতবাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। রাজনৈতিক দর্শনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত ধারাগুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেঃ

যে মানুষ সমগ্র বিশ্বজাহান ও বস্তুরাজি দ্বারা উপকৃত হয়, আল্লাহ্ তাআলা সেসব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

"এবং তিনি আসমান যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।"

-সূরা আল আনআমঃ ৭৩

"বল, আল্লাহই সকল বস্তুর স্রষ্টা, আর তিনিই একক, মহাপ্রতাপশালী।"

- সূরা আর রাআদঃ ১৬

"হে লোক সকল! তোমাদের সে রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, আর এতদোভয় থেকে তিনি অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

- সূরা আন নিসাঃ ১

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২৯

"আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি- যে আসমান-যমীন থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করে? -সূরা ফাতিরঃ ৩

"তোমরা কি ভেবে দেখেছো? তোমরা যে শুক্রপাত করো তা থেকে সন্তান তোমরা জন্ম দাও, না আমি তার জন্মদাতা? ------- তোমরা কি চিন্তা করেছো? এই যে তোমরা বীজ বপন করো, তা থেকে ফসল তোমরা উৎপাদন করো, না আমি তার উৎপাদক? ------- তোমরা কি চিন্তা করেছো? তোমরা যে পানি পান

www.pathagar.com

করো, মেঘমালা থেকে তোমরা তা বর্ষণ করো, না আমি তার বর্ষণকারী? ------ তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো? তোমরা যে আগুন জ্বালাও; তার বৃক্ষ তোমরা সৃষ্টি করেছো? না আমি তার স্রষ্টা?"

-আল ওয়াকিয়াঃ ৫৮-৭২

"আসমান-যমীন, এতদোভয়ের মধ্যস্থল এবং মাটির গভীর তলদেশে যাকিছু আছে, সমস্তই তাঁর।" -সূরা ত্বাহাঃ ৬

তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্বের মালিক, পালক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালকও আল্লাহ তাআলাইঃ

"আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর। সবকিছুই তাঁর ফরমানের অনুগত।"

-সূরা আর রূমঃ ২৬

"চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারকা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। সাবধান! সৃজন এবং কর্তৃত্ব তাঁরই। আল্লাহ সারাজাহানের মালিক-পরওয়ারদেগার, একান্ত বরকতের অধিকারী।"

-সূরা আল আরাফঃ ৫৪

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন।" -সূরা সাজদাঃ ৫

এ বিশ্বজগতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আর কারো তা নেই, হতেও পারে না। সার্বভৌমত্বে তাঁর অংশীদার হওয়ার কারো অধিকার নেইঃ

"তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনের রাজত্ব আল্লাহর?" -সূরা আল বারাকাঃ ১০৭

"এবং রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই।" - সূরা আল ফুরকানঃ ২

"দুনিয়া-আখেরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য; হুকুম দেয়ার ইখতিয়ার কেবল তাঁরই আছে। তোমরা তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে।" -সূরা আল কাসাসঃ ৭০

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফায়সালার ইখতিয়ার নেই।"

-সূরা আল আনআমঃ ৫৯

www.pathagar.com

“তিনি ছাড়া বান্দাদের আর কোনো ওলী-পৃষ্ঠপোষক নেই। আপন নির্দেশে তিনি কাউকে শরীক করেন না।” - সূরা আল কাহ্‌ফঃ ২৬

“তারা বলে, আমাদের ইখতিয়ারের মধ্যে কিছু আছে কি? বল, ইখতিয়ার সর্বতোভাবে আল্লাহর।” - সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৪

“ইখতিয়ার আল্লাহরই হাতে-শুরুতেও এবং শেষেও।” -সূরা আর রূমঃ ৪

“আসমান যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সমুদয় ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।”

-সূরা আল হাদীদঃ ৫

“যে পয়দা করে, সে কি তার মতো হতে পারে, যে পয়দা করে না? তোমরা কি চিন্তা করো না? -সূরা আন নাহলঃ ১৭

“তারা কি আল্লাহর জন্য এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে? যাতে সৃষ্টির ব্যাপারটি তাদের কাছে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে।” - সূরা আর রাআদঃ ১৬

“বল, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা (রব হিসেবে) ডাকো, তোমাদের সেসব কল্পিত শরীকদেরকে তোমরা কি কখনো দেখেছো? আমাকে দেখাও, যমীনে তারা কি সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানে তাদের কোনো অংশ আছে?---- মূলত আল্লাহই আসমান-যমীনকে বিচ্যুতি থেকে আটকে রেখেছেন। আর যদি তা বিচ্যুত হতে থাকে তাহলে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তাকে সামলে রাখতে পারে।” -সূরা ফাতেরঃ ৪০-৪১

সার্বভৌমত্বের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য, সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহর সত্তাতেই কেন্দ্রীভূত। এ বিশ্ব-চরাচরে অন্য কেউ এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী আদৌ নেই। তিনিই সকলের ওপর পরাক্রমশালী, তিনি সবকিছুই জানেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত তিনি। সকলের নেগাহবান, রক্ষক। সকলের নিরাপত্তা বিধায়ক। চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত, সকল বস্তু-নিচয়ের ওপর ক্ষমতাবান। সকল ক্ষমতা ইখতিয়ার তাঁর হাতে নিবদ্ধ। সমুদয় বস্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই ফরমানের অনুগত। কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই তাঁর

www.pathagar.com

ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি ছাড়া এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না; পারে না কোনো উপকার করতে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর সামনে সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারবে না। তিনি যাকে চান, পাকড়াও করেন, যাকে খুশী ক্ষমা করেন। তাঁর নির্দেশের ওপর পুনরুক্তি করতে পারে, এমন কেউ নেই। তাঁকে কারো সামনে জবাবহিহি করতে হয় না, কৈফিয়ত দিতে হয় না। সকলেই তাঁর সামনে জবাবহিহি করতে বাধ্য। তাঁর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে। তাঁর নির্দেশ রদ করতে পারে- এমন ক্ষমতা কারোর নেই। সার্বভৌমত্বের এ সকল গুণ-বৈশিষ্ট কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এতে কেউ তাঁর শরীক-অংশীদার নেইঃ

"তিনিই তো তাঁর বান্দাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধিকারী- কর্তৃত্বের মালিক। তিনি মহাজ্ঞানী, সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত।"

-সূরা আল আনআমঃ ১৮

"প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞাতা মহান, বিপুল মর্যাদার অধিকারী।"

-সূরা আর রাআদঃ ৯

"রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত, শান্তি-নিরাপত্তা দাতা, হেফাজতকারী, প্রতাপশালী, শক্তিবলে নির্দেশ জারিকারী, বিপুল মহিমার অধিকারী, মহত্ত্বের মালিক।"

-সূরা আল হাশরঃ ২৩

"তিনি চিরঞ্জীব, আপন ক্ষমতাবলে উদ্ভুত। নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমানে-যমীনে যাকিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে, এমন কে আছে? যাকিছু মানুষের সামনে আছে, তাও তিনি জানেনঃ আর যেসব বিষয় তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন তাও তিনি পরিজ্ঞাত।" -সূরা আল বাকারাঃ ২৫৫

"সকল বরকত-মহিমা সেই মহান সত্তার, বাদশাহী যাঁর হাতে। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" -সূরা আল মুল্‌কঃ ১

"সমুদয় বস্তুর ইখতিয়ার তাঁর হাতে। তোমাদেরকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।"

-সূরা ইয়াসিনঃ ৮৩

www.pathagar.com

“আসমান-যমীনে বসবাসকারী সকলেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই নির্দেশের অনুগত।”

-সূরা আলে ইমরানঃ ৮৩

“সকল ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত। তিনি সবকিছু শুনেন, জানেন।” -সূরা ইউনুসঃ ৬৫

“বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, তাহলে তা থেকে তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণ বাঁচাবার ক্ষমতা কার আছে? অথবা তিনি যদি তোমাদের উপকার করতে চান (তাহলে কে তাঁকে বাধা দিতে পারে?)”

- সূরা আল ফাতহঃ ১১

“আল্লাহ্ যদি তোমার ক্ষতি করেন, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করার নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান, অনুগ্রহ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

-সূরা ইউনুসঃ ১০৭

“তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসেব নেবেন; অতপর যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, যাকে খুশী শাস্তি দেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।”

-সূরা আল বাকারাঃ ২৮৪

“তিনি পূর্ণমানের শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি ছাড়া বান্দাদের কোনো ওলী- পৃষ্ঠপোষক নেই। তিনি স্বীয় রাজ্য শাসনে কাউকে শরীক করেন না।”

- সূরা আল কাহাফঃ ২৬

“বল, কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়স্থলও পেতে পারি না।” -সূরা জ্বিনঃ ২২

“তিনি আশ্রয় দান করেন, তাঁর মুকাবিলায় কোনো আশ্রয় দেয়া যায় না।”

-সূরা মুমিনূনঃ ৮৮

www.pathagar.com

"তিনিই সূচনা করেন, তিনিই পুনরুত্থান করেন। তিনি ক্ষমা, মার্জনাকারী। তিনি ভালোবাসেন। রাজ্য-সিংহাসনের মালিক, মহান তিনি। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।" -সূরা আল বুরুজঃ ১৩-১৬

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যা খুশী, ফায়সালা করেন।" -সূরা মায়েদাঃ ১

"আল্লাহ্ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই।" -সূরা আর রাআদঃ ৪১

"তিনি যা কিছু করেন, তার জন্য তাঁকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হয় না। অন্য সকলকেই তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হয়।" -সূরা আল আম্বিয়াঃ ২৩

"তাঁর ফরমান পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁর মুকাবিলায় তুমি কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।" -সূরা আল কাহাফঃ ২৭

"আল্লাহ্ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন?"
"বল, হে খোদা! রাজ্যাধিপতি। যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো; আর যার কাছ থেকে খুশী রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে খুশী সম্মান দাও, যাকে খুশী অপমান কর। সকল কল্যাণ তোমার এখতিয়ারাধীন। তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" -সূরা আলে ইমরানঃ ২৬

"বস্তুত যমীন আল্লাহ্র। আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, তাঁর উত্তরাধিকারী করেন।" -সূরা আল আরাফঃ ১২৮

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহাদের মৌলিক শিক্ষা

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার আমি বলেছি যে, এসব ইবাদাত অন্যান্য ধর্মের ইবাদাতের ন্যায় নিছক পূজা, উপাসনা এবং যাত্রার অনুষ্ঠান মাত্র নয়; কাজেই এ কয়টি কাজ করে ক্ষান্ত হলেই আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি খুশী হতে পারেন না। মূলত একটি বিরাট উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার জন্য এবং একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে সুদক্ষ করার উদ্দেশ্যেই এসব ইবাদাত মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। এটা মুসলমানকে কিভাবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে এবং এর ভেতর দিয়ে মুসলমান কেমন করে সেই বিরাট কাজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করে, ইতোপূর্বে তা আমি বিস্তারিতরূপে বলেছি। এখন সেই বিরাট উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ এবং তার বিস্তারিত পরিচয় দানের চেষ্টা করবো।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানুষের ওপর থেকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভুত্ব বিদূরিত করে শুধু আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করাই এসব ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার নামই হচ্ছে জিহাদ। নামায, রোযা ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদাতের কাজগুলো মুসলমানকে এ কাজের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত করে। কিন্তু মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এ মহান উদ্দেশ্য ও এ বিরাট কাজকে ভুলে আছে। তাদের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, জিহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর অন্তর্নিহিত বিরাট লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সে জন্য বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

দুনিয়ায় যত পাপ, অশান্তি আর দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থার মূলগত দোষ-ত্রুটি। শক্তি এবং সম্পদ সবই সরকারের করায়ত্ত থাকে। সরকারই আইন রচনা করে এবং আইন-জারী করে দেশের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা, শাসন ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষমতা সরকারেরই

www.pathagar.com

একচ্ছত্র অধিকারের বিষয়বস্তু। পুলিশ ও সৈন্য-সামন্তের শক্তি সরকারের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। অতত্রব, এতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যা কিছু অশান্তি এবং পাপ দুনিয়ায় আছে তা হয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করে, নতুবা সরকারের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থনে তা অবাধে অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কারণ দেশের কোন জিনিসের প্রচার ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য যে শক্তির আবশ্যক তা সরকার ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, দুনিয়ার চারদিকে ব্যভিচার অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে- দালান-কোঠায়, বাড়িতে প্রকাশ্যভাবে এ পাপকার্য সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ এই যে, রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বিশেষ কোন অপরাধ নয়। বরং তারা নিজেরাই এ কাজে লিপ্ত হয়ে আছে এবং অন্যকেও সে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নতুবা সরকার যদি এ পাপানুষ্ঠান বন্ধ করতে চায়, তবে এটা এত নির্ভিকভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে সুদের কারবার অব্যাহতভাবে চলছে। ধনী লোকগণ গরীবদের বুকের তাজা-তপ্ত রক্ত শুষে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এটা কেন হতে পারছে? শুধু এই কারণে যে, সরকার নিজেই সুদ খায় এবং সুদখোরদের সাহায্য ও সমর্থন করে। সরকারের আদালতসমূহ সুদের ডিক্রী দেয় এবং তাদের সহায়তা পায় বলে চারদিকে বড় বড় ব্যাংক আর সুদখোর মহাজন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরও একমাত্র কারণ এই যে, সরকার নিজেই লোকদেরকে এরূপ শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের চরিত্রকে এরূপেই গঠন করছে। চারদিকে মানব চরিত্রের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে, সরকার তাই ভালোবাসে এবং পছন্দ করে। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কোন শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করতে চায় তবে তাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হতে পারে না। কারণ, সে জন্য যে উপায়-উপাদান একান্ত অপরিহার্য তা সংগ্রহ করা বেসরকারী লোকদের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয় না। আর বিশেষ প্রচেষ্টার পর তেমন কিছু লোক তৈরী করতে পারলেও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ আদর্শের ওপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। যেহেতু জীবিকা উপার্জনের যত উপায় আছে এবং এই ভিন্নতর চরিত্র-বিশিষ্ট লোকদের বেঁচে থাকার যতগুলো পন্থা থাকতে

www.pathagar.com

পারে তার সবগুলোরই বন্ধ দরযার চাবিকাঠি সাম্প্রতিক বিকৃত ও গুমরাহ সরকারের হাতেই নিবন্ধ রয়েছে। দুনিয়ায় সীমা-সংখ্যাহীন খুন-যখম ও রক্তপাত হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞান আজ গোটা মানুষকে ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবনেই নিযুক্ত হয়ে আছে। মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আজ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করা হচ্ছে। মানুষের অসংখ্য মূল্যবান জীবনকে মূল্যহীন মাটির পাত্রের ন্যায় অমানুষিকভাবে সংহার করা হচ্ছে। নারী ধর্ষন ও শিশু হত্যা করা হচেছ নির্বিচারে। মুসলিম শিশুদের ঘিলু বসনিয়া এবং কসভোর খৃস্টান জালিমদের কুকুরের খাদ্য হিসাবে খাওয়াচেছ বলে পত্র পত্রিকায় আসছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেন ফ্রান্স জার্মানী আফগানিস্তান আর ইরাকে মুসলমানদের বাড়ীঘর বিনা অপরাধে নির্বিচারে মিথ্যা তৈরী করা অজুহাতে বোম্বিং করে গুড়িয়ে দিচেছ। কার্পেট বোম্বিং করে মানুষজন দালানকোঠা মাটির সাথে গুড়িয়ে মিশিয়ে দিচেছ। এসবই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে। কিন্তু এটা কেন হয়? হওয়ার কারণ শুধু এটাই যে, মানব সন্তানের মধ্যে যারাই সর্বাপেক্ষা বেশী শয়তান প্রকৃতির ও চরিত্রহীন, তারাই আজ দুনিয়ার জাতিসমূহের 'নেতা' হয়ে বসেছে এবং কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সার্বভৌম শক্তি তাদেরই কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আজ শক্তি সামগ্রিকভাবে তাদের করতলগত, তাই তারা আজ দুনিয়াকে যেদিকে চালাচ্ছে দুনিয়া সেদিকেই চলতে বাধ্য হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, শ্রম-মেহনত এবং জীবন ও প্রাণের ব্যবহার এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে তারা যা কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাতেই আজ সব উৎসর্গীকৃত হচ্ছে। দুনিয়ায় আজ যুলুম ও অবিচারের প্রবল রাজত্ব চলছে। দুর্বলের জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে পড়েছে। এখানকার আদালত বিচারালয় নয় এটা আজ বানিয়ার দোকান বিশেষে পরিণত হয়েছে। এখানে আজ কেবল টাকা দিয়ে 'বিচার' ক্রয় করা যায়। মানুষের কাছ থেকে আজ জোর-জবরদস্তি করে ট্যাক্স আদায় করা হয়। সেই ট্যাক্সের পরিমাণেও কোন সীমাসংখ্যা নেই। এবং সরকার তা উচ্চ কর্মচারীদেরকে রাজকীয় বেতন ও ভাতা দেয়ায় (উজির-দূতের টি-পার্টি আর ককটেল পার্টি দেয়ায়), বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করায়, লড়াই সংগ্রামের জন্য গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করায় এবং এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন কাজে গরীবদের রক্ত পানি করে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে খরচ করছে। সুদখোর-মহাজন, জমিদার, রাজা এবং সরদার উপাধি প্রাপ্ত এবং

www.pathagar.com

উপাধি প্রার্থী রাজন্যবর্গ, পুরোহিত, সিনেমা কোম্পানীর মালিক, মদ ব্যবসায়ী, অশ্লীল পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশক ও বিক্রেতা এবং জুয়াড়ী প্রভৃতি অসংখ্য লোক আজ আল্লাহর সৃষ্ট অসহায় মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, চরিত্র ও নৈতিকতা সবকিছু ধ্বংস করে ফেলেছে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেবার কেউ নেই কেন? এজন্য যে, রাষ্ট্রযন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে। শক্তিমান লোকেরা নিজেরাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেরা তো যুলুম করেই, পরন্তু অন্যান্য যালেমকেও সাহায্য করে। মোটকথা দেশে দেশে যে যুলুমই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একমাত্র কারণ এই যে, সাম্প্রতিক সরকার এই পক্ষপাতী এবং তা সে নীরবে সহ্য করে অথবা নিজেই জুলুমের উদ্যোক্তা। পৃথিবীতে যত অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে তা বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের। প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা তা বন্ধ করছেনা বা বন্ধ করার জন্য যে আইন-কানুন প্রয়োজন তা যথেষ্ট পরিমাণ বর্তমান নেই। অথবা অপরাধ অব্যাহত গতিতে চলার জন্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য যেসব আইন-কানুন প্রয়োজন তার সবই সাম্প্রতিক সরকারগুলোর আইন-কানুন নিয়ম-নীতি পন্থা ও পদ্ধতি রয়েছে তাই বিশ্বব্যাপি অন্যায় অত্যাচার অবিচার জুলুম নির্যাতনের ছয়লাব চলছে, সাগরের উত্তাল ঢেউ আর বন্যার পানির বা শ্রোতের মত দুনিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খড়কুটার মত। এ সবই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা রাষ্ট্রের অপর্যাপ্ত আইন-কানুনের কারণে অথবা আইন কিছু থাকলেও প্রয়োগ পদ্ধতির ক্রটির কারণে, তাই রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং পদ্ধতিগত সংস্কার প্রয়োজন।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমস্ত বিপর্যয়ের মূল উৎস হচ্ছে হুকুমতের খারাবী। মানুষের মত ও চিন্তার খারাপ হওয়া, আকীদা বিকৃত হওয়া, মানবীয় শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতার ভ্রান্ত পথে অপচয় হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যেও মরাত্মক ভ্রান্ত, শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনামূলোক হওয়া। যুলুম, না-ইনসাফী ও কুৎসিত কাজ-কর্মের প্রসার লাভ হওয়া এবং বিশ্বমানবের ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সব কিছুরই মূল কারণ একটি এবং তা এই যে, সমাজ ও সরকারের নেতৃত্ব, শক্তি সবই আজ অনাচারী ও দুরাচারী লোকদের হাতে চলে গেছে। আর শক্তি ও সম্পদের চাবিকাঠি যদি খারাপ লোকদের হাতে থাকে এবং জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপায়ও যদি তাদেরই করায়ত্ত হয়ে থাকে তবু শুধু যে তারাই আরও খারাপ হয়ে

www.pathagar.com

যাবে তাই নয় বরং সমগ্র দুনিয়াকে আরও অধিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে, তাদের সাহায্য ও সমর্থনের সর্বব্যাপী বিপর্যয় আরও মারাত্মকভাবে জেগে ওঠবে। বস্তুত তাদের হাতে শক্তি থাকা পর্যন্ত আংশিক সংশোধনের জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা সফল হতে পারে না, একথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাদের হাতের ক্ষমতায় সর্বব্যাপি অপব্যাবহার বিশ্বব্যাপি বিপর্যয় সৃষ্টি করবেই।

এ বুনিয়াদী কথাটি বুঝে নেয়ার পর মূল বিষয়টি অতি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। মানুষের দুরাবস্থা দূর করে এবং আসন্ন ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করে এক মহান কল্যাণকর পথে পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারের কর্মনীতিকে সুসংবদ্ধ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ হতে পারে না। একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও একথা বুঝতে পারে যে, যে দেশের লোকদের ব্যভিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সেখানে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে হাজার ওয়ায করলেও তা কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি দখল করে যদি ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তবে জনসাধারণ নিজেরাই হারাম পথ পরিত্যাগ করে হালাল উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। মদ, গাঁজা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীল সিনেমা-বায়স্কোপ, অর্ধনগ্ন পোশাক, নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা এবং এ ধরনের যাবতীয় পাপ প্রচলনকে নিছক ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বন্ধ করতে চাইলে তা কখনও সম্ভব হবে না। সেজন্য দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মানুষের আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের জন্য মানুষকে গড়ে তোলার জন্য ইমানী শক্তি বুলন্দ করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইমানদার যোগ্য দক্ষ বিজ্ঞ ও নেতৃত্বের গুনাবলীতে মহিমান্বিত নেতাদেরকে সমাজ এবং রাষ্টের প্রধান যায়গাগুলেতো বসাতে হবে। প্রণয়ন করতে হবে অন্যায় অসত্য আর অসুন্দর কাজ বন্ধ করার জন্য আইন এবং পাশাপাশি ন্যায় সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠার আইনও প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাসবায়নের জন্য সৎ দক্ষ যোগ্য ইমানদার নেতৃবৃন্দের হাতে দায়িত্ব দিতে হবে। শুধু আইন প্রণয়ন করে বিড়ালের কাছে মুরগীর খোপ পাহারা দিতে দিলে চলবেনা। সে নিজেই প্রতিদিন মুরগী খেয়ে ছাপ করবে একদিন দেখা যাবে যে খোপে মুরগী একটাও নেই পাহারাদার বিড়াল সব খেয়ে সবশেষ করে ফেলেছে। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করতে চাইলে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে। যারা জনসাধারণকে শোষণ করে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে, তাদেরকে শুধু মৌখিক কথা দ্বারা লাভজনক কারবার

www.pathagar.com

থেকে বিরত রাখা যাবে না। কিন্তু শক্তি লাভ করে যদি এ অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করা হয় তবে অতি সহজেই সমস্ত পাপের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) যখন কালেমায়ে তাইয়্যেবার দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছিলেন তখন মক্কার কোরায়েশ সরদাররা বলেছিলেন মোহাম্মদ কি চায়? সুন্দরী রমনী? অর্থ? না অন্য কিছু? ওকে তোমরা বল আরবের যে কোন সুন্দরী এবং যত অর্থই হোক সে চাইলে তাকে দেওয়া হবে শুধু এই নূতন ধরনের এই আহবান এটা বন্ধ করে দিক। একথা কোরায়েশদের বলার কারণ ছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল। এই কালেমার মাধ্যমেই সমস্ত ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হচেছ। সেখানে আল্লাহ্‌কে বসানো হয়েছে আর মোহাম্মদ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতায় সেই বসবে। কাজেই কালেমা তাইয়্যেবার দাওয়াতই রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন করে দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই ক্ষমতাশালী কোরায়েশ সরদাররা নবী (দঃ) এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবী (দঃ) মদিনায় হিজরত করেন পথিমধ্যেও হত্যার চেষ্টা করা হয়। হত্যা করতে না পেরে মদিনা আক্রমন করে বার বার পরাজিত হয়ে পিছু হটতে থাকে। রাসুলের বিকাশমান বিপ্লবী আন্দোলনের তোড়ে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কোরায়েশ বা মক্কায় তাদের ঘরে হাত পা ধুয়ে উঠে বসার উপক্রম হয় আর এদিকে ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারের তোড়ে মক্কাও ভেসে ছয়লাব হয়ে যায়। ন্যায় সত্য এবং সুন্দরের কাছে বাধ্য হয়ে সবাই আত্মসমর্পন করে। অন্যায় অসত্য অসুন্দর ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে উৎখাত হয়ে ন্যায় সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুবিচারের পূর্ণতা পায় সমাজ এবং রাষ্ট্রে। তাই বলব যুক্তিযুক্ত কারণেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। পানি ছাড়া যেমন মাছ জীবন ধারন করতে পারে না তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়া ইসলামী আদর্শ টিকে থাকতে পারে না। দেহ ছাড়া যেমন জীবন ধারন সম্ভব নয় তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। পবিত্র কালেমা পাকে এরশাদ হয়েছে ন্যায়ের আদেশ অন্যায়ের নিষেধ করতে, আল্লাহর আইনে বিচার ফায়সালা করতে যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকে তাহলে পবিত্র কোরআনের এ বিধান বাস্তবায়িত হবে কিভাবে? জাহেলী রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে কে? কোন জিনাকারী, সুদখোর বা সন্ত্রাসীর বিচার করার জন্য যদি আলেম-ওলামা, পীর-মাসায়েক বা

www.pathagar.com

ইসলামী নেতার স্মরণাপন্ন হওয়া মানে তিনি কি পারবেন জাহেলী রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে ঐ অপরাধের বিচার করতে? না, পারবেনা। কারণ জাহেলী রাষ্ট্রের আইনে তার কোন বিচার,নেই, তা বৈধ। রাষ্ট্রের দেওয়া বৈধতার বিরুদ্ধে বিচার করলে বিচারক আলেমেরই সাজা হবে, তারই মৃত্যুদন্ড হবে, তাকেই বিচারক না বলে সন্ত্রাসী বা মৌলবাদী বলবে। আজকের দিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইউরোপের মিত্রদের নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ নয় তা হচ্ছে সন্ত্রাসী যুদ্ধ; ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের বিরুদ্ধে অন্যায়, অসত্য এবং অসুন্দরকে মানব জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার যুদ্ধ। ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার যুদ্ধ।

মানুষের শ্রম, মেহনত, সম্পদ, প্রতিভা ও যোগ্যতার এই অপচয় যদি বন্ধ করতে হয় এবং সেগুলোকে সঠিক ও সুস্থ পথে প্রয়োগ করতে হয়- যুলুম বন্ধ করে যদি বিচার-ইনসাফ কায়েম করতে হয়, দুনিয়াকে ধ্বংস এবং ভাঙ্গনের করাল গ্রাস ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করে মানুষকে যদি বাঁচতে হয়, অধপতিত মানুষকে উন্নত করে সমস্ত মানুষকে যদি সমান মান-সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে শুধু মৌখিক ওয়াজ-নসীহত দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য এ জন্য যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে তা খুবই সহজে সম্পন্ন হতে পারে। অতএব এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজ সংস্কারের কোন প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ ছাড়া সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। একথা আজ এতই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা বুঝার জন্য খুব বেশী চিন্তা-গবেষণার আবশ্যক হয় না। আজ দুনিয়ার বুক থেকে প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ দূর করতে চাইবে এবং দুনিয়ার মানুষের দুরাবস্থা দূর করে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করতে অন্তর দিয়ে কামনা করবে তার পক্ষে আজ শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতা হওয়া একেবারেই অর্থহীন। আজ তাকে উঠতে হবে এবং ভ্রান্ত নীতিতে স্থাপিত সরকার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে, ভ্রান্ত নীতি অনুসারী লোকদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নিয়ে সঠিক নীতি এবং খাঁটি (ইসলামী) নীতির রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে হবে এবং সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

www.pathagar.com

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর আর এক কদম সামনে অগ্রসর হোন। একথা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষের জীবনে যত কিছু খারাবী ও অশান্তি প্রসারিত হচেছ, তার মূলীভূত কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের ভ্রান্তি। এবং একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সংশোধন যদি করতে হয়, তবে এর মূল শিকড়ের সংশোধন করতে হবে সর্বাগ্রে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকারের দোষ-ত্রুটির মূল কারণ কি এবং কোন্ মৌলিক সংশোধনের দ্বারা সেই বিপর্যয়ের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করা যেতে পারে?

এর একমাত্র জবাব এই যে, আসলে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ। অতত্রব সংশোধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে। এতবড় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বস্তুত এই প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে যতই খোঁজ ও অনুসন্ধান করা হবে এই একটি মাত্র কথাই এর সঠিক জবাব হতে পারে বলে বিবেচিত হবে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, যে দুনিয়ায় মানুষ বসবাস করে তা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? পৃথিবীর এই মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের এ সীমাসংখ্যাহীন উপায়-উপাদান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন না অন্য কোন শক্তি? এ প্রশ্নগুলোর একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোন উত্তর বস্তুতই হতে পারে না যে, পৃথিবীর মানুষ এবং এ সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। অন্য কথায় এ পৃথিবী আল্লাহর। ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই প্রজা। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাজ্যে অপরের হুকুম চালাবার কি অধিকার থাকতে পারে। আল্লাহর 'প্রজা' সাধারণের ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্যের রচিত আইন কিংবা স্বয়ং প্রজাদের রচিত আইন কি করে চলতে পারে? দেশ ও রাজ্য হবে একজনের আর সেখানে আইন চলবে অপরের। মালিকানা হবে একজনের আর মালিক হয়ে বসবে অন্য কেউ? প্রজা হবে একজনের আর তার ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কারো? মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একথা কেমন করে স্বীকার করতে পারে? বিশেষত একথাটাই প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যেহেতু এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাফ, তাই

www.pathagar.com

যখনই এবং যেখানেই এরূপ হয়েছে বা হচেছ সেখানে তারই পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে বা হচেছ। যেসব মানুষ আইন প্রণয়ন ও প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করে তারা নিজেরা স্বাভাবিক মূর্খতা ও অক্ষমতার দরুনই নানারূপ বিরাট বিরাট ভুল করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকটা নিজেদের পাশবিক লালসার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছা করে যুলুম ও অবিচার করতে শুরু করে। তার প্রথম কারণ এই যে, মানবীয় সমস্যা ও ব্যাপারসমূহের সুষ্ঠু সমাধান ও পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নির্ভুল নিয়ম-কানুন রচনা করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিদ্যাই তাদের থাকে না। দ্বিতীয়ত, তাদের মনে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার আতঙ্ক আদৌ থাকে না বলেই তারা একেবারে বল্লাহীন পশু হয়ে যায় এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ভুল। যে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় একবিন্দু থাকবে না এবং কোন উচ্চতর শক্তির কাছে জবাবদিহি করার চিন্তাও যার হবে না বরং যার মন এই ভেবে নিশ্চিত হবে যে, 'আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই, -এ ধরনের মানুষ যখন শক্তি লাভ করবে, তখন তারা যে বল্লাহারা হিংস্র পশুতে পরিণত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? একথা বুঝার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি-জ্ঞানের আবশ্যক নেই। এসব লোকের হাতে যখন মানুষের জীবন প্রাণ এবং রিযক ও জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এসে পড়বে, যখন কোটি কোটি মানুষের মস্তক তাদের সামনে অবনমিত হবে, তখন তারা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের আদর্শ রক্ষা করে চলবে এমন আশা কি কিছুতেই করা যায়? তারা পরের হক কেড়ে নিতে, হারাম উপায়ে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে এবং আল্লাহর বান্দাহগণকে নিজেদের পশু বৃত্তির দাসানুদাস বানাতে চেষ্টা করবে না, এ ভরসা কিছুতেই করা যেতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজেরা সৎপথে থাকবে এবং অন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি? কখনও নয়। মূলতই তা সম্ভব হতে পারে না, হওয়া বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এর বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্তমান সময়েও যাদের মনে আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহিতার আতঙ্ক নেই, তারা শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করে কত যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার চরম শত্রুতা করতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ চোখ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাপি তার ছয়লাব চলছে।

www.pathagar.com

কাজেই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির গোড়াতেই সর্বাত্মক আঘাত হানতে হবে। অর্থাৎ মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব ক্ষমতাকে নির্মূল করে তথায় একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার স্থাপিত করতে হবে।

অতপর যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের হুকুমাত কায়েম করবে ও চালাবে তারা নিজেরা কখনও রাজাধিরাজ ও একচ্ছত্র প্রভু হয়ে বসতে পারবে না- আল্লাহকেই একমাত্র বাদশাহ স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধি হয়েই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতে হবে। এ দায়িত্ব হলো তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত মহান আমানত। একথা তাদের অবশ্যই মনে করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন তাদের এ আমানতের হিসেব দিতে হবে সেই মহান আল্লাহর সমীপে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য- সবকিছুই জানেন। রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হবে আল্লাহর দেয়া বিধান। কারণ তিনি সবকিছুরই নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত- সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর আইন ও বিধানের এক বিন্দু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো থাকবে না। তাহলেই তারা মানুষের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং অবাঞ্ছিত পাশবিক লালসার অনধিকার চর্চা থেকে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত থাকতে পারবে।

ইসলাম এ মূল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েই দুনিয়ায় এসেছে। সমগ্র বিপর্যয়ের মূল উৎসকেই এটা এমনিভাবে সংশোধন করতে চায়। আল্লাহকে যারা নিজেদের বাদশাহ- কেবল মৌখিক আর কাল্পনিক বাদশাই নয়- প্রকৃত বাদশাহ বলে স্বীকার করবে এবং তিনি তাঁর নবীর মধ্যস্থতায় যে বিধান দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাকে যারা বিশ্বাস করবে ইসলাম তাদের কাছে এ দাবি উত্থাপন করে যে, তারা যেন তাদের বাদশাহর রাজ্যে তাঁর আইন ও বিধান জারি করার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই বাদশাহর যেসব প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে এবং নিজেরাই রাজাধিরাজ হয়ে বসেছে তাদের শক্তি ক্ষুণ্ন করতে হবে, আর আল্লাহর প্রজাবৃন্দকে অন্য শক্তির 'প্রজা' হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহকে 'আল্লাহ' এবং তাঁর আইনকে জীবন বিধান বলে কেবল স্বীকার করাই ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে এ কর্তব্যও আপনা আপনিই তাদের ওপর আবর্তিত হয় যে, যেখানেই বাস কর, যে দেশ বা রাজ্যেই তোমাদের বাসস্থান হোক না

www.pathagar.com

কেন সেখানেই মানুষের সংশোধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেখানকার ভ্রান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহদ্রোহী নাস্তিক ও আল্লাহর-নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারী লোকদের হাত থেকে আইন রচনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরকালে জবাবদিহিতার জাগ্রত অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করেই রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পন্ন করতে হবে। -বস্তুত এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করার নামই জিহাদ।

প্রভুত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার মূলতই অত্যন্ত জটিল, দায়িত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নেই। তা লাভ করার বাসনা কারো মনে জাগ্রত হলেই তার মধ্যে স্বভাবতই লালসার লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ হলেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত লালসা জেগে ওঠে- তখন মানুষের ওপর নিরংকুশ প্রভুত্ব বিস্তারের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা খুব কঠিন কাজ নয়; কিন্তু তা লাভ করার পর নিজে খোদা না হয়ে 'আল্লাহর অনুগত দাস' হিসেবে কর্তব্য পালন করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার। কাজেই এক ফিরাউনকে পদচ্যুত করে তুমি নিজে যদি সেখানে 'ফিরাউন' হয়ে বস, তাহলে আসলে লাভ কিছুই হলো না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা ছাড়া পৃথিবীর অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বৈজ্ঞানিক কারণেই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের প্রকৃতিই হচেছ এমন যে, মনুষত্ব আর পশুত্বের বংশ মিশ্রণেই মানুষ সৃষ্টি। মহান সৃষ্টিকর্তার ভয় এবং ভালবাসার মাধ্যমে পশুত্ব দূরিভূত হয়ে মনুশ্বত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া মানুষ প্রকৃত মানুষই হতে পারে না। কাজেই এ বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম তোমাকে সে মানুষের মন ও মগয থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দূর না হলে, তোমার মন ও আত্মা নির্মল না হলে, নিজের বা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে লড়াই করার পরিবর্তে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধনা ও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না হলে; উপরন্তু রাষ্ট্রশক্তি লাভ করার পর নিজের লোভ-লালসা ও দুস্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে খোদা হয়ে বসার পরিবর্তে প্রাণে ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা না জন্মালে রাষ্ট্রশক্তি লাভের দাবি উত্থাপন করা এবং দুনিয়ার বাতিল শক্তির সাথে লড়াই শুরু করে দেয়ার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

কালেমা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করলেই ইসলাম তোমাকে মানুষের ওপর আক্রমণ করার অধিকার বা অনুমতি দেয় না। কারণ তখন তুমিও ঠিক সেই দুষ্কার্য করতে শুরু করবে, যা করছে দুনিয়ার বর্তমান আল্লাহদ্রোহী ও যালেম লোকগণ। বরং এতবড় বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেয়ার পূর্বে ইসলাম তোমার মধ্যে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে চায়।

বস্তুত ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই নির্দিষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিং এ উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়। তারপরই তাদের জিহাদ ও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এ উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্মচারীদের যে কাজে নিযুক্ত করে থাকে তাতে নির্মল নৈতিক চরিত্র, মনের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় স্রষ্টির কোনই আবশ্যক হয় না। এজন্য তাদেরকে কেবল সুদক্ষ করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। আর সুদক্ষ হওয়ার পর সে যদি ব্যভিচারী হয়, মদ্যপায়ী হয়, বেঈমান ও স্বার্থপর হয়, তবুও তাতে কোনরূপ আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ইসলাম তার কর্মীদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা আগা-গোড়া সবই হচ্ছে একান্তভাবে নৈতিক কাজ। অতএব, ইসলামে তাদের 'সুদক্ষ' করে তোলার দিকে যতখানি লক্ষ্য দেয়া হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মন-মগজকে পবিত্র করার দিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তদপেক্ষা অনেক বেশি। ইসলাম তাদের মধ্যে এতখানি শক্তি জাগাতে চায় যে, যখন তারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর হুকুমাত কায়েম করার দাবি নিয়ে উঠবে, তখন যেন তারা নিজেদের এ দাবির ঐকান্তিকতা ও সততা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। তারা যেন কখনই নিজেদের ধন-দৌলত, জমি-জায়গা, দেশ ও রাজ্য সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করার জন্য লড়াই না করে। তারা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আল্লাহর কোটি কোটি বান্দার জন্য লড়াই করে, আর একথা যেন কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বিজয়ী হলে যেন অহংকারী,

www.pathagar.com

দাম্ভিক ও আল্লাহদ্রোহী না হয়, তখনও যেন তাদের বিনয়াবনত মস্তক আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকে। তারা শাসক হলে মানুষকে যেন তারা নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত না করে। বরং নিজেরাই যেন আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবন যাপন করে। আর অন্যান্য মানুষকেও যেন একমাত্র আল্লাহর দাস বানাতে চেষ্টা করে। তারা রাষ্ট্রের ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করে থাকলে তা যেন কেবল নিজের বা নিজের বংশের কিংবা স্বজাতীয় লোকদের পকেট বোঝাই করার কাজে উজাড় করে না দেয়। তারা যেন আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারকে তারই বান্দাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করে দেয় এবং একজন খাঁটি আমানতদারের ন্যায় একথা স্মরণ রেখে কাজ করে যে, এক অদৃশ্য চোখ তাকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে- ওপরের কেউ আছে, যার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে সক্ষম নয় এবং তারই কাছে তাকে এক এক পয়সার হিসেব দিতে হবে।

বস্তুত মানুষকে এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা ইসলামের নির্দিষ্ট এই ইবাদাতগুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হতে পারে না। আর ইসলাম মানুষকে এভাবে গঠন করে বলেঃ এখন তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নেক ও সালেহ বান্দাহ, তোমরা সামনে অগ্রসর হও, লড়াই-সংগ্রাম করে আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুত কর এবং সকল ক্ষমতা ও অধিকার নিজেদের হস্তগত করে নাও দুনিয়ার বুকে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা কর।

সহজেই বুঝতে পারা যায়, যেখানে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল ও কর ধার্যকরণ ইত্যাদি সকল সরকারী কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ আল্লাহভীরু হবে, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে, যেখানে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার সমস্ত নিয়ম-কানুন আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে রচিত হবে, সেখানে অবিচার ও অজ্ঞতার কোন অবকাশ নেই, যেখানে পাপ ও পাপানুষ্ঠানের সমস্ত পথ যথাসময়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, সরকার নিজেই শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে ন্যায়, পুণ্য ও পবিত্র ভাবধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। তথায় মানবতা যে সর্বাংগীন কল্যাণ লাভ করতে পারবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। এ ধরনের সরকার যদি ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা সাহায্যে কিছুকাল পর্যন্ত লোকদের চরিত্র ও স্বভাব-প্রকৃতি গঠন করতে নিযুক্ত থাকে, হারাম পন্থায় অর্থলাভ, পাপ, যুলুম, নির্লজ্জতা ও নৈতিক চরিত্রহীনতার সকল

www.pathagar.com

উৎস বন্ধ করে দেয়া হয়, ভুল-ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি বন্ধ করে সুস্থ ও নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা লোকদের মনোভাব ও চিন্তাধারা তৈরী করতে থাকে, তবে তার অধীনে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্চরিত্র ও সৎপ্রকৃতির পবিত্র পরিবেশে মানুষ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবে; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। তখন মানুষের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। পাপিষ্ঠ ও আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বাধীনে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে যে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, ধীরে ধীরে তা স্বতই সত্যদ্রষ্টা ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে বাধ্য। নৈতিক পংকিলতার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকার দরুন যে দিল মসীলিপ্ত ও মলিন হয়ে গেছে; ধীরে ধীরে তা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং সত্যের প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা জেগে ওঠবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে সকলের একমাত্র রব, তিনি ছাড়া আর কেউ যে বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে নবীজীর মারফত এ সত্যের পয়গাম লাভ হয়েছে, তিনি যে সত্য ও সত্যবাদী নবী- এ তত্ত্ব গভীরভাবে হৃদয়ংগম করা তখনকার পরিবেশে সকলের পক্ষে সহজ হবে। আর যে কথা বুঝিয়ে দেয়া খুবই কঠিন মনে হয়, তখন তাই সকলের মগযে আপনা-আপনি স্থান লাভ করবে। আজ বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের সাহায্যে যে কথা বুঝানো যায় না, তখনকার দিনে সেই কথা এতদূর সহজবোধ্য হবে যে, তাতে নামমাত্র জটিলতা অনুভূত হবে না।

মানুষের মনগড়া মত ও পথ অনুযায়ী কাজ-কর্ম সম্পন্ন হওয়া এবং আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা যারা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, আল্লাহর পরিপূর্ণ একত্ব (তাওহীদ) এবং তাঁর পয়গাম্বরের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং তা অবিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। বস্তুত, ফুল ও কাঁটার পার্থক্য জেনে নেয়ার পর কাটার থেকে হাতকে রক্ষা করে ফুল আহরণ করা সহজ হয়ে থাকে। তখনকার দিনে ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করা এবং কুফর ও শিরককে আঁকড়িয়ে থাকা বড়ই কঠিন। সম্ভবত, খুব বেশি হলেও হাজারে দশজন লোকের মধ্যেই এতখানি গোঁড়ামি পাওয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়।

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ফরয করা হয়েছে, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ তা সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পেরেছেন। যদিও আজ পর্যন্ত এগুলোকে নিছক পূজা অনুষ্ঠানের ন্যায়ই মনে

www.pathagar.com

করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ভ্রান্ত ধারণাই বদ্ধমূল করে রাখা হয়েছে। এটা যে বিরাট উচ্চতর কাজের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি। এ কারণেই মুসলমানগণ নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছে; কিন্তু মূল কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কোন ধারণাই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। যদিও মূলত এর জন্যই এ ইবাদাতসমূহ ফরয হয়েছে কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, জিহাদের বাসনা না হলে এবং জিহাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করলে এ ইবাদাতসমূহ একেবারে অর্থহীন। এ ধরনের অর্থহীন অনুষ্ঠান পালন করে যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব মনে করা হয়, তা যে ভুল তা বিচারের দিন এর সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে।

বাজারে বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় দ্বীন, শরীয়াত ও ইবাদাত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাসমূহের বিস্তারিত অর্থ লিখিত হয়। এখানে প্রসঙ্গত তার দিকে সামান্য ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট হবে।

'দ্বীন' অর্থ আনুগত্য করা,
আইনকেই বলা হয় শরীয়াত
ইবাদাত অর্থ বন্দেগী ও দাসত্ব।

আপনি কারো আনুগত্য স্বীকার করলে এবং তাকে নিজের শাসক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিলে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি তার 'দ্বীন' গ্রহণ করেছেন। পরন্তু আপনি যখন তাঁকে নিজের বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করলেন এবং কার্যত আপনি তাঁর প্রজা হলেন তখন তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-পন্থা আপনাদের জন্য আইন কিংবা শরীয়াতের মর্যাদা পেল। এমতাবস্থায় যদি আপনি তাঁর 'শরীয়াত' অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তিনি যা কিছুর দাবি করেন আপনি তা পূরণ করেন, তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম আপনি পালন করেন, তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে সীমার মধ্যে থেকে আপনার কাজ করা তিনি সংগত ঘোষণা করবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকে আপনি কাজ করতে থাকেন, শুধু তাই নয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, কাজ-কর্ম, আত্মীয়তা, শত্রুতা ও মামলা-মোকদ্দমা- সবকিছুই তাঁর নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। তাঁরই মতো ও ফায়সালাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন ও তাঁর সামনে মাথা নত করেন, কাজেই আপনার এ আচরণকে তাঁর ইবাদাত বা বন্দেগী বলে অভিহিত করা যাবে।

www.pathagar.com

এ বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দ্বীন মূলত রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়, শরীয়াত হচ্ছে এর আইন এবং এই আইন ও নিয়ম-প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদাত। আপনি যাকেই শাসক ও নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র-কর্তারূপে মেনে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবেন, আপনি মূলত তাঁরই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনার এ শাসক ও রাষ্ট্রকর্তা যদি আল্লাহ হন তবে আপনি তাঁর দ্বীন-এর অধীন হলেন, তিনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হন, তবে বাদশাহর 'দ্বীন'কেই আপনার কবুল করা হবে। বিশেষ কোন জাতিকে এ মর্যাদা দিলে সেই জাতিরই 'দ্বীন' গ্রহণ করা হবে। আর আপনার নিজের জাতি বা নিজ দেশের জনগণকে সেই অধিকার দিলে জনগণের 'দ্বীন'ই আপনি গ্রহণ করলেন। মোটকথা, যারই আনুগত্য করবেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁরই 'দ্বীন' পালন করতে থাকবেন এবং যারই আইন আপনি মেনে চলবেন, মূলত তাঁরই ইবাদাত করা হবে।

একথার পরে এ সহজ কথাটিও বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, একজন মানুষ একই সময়কালে দুটি 'দ্বীন' কোনরূপে পালন করতে পারে না। বিভিন্ন শাসকের মধ্যে এক সময়ে মূলত ও কার্যত একজনকেই অনুসরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন আইনের মধ্যে একটি আইন মানুষের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং অসংখ্য মাবুদের মধ্যে একজনেরই ইবাদাত করা আপনার পক্ষে সম্ভব। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমরা একজনকে শাসনকর্তা মানবো আর বাস্তবক্ষেত্রে আনুগত্য করবো অপরজনের এবং বন্দেগী করবো তৃতীয় একজনের আইন অনুসারে, এতে আপত্তি কি থাকতে পারে? এর উত্তর এই যে, এটা হতে পারে- বস্তুত এখন চারদিকে এটাই হচ্ছে। এরকম হলে অবস্থাটা এমনি দাঁড়ায় যে, আপনার ক্যানসার রোগে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট হলো, ক্যানসার রোগও ধরা পড়লো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রও দিল কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা হলো না। চিকিৎসা গ্রহণ করা হলো হাতুড়ে ডাক্তারের তিনি প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্টও তৈরি করে দেখলেন না। তিনি শরীরে তাপ দেখে টাইপয়েডের ওষুধ দিলেন। সেই ওষুধ সেবন করাতে করাতে প্রাণ যখন ওষ্ঠগত তখন আপনি দৌড়ালেন কবিরাজের কাছে, কবিরাজও ঘটনা শুনে মনে করলেন টাইফয়েডের ওষুধ সেবন করিয়ে যখন কাজ হয়নি তহন কালাজ্বর ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? কাজেই কালা জ্বরের ওষুধ দেওয়া শুরু করলেন কবিরাজ। তখন রোগীর প্রায় শেষ সময়।

www.pathagar.com

ক্রমাবনতি দেখে সবাই কান্নাকাটি শুরু করেছে। তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে বটগাছ তলায় বসা ধ্যানমগ্ন গাঁজাখোর ভন্ড ফকিরের কাছে একবার অন্তত শেষবারের চেষ্টা করার জন্য ছুটলেন। গাঁজাখোর দয়াল বাবা গাঁজায় দম দিয়ে একবার রোগীর দিকে কেরামতি প্রদর্শনের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো হক মাওলা- ছু---- ছু----ছু বলে ফুঁ দিয়ে বললো, যা সেরে যাবে। যা তোর কোন ভয় নেই। আর অমনি আপনি রোগী নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য রওনা করলেন, পথিমধ্যেই রোগী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

বর্তমান রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার রূপ আলোচ্য রোগীর অনুরূপ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করলে রোগীকে চিকিৎসা করা সম্ভব হতো অথচ অবৈজ্ঞানিক পন্থায় এবং পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করে রোগীর জীবন দিতে হলো যেমনি করে, ঠিক তেমনিই মহাবৈজ্ঞানিক মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যা মানেন আর কোন ব্যক্তির পক্ষেতো মানা সম্ভব নয়। তাই মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী খোদা প্রদত্ত বিধানই একমাত্র মুক্তির পথ, অন্য কিছু নয়। মানুষের তৈরি বিধান কোন দিন মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে না। কিন্তু জেনে রাখুন এটা পরিষ্কার শির্‌ক, আর শির্‌কের সবটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি যারই আইন মেনে চলবেন, মূলত তারই 'দ্বীন' আপনার পালন করা হবে। অতএব, যার আনুগত্য আপনি করেন না তাঁকে শাসনকর্তা এবং তাঁর 'দ্বীন'কে নিজের 'দ্বীন' বলে প্রকাশ করা বিরাট মিথ্যা ছাড়া কি-ইবা হতে পারে? মুখে একথা প্রচার করলে কিংবা মন দিয়ে তা বুঝতে থাকলে তাতে লাভ কি এবং বাহ্য জগতে তার কি-ইবা ফল পাওয়া যেতে পারে? আপনার জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম যখন একজনের শরীয়াত অনুযায়ী সম্পাদিত হয় কার্যত তখন অন্য কোন শরীয়াত মেনে চলা সম্পর্কে আপনার দাবী কি একেবারে অর্থহীন হয়ে যায় না? বাস্তবক্ষেত্রে আপনি যদি একজনের বন্দেগী করেন তখন অন্য কাউকে নিজের মাবুদ বলে প্রচার করা এবং নিজের মস্তক প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁরই হুকুম পালন করে চলেন, তাঁরই নিষিদ্ধ কাজ থেকে আপনি বিরত থাকেন, তাঁরই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সকল কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাঁরই উপস্থিত নিয়ম-পন্থা আপনি বাস্তবক্ষেত্রে পালন করে চলেন, নিজেদের মধ্যে লেনদেনও তাঁরই দেয়া নীয়ম-নীতি অনুসারে করে থাকেন। আপনার যাবতীয় ব্যাপারে ও কাজ-কর্মে আপনি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন, আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংগঠন এবং অধিকার বন্টনের কাজও তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী করে থাকেন, শুধু তাই নয় তাঁর দাবী ও নির্দেশ অনুযায়ী আপনি আপনার মন-মগয ও হাত-পায়ের সমগ্র শক্তি, প্রতিভা, শ্রমোপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ এবং সর্বশেষে নিজের মহামূল্যবান জীবন প্রাণ পর্যন্ত তাঁর সামনে পেশ করে থাকেন। অতত্রব, আপনার কাজ যদি আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত হয়, তবে আপনার বাস্তব কাজই হবে আসল ধর্তব্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় নিছক আকীদা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তা হিসেবের মধ্যে আসতে পারে না। এমন আকীদা-বিশ্বাসের গুরুত্বইবা কি হতে পারে- বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই? বাস্তবক্ষেত্রে একজন লোক যদি বাদশাহর দ্বীন মেনে চলে, তবে আল্লাহর দ্বীনের কোন স্থানই সেখানে হতে পারে না। অনুরূপভাবে বাস্তব কাজ-কর্ম যদি জর্জ বুশের 'দ্বীন' কিংবা ইংল্যাণ্ড, জার্মানীর দ্বীন অনুযায়ী হয়, তখন অন্যান্য কোন দ্বীনের স্থানই সেখানে হবে না। এক কথায় এটা চূড়ান্তভাবে মনে রাখা দরকার যে, শির্ক নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর কোন দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা ছাড়া আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, 'দ্বীন' যাই এবং যে ধরনেরই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারি কর্তৃত্ব ছাড়া তাই কল্পনার জগতে আল্লাহ্ আর বাস্তবে বুশ হলে চলবে না। তাই বাস্তবতা হচেছ জনগণের দ্বীন বা গণতন্ত্র শাহী-দ্বীন, কমিউনিস্ট-দ্বীন যা-ই হোক না কেন, একটি দ্বীনের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রাসাদের শুধু কাল্পনিক চিত্র- যার বাস্তব কোন অস্তিত্বই নেই তা যেমন অর্থহীন, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সরকার ছাড়া একটি দ্বীন (এবং জীবনব্যবস্থা)ও সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আপনি যখন বাস করবেন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে, তারই দ্বারে প্রবেশ করবেন, তা থেকে বের হবেন, তার ছাদ ও প্রাচীরের ছায়া আপনাকে আশ্রয় দান করবে, তখন এক কাল্পনিক প্রাসাদের রঙ্গিন চিত্র হতে কি ফায়দা আপনি আশা করতে পারেন। আপনাকে তো বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ অনুযায়ী। পরন্তু একটা চিত্র অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদে বসবাস শুরু করে অন্য প্রাসাদের চিত্র কল্পনা করা কিংবা তার প্রতি নিছক একটা ভক্তি বা বিশ্বাস রাখার বাস্তব ক্ষেত্রে কি ফল পাওয়া যেতে পারে? একটি কাল্পনিক প্রাসাদ মনের মধ্যে রেখে বাস্তব বসবাস অন্য কোন প্রাসাদে করা কতখানি হাস্যকর ব্যাপার তা সহজেই

www.pathagar.com

অনুমেয়। মস্তিস্কের মধ্যে যে প্রাসাদের কাল্পনিক চিত্র রয়েছে, তাকে কখনও প্রাসাদ বলা যায় না, আর তাতে বসবাস করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ উদাহণ অনুযায়ী কোন 'দ্বীন'কে সত্য 'দ্বীন' হিসেবে শুধু বিশ্বাস করারই কোন অর্থ হয় না। মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করবে একটি 'দ্বীন' অনুসারে তখন অন্য কোন 'দ্বীন'কে কাল্পনিকভাবে বিশ্বাস করা একেবারেই অর্থহীন। কাল্পনিক 'দ্বীন'কেও অনুরূপভাবে 'দ্বীন' বলা যায় না এবং কল্পিত প্রাসাদের ন্যায় কাল্পনিক 'দ্বীন' ও কেউ প্রকৃত 'দ্বীন' রূপে গ্রহণ করতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে যার ক্ষমতা স্বীকৃত ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে, যার আইন মত সবকিছু চলবে এবং যার দেয়া ব্যবস্থানুযায়ী মানব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন হবে, বস্তুত দ্বীন তাঁর হবে। অতত্রব প্রত্যেক দ্বীন স্বভাবতই নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে এবং দ্বীন এ জন্যই হয় যে, তারা যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বন্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনও একমাত্র তাঁরই হবে। একটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হলোঃ

জনগণের দ্বীন-এর অর্থ কি? একটি দেশের অধিবাসী জনগণই সেখানে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মালিক হয়, তাদের নিজেদের রচিত আইনই তাদের ওপর জারী হয় এবং দেশের সমগ্র অধিবাসী সম্মিলিতভাবে নিজেদের গণ-শক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব করে- বস্তুত তাই হচ্ছে জনগণের দ্বীন বা গণতন্ত্র। কাজেই দেশের প্রকৃত ক্ষমতায় যতদিন জনগণ কর্তৃক রচিত আইন জারী না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ গণতন্ত্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করাও যায় না। কিন্তু জনগণের পরিবর্তে দেশের শক্তি প্রভুত্ব যদি কোন ভিন্ন জাতি কিংবা কোন বাদশাহ করায়ত্ত করে নেয় এবং সারা দেশে তারই রচিত আইন জারী হয়, তবে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কোথায় থাকবে? সেখানে কেউ যদি গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখে, তবে তার কি মূল্য হতে পারে? কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ কিংবা ভিন্ন জাতির তন্ত্র বা আইন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করতে পারে না। শাহীদ্বীন বা বাদশাহী তন্ত্রের কথাই ধরা যাক। বাদশা তার রাজ্যে বাদশাহী আইন জারী করলো অথচ জনগণের মনের মধ্যে গণতন্ত্রবদ্ধ মূল হয়ে আছে। জনগণ বাদশাহ্র হুকুম মতই চলছে কিন্তু বিশ্বাস গণতন্ত্রের। তাইলে এই গণতন্ত্রের কি কোন মূল্য রইল? বর্তমানে ইসলামের অবস্থাও এরকম। মনের মধ্যে ইসলাম কাজে কর্মে বুশ ও ব্লেয়ার। মাহফিলে সুরের মুরছনীয় ইসলামের ভাষা, চোখের পানিতে ইসলামী

www.pathagar.com

গন্ধ, তলোয়ারের ঝনঝনানী শব্দ শুনলে সবার ভয়ে বুক কাপতে থাকে। ভয়ে হোক দায় ঠেকে হোক বুশের কথা মতই চলে, মনের মধ্যে নাকি ইসলাম ইসলাম ভাব তাহলে কি ইসলাম হয়?

দ্বীনের মূল কথা এই যে, পৃথিবীর মালিক ও সমগ্র মানুষের একমাত্র বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। কাজেই আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র তারই করতে হবে এবং তাঁর দেয়া শরীয়াত অনুযায়ী মানব জীবনের সকল প্রকার কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হবে। ইসলাম কর্তৃক স্থাপিত এ মত- উচ্চতর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর- কেবলমাত্র এজন্যই পেশ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহরই আইন চলবে, অন্য কারো নয়। আদালতের বিচার তাঁর বিধান অনুযায়ী হবে, পুলিশ তাঁরই বিধান জারী করবে। লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় কাজ-কর্ম, লেন-দেন ইত্যাদি তাঁর বিধান অনুসারে সম্পন্ন হবে। তাঁরই মর্জি অনুযায়ী 'কর' নির্ধারিত হবে- ব্যয়ও হবে একমাত্র তাঁরই দেয়া রীতিনীত অনুযায়ী। সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্য বিভাগ তাঁরই হুকুমের অধীন হবে। সকল লোক ভয় করবে- অন্তরের সাথে সমীহ করে চলবে- দেশের প্রজা সাধারণ একমাত্র তাঁরই অনুগত হবে। এক কথায় মানুষ আল্লাহ ভিন্ন কারো দাসত্ব বরণ করবে না। অতত্রব এটা সুস্পষ্ট কথা যে, খাঁটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত না হলে উক্ত উদ্দেশ্য কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। অন্য কোন দ্বীনের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই- অংশীদারিত্বও নেই, আর সত্য কথা এই যে, কোন 'দ্বীন'ই অন্য দ্বীনের অংশীদারিত্বও বরদাশত করতে পারে না। অন্যান্য দ্বীনের ন্যায় দ্বীন ইসলামও এ দাবি করে যে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরংকুশভাবে কেবলমাত্র আমারই হবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 'দ্বীন'ই আমার সামনে অবনত পরাজিত থাকবে। অন্যথায় আমার অনুসরণ কি করে সম্ভব হতে পারে? আমার দ্বীন 'গণ-দ্বীন' হবে না, 'শাহী-দ্বীন' হবে না, 'কমিউনিস্ট-দ্বীন' হবে না। অপর কোন দ্বীনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন দ্বীনের অস্তিত্ব থাকলে আমি থাকবো না। তখন আমাকে শুধু মুখেই সত্য বলে স্বীকার করলে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ পাক বার বার একথাই ঘোষণা করেছেনঃ

www.pathagar.com

“লোকদের শুধু এ হুকুমই দেয়া হয়েছে (এছাড়া অন্য কোন নির্দেশই দেয়া হয়নি) যে, তারা সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে।” (সূরা আল বাইয়্যেনাহঃ ৫)

“তিনি তাঁর রাসূলকে জীবনব্যবস্থা ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন- এজন্য যে, একে সমগ্র দ্বীনের ওপর জয়ী করে দেবেন; যদিও শিরক বাদীগণ এটা মোটেই বরদাশত করে না।” (সূরা আত তাওবাঃ ৩৩)

“তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না ফেতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং ‘দ্বীন’ সমগ্রভাবে আল্লাহ তাআলারই স্থাপিত হয়।” (সূরা আনফালঃ ৩৯)

“আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। তাঁরই নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না।” (সূরা ইউসুফঃ ৪০)

“যে ব্যক্তি নিজের রবের সাক্ষাত লাভ করতে ইচ্ছুক সৎকাজ করা এবং রবের ইবাদাতের ব্যাপারে অপর কাউকে শরীক না করা তার একান্তই কর্তব্য।” (সূরা আল কাহাফঃ ১১০)

“যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের এ বৈষম্য তুমি লক্ষ্য করনি যে, তারা ‘তাগুত’ (আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তি ও বিচার ব্যবস্থা) এর কাছে নিজেদের (মকদ্দমার) বিচার ফায়সালা চায়। অথচ তাকে অস্বীকার ও অমান্য করার নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। ...... আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে পাঠিয়েছি।” (সূরা আন নিসাঃ ৬০-৬৪)

ইবাদাত, দ্বীন ও শরীয়াতের পূর্বোক্ত ব্যাখার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ আয়াতসমূহের মূল অর্থ ও ভাবধারা অনুধাবন করতে পাঠকদের আদৌ বেগ পাওয়ার কথা নয়। ইসলামে জিহাদের এতদূর গুরুত্ব কেন, তাও পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। অন্যান্য ধর্ম ও দ্বীনের ন্যায় শুধু সত্য বলে মেনে নিলেই এবং এই আকীদা ও বিশ্বাসের বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ শুধু পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহর ‘দ্বীন’ মানা হলো না এবং আল্লাহতায়ালাও সন্তুষ্ট হতে পারেন না।। কারণ অন্য কোন দ্বীনের অধীন থেকে

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা আদৌ সম্ভব নয়, -অন্য কোন দ্বীনের সংমিশ্রণে তার অনুসরণ অসম্ভব। অতএব আল্লাহর এ দ্বীনকে যদি বাস্তবিকই সত্য দ্বীন বলে বিশ্বাস করেন, তবে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ সাধনা ও সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। এ সাধনা ও সংগ্রামের ফলেই ইসলাম কায়েম হবে, অন্যথায় এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থেকে জীবন দান করতে হবে, বস্তুত এটা একটি শাশ্বত মানদণ্ড, এতে আপনার ঈমান ও আকীদার সত্যতার যাচাই হতে পারে। ইসলামের প্রতি আপনার যথার্থ ঈমান থাকলে অপর কোন দ্বীনের অধীন থেকে সুখ নিদ্রায় অচেতন থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না, বরং তার খেদমত করা এবং তার বিনিময়ে লব্ধ জীবিকার কিছুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করার তো কোন কথাই উঠতে পারে না। দ্বীন ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার পর অন্য কোন দ্বীনের অধীন আপনার জীবন যদি অতিবাহিত হয়ও তবুও আপনার শয্যা কন্টকাকীর্ণ, খাদ্য বিষাক্ত ও তিক্ত বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর এ সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সাধনা না করে এক বিন্দু স্বস্তিও আপনি লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন ভিন্ন অপর কোন দ্বীনের অধীন জীবন যাপন করায় আপনার যদি তৃপ্তি লাভ হয় এবং সেই অবস্থায় আপনার মন সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হয়ে থাকে, তবে আপনি আদৌ ঈমানদার নন- আপনি মনোযোগ দিয়ে যতই নামায পড়েন, দীর্ঘ সময় ধরে 'মোরাকাবা' করেন, আর কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করেন ও ইসলামের দর্শন প্রচার করেন না কেন; কিন্তু আপনার ঈমানদার না হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্য কোন দ্বীনের প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যেসব মুনাফিক অন্যান্য দ্বীনের নিষ্ঠাবান খেদমত করে, কিংবা অন্য কোন দ্বীন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ও চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে কিইবা বলা যায়? .... মৃত্যু দূরে নয়, যখন তা উপস্থিত হবে, তখন তাদের বৈষয়িক জীবনের 'আমলনামা' স্বয়ং আল্লাহই তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। বস্তুত এরা নিজেদেরকে যদি মুসলমান বলে মনে করে, তবে এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাদের সুষ্ঠু বুদ্ধি থাকলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, একটি দ্বীনকে সত্য বলে মানা ও স্বীকার করা আর বাস্তব ক্ষেত্রে অপর কোন দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট থাকা কিংবা সেই কাজে অংশগ্রহণ করা ও সে জন্য চেষ্টা

www.pathagar.com

করা- পরস্পর বিরোধী কাজ। আগুন ও পানি হয় তো একই সাথে অবস্থান করতে পারে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে এরূপ কার্য পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না।

কুরআন শরীফে এ সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্বৃত হলোঃ
"তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে? এ ব্যাপারে তাদেরকে বিন্দুমাত্র পরীক্ষা করা হবে না; অথচ তাদের পূর্বে যারাই ঈমানের দাবি করেছে তাদেরকে আমরা পরীক্ষা করেছি, যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঈমানের দাবী করার ব্যাপারে কে খাঁটি ও সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনকাবুতঃ ২-৩)

"কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে; কিন্তু আল্লাহর পথে তারা যখনই নির্যাতিত হয়েছে, তখনই মানুষের নির্যাতনে তারা এতদূর ভীত হয়ে পড়েছে, ঠিক যতখানি ভীত হওয়া উচিত আল্লাহর আযাবের। অথচ তোমার রবের কাছ থেকে সাফল্য ও বিজয় লাভ হলে এরাই অগ্রসর হয়ে বলবে, 'আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম'। এদের মনের কথা কি আল্লাহ জানেন না? তবুও কোন্ সব লোক প্রকৃত মু'মিন এবং কোন্ সব লোক মুনাফিক, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখে নেবেন।" (সূরা আনকাবুতঃ ১০-১১)

"মু'মিনগণকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেয়া আল্লাহর নীতি বিরোধী, (কেননা, এখন সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী এবং খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিক একাকার হয়ে আছে) আল্লাহ পবিত্র ও পাপীদের মধ্যে নিশ্চয়ই তারতম্য করবেন।"

(সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৯)

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে আল্লাহ এমনি ছেড়ে দেবেন? অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে, আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিন লোকদেরকে কে ত্যাগ করে অন্য লোকদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তা এখনও আল্লাহ তাআলা পার্থক্য করে দেখেননি।"

(সূরা আত তাওবাঃ ১৬)

www.pathagar.com

"তুমি কি ওসব লোকের কথা চিন্তা করে দেখেছ, যারা অভিশপ্ত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে? মূলত এরা না তোমাদের আপন লোক, না তাদের। .... এরা শয়তানের দলভুক্ত! সাবধান! শয়তানের দলই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় (দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচারণ করে) তারা নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা এই যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণই জয়ী হবো। প্রকৃত শক্তিশালী পরাক্রমশালী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।" (সূরা মুজাদালাঃ ১৪, ১৯-২১)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন কোথাও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তথাকার সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী মু'মিনদের পরিচয় এই হবে যে, এ বাতিল 'দ্বীন' নির্মূল করে প্রকৃত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাধনা করবে। তারা যদি বাস্তবিক তাই করে, নিজেদের সমগ্র শক্তি এ উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত করে, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী দেয় ও সকল প্রকার ক্ষতি-লোকসান অকাতরে বরদাশত করে, তবে তাদের সাচ্চা ঈমানদার হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই। তাদের চেষ্টা-সাধনা সাফল্য লাভ করলো কি করলো না সেই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু তারা যদি বাতিল দ্বীনের প্রতিষ্ঠায়ই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত থাকে, কিংবা তাকে জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি একেবারেই মিথ্যা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পরন্তু দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতার কথা যারা ওযর হিসেবে পেশ করে থাকে, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাদেরও জবাব দিয়েছেন। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কোথাও চেষ্টা করা হবে, কোন না কোন বাতিল 'দ্বীন' পূর্ণ শক্তি সহকারে তথায় পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকবেই। সকল প্রকার শক্তি ক্ষমতা তার দখলে থাকবে, জীবিকার ভাণ্ডার তারই কুক্ষিগত হবে এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রভাব প্রবল থাকবে; এরূপ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে চূর্ণ করে অপর কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আর যাই হোক- কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ হতে পারে না। পরম শান্তি ও স্বস্তি সহকারে নবাবী চালে কাজ করলে এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না, আর তা কখনও সম্ভব নয়। বাতিল দ্বীনের অধীনে থেকে কিছু না কিছু বৈষয়িক সুখ-শান্তি লাভ হতে থাকবে,

www.pathagar.com

আর সেই সাথে দ্বীন ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হবে- এটা একেবারেই অসম্ভব। এ বিরাট কাজ তখনই সম্পন্ন হতে পারে যখন বাতিল দ্বীনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অধিকার, স্বার্থ ও যাবতীয় আয়েশ-আরামকে আপনারা পদাঘাত করতে প্রস্তুত হবেন এবং এ কাজে যত ক্ষতি-লোকসানেরই সম্মুখীন হতে হয়, সাহসের সাথে আপনারা তা বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকবেন। বস্তুত যারা এ কঠোর সাধনা করতে প্রস্তুত থাকবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের লোক সকল সমাজে মুষ্টিমেয়ই থাকে। আর যারা দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করে চলতে চাইলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তাদের নফসের খেদমত করতে থাকুক, সত্যের মুজাহিদগণ দুঃখ-নির্যাতন অকাতরে ভোগ করে এ পথে অপরিসীম কুরবানী দিয়ে যখন দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখনই তারা এসে বলবে- "আমরা তো তোমাদেরই দলের লোক, অতএব এখন আমাদেরও প্রাপ্য অংশ দাও।" মনুষ্য সমাজ চীরকাল এমনই ছিল বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও এমনই থাকবে। তথাপী এই অবস্থা মোকাবেলা করে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহ-র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে এমনকি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবন উৎস্বর্গ করবে তারাই মুজাহিদ তারাই সফলকাম এবং এটাই আল্লাহ্ বান্দার কাছে চান।

জিহাদ ও শাহাদাতের তাৎপর্য

সচরাচর ব্যবহারে বিশেষত ইসলামী পরিভাষায় কতগুলো শব্দ ও বাচনভঙ্গীর সাথে কিছু মর্যাদা এমনকি পবিত্রতার ভাব বা আমেজ জড়িত থাকে।

ছাত্র, শিক্ষক, পন্ডিত, উদ্ভাবক, বীর, সংস্কারক, দার্শনিক, জাকির (ধর্ম প্রচারক), মুমিন (বিশ্বাসী) জাহিদ (ধার্মিক) মুজাহিদ, সিদ্দিক (সত্যবাদী), অলী (দরবেশ), মুজতাহিদ, ইমাম, নবী-রাসূল হচেছ এ ধরনের কয়েকটি শব্দ। সাধারণভাবে বিশেষত ইসলামী পরিভাষায় সম্মান, মর্যাদা ও পবিত্রতার ভাবধারা এসব শব্দের উপর আরোপ করা হয়।

এটা সুস্পষ্ট যে কোন শব্দের বিশেষ কোন পবিত্রতা থাকে না। শব্দের মাধ্যমে যে ভাবধারা প্রকাশ করা হয়, তার কারণেই শব্দটি পবিত্র হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

জনগণ সাধারণভাবে অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত জনসমষ্টি তাদের বিশেষ কোন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা লালিত মূল্যবোধের কারণে এসব শব্দের সাথে পবিত্রতা বা মর্যাদা জুড়ে দেয়।

ইসলামী পরিভাষায় এমন একটি শব্দ আছে যা বিশেষভাবে পবিত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী প্রকাশভংগীর সাথে পরিচিত কোন ব্যক্তি যখন এ শব্দটি শুনে, তখন তার কাছে এ শব্দটি বিশেষ গৌরব মন্ডিত বলে মনে হয়। যারাই এ শব্দটি ব্যবহার করে তাদের কাছে এ শব্দটি একটি মহনীয়তা ও পবিত্রতার ভাবধারা প্রকাশ করে। অবশ্য এর মানদন্ড-মর্যাদা ও বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বর্তমানে আমরা ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে ব্যবহার নিয়েই আলোচনা করব।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা কেবলমাত্র সে ব্যক্তিকেই শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে গণ্য করতে পারি, যিনি তাঁর কাজকর্মে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী উৎরে গেছেন বলে ইসলাম স্বীকার করে। যিনি ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দেন এবং মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের আকাঙ্খা দ্বারা যথার্থই উদ্বুদ্ধ হন তিনিই এ মর্যাদা লাভ করেন। মানুষের আকাঙ্খার জগতে মর্যাদা ও সম্মান হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। শহীদ শব্দটির ওপর মুসলমানেরা এত বেশি পবিত্রতা আরোপ করেছেন কি কারণে এবং তার পেছনে যুক্তিই বা কি তা পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি।

পবিত্র কুরআন মজীদ শহীদের আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাঁদের তোমরা মৃত ভেবো না, তাঁরা জীবিত, আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত।

(সূরা আলে ইমরান, ১৬৯ নং আয়াত)।

ইসলামী আদর্শে যখন কোন গুণবান ব্যক্তির বা তার প্রশংসনীয় কাজের উচ্চ প্রশংসা করা হয়, তখন বলা হয় যে, সে ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হাসিল করেছেন অথবা সে নির্দিষ্ট কাজটি শাহাদাতের পুরস্কার লাভের যোগ্য। একজন ছাত্রের বিষয়, আমরা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। বলা হয়েছে সত্যের অন্বেষায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের আশায় যদি তার জ্ঞান সাধনা পরিচালিত হয় এবং যদি জ্ঞানার্জনকালে তার মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যু হবে শহীদের মৃত্যু। এ

www.pathagar.com

প্রকাশভংগীর মাধ্যমে একজন ছাত্রের উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। একইভাবে বলা যায় কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে কষ্ট ভোগ করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামরত একজন মুজাহিদ। উল্লেখ্য যে, ইসলাম আলস্য, জড়তা ও পরজীবী জীবনধারার ঘোরতর বিরোধী। কঠোর পরিশ্রম ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কর্তব্য।

যারা মানবজাতির সেবা করেছেন কোন না কোন উপায়ে- পন্ডিত, দার্শনিক, উদ্ভাবক বা শিক্ষক হিসেবে তাঁরা মানুষের কৃতজ্ঞভাজন। কিন্তু একজন শহীদ এর যতটুকু হকদার, ততটুকু আর কেউ নন। এই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে তাঁদের জন্যে একটি আবেগাপ্লুত অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানবতার আর যতো সেবক আছেন তাঁরা সবাই শহীদদের কাছে ঋণী। কিন্তু শহীদেরা তাঁদের কাছে ঋণী নন। একজন পন্ডিত, একজন দার্শনিক, একজন উদ্ভাবক, একজন শিক্ষক- এদের সবারই কাজের জন্যে, অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। একজন শহীদ তাঁর চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে সে পরিবেশ সৃষ্টি করে যান।

একটি মোমবাতির সাথে তাঁর তুলনা করা চলে। মোমবাতির কাজ হচ্ছে পরের কল্যাণে আলো জ্বালাতে গিয়ে নিজে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। শহীদরা হচ্ছে সমাজের মোমবাতি। তাঁরা নিজেদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমাজকে আলোকিত করে। তাঁরা যদি আলো না ছড়ান তাহলে কোন প্রতিষ্ঠানই আলোকিত হবে না।

যে কোন মানুষ দিনের বেলা সূর্যের আলোকে এবং রাতের প্রদীপ বা মোমবাতির আলোতে কাজ করে। সব দিকেই তার দৃষ্টি থাকে, কিন্তু তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না আলোর উৎসের প্রতি। অথচ এটা বলাবাহুল্য যে, আলো ব্যতিরেকে সে কিছুই করতে পারে না। শহীদরা হচ্ছেন সমাজের জন্যে প্রদীপ। স্বৈরাচার ও নির্যাতনের অন্ধকারে তারা দীপ না জ্বালালে মানবতা প্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে পারত না মোটেই।

আল-কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐশী গ্রন্থে তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রজ্জ্বলিত হওয়া ও আলোকিত করা- এ উভয় অর্থই এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, "হে নবী, আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদতাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (সূরা আল-আহযাব, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াত)।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী পরিভাষায় 'শহীদ' একটি পবিত্র শব্দ এবং যারা ইসলামী অভিধান বা শব্দ তালিকা ব্যবহার করেন এটা তাঁদের জন্যে যে কোন শব্দের চাইতে উচ্চতর অর্থবহ।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে আইনগত ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ইসলামী আইনই একটি সমাজ চিন্তার ভিত্তিতে রচিত। ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমানের লাশকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোসল দিতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাফন দিতে হবে। তারপর জানাযা পড়তে হবে এবং সবকিছু করার পরই তাকে কবর দেয়া যাবে। এসব কিছু করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম আছে। শহীদের লাশের গোসল দেয়া বা তাকে নতুন কাপড়ে কাফন পরানোর প্রয়োজন পড়ে না। মৃত্যুর সময় তাঁর দেহে যে কাপড় ছিল সে কাপড়েই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, শহীদের আত্মা ও ব্যক্তিত্ব উভয়ই এমন পবিত্র যে, তাঁর দেহ, রক্ত এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুই এ পবিত্রতায় সমাচ্ছন্ন। বলা হয়, শহীদের দেহ আত্মিকতায় পূর্ণ। কথাটি এ অর্থে বলা হয় যে, শহীদের আত্মার জন্য প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি তাঁর দেহের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। শহীদের রুহু, সদগুণাবলি (নেকী) ও আত্মত্যাগের কারণে তাঁর লাশ ও পোশাক-পরিচ্ছদও হয় সম্মানার্হ। যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন তাঁকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত দেহে কোন প্রকার গোসল ছাড়াই সমাহিত করা হয়।

ইসলামী আইনের উপরিউক্ত বিধানসমূহ শহীদের পবিত্রতার পরিচয় বহন করে। শাহাদাতের পবিত্রতার ভিত্তি কি? এটা সুস্পষ্ট যে, শুধুমাত্র নিহত হওয়ার কারণে

www.pathagar.com

পবিত্রতা হাসিল করা যায় না। এটা সব সময় গর্বের বিষয় নয়। অনেক মৃত্যুই হয়তো অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চলুন বিষয়টি আমরা আরো কিছুটা ব্যাখ্যা করি। আমরা জানি মৃত্যু বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমনঃ

১। **স্বাভাবিক মৃত্যুঃ** যদি কোন ব্যক্তি তার জীবনের স্বাভাবিক মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার মৃত্যু একটি সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। এটা কোন গৌরব বা লজ্জার বিষয় নয়। এটা এমনকি বড় বেশি দুঃখের ব্যাপারও নয়।

২। **আকস্মিক মৃত্যুঃ** কোন দুর্ঘটনার কারণে অথবা বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি মহামারীর দরুন বা ভূমিকম্প অথবা বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যদি কেউ মারা যায় তাহলে সেটা অকাল মৃত্যু এবং এ কারণে তা হবে দুঃখজনক।

৩। **অপরাধের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণঃ** এ ধরনের ঘটনায় এক ব্যক্তি শুধুমাত্র তার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে অথবা কোন ব্যক্তিকে তার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এ ধরনের ঘটনার অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। আমরা প্রায়ই দৈনিক পত্রিকায় কোন এক মা কর্তৃক তার শিশু সন্তানকে হত্যার সংবাদ পড়ে থাকি। স্ত্রী লোকটি তার নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে। কারণ তার স্বামী শিশুটিকে ভালবাসতো অথচ সেই মহিলাটি চাইত তার স্বামী শুধু তাকেই ভালোবাসুক। অথবা দেখা যায় কোন এক পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করেছে, কারণ সে নারী তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছে। একইভাবে আমরা ইতিহাসেও দেখি যে, এক রাজা অপর রাজার রাজ্যভুক্ত সকল শিশু সন্তানকে হত্যা করেছে যাতে ভবিষ্যতে সে দেশে তার প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে।

এ ধরনের ঘটনায় হত্যাকারীর কাজকে জঘন্য ও নৃশংস অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিনা কারণে নিহত ব্যক্তিকে হামলা ও অত্যাচারের শিকার বলে মনে করা হয়। এহেন হত্যাকান্ডের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া হয় ভয়াবহ ও দুঃখজনক। একথা সুস্পষ্ট যে, এ জাতীয় মৃত্যু মর্মান্তিক ও করুন কিন্তু তা প্রশংসাযোগ্যও নয় বা গর্বের বিষয়ও নয়। এসব ক্ষেত্রে শত্রুতা ও ঘৃণাবশত মিছামিছি একজন লোক তার প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

৪। আত্মহত্যাঃ এ ধরনের মৃত্যু নিজেই একটি অপরাধ, সে কারণে আত্মহত্যা হচেছ নিকৃষ্টমানের মৃত্যু। আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু এবং স্বীয় গাফলতির কারণে যারা মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয় তারা এ পর্যায়ভুক্ত। অপরাধী ব্যক্তি দুস্কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

৫। শাহাদাতঃ শাহাদাত হচেছ এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু, যিনি সকল ঝুঁকি এবং বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও একটি মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিলের খাতিরে অথবা পবিত্র কুরআনের ভাষায় আল্লাহর রাহে স্বেচছায় সকল বিপদ ও ঝুঁকির মোকাবিলা করেন।

শহীদী মৃত্যুর দুটি মৌলিক গুণ আছেঃ (ক) এ মৃত্যুতে জীবন উৎসর্গ করা হয় একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে, (খ) শহীদরা সচেতনভাবে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেন। শাহাদাতের ঘটনার সাথে সাধারণত একটি অপরাধও জড়িত থাকে। যিনি অপরাধের শিকার হন তাঁর মৃত্যু পবিত্র কিন্তু তাঁর হত্যাকারীদের ক্রিয়াকান্ড হচেছ জঘণ্য অপরাধ।

শাহাদাত বীরোচিত ও প্রশংসনীয় কাজ, কারণ, একটি স্বেচছা প্রণোদিত, সচেতন ও নিঃস্বার্থ কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি হচেছ এই শাহাদাত। এটিই একমাত্র মৃত্যু যা জীবনের চাইতেও বড় মহান ও পবিত্র।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অধিকাংশ জাকির (ধর্ম প্রচারক) শাহদাত তত্ত্ব সম্পর্কে খুব কমই বৈশ্লেষিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ এঁরাই কারবালার ঘটনা বর্ণনাকালে হযরত ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) শহীদানের নেতা বলে আখ্যায়িত করেন। তারা ঘটনাবলি এমন ধারায় বর্ণনা করেন, মনে হয় তিনি (হযরত ইমাম হোসাইন) বৃথাই তাঁর জীবন দান করেছেন।

অনেকেই ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, তিনি ছিলেন নির্দোষ নিরীহ। তাঁরা এ জন্য দুঃখিত যে তিনি (ইমাম)এ ক্ষমতালিপ্সু লোকের স্বার্থপরতার শিকার হয়েছিলেন। এই ক্ষমতালিপ্সু লোকটি নির্দোষ ইমামের রক্তপাত করেছিল। ব্যাপার যদি এতই সাদাসিধে হতো তাহলে আমরা হযরত ইমাম হোসাইন সম্পর্কে বলতে পারতাম যে, নির্দোষ ছিলেন অথচ তাঁর ওপর বড় অবিচার করা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তাঁকে শহীদ নামে আখ্যায়িত করা যেতো না, শহীদানের নেতা হওয়া তো দূরের কথা।

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্বার্থান্ধ চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন, একথা বললে সম্পূর্ণ ঘটনা বলা হয় না। এটা নিঃসন্দেহে সেই বিয়োগান্তক ঘটনার নায়কেরা তাদের স্বার্থপরতার কারণেই মারাত্মক অপরাধ করেছিল, কিন্তু ইমাম তো স্বজ্ঞানে সচেতনভাবেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিল তিনি যেন আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি এর পরিণতি ভাল করেই জানতেন। সেজন্যে তাদের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সংকট সন্ধিক্ষণে নীরবতা অবলম্বন করাকে তিনি মস্তবড় পাপ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের কাহিনী, বিশেষতঃ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এর সাক্ষী।

যে পবিত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শাহাদাতের পথে পরিচালিত করে বা তাকে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রেরণা যোগায়, তা ইসলামে একটি আইনে পরিণত হয়েছে। এরই নাম জিহাদ। জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা, অথবা এটা সব সময় প্রতিরক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক, সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা এবং যদি প্রতিরক্ষামূলক হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি ব্যক্তির প্রতিরক্ষা বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে জাতীয় অধিকারের হিফাযতের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথবা এর পরিধি কি এতই ব্যাপক যে আজাদী ও ইন্‌সাফের মতো সকল মানবিক অধিকারের সংরক্ষণ এর আওতায় পড়ে, এসব আলোচনার সময় এখন নয়। এর সাথে প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি প্রশ্নও জড়িত আছে- যেমন তওহীদে বিশ্বাস কি মানুষের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, না অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা জিহাদ কি মৌলগতভাবেই অধিকারের বিরোধী, না বিরোধী নয়? এ প্রশ্নগুলোর আলোচনা একই সাথে আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, যদি তা যথাস্থানে হয়।

আপাতত একথা বলাই যথেষ্ট যে, ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা একথা বলবে যে, কেউ তোমার ডান গালে চড় দিলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও অথবা একথা বলবে না যে, সিজারের (রাজা) প্রাপ্য সিজারকে দাও, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহকে দাও। অনুরূপভাবে কোন পবিত্র সামাজিক আদর্শবিহীন ধর্মও ইসলাম নয় বা এটা এমন কোন ধর্মও নয় যা তার পবিত্র সামাজিক আদর্শ হিফাযত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তিনটি পবিত্র বিষয়ের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচেছ বিশ্বাস (ঈমান), হিযরত ও জিহাদ। আল-কুরআনে যে

www.pathagar.com

ধরনের মানুষের কথা আল্লাহ্ বলেছেন সে মানুষ ঈমানের প্রতি হবে আসক্ত এবং দুনিয়ার অন্য সবকিছুর ব্যাপারে হবে নিরাসক্ত। সে তার ঈমানের হিফাযতের জন্যেই হিযরত করে এবং সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই জিহাদ করে। আমরা যদি এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ এখানে উল্লেখ করতে চাই তাহলে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর 'নাহজুল বালাগা' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর বাছাই করা বান্দাদের জন্যে যে বেহেশত উন্মুক্ত রেখেছেন, জিহাদ হচেছ তার প্রবেশদ্বার। জিহাদ হচেছ ধার্মিকতার ভূষণ, আল্লাহ্র দুর্ভেদ্য বর্ম এবং নির্ভরযোগ্য ঢাল। যে কেউ এটাকে অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্ তাকে অপমানের ভূষণ এবং দুর্দশার জামা পরিধান করাবেন।"

জিহাদ বেহেশতের একটি দরজা। কিন্তু এটা সকলের জন্যে উন্মুক্ত নয়। প্রত্যেকে এর উপযুক্ত নয়। প্রত্যেকেই মুজাহিদের মর্যাদা পেতে পারেন না। আল্লাহ্ এ দরজা তাঁর বন্ধুদের জন্যেই শুধু খোলা রেখেছেন। মুজাহিদ অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এতো বেশি উঁচু মর্যাদার আসনে সমাসীন যে আমরা তাঁকে শুধুমাত্র আল্লাহর বন্ধু বলে আখ্যায়িত করতে পারি না। এমন ব্যক্তি আল্লাহর বাছাই করা মনোনীত বন্ধু। আল কুরআনে বলা হয়েছে যে, বেহেশতের আটটি দরজা আছে। স্পষ্টত মানুষের ভিড় এড়ানোর জন্যে এতগুলো দরজা রাখা হয়নি, কেননা পরজগতে এ ধরনের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। আল্লাহ্ যেভাবে সব মানুষের কর্মফল বা হিসাব তাৎক্ষনিকভাবে দেখে নিতে পারেন (যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন) তেমনি তিনি এক দরজা দিয়েই সব মানুষকে বেহেশতে দাখিল করতে পারেন। পালাক্রমে বা লাইন ধরে বেহেশতে প্রবেশ করার কোন প্রশ্নই আসে না। একইভাবে বলা যায়, এ দরজাগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হয় নি। কারণ পরজগতে কোন শ্রেণীভেদ থাকবে না। সেখানে মানুষকে তার সামাজিক মর্যাদা বা পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে না। ঈমান, সৎকর্ম ও তাকওয়ার মাত্রানুযায়ী পরকালে মানব জাতির কর্মবিভক্তি

www.pathagar.com

হবে এবং বিভিন্ন গ্রুপে সাজানো হবে। প্রতিটি গ্রুপ পৃথিবীতে যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করবে তদনুযায়ী বেহেশতে একটি দরজা পাবে। কারণ, আখেরাত হচেছ দুনিয়ারই স্বর্গীয় প্রতিরূপ। যে দরজা দিয়ে সকল মুজাহিদ ও শহীদ বেহেশতে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তাদের জন্যে যে স্থানটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, তা হচেছ আল্লাহ্‌র বাছাই করা বন্ধুদের জন্যে সংরক্ষিত স্থান। তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য হবেন।

জিহাদ হচেছ খোদাভীরুতা বা তাকওয়ার পরিচছদ। 'তাকওয়ার পরিচছদ' কথাটি আল-কুরআনের সূরা আল আরাফে ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'জিহাদ হচেছ তাকওয়ার ভূষণ। সত্যিকার পবিত্রতা বা শুদ্ধতার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। অর্থাৎ স্বার্থন্ধতা, অহংকার ও চেতনার গভীরে প্রোথিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কলুষতার হাত থেকে মুক্তি লাভ। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতে বলা যায় যে, একজন সত্যিকার মুজাহিদ হচেছ সবচেয়ে বড় মুত্তাকী বা খোদাভীরু সৎ ব্যক্তি। তিনি পবিত্র ও শুদ্ধ। কেননা তিনি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে অবস্থান করেন, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘার উর্ধ্বে থাকেন, লোভ-লালসা মুক্ত থাকেন এবং কৃপণতা পরিহার করেন। একজন মুজাহিদ হচেছন সকল পবিত্রের পবিত্রতম। তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আত্মত্যাগের পূর্ণ অনুশীলন করেন। তাঁর সামনে যে দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তা নৈতিক কলুষতামুক্ত, অপরাপর বেহেশতীদের জন্যে নির্ধারিত প্রবেশদ্বার থেকে ভিন্নতর। তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় রয়েছে। আল-কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়ঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছু খেয়েছে সেজন্যে কোন পাপ তাদের হয়নি, যদি তারা খোদাভীরুতা অবলম্বন করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (সূরা মায়িদা, ৯৩ আয়াত)।

এ মহান আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে কুরআনী জ্ঞানের দুটি মূল্যবান বক্তব্য। প্রথম বক্তব্যটি হচেছ- ঈমান ও তাকওয়ার বিভিন্ন পর্যায়। বর্তমানে এটাই আলোচ্য বিষয়। অপর বক্তব্যটি জীবন দর্শন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত। আল-কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমানদার, খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে সমস্ত ভালো জিনিসগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ্‌র সকল নেয়ামত বা অনুগ্রহ কাজে লাগাতে পারে যদি সে প্রকৃতি নির্ধারিত বিবর্তনের পথে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। এ পথ হচেছ ঈমান বা বিশ্বাস, তাকওয়া বা খোদাভীরুতা ও মনুষ্যচিত কর্মের পথ।

www.pathagar.com

মুসলিম মনীষীগণ কুরআনুল করীমের এ মহান আয়াত এবং বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থে উল্লেখিত ও গূঢ় বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাকওয়া বা খোদাভীরুতাকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেনঃ

১. সাধারণ তাকওয়া

২. অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের তাকওয়া

৩. অসাধারণ তাকওয়া

মুজাহিদদের তাকওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের তাকওয়া। তাঁরা আন্তরিকভাবে নিজেদের সবকিছু, বিলিয়ে দেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাকওয়ার পরিচ্ছেদে তাঁরা ভূষিত হন।

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর অভেদ্য বর্ম। মুসলিম জাতি যদি জিহাদের ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়, তাহলে দুশমনের হামলা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য ঢাল। বর্ম পরিধান করা হয় যুদ্ধের সময়ে আত্মরক্ষার জন্যে, কিন্তু হাতে ঢাল ধারণ করা হয় দুশমনের আঘাত বা তরবারির খোঁচা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে বা প্রতিহত করার জন্যে। আঘাত প্রতিহত করার জন্যে ঢাল ব্যবহার করা হয় এবং ব্যর্থ করার জন্যে বর্ম ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টত হযরত আলী (রাঃ) জিহাদকে বর্ম ও ঢাল উভয়ের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা এমন কিছু জিহাদ আছে যেগুলো প্রতিরোধমূলক। এসব জিহাদের মাধ্যমে দুশমনের হামলা ব্যাহত হয়। আর এমন কিছু জিহাদ আছে যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই দুশমনের আক্রমণকে রুখতে পারে এবং তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

যে কেউ জিহাদ করাকে অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্‌ তাকে অপমানের ভূষণ পরিধান করাবেন। যারা সংগ্রামী মনোবৃত্তি এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তারা অপমান, দুর্ভাগ্য ও অসহায়তায় নিমজ্জিত হয়। হযরত নবী করীম (সঃ) বলেনঃ সকল কল্যাণ তরবারী এবং তার ছায়াতলে নিহিত। (তাহজীব উল আহকাম- শেখ তুসী)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্‌ আমার অনুসারীদের সম্মানিত করেছেন তাদের ঘোড়ার খুরের জন্যে এবং তাদের তীরের লক্ষ্যের জন্যে।" এর অর্থ দাঁড়াচেছ এই যে, মুসলিম জাতি হচেছ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একটি জাতি। ইসলাম শক্তির ধর্ম। সে

www.pathagar.com

মুজাহিদ তৈরী করে। উইল ডুরান্ট তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক বইতে লিখেছেনঃ ইসলামের মতো আর কোন ধর্মই তার অনুসারীদের শক্তির দিকে এতবেশি আহ্বান জানায় নি।

অপর একটি হাদীসে দেখা যায় রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ 'যে কখনো জিহাদ করেনি এমনকি জিহাদ করার কথা চিন্তাও করেনি, সে এক ধরনের মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করবে।" জিহাদ, অথবা ন্যূনপক্ষে এতে অংশগ্রহণ করার আকাঙ্খা হচেছ ইসলামী মতবাদের একটি অবিচেছদ্য অংশ। ইসলামের প্রতি ব্যক্তির বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য এরই মাধ্যমে বিচার করা হয়। আরেকটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, রসূল করীম (সঃ) বলেছেনঃ শহীদকে কবরে কোন প্রশ্ন করা হবে না। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন, শহীদের মাথার ওপর তরবারীর ঝলকানি তাঁর পরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট। শহীদের বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য একবার প্রমাণিত হয়ে গেলে তাঁকে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই এক বিশেষ ধরনের মনোবৃত্তি ছিল। শাহাদাতের আকাঙ্খাই ছিল সে মনোবৃত্তি। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নিজেই বলেনঃ 'যখন কুরআন মজিদের আয়াত- মানুষ কি মনে করে যে তারা (আমরা বিশ্বাস করি) একথা বলার কারণেই কোন পরীক্ষা ছাড়াই তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে?' নাজিল হলো, তখন আমি নবী করীমকে (সঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি জানতাম যে যতদিন তিনি (নবী সঃ) জীবিত আছেন ততদিন মুসলমানেরা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। মহান পয়গম্বর (সঃ) বললেন যে, তাঁর ওফাতের পরে মুসলমানদের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, ওহোদ যুদ্ধের সময়ে যখন কয়েকজন নিহত হলেন এবং আমি শাহাদাত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে মনমরা হয়ে পড়েছিলাম তখন তিনি আমাকে স্বান্ত্বনা দান করে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আমি শহীদ হবো। আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) এ কথার সত্যতা সমর্থন করলেন এবং আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, সে সময়ে আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করবো কিনা? আমি জবাবে জানালাম যে, সে সময় বা উপলক্ষটি আমার জীবনে শুধু ধৈর্য্য ধারণ করার হবে না বরং তা হবে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময়। অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) ভবিষ্যত

www.pathagar.com

ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বিশদ বিবরণ দান করলেন।" শাহাদাতের আকাঙ্খা বলতে আমরা এটাই বুঝি। হযরত আলী (রাঃ) যদি শাহাদাত সম্পর্কে আশান্বিত না হতেন তাহলে পুরো জীবনটাই তাঁর জন্যে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াতো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম সব সময় মুসলিম উম্মাহ্‌র মুখে মুখে। তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেও আমরা দাবি করি। খালিদ ইবনে ওলিদ একদিন যুদ্ধের ময়দানে নয়টি তলোয়ার যুদ্ধ করে জিহাদের মাধ্যমে শহীদ হওয়ার বাসনায় ভেঙ্গে ফেলেন কিন্তু শহীদ হতে পারেন না বরং বিজয়ী হন। তারপর তিনি শহীদ হতে না পারার জন্য আফসোস করেন। এমনি ভাবে সমস্ত সাহবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করার জন্য উন্মুখ থাকতেন এবং অনেকেই হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করেছেন। মৌখিক স্বীকৃতি প্রকাশই যদি যথেষ্ট হতো তা হলে কেউই আমাদের চাইতে ভাল মুসলমান হতো না। কিন্তু সত্যিকার মুসলমান মতবাদের দাবি হচেছ এই যে, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমরা এখানে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি দিক তুলে ধরলাম মাত্র। হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনি, হযরত আলী, হযরত হুসাইন (রা) সহ কারবারায় শহিদান এবং ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি বীর মুজাহিদ শাহাদাৎ বরণ করেছেন যার সম্মান এবং মর্যাদা এক নবী এবং রাসুল (দঃ) ছাড়া সমগ্র মানব জাতির উপরে। বেহেস্তে প্রবেশের দরজা পর্যন্ত সবার উপরে রাখা হয়েছে। আল্লাহর বিশেষ প্রিয় বন্ধুদেরকে বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছেন।

হুজুরপাক ছাড়াও আমরা আরো অনেকের কথা জানি, যাঁরা শাহাদাতের আকাঙ্খা পোষণ করতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহ্‌র কাছে এ জন্যে দোয়া করতেন। মহান সাহাবাদের কাছ থেকে আমরা যে সব দোয়া পেয়েছি তা থেকে এসব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পবিত্র রমযান মাসের রাতে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে বলি, 'হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তোমার রাহে মৃত্যুবরণ করার তওফিক দাও, তোমার বন্ধুর সাথী হবার এবং শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দান করো।'

ইতিহাসে দেখতে পাই, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিটি মানুষ যুবক বা বৃদ্ধ, বড় বা ছোট, সবারই এ বাসনা ছিল। কোন কোন সময় হুজুর আকরাম (সঃ)-

www.pathagar.com

এর কাছে লোকজন এসে তাঁদের শাহাদাতের আকাঙ্খার কথা বলতেন। ইসলাম আত্মহত্যার অনুমতি দেয় না। সে যুগের মুসলমানেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হতে চেয়েছিলেন। তারা হযরত রসূলে করীমকে (সঃ) অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁদের শাহাদাতের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন।

'সফিনাতুল বেহার' পুস্তকে খেছুমা (বা খছিমা) নামক এক ব্যক্তির কাহিনী আছে। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি এবং তাঁর ছেলে উভয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। পরিশেষে লটারী করলেন। লটারীতে ছেলে জিতে গেলেন এবং যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তাঁর বাবাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধ লোকটি হযরত নবী করীম (সঃ) এর কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) বললেন, যদিও তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং এতো দুর্বল যে যুদ্ধ করার মতো গায়ের জোরও তার নেই, তবুও তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হতে চান। তিনি প্রিয় নবীকে (সঃ) অনুরোধ করলেন তিনি যেন আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর (বৃদ্ধ লোকটির) আকাঙ্খা পূরণের জন্যে দোয়া করেন। মহানবী (সঃ) তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে দোয়া করলেন। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের পরিসরে বৃদ্ধ লোকটি শুধু যে ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তা নয়, শাহাদাত হাসিলের খোশ-নসীবও তাঁর হয়েছিল।

আরেকজনের কথা। তিনি ছিলেন আমর ইবনে জামুহ্‌। তাঁর কয়েকজন ছেলে ছিল। এক পা খোঁড়া হওয়াতে ইসলামী আইন অনুযায়ী যুদ্ধে যোগদান করা থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভের কথা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে "খোঁড়া যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে সে জন্যে কোন অপরাধ নেই" (সূরা আল ফাতাহ্‌- ১৭ আয়াত)। ওহোদের যুদ্ধের সময় জিহাদে অংশগ্রহণ করে প্রাণ বিলিয়ে দিতে চান। তাঁর ছেলেরা এতে আপত্তি উত্থাপন করে তাকে বাড়িতে অবস্থান করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, জিহাদে যোগদানের জন্যে তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তবুও আমর পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। ছেলেরা পরিবারের বয়স্ক লোকজনদের দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

www.pathagar.com

করাতে চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি কোনমতেই তার মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। তিনি বরং রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নিকট গিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার ছেলেরা আমাকে শহীদ হতে দিতে চায় না কেন? শাহাদাত যদি অন্যদের জন্যে ভালো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার জন্যেও হবে।” হযরত নবী করীম (সঃ) তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, তাঁরা যেন তাঁকে (বৃদ্ধকে)আর বাধা না দেয়। তিনি বললেন, ‘এ মানষটি শাহাদাতের আকাঙ্খা পোষণ করছেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা তাঁর যেমন বাধ্যতামূলক নয়, তেমনি নিষিদ্ধও নয়।” বৃদ্ধ খুশী হলেন। জিহাদের ময়দানে তাঁর এক পুত্র তাঁকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা সোৎসাহে বেপরোয়া লড়ে যাচিছলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হলেন। তাঁর এক পুত্রও শহীদ হলেন।

ওহোদের ময়দান ছিল মদীনার কাছাকাছি। মুসলমানেরা সে লড়াইয়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল। ইতোমধ্যে মদীনায় খবর পৌঁছল যে মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছেন। মদীনার নারী-পুরুষ ওহোদ ময়দানের দিকে ছুটলেন। মহিলাদের মধ্যে আমর ইবনে জামুহ্‌র স্ত্রীও ছিলেন। তিনি ওহোদে পৌঁছে তার স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের লাশ খুঁজে বের করলেন। লাশ তিনটি একটি হৃষ্টপুষ্ট উটের পিঠে চাপিয়ে মদীনার দিকে চলেছে এবং বার বার ওহোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছে। এ সময়ে আরো কয়েকজন মহিলাকে ওহোদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে হযরত নবী করীম (সঃ) এর কয়েকজন স্ত্রীও শামিল ছিলেন।

জনৈকা নবী-পত্নী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোত্থেকে আসছেন। মহিলা জবাবে জানালেন যে, তিনি ওহোদ ময়দান থেকে ফিরেছেন।
“আপনার উটের পিঠে কি নিয়ে যাচেছন।”

“কিছুই না। এতে আছে শুধু আমার স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের লাশ। আমি তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাই।”

“হযরত রসূলে করীম (সঃ) কেমন আছেন?”
“আলহামদুল্লিাহ। সবকিছুই ঠিক-ঠাক আছে। প্রিয় নবী (সঃ) নিরাপদে আছেন। কাফিরদের পরিকল্পনা আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। রসূলূল্লাহ (সঃ) যদি নিরাপদে থাকেন তাহলে অন্য কিছু নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই।”

www.pathagar.com

এরপরে মহিলাটিকে জানালেন, তাঁর উটটির ব্যবহার কিছুটা বেখাপ্পা ধরনের মনে হচেছ। সে মদীনার দিকে যেতে চায় না। যেখানে তারা খাদ্য খাবার রক্ষিত আছে তার সেদিকেই যাওয়া উচিত, কিন্তু সে তা না করে ওহোদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে চায়। নবী-পত্নী বললেন, ব্যাপারটি নবী করীম (সঃ)-এর গোচরীভূত করা উচিত। তারা যখন নবীর (সঃ) দরবারে হাজির হলেন তখন স্ত্রী লোকটি বললেন, "আমি এক অদ্ভুত ঘটনা বলতে চাই। এ প্রাণীটি খুবই কষ্টে-সৃষ্টে মদীনার পানে যায়, কিন্তু ওহোদের পথে চলে অনায়াসে।" হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রশ্ন করলেন, "আপনার স্বামী কি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোন কিছু বলেছিলেন?"

মহিলাটি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমি যেন এই ঘরে আর ফিরে না আসি।"

আল্লাহর নবী (সঃ) বললেন, "ঠিক তাই, আপনার স্বামীর দোয়া কবুল হয়ছে। এখন তাঁকে অন্য শহীদানের সাথে ওহোদ ময়দানে দাফন করা হোক।"

হযরত আলী (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করার চাইতে এক হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করাকে আমি শ্রেয় মনে করি।"

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন কারবালা ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচিছলেন তখন তাঁর মুখে ছিল কিছু কবিতার পংক্তিমালা।

শোনা যায় তাঁর পিতাও মাঝে মাঝে এসব কবিতা আবৃত্তি করতেন। আমরা তাহলে সে স্মরণীয় পংক্তিমালার অনুবাদ এখানে উদ্বৃত করছিঃ

পার্থিব বস্তুনিচয় নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক, যদিও
পরকালের প্রতিদান এর চেয়ে শ্রেয়তর নিঃসন্দেহে,
তোমার যা কিছু আছে, আছে যতো সম্পদ বৈভব,
সবই যদি থেকে যায় পশ্চাতে,
তাহলে এতো ব্যয় কুণ্ঠ হয়ে লাভ কি হলো?
দেহর নিয়তি যদি হয় ক্ষয় আর মৃত্যুতে বিলীন,
আল্লাহর রাহে খন্ড বিখন্ডিত হোক আমার দেহ
তা কি নহে প্রিয়তর?

www.pathagar.com

শহীদের প্রেরণা সাধারণ লোকের মতো নয়, ভিন্নতর। তার যুক্তি হচ্ছে সংস্কারের অন্ধ যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ প্রেমিকের যুক্তি। যদি উভয়ের যুক্তি, যেমন একজন খাঁটি সংস্কারক এবং একজন একান্ত উৎসাহী ও আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ প্রেমিকের যুক্তি এক সাথে মিশিয়ে ফেলা যায় তবে তার ফলাফল হবে ভিন্ন। আসুন আমরা বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন কুফা যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সে সময়ে তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাঁকে কুফা যাত্রা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের বক্তব্যঃ তাঁর কাজ যুক্তিসম্মত নয়। নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁদের কথা সঠিক ছিল। হযরত ইমাম হোসাইনের কুফা গমনের সিদ্ধান্ত তাঁদের সমর্থনযোগ ছিল না, কারণ তাঁদের যুক্তি ছিল পার্থিব মাপকাঠিতে জ্ঞানী বিবেচিত লোকদের যুক্তি। কিন্তু হযরত ইমামের ছিল উন্নততর যুক্তি। তাঁর ছিল শহীদের যুক্তি, যা সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না।

চালাক লোকদের অভ্যাস হচেছ নিজ কাজে অন্য লোকদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। তারা অন্য লোকদের সামনে ঠেলে দেয় এবং নিজেরা পেছনে থেকে যায়। অন্যেরা সফল হলে তারা তাদের কামিয়াবীর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যথা তাদের কোন ক্ষতিই হয় না। ইবনে আব্বাস ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) বললেন, "কুফার জনগণ আপনাকে একথা বলার জন্যে চিঠি লিখেছেন যে, তারা আপনার জন্যে যুদ্ধ করতে রাজী। ইয়াজিদের অফিসারদের সেখান থেকে বের করে দেয়ার জন্যে তাদের কাছে আপনার চিঠি লেখা উচিত। তারা হয়ত আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে অথবা করবে না। যদি তারা আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে আপনি সেখানে নিরাপদে যেতে পারেন। আর যদি তারা তা না করে তাহলে আপনার মর্যাদা ঠিকই থাকবে।"

ইমাম এ উপদেশ মোটেই শুনলেন না। সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি কুফায় যেতে বদ্ধপরিকার। ইবনে আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি নিহত হবেন।"
-তাতে কি? ইমাম বললেন।

"কোন ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে সে মারা যাবে, সে অবস্থায় স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সে সাথে নিয়ে যায় না।"
-"কিন্তু আমি অবশ্যই তাদের সাথে নিয়ে যাবো।"

www.pathagar.com

শহীদের যুক্তি অনুপম। সাধারণ মানুষের বোধশক্তির বাইরে এ যুক্তি। এ কারণে শহীদ শব্দটিকে ঘিরে আছে পবিত্রতার এক অলৌকিক মহিমা। পবিত্র গৌরবমন্ডিত শব্দমালার তালিকায় শহীদ শব্দটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বীর এবং সংস্কারক বলতে যা বুঝায়, এর ব্যঞ্জনা তার চেয়ে উচচতর। এর পরিবর্তে ভিন্ন কোন শব্দ ব্যবহার করা যায় না।

শহীদ কি করেন? দুশমনকে প্রতিহত করা এবং তা করতে গিয়ে তাকে আঘাত করা বা তার হাতে আহত হওয়ার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপারটা যদি তাই হতো, তাহলে আমরা বলতে পারতাম শহীদের খুন বৃথাই ঝরে। কিন্তু শহীদের রক্তদান তো কখনই বৃথা যায় না। মাটির বুকে তা প্রবাহিত হয় না। প্রতিটি রক্তবিন্দু শত-সহস্র রক্ত বিন্দুতে নয় বরং শত-সহস্র মণ রক্তে পরিণত হয় এবং সমাজদেহে তা পরিসঞ্চালিত হয়। এ কারণেই রসুল আকরাম (সঃ) বলেন, "তাঁর রাহে রক্তপাত ছাড়া আর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে এতবেশি পছন্দনীয় নয়।" শাহাদাত হচেছ সমাজদেহে বিশেষত রক্তশূন্যতায় ব্যাধিগ্রস্ত সমাজদেহে রক্ত সঞ্চালন। শহীদই হচেছন সে মহান ব্যক্তি যিনি শিরায় নতুন রক্ত প্রবাহিত করেন।

শহীদের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় তা হচেছ, তিনি সমগ্র পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে সাহস ও উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেন। তিনি মানুষের মাঝে বীরত্ব ও বিরোচিত সহিষ্ণুতার মনোভাব উজ্জীবিত করেন। যারা সাহসহারা, যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষত মহান আল্লাহ্‌র কাছে দাড়াবার আগ্রহ ও আন্তরিকতা হারিয়েছে, তাদের মাঝে সাহসের সঞ্চার করেন। তাদের মাঝে আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার পুনরুজ্জীবন ঘটান। এ কারণে ইসলামে শহীদের প্রয়োজন সব সময় আছে। একটা জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে সাহস এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার পুনরুজ্জীবন চাই। এটা অত্যবশ্যক।

একজন বিদ্বান বা মনীষী জ্ঞান দিয়ে সমাজের খিদমত করেন। জ্ঞানের কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্ব সমাজদেহে লীন হয়ে যায়, যেভাবে পানি বিন্দু মিশে যায় সাগরের সাথে। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অংশ, অর্থাৎ তাঁর মতবাদ ও চিন্তাধারা হয়ে যায় অমর। একজন উদ্ভাবক সমাজের মাঝে মিশে যান তাঁর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে সমাজের

www.pathagar.com

সেবা করেন, নিজে অমরত্ব লাভ করেন। একজন কবি তাঁর কাব্যকর্ম এবং একজন নৈতিকতার প্রবক্তা তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকেন।

অনুরূপভাবে একজন শহীদও তাঁর নিজস্ব পথে অমরত্ব লাভ করেন। তিনি সমাজকে দান করেন তাঁর অমূল্য রক্ত।

অন্য কথায়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর চিন্তাধারাকে, শিল্পী তাঁর শিল্পকে, উদ্ভাবক তাঁর আবিষ্কারকে এবং নৈতিকতার প্রবক্তা তাঁর প্রচারিত শিক্ষাকে অবিনশ্বরতা দান করেন। কিন্তু একজন শহীদ রক্ত দানের মাধ্যমে তাঁর পুরো সত্তাকে অমরত্ব দান করেন। সমাজের ধমনীতে তাঁর রক্ত প্রবাহিত হয়। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীতেই তাঁদের রক্ত প্রবাহিত হয়। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীই তাঁদের কিছু কিছু গুণাবলিকে অবিস্মরণীয় করে রেখে যান। কিন্তু শহীদ তাঁর সমস্ত গুণাবলির জন্যে অমর হয়ে থাকেন। এ কারণে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেন, "প্রত্যেক পুণ্যের ওপরে আরেকটি পুণ্য আছে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার চাইতে আর কোন বড় পুণ্য হতে পারে না।"

একটি হাদীসে দেখা যায় যে, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরা হচেছনঃ নবী-রসূলগণ, উলামা এবং শহীদগণ।

নবী-রাসূলদের সুপারিশ করার বিষয়টি পুরোপুরি বোধগম্য। কিন্তু শহীদদের সুপারিশের ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে হবে।

শহীদেরা সুপারিশ করার এই বিশেষ অধিকার হাসিল করেন, কারণ তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সৎপথে পরিচালিত করেন। দুনিয়াতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঘটনার সঠিক বর্ণনা শহীদের সুপারিশের মাধ্যমে ফুটে উঠবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা শেষ বিচারের দিন এমন জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় ও জৌলুস সহকারে শহীদদের সবার সামনে হাজির করবেন, যা দেখে স্বর্গীয় বাহনে উপবিষ্ট নবী-রাসূলগণও শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিচে অবতরণ করবেন এমনি শান-শওকত সহকারে শেষ বিচার দিনে শহীদান সর্বসমক্ষে উপস্থিত হবেন।"

www.pathagar.com

ইসলামের প্রাথমিক যুগের শহীদানদের মধ্যে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হচেছন একটি প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। 'শহীদদের সরদার'- এ বিশ্লেষণে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত নবী করীম (সঃ) এর চাচা। ওহোদের যুদ্ধে তিনি শরীক হয়েছিলেন।

মদীনা শরীফ সফর করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর কবর জিয়ারাত করেছেন।

হযরত হামজা (রাঃ) পবিত্র মক্কা নগরী থেকে মদীনা শরীফে একাকি হিজরত করেন। মদীনায় তাঁর বাড়িতে আর কেউ ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন ওহোদ থেকে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন একমাত্র হযরত হামজা (রাঃ)-এর ঘরে ছাড়া আর সব শহীদের ঘরেই মহিলারা বিলাপ করছেন। নবী করীম (সঃ) শুধুমাত্র একটি কথা বললেন, "হামজার জন্যে বিলাপ করার কেউ নেই।" রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবীরা তাঁদের নিজ নিজ ঘরে গিয়ে মহিলাদের ডেকে বললেন- নবী মুস্তফা (সঃ) বলেছেন- হামজার জন্যে বিলাপ করার কেউ নেই। মহিলারা তখন তাঁদের স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতাদের জন্যে রোনাজারী করছিলেন। একথা শোনার সাথে সাথেই তাঁরা প্রিয় নবী (সঃ)- এর ইচছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে হযরত হামজা (রাঃ)- এর ঘরে গিয়ে তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করলেন। এরপরে এটি একটি প্রথায় পরিণত হলো- যখন কেউ কোন শহীদের জন্যে বিলাপ করতে ইচছুক হতেন, তাহলে তিনি প্রথমে হযরত হামজা (রাঃ) এর ঘরে যেতেন এবং বিলাপ করতেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, যদিও সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কান্নাকাটি করার ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহ দেয় না তবুও শহীদের মৃত্যুতে মানুষ ক্রন্দন করুক ইসলাম যেন এটাই বলতে চায়। একজন শহীদ সাহস ও শৌর্যবীর্যের আবহ সৃষ্টি করেন। কাজেই তাঁর জন্যে অশ্রুপাত করার মানেই হচেছ তাঁর সাহস ও শৌর্যবীর্যে শরীক হওয়া। শহীদের জন্যে রোনাজারী তাঁর শাহাদাতের জন্যে ব্যাকুল আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'শহীদের সরদার' উপাধি প্রথমে হযরত হামজার জন্যে ব্যবহৃত হতো। ১০ই মুহররমের বিয়োগান্ত ঘটনা ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের শাহাদাতের পর এ উপাধি হযরত হুসাইন (রাঃ) এর নামের সাথে যুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

গেল। কারণ তাঁর শাহাদাত অন্যসব শহীদী মৃত্যুকে ম্লান করে দিয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহ যে এখনো এ উপাধি হযরত হামজার (রাঃ) জন্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর যুগের শহীদানের নেতা ছিলেন। অপরদিকে হুসাইন (রাঃ) যুগ যুগ ধরে শহীদের নেতা ছিলেন, থাকবেন, যেমনি করে হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর যুগে কুমারীদের এবং হযরত ফাতিমা জাহরা (রাঃ) অনন্তকাল ধরে মহিলাদের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের আগে হযরত হামজা (রাঃ) কে শহীদানের জন্যে বিলাপ বা শোকের প্রতীক বলে গণ্য করা হতো। তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করার মানেই হচেছ চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে শাহাদাতের আকাঙ্খার সাথে মিল রেখে শহীদী সাহস ও শৌর্যবির্যে অংশগ্রহণ। শাহাদাত বরণ করার পর থেকে হুসাইন (রাঃ) এই স্থানেই অধিষ্ঠিত হন।

এখানে শহীদের জন্যে ক্রন্দন বা বিলাপের পেছনে যে দর্শন রয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

"লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এক জাতি তাঁর শহীদের জন্যে কাঁদেন, কারণ শাহাদাত সে জাতির কাছে একটি অবাঞ্চিত ও দুঃখজনক ঘটনা, অন্যদিকে অপর জাতি শহীদের মৃত্যুতে উৎফুল্ল হন, কেননা সে জাতির জনগোষ্ঠীর কাছে শাহাদাত হচেছ একটি মহান সাফল্য ও গর্বের বিষয়। কোন জাতি যদি হাজার বছর ধরে অশ্রুপাত করে শোকে হাহুতাশ করে তাহলে স্বভাবতই সে তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে, দুর্বল ও কাপুরুষ হয়ে যায়। অপরদিকে যে জাতি তাঁর বীরের শাহাদাতের ঘটনাকে বিধিসম্মতভাবে স্মরণ করে ও পালন করে, সে হয়ে ওঠে শক্তিশালী, সাহসী ও আত্মত্যাগী। এক জাতির জন্যে শাহাদাতের অর্থ ব্যর্থতা। এর প্রতিক্রিয়া হচেছ ক্রন্দন, বিলাপ, শোক-বিহ্বলতা- যা তাকে দুর্বলতা, অসহায় ও আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু অন্য এক জাতির জন্যে শাহাদাতের অর্থ হচেছ বিজয় ও সাফল্য এবং এ কারণে এর প্রতিক্রিয়া হচেছ আনন্দ ও উল্লাস, যা তার মনোবলকে চাঙ্গা করে তুলে।"

মৌল বক্তব্য হচেছ এটাই। অন্যান্য সমালোচকরাও একই ধরনের যুক্তি পেশ করেছেন। এ বিষয়টিকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই এবং প্রমাণ করতে চাই যে শহীদ স্মরণে খ্রিস্টানেরা যে উৎসব পালন করে থাকেন তা তাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা থেকে উদ্ভূত আর মুসলমানেরা শহিদের সম্মান এবং মর্যাদা সবার উপরে স্থান দিয়ে স্মরণ করেন।

www.pathagar.com

অবশ্য আমাদের জনগণের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছেন যাঁরা হযরত হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে শুধু এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার প্রতি বড় অবিচার করা হয়েছিল এবং মিছেমিছি তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তাদের দৃষ্টিকোণ সঠিক বলে মনে করি না। এ ধরনের লোকেরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রশংসনীয় আচরণ ও কার্যকলাপের প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকেন। আমরা ইতোপূর্বে এ দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করেছি।

গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন বলেছেন যে, জীবনের আকৃতি ও রূপ যাই হোক না কেন তিনি সকল পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে বেঁচে থাকা বেশি পছন্দনীয়। তিনি বলেন, এ বেঁচে থাকা যদি খচচরের পেট থেকে মাথা বের করে নিশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকার মতোও হয়, তবুও। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মৃত্যুর শুধুমাত্র একটি নেতিবাচক দিক আছে।

১০ মুহররম ও তার আগে হযরত হুসাইন (রাঃ) লক্ষ্য করলেন তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই বিশ্বস্ততার সাথে তাকে অনুসরণ করছেন। এটা ছিল তাঁর জন্যে সত্যিই আনন্দের ব্যাপার।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করে তিনি খুশী হলেন। তা হচেছ তাঁর কোন সংগীর চালচলনে দুর্বলতার কোন চিহ্ন বিন্দুমাত্রও দেখা যায়নি। তাঁরা কেউ শত্রু পক্ষে যোগদান করেন নি। অপরদিকে শত্রুপক্ষের কয়েকজন সৈন্যকে তারা হযরত হুসাইন (রাঃ) এর পক্ষে টানতে পেরেছিলেন। দুশমন বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আশুরার দিন এবং তার আগের রাতে তাঁদের পক্ষে চলে আসেন। হুরবিন ইয়াযিদ ছিলেন এদের অন্যতম। আশুরার রাতে সর্বমোট ৩০ জন সৈন্য ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর বাহিনীতে যোগদান করেন। এ সবই ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর জন্যে প্রীতিকর ঘটনা ছিল।

হযরত হুসাইন (রাঃ) এর সংগী সাথীরা একে একে তাঁকে বললেন, "হুজুর আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দিচেছন আপনাকে একলা ফেলে চলে যেতে? তা কখনো হতে পারে না। আপনাকে ছাড়া আমাদের জীবনের কোন মূল্যই নেই।"

www.pathagar.com

একজন বললেন, আমার সাধ জাগে, আহা! আমি যদি নিহত হতাম আমার দেহ যদি পুড়িয়ে ফেলা হতো এবং দেহের ছাইগুলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে দেয়া হতো। আহা! যদি ৭০ বার আমার সাথে এমন ব্যবহার করা হতো! শুধু একবার নিহত হওয়া এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়।"

আরেকজন বললেন, আমার সাধ হয়, আহা! আমি যদি ক্রমাগত এক হাজার বার নিহত হতাম। আহা! আমার যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকতো, তাহলে সবই আপনার জন্যে কুরবানী করে দিতাম।"

প্রথমেই কথা বললেন, তাঁর বিবেকবান ভাই, আবু আল-ফযল আল আব্বাস। অন্যেরা তাঁর কথা পুনরোক্তি করলেন। এটাই ছিল তাঁদের শেষ পরীক্ষা। যখন তাঁরা সবাই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন, তখন হযরত হুসাইন (রাঃ) আগামীকাল কি ঘটতে যাচেছ তা সবার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন "আমি আপনাদের জানাচিছ, আপনারা সবাই আগামীকাল নিহত হবেন।" তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ মহান আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর প্রিয়নবী (সঃ) এর বংশধরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করার সুযোগ দিয়েছেন।

এখানে সবার জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। এটা যদি শহীদের যুক্তির ব্যাপার না হতো তাহলে এ কথা বলা যেতো যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) এর তাঁবুতে তাদের অবস্থান ছিল অর্থহীন। যে কোন ভাবেই হযরত হুসাইন (রাঃ) যদি নিহত হন, সেজন্য তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করবে কেন? কিন্তু দেখা গেল তবুও তারা থেকে গেলেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) তাদের চলে যেতে বাধ্য করেননি। তাদের সেখানে থাকা নিরর্থক, বৃথাই জীবন নষ্ট হবে, কাজেই সেখানে অবস্থান নিষিদ্ধ করা হলো- এমন কথা হযরত হুসাইন (রাঃ) তাদের কাউকে বলেন নি।

অপরদিকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্যে তারা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ইমাম তার প্রশংসা করেছিলেন। এতে বুঝা যায়, শহীদের যুক্তি অন্যান্যের যুক্তির মতো নয়, ভিন্ন। শহীদেরা অনেক সময় তাদের জীবন বিলিয়ে দেন, এটা উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে, সমাজকে প্রদীপ্ত করা, তাতে প্রাণ সৃষ্টি করা এবং সমাজ দেহে রক্ত সঞ্চালনের জন্যে। এটা ছিল তেমনি এক মুহূর্ত।

www.pathagar.com

দুশমনকে পরাজিত করাই শাহাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজ পরিমন্ডলে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করাও এর লক্ষ্য। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর সাথীরা সেদিন যদি প্রাণ লুটিয়ে না দিতেন; তাহলে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো কেমন করে? শাহাদাতের এ ঘটনায় যদিও হযরত হুসাইন (রাঃ)-ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব ও কেন্দ্রবিন্দু তাঁর সংগী-সাথীরাও এ শাহাদাতকে আরো দ্যুতিময় করে তুলেছিলেন, তাতে আরোপ করেছিলেন আরো মহনীয়তা এবং তাকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন উচ্চতর মর্যাদায়। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত শত সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর মানুষকে আন্দোলিত করেছে, তাদের জ্ঞান দান করেছে এবং তাদের দিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা। তাঁর এই শাহাদাত এত তাৎপর্যবহ হতো না, এত গুরুত্ব লাভ করতো না যদি তাঁর সংগী-সাথীদের অবদান তাঁর সাথে জড়িত না হতো। মৃত্যুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মৃত্যু শাহাদাৎ এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হচেছ শহীদ, পরম দয়ালু ও দাতা মহান আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হচেছ শহীদ। সম্মান এবং মর্যাদার দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদাই সর্বোচচ।

শাহাদাতের এই মর্যাদার কারণ বুঝা অত্যন্ত সহজ। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচেছ তার জীবন। সেই প্রিয় জীবনটি আল্লাহ-র সন্তুষ্টির জন্য যিনি বিলিয়ে দেন আল্লাহর প্রীতি ভালবাসার এর চেয়ে আর বড় নিদর্শন কি হতে পারে। তাই শহীদের মর্যাদা সম্মান এত উপরে। শহীদ আল্লাহর সব চেয়ে প্রিয় বান্দা। শহীদ অমর। শহীদ অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শহীদী ঝান্ডা সকলের অগ্রভাগে শহীদ মানেই সেরা।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

বিশ্বজাহান সম্পর্কে এহেন ধারণার ভিত্তিতে কুরআন বলে, বিশ্বজাহানের যিনি শাসক-পরিচালক, মানুষের শাসক-পরিচালকও তিনিই। মানুষের কাজ কারবারেও তিনিই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মানবীয় ও অ-মানবীয় শক্তির নিজের পক্ষ থেকে নির্দেশ-ফায়সালা দান করার কোন অধিকার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহর নিজস্ব শক্তিতেই তাঁর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, এজন্য কারোর স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। এমনকি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ পর্যন্ত সমুদয় বস্তু যেমন তাঁর অনুগত, ঠিক তেমনি মানুষও তার জীবনের ইখতিয়ার বহির্ভূত বিভাগে স্বভাবত তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং কর্তৃত্বের অধীন। তাঁর এ সার্বভৌমত্ব জোর করে চাপিয়ে দেন না। বরং প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থাদির মাধ্যমে, যার মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে আল কুরআন- তিনি মানুষকে আহ্বাহন জানান ইচ্ছা ও চেতনা সহকারে তাঁর এ সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করার জন্য। এ পর্যায়ের বিভিন্ন দিক কুরআনে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

ক. বস্তুত বিশ্বজাহানের রবই মানুষের রব। তাঁর রুবুবিয়্যাত স্বীকার করে নেয়াই বাঞ্চনীয়ঃ

"বল, আমার সালাত, আমার জীবন-মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিমিত্ত .... বল, আল্লাহ ছাড়া আমি কি অন্য কোনো রব তালাশ করবো? অথচ তিনিই তো সকল বস্তুর রব।" -সূরা আল আনআমঃ ১৬২-১৬৪

"বস্তুত আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন।"

-সূরা আল আরাফঃ ৫৪

"বল, মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মাবুদের কাছে আমি আশ্রয় চাই।" -সূরা আন নাসঃ ১-৩

www.pathagar.com

"বল, কে তোমাদেরকে আসমান-যমীন থেকে রিয্‌ক দান করেন? শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি কার ইখতিয়ারভুক্ত? কে নিস্প্রাণ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে নিস্প্রাণ বের করেন? কে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা ভয় করো না? আল্লাহতো তোমাদের প্রকৃত রব। সত্যের পরে গুমরাহি ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তাহলে তোমরা কোথায় ঠোকর খেয়ে বেড়াচ্ছ?" -সূরা ইউনুসঃ ৩১-৩২

খ. নির্দেশ দান এবং ফায়সালার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। মানুষের উচিত তাঁরই বন্দেগী করা। এটাই সঠিক পন্থাঃ
"তোমাদের মধ্যে যে মতভেদই হোক না কেন, তার ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ।" -সূরা আশ শুয়ারাঃ ১০

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ নেই। তাঁরই ফরমান যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। এটিই তো দীনে কাইয়্যেম- সত্য-সঠিক জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।" -সূরা ইউসুফঃ ৪০

"তারা বলে, আমাদেরও কি কোনো ইখতিয়ার আছে? বল, সমস্ত ইখতিয়ার আল্লাহরই।" -সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৪

গ. একমাত্র আল্লাহই হুকুম দেয়ার অধিকার ও ইখতিয়ার রাখেন। কারণ তিনিই স্রষ্টাঃ
"সাবধান, সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও তাঁরই।" -সূরা আল আরাফঃ ৫৪

ঘ. একমাত্র আল্লাহই নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখেন। কারণ তিনিই সমগ্র জগতের বাদশাহঃ

"চোর- নারী-পুরুষ উভয়ের হাত কেটে দাও। .... তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীন বাদশাহী আল্লাহরই জন্য।"

-সূরা আল মায়েদাঃ ৩৮-৪০

ঙ. আল্লাহর নির্দেশ সত্য-সঠিক এজন্য যে, তিনিই বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং তিনিই সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেনঃ

www.pathagar.com

"হতে পারে একটি জিনিস তোমাদের মনপুত নয়; অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং হতে পারে একটি জিনিস তোমাদের মনপূত; অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহই জানেন তোমরা জান না।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২১৬

"কে বিপর্যয়কারী, আর কে সংশোধনকারী তা আল্লাহ জানেন।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২২০

"যা কিছু তাদের সামনে আছে, তাও তিনি জানেন আর যা তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন, তার খবরও তিনি রাখেন। তিনি যেসব বিষয় জ্ঞান দান করতে চান তা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কোনো বিষয়ই জানতে পারে না।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২৫৫

"তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও আর তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদে পৌঁছে, তখন তাদেরকে (নিজেদের পছন্দসই) স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বারণ করো না। .... এটা তোমাদের জন্য অধিক মার্জিত এবং পবিত্র পন্থা। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২৩২

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিচ্ছেন। .... তোমাদের পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে উপকারের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জান না। উত্তরাধিকারের হিস্যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।"

-সূরা আন নিসাঃ ১১

"তারা তোমার কাছে জানতে চায়। বল, আল্লাহ 'কালালা' সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাচ্ছেন। .... আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে বিধান বিশ্লেষণ করছেন, যাতে তোমরা বিপথগামী না হয়ে যাও। এবং তিনি সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।" -সূরা আন নিসাঃ ১৭৬

"আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়-স্বজনরা (অন্যদের তুলনায়) বেশি হকদার। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।" -সূরা আনফালঃ ৭৫

www.pathagar.com

"সদকা তো নিঃস্বদের জন্য। .... এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।" -সূরা আত তাওবাঃ ৬০

"হে ঈমানদারগণ। তোমাদের দাস-দাসীরা অনুমতি নিয়ে যেন তোমাদের কাছে হাযির হয়। .... এমনি করে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ উন্মুক্ত করে দেন। তিনি সবকিছু জানেন, মহাজ্ঞানী তিনি।"

-সূরা আন নূরঃ ৫৮-৫৯

"হে ঈমানদারগণ! যেসব মু'মিন মহিলা হিযরত করে তোমাদের কাছে আসে, তাদেরকে পরীক্ষা করো .... এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।" -সূরা আল মুমতাহিনাঃ ১০

আল্লাহর আইনানুগ সার্বভৌমত্ব

এসব কারণে কুরআন ফায়সালা করে যে, আনুগত্য হবে নিরংকুশভাবে আল্লাহর আর অনুসরণ অনুবর্তন হবে তাঁর আইন-বিধানের; এটিই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অথবা নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ নিষিদ্ধঃ

"(হে নবী!) আমরা এ কিতাব যথাযথভাবে তোমার প্রতি নাযিল করেছি। সুতরাং দীনকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে তাঁর বন্দেগী করো। সাবধান! খালেছ দীন আল্লাহরই জন্য।" -সূরা যুমারঃ ২

"বল দীনকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে তাঁর বন্দেগী করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আমিই যেন সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির অবনতকারী হই।" -সূরা আয যুমারঃ ১১-১২

"এবং আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুত থেকে বিরত থাকো।"

-সূরা আন নাহলঃ ৩৬

"দীনকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে নির্দিষ্টভাবে তাঁর বন্দেগী করা ছাড়া তাদেরকে আর কোনো নির্দেশই দেয়া হয়নি।" -সূরা আলবাইয়্যেনাঃ ৫

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করো, তা বাদ দিয়ে তোমাদের নেতাদের অনুসরণ করো না।"

-সূরা আল আরাফঃ ৩

www.pathagar.com

"তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও তুমি যদি তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার কোনো সাহায্যকারী হবে না, হবে না কোনো রক্ষাকারী।" -সূরা আর রাআদঃ ৩৭

"অতঃপর আমি তোমাদের দীনের এক বিশেষ পদ্ধতির ওপর স্থাপন করেছি। সুতরাযং তুমি তারই অনুসরণ করো। যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তাদের খাহেশের অনুসরণ করো না।" -সূরা জাসিয়াঃ ১৮

কুরআন বলে, মানুষের কার্যাবলী সংগঠিত সুবিন্যস্ত করার জন্য আল্লাহ যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করার অধিকার কারোর নেই।

"......... এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। এগুলো লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে, তারাই যালেম, অত্যাচারী।"

-সূরা আল বাকারাঃ ২২৯

"......... এসব হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজেই নিজের নফসের ওপর যুলুম করে।" -সূরা আত তালাকঃ ১

"......... এসব হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। বাধ্য-বাধকতা মেনে চলতে যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" -সূরা আল মুজাদালাঃ ৪

কুরআন এও বলে যে, আল্লাহর হুকুমের বিরূদ্ধে যে হুকুমই হোক না কেন, তা শুধু অন্যায় অবৈধই নয়, বরং তা হচ্ছে কুফরী, গুমরাহী, যুলুম-শিরক-অন্যায় এবং স্পষ্ট পাপাচার। এ ধরনের যে কোনো ফায়সালা জাহেলিয়াতের ফায়সালা- ঈমান বিরূদ্ধ ফায়সালা। এ ধরনের ফায়সালা অস্বীকার করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি-অবিচ্ছেদ্য অংশঃ

"আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" -সূরা আল মায়েদাঃ ৪৪

www.pathagar.com

“আল্লাহর নাযিল করা হুকুম অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই যালেম।”
-সূরা আল মায়েদাঃ ৪৫

“আল্লাহর নাযিলকৃত নির্দেশ অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক, পাপাচারী।” - সূরা আল মায়েদাঃ ৪৭

“তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?” -সূরা আল মায়েদাঃ ৫০

“তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার ওপর নাযিল করা কিতাবের প্রতি তারা ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তোমার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপরও, অতপর ফায়সালার জন্য নিজেদের ব্যাপারে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দূরে নিয়ে যেতে চায়।” -সূরা আন নিসাঃ ৬০

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

রাসূলের মর্যাদা

ওপরের আয়াতসমূহে আল্লাহর যে বিধান মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌঁছার একমাত্র Media (মাধ্যম) তার রাসূল (স)। তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধান এবং হেদায়েত মানুষের কাছে পৌঁছান এবং নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা সেসব বিধি-বিধান ও হেদায়েতের ব্যাখ্যা দান করেন। সতরাং রাসূল (স) মানব জীবনে আল্লাহর আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) প্রতিনিধি। এর ভিত্তিতে আনুগত্য অবিকল আল্লাহর আনুগত্য। রাসূলের আদেশ-নিষেধ এবং ফায়সালাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আদেশ-নিষেধ ফায়সালা এমনভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যেন অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংকোচও না থাকে, অন্যথায় ঈমান কোনো কাজেই আসবেনা।

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তা করেছি এজন্য যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য লক্ষ্য হবে।" -সূরা আন নিসাঃ ৬৪

"যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করে।"

-সূরা আন নিসাঃ ৮০

"হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের সাথে মতবিরোধ করে, তাঁর বিরোধিতা করে এবং ঈমানদারদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে সে নিজে যে দিকে ফিরে যেতে চায়, আমি তাঁকে সে দিকে ফিরিয়ে দেব। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।"

-সূরা আন নিসাঃ ১১৫

"রাসূল তোমাদেরকে যাকিছু দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো, আর যেসব সম্পর্কে নিষেধ করেন, সেসব থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" -সূরা হাশরঃ ৭

"না, তোমার রবের শপথ, তারা কখনো মু'মিন হবে না, যতক্ষণ তারা তোমাকে (হে নবী) নিজেদের সকল মতবিরোধে ফায়সালাকারী বলে মেনে না নেয়। অতপর তুমি যে ফায়সালা করবে, তাতে নিজেদের অন্তরে তারা কোনো রকম সংকীর্ণতা বোধ করবে না; বরং পুরোপুরি তা মেনে নেবে।"

-সূরা আন নিসাঃ ৬৫

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

উর্ধ্বতন আইন

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ হচ্ছে, এমন এক উর্ধ্বতন আইন (Supreme Law) যার মুকাবিলায় ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আনুগত্যের পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূল ফায়সালা দিয়েছেন, সেসব ব্যাপারে কোনো মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে কোনো স্বাধীন ফায়সালা দেয়ার অধিকারী নয়। আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালা থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো এবং তার বিরোধিতা-অবাধ্যতা ঈমানের পরিপন্থীঃ

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোনো মু'মিন নারী-পুরুষের কোনো প্রকার ইখতিয়ারই থাকে না। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী (অবাধ্যতা) করে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহিতে নিমজ্জিত।" -সূরা আল আহযাবঃ ৩৬

"তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য কবুল করেছি, অতপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; তারা কখনো মু'মিন নয়। তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফায়সালা করেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।" -সূরা নূরঃ ৪৭-৪৮

"ঈমানদারদের কাজ হচ্ছে এই যে, যখন রাসূল তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এজন্য তাদেরকে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে আহবান জানানো হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। এমন ব্যক্তিরাই সফলতা লাভ করবে।" -সূরা আন নূরঃ ৫১

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

খেলাফত

কুরআনের বিধান মতে মানবীয় শাসনের সত্যিকার রূপ হচ্ছে, রাষ্ট্রে, আল্লাহ এবং রাসূলের আইনগত কর্তৃত্ব (Legal Supremacy) স্বীকার করে তাঁর সপক্ষে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ত্যাগ করবে এবং আসল শাসকের অধীনে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) এর ভূমিকা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আইনগত, প্রশাসনিক বা বিচার সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেন উপরে আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব, রাসূলের মর্যাদা ও উর্ধ্বতন আইন শিরোনামায় বর্ণিত চৌহদ্দীর মধ্যে অবশ্যি সীমিত থাকবেঃ

"(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্য-সঠিকভাবে নাযিল করেছি। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং তার হেফাযত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকিছু নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী লোকদের মধ্যে তুমি ফায়সালা করো। আর মানুষের খাহেশের অনুবর্তন করতে গিয়ে তোমার নিকট আগত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।"

-সূরা আল মায়েদাঃ ৪৮

"হে দাউদ, আমি তোমাকে যমীনে খলীফা (প্রতিনিধি) করেছি। সুতরাং তুমি সত্যানুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো এবং নফসের খাহেশ (মনের অভিলাষ এবং কামনা-বাসনা)- এর অনুসরণ করো না। এমন করলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।" -সূরা সোয়াদঃ ২৬

খেলাফতের তাৎপর্য

কুরআনে এ খেলাফতের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা হচ্ছেঃ যমীনের বুকে মানুষ যে শক্তি-সামর্থ লাভ করেছে, তা সবই সম্ভব হয়েছে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ মানুষকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যার ফলে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ তাঁরই দেয়া স্বাধীন ক্ষমতা বলে তাঁর যমীন ব্যবহার করে। এজন্য দুনিয়ার বুকে মানুষের স্বাধীন মালিকানা নেই। বরং সে প্রকৃত মালিকের খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্রঃ

www.pathagar.com

“এবং স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো।” -সূরা আল বাকারাঃ ৩১

“(মানবমণ্ডলী)! আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে স্বাধীন কর্মক্ষমতা দিয়ে সংস্থাপন করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছি।” -সূরা আল আরাফঃ ১০

“তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, যমীনে যাকিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিজিত করে দিয়েছেন।” -সূরা আল হাজ্জঃ ৬৫

“(হে আদ জাতি)! যমীনে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে নূহের জাতির পরে খলিফা করেছেন, তখনকার কথা স্মরণ করো।” -সূরা আল আরাফঃ ৬৯

“(হে সামুদ জাতি)! স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন তিনি আদ জাতির পরে তোমাদেরকে খলিফা করেছিলেন।” -সূরা আরাফঃ ৭৪

“(হে বনী ইসরাঈল)! সে সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমন (ফেরাউন)-কে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন। এবং তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কার্য করো।” -সূরা আল আরাফঃ ১২৯

“অতপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি তোমরা কেমন কাজ করো, তা দেখার জন্য।” -সূরা ইউনুসঃ ১৪

কিন্তু এ খেলাফত কেবলমাত্র তখন সঠিক এবং বৈধ হতে পারে; যখন তা হবে সত্যিকার মালিকের (আল্লাহ তা'আলার) নির্দেশ অনুসারে। তা থেকে বিমুখ হয়ে যে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তা খেলাফত হবে না। বরং খেলাফতের পরিবর্তে তা হবে ‘বাগাওয়াত’ তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহঃ

“তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলিফা করেছেন। অতপর যে কুফরী করবে- তার কুফরী তার ওপর শাস্তি স্বরূপ আপতিত হবে। আর কাফেরদের কুফরী তাদের রব-এর কাছে তাঁর গযব ছাড়া অন্য কোনো বিষয় বৃদ্ধি করতে পারে না। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করতে পারে।”

-সূরা আল ফাতেরঃ ৩৯

www.pathagar.com

"তুমি কি দেখনি, তোমার রব আদ-এর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? ....এবং সামুদের সাথে; যারা উপত্যকায় পাথর কেটেছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য) এবং খুঁটি-তাঁবুর অধিকারী ফেরাউনের সাথেও- যারা দেশে অবাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল?" -সূরা আল ফজরঃ ৬-১১

"(হে মূসা!) ফেরাউনের কাছে যাও। কারণ, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। .... ফেরাউন লোকদের বলেছিল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব- পালনকর্তা- পরওয়াদেগার।" -সূরা আন নাযিয়াতঃ ১৭-২৪

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলিফা করবেন, যেমন তিনি খলিফা করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে .... তারা আমার বন্দেগী করবে, আমার সাথে কিছুকেই শরীক করবে না।" -সূরা আন নূরঃ ৫৫

সমষ্টিক খেলাফত

কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এ বৈধ এবং সত্য-সঠিক ধরনের খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) এর একক ধারক-বাহক নয়। বরং যে দল (Community) উপরিউক্ত মূলনীতিগুলো স্বীকার করে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা করে, সে দলই হয় এ খেলাফতের ধারক-বাহক। সূরা আন নূর-এর ৫৫নং আয়াতের বাক্যাংশ এ ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন। এ বাক্যাংশের আলোকে ঈমানদারদের জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তিই খেলাফতের সমান অংশীদার। সাধারণ মু'মিনদের খেলাফতের অধিকার হরণ করে তা নিজের কুক্ষিগত করার অধিকার কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নেই। কোনো ব্যক্তি বা দল নিজের স্বপক্ষে আল্লাহর বিশেষ খেলাফতের দাবিও করতে পারে না। এ বিষয়টিই ইসলামী খেলাফতকে (একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র) গোষ্ঠীতন্ত্র এবং ধর্মীয় যাজক-সম্প্রদায়ের শাসন থেকে পৃথক করে তাকে সাধারণ মানুষের মতামত প্রদানের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ইসলামী শাসনতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular Soverignty)-এর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনতন্ত্র (ইসলামের জমহুরী খেলাফত) জনগণ স্বয়ং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যেই সীমিত করে দেয়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের আনুগত্যের সীমা

এ খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ শুধু ভাল কাজে (মারুফ) তার আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে। 'মাসিয়াত' (আইনের বিরুদ্ধাচারণ, পাপ অন্যায়)- এ কোনো আনুগত্য নেই, নেই কোনো সহযোগিতাঃ

"হে নবী! ঈমানদার মহিলারা যখন তোমার নিকট এসব বিষয়ের বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, এবং কোনো বৈধ বিধানের ব্যাপারে তোমার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করবে না, তখন তুমি তাদের বায়আত কবুল করো।"

-সূরা আল মুমতাহিনাঃ ১২

"নেকি এবং পরহেযগারী- ভাল কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করো; পাপ এবং ঔদ্ধত্যে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" -সূরা মায়েদাঃ ২

"তাদের মধ্য হতে কোনো পাপাচারী এবং অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করো না।"

-সূরা আদ দাহরঃ ২৪

পরামর্শ সভা

ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যাবলি-প্রতিষ্ঠা-সংগঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান এবং উলিল আমর-এর নির্বাচন, শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলী পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঈমানদারদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হওয়া উচিত; এ পরামর্শ কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হোক বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেঃ

"এবং মুসলমানদের কার্যাবলি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।"

-সূরা আশ শূরাঃ ৩৮

উলিল আম্‌র-এর গুণাবলি

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উলিল আম্‌র এর নির্বাচনে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, তা এইঃ

www.pathagar.com

ক. যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হবে, তাকে সেসব মূলনীতি মেনে চলতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে একটি ব্যবস্থার বিরোধী, তার ওপর সে ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় নাঃ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলিল আম্‌র।" -সূরা আন নিসাঃ ৫৯

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে গোপনীয় বিষয়ের অংশীদার করো না।" - সূরা আলে ইমরানঃ ১১

"তোমরা কি মনে করে বসেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে, আল্লাহ, রাসূল এবং মু'মিনদের ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের ব্যাপারে দখলদার বানায়নি আল্লাহ এখনও তা পরখ করেননি।" -সূরা তাওবাঃ ১৬

খ. সে যালেম ফাসেক-ফাজের, আল্লাহবিমুখ এবং সীমালঙ্ঘনকারী হবে না। বরং ঈমানদার, আল্লাহভীরু এবং নেক্‌কার হতে হবে তাকে। কেনো যালেম বা ফাসেক ব্যক্তি যদি ইমারাত বা ইমামের পদ অধিকার করে বসে, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তার ইমারাত (নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব) বাতিলঃ

"এবং স্মরণ করো, ইবরাহীমকে তার রব যখন কয়েকটি কথার ব্যাপারে পরীক্ষা করছিলেন এবং তা সে পূর্ণ করেছিল। তখন তার রব বলেছিলেন- আমি তোমাকে লোকদের ইমাম (নেতা) বানাবো। ইবরাহীম বললো- আমার বংশধরদের মধ্যেও? তিনি বললেন, যালেমরা আমার আহদ-অঙ্গীকার লাভ করে না। -সূরা আল বাকারাঃ ১২৪

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আমরা কি সেসব লোকদের মতো করবো, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? আমরা কি মুত্তাকি-পরহেযগারদেরকে ফাসেকদের মতো করবো?" -সূরা সাদঃ ২৮

"এমন কোনো লোকের আনুগত্য করো না যারা অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, যে তার নফসের কামনা-বাসনা (খাহেসে-নফস)- এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, এবং যার কার্যধারা সীমাতিক্রম করেছে।"
-সূরা আল কাহাফঃ ২৮

www.pathagar.com

“সেসব সীমালংঘনকারীর আনুগত্য করো না, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে- সংস্কার-সংশোধন করে না।” -সূরা শূয়ারাঃ ১৫১-১৫২

“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী-পরহেযগার-সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।”

-সূরা আন নিসাঃ ৫

“(বনী ইসরাঈল) বলো, সে (তালুত) আমাদের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার পেল কোথায়? অথচ তার তুলনায় আমরা শাসনকার্যের বেশি হকদার। আর তাকে তো ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি। নবী বললেন, আল্লাহ তোমাদের মুকাবিলায় তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং তার জ্ঞান-শক্তিতে প্রশস্ততা দান করেছেন।” -সূরা আল বাকারাঃ ২৪৭

“এবং দাউদের রাজত্বকে আমরা সুদৃঢ় করেছি, তাকে দিয়েছি জ্ঞান-কৌশল এবং চূড়ান্ত ফায়সালাকারী, কথা বলার যোগ্যতা।” -সূরা সাদঃ ২০

“ইউসুফ বললো, আমাকে যমীনের ভাণ্ডারসমূহের কাজে নিযুক্ত করো। কারণ, আমি হেফাজতকারী এবং ওয়াকেফহাল।” -সূরা ইউসুফঃ ৫৫

“আর এরা যদি (গুজব না ছড়িয়ে) খবরটি রাসূল এবং তাদের উলিল আম্র-এর নিকট পৌঁছাতো, তাহলে তা এমন ব্যক্তিদের জ্ঞানে আসতো, তাদের মধ্যে যারা বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম।” -সূরা আন নিসাঃ ৮৩

“বল, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই, উভয়ে কি সমান হতে পারে?”

-সূরা আয যুমারঃ ৯

ঘ. তাকে এমন আমানতদার হতে হবে, যাতে আস্থার সাথে তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারেঃ

“আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানতসমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে ফেরত দেয়ার জন্য।” -সূরা আন নিসাঃ ৫৮

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যেসব মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা এইঃ
ক. "তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তোমাদের উলিল আম্‌র-এর। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো- যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো।"
-সূরা আন নিসাঃ ৫৯

আলোচ্য আয়াতটি শাসনতন্ত্রের ছয়টি ধারা স্পষ্ট করে তুলে ধরেঃ
১. আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য সকল আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য।
২. উলিল আম্‌র-এর আনুগত্য আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের অধীন।
৩. উলিল আম্‌র ঈমানদারদের মধ্যে হতে হবে।
৪. শাসকবর্গ এবং সরকারের সাথে মতবিরোধের অধিকার জনগণের রয়েছে।
৫. বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিধানই হবে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী দলিল।
৬. খেলাফত ব্যবস্থায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, যা উলীল আম্‌র এবং জনগণের চাপ-প্রভাব মুক্ত হয়ে উর্ধতন আইন অনুযায়ী সকল বিরোধ মীমাংসা করতে পারে।

খ. প্রশাসন যন্ত্রের (Executive Body) ক্ষমতা-এখতিয়ার অবশ্যই আল্লাহর সীমারেখা দ্বারা সীমিত হবে, হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ-রাসূলের আইনে বাঁধা। তা লঙ্ঘন করে, প্রশাসন যন্ত্র এমন কোনো নীতি (Policy) গ্রহণ করতে পারে না, এমন কোনো নির্দেশ দিতে পারে না, যা মাসিয়াত (পাপাচার; কুরআন-সুন্নাহর যে কোনো স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশের পরিপন্থী)- এর সংজ্ঞায় পড়ে। কারণ, এ আইনানুগ সীমারেখার বাইরে গিয়ে আনুগত্য দাবি করার অধিকারই তার নেই। (এ সম্পর্কে ওপরের ৩, ৫ ও ৯নং প্যারায় আমরা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ করেছি।) এছাড়াও প্রশাসনিক কাঠামো অবশ্যই শূরা অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হতে হবে। এবং শূরা অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তাকে কার্য পরিচালনা করতে হবে। ওপরে ১০নং প্যারায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন এবং পরামর্শ সম্পর্কে কুরআন কোনো সুস্পষ্ট এবং

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট রূপ-কাঠামো নির্ধারণ করে দেয় নি। বরং এক সামগ্রিক মূলনীতি নিরূপণ করে বিভিন্ন যুগে সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকর করার পথ উন্মুক্ত রেখেছে।

গ. আইন পরিষদ (Legislature) অবশ্যই পরামর্শভিত্তিক হবে (১০নং প্যারায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তার আইন প্রণয়নের অধিকার সর্বাবস্থায়ই ৩ এবং ৫নং প্যারায় বর্ণিত সীমারেখায় সীমিত হতে বাধ্য। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রাসূল কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেননি বা মূলনীতি এবং সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আইন পরিষদ সেসব ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে পারে। তা কার্যকর করার জন্য প্রাসঙ্গিক নিয়ম-নীতির পরামর্শ দিতে পারে, প্রস্তাব পেশ করতে পারে। কিন্তু তাতে রদবদল করতে পারে না। অবশ্য যেসব ব্যাপারে ঊর্ধতন আইন প্রণেতা কেনো সুস্পষ্ট বিধান দেয়নি, সীমারেখা এবং মূলনীতি নির্ধারণ করেনি; সেসব ব্যাপারে ইসলামের স্পিরিট (Sprit) এবং সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী আইন পরিষদ যে কোনো প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কারণ সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশ না থাকাই এ কথার প্রমাণ যে, শরী'আত প্রণেতা তা ঈমানদারের শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ঘ. বিচার বিভাগকে (Judiciary) সকল প্রকার হস্তক্ষেপ এবং চাপ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে, যেন সরকার এবং জনগণ সকলের ব্যাপারে আইন অনুযায়ী পক্ষপাতহীন রায় দিতে পারে। ওপরে ৩ এবং ৫ নম্বর প্যারায় যেসব সীমারেখার উল্লেখ করা হয়েছে, তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিজের এবং অন্যের অভিলাষ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে মামলার রায় দেয়া হবে তার কর্তব্যঃ

"আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করো এবং তাদের কামনা-বাসনা (খাহেশ)- এর অনুসরণ করো না।" -সূরা আল মায়েদাঃ ৪৮

"নিজেদের নফসের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। (এরূপ করলে) তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।" -সূরা আস সাদঃ ২৬

"মানুষের মধ্যে যখন ফায়সালা করবে, ইনসাফের সাথে করবে।"

-সূরা আন নিসাঃ ৫৮

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের লক্ষ

এ রাষ্ট্রকে দু'টি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করতে হবেঃ

১. মানব জীবনে ইনসাফ-সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হোক; যুলুম-নির্যাতনের অবসনা হোকঃ

"আমরা স্পষ্ট হেদায়াত দিয়ে আমাদের রাসূল প্রেরণ করেছি, আর তাদের সাথে কিতাব এবং 'আল মিযান' নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমরা লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে কঠিন শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ।" -সূরা আল হাদীদঃ ২৫

২. সরকারি ক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণ দ্বারা 'সালাত প্রতিষ্ঠা' এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে- যা ইসলামী জীবনের স্তম্ভ। কল্যাণ এবং পুণ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে। বিশ্বে ইসলামের আগমণের এটাই আসল উদ্দেশ্য। অন্যায়-অকল্যাণের প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যায়-অকল্যাণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্যঃ

"তারা এমন ব্যক্তি, আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, ন্যায়ের আদেশ করে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করে।" -সূরা আল হাজ্জঃ ৪১

মৌলিক অধিকার

এ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মুসলিম, অ-মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিম্নে দেয়া হলো। এসব অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ক. জীবন সংরক্ষণঃ

"যে জীবনকে আল্লাহ হারাম-সম্মানার্হ করেছেন, হক ছাড়া তাকে হত্যা করো না।" -সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩৩

খ. মালিকানার অধিকার সংরক্ষণঃ

"নিজেদের সম্পদ পরস্পরে অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না।"

-সূরা আন নিসাঃ ২৯

www.pathagar.com

গ. সম্মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণঃ

"একদল যেন অপর দলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে। .... একে অপরকে দোষারোপ করো না, একে অন্যকে বিরূপ পদবী দিও না। .... একে অন্যের গীবত করো না- তার অনুপস্থিতিতে তাকে মন্দ বলো না।"

-সূরা আল হুজুরাতঃ ১১-১২

ঘ. ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণঃ

"অনুমতি গ্রহণ না করে নিজেদের গৃহ ছাড়া অপরের গৃহে প্রবেশ করো না।"

-সূরা আন নূরঃ ২৭

"মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়িও না।" -সূরা আল হুজুরাতঃ ১২

ঙ. যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারঃ

"প্রকাশ্য নিন্দাবাদ আল্লাহ পছন্দ করেন না, অবশ্য যদি কারো ওপর যুলুম হয়ে থাকে।" -সূরা আন নিসাঃ ১৪৮

চ. ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ এবং সমালোচনা করার অধিকারঃ

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, দাঊদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম-এর ভাষায় তাদের ওপর লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল; করেছিল বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করা থেকে বারণ করতো না। তারা যা করতো, তা কতই না মন্দ ছিল।" -সূরা আল মায়েদাঃ ৭৮-৭৯

"যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করতো, আমরা তাদেরকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছি; আর যালেমদের কঠোর আযাবে পাকড়াও করেছি- তারা যে ফিসক-পাপাচার করতো, তার প্রতিদানে।" -সূরা আল আরাফঃ ১৬৫

"তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে।" সূরা আলে ইমরানঃ ১১০

www.pathagar.com

ছ. সংগঠন করার অধিকার (Freedom of Association)- এর অধিকার। অবশ্য এজন্য শর্ত এই যে, তা মঙ্গল-কল্যাণ কাজে ব্যবহার হবে। সমাজে দলাদলি এবং মৌল বিরোধ ছড়াবার কাজের মাধ্যমে হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হবে নাঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্চনীয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। এমন লোকেরাই হবে সফলকাম। যারা নানা-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, স্পষ্ট হেদায়েত আসার পরও যারা মতভেদ করেছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এমন লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" -সূরা আলে ইমরানঃ ১০৪-১০৫

জ. বিবেক-বিশ্বাসের স্বাধীনতাঃ

"দীনে কোনো যবরদস্তি নেই।" -সূরা আল বাকারাঃ ১৫৬

"মু'মিন হয়ে যাওয়ার জন্য তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে?"

-সূরা ইউনুসঃ ৯৯

"ফেতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক।" -সূরা আল বাকারাঃ ১৯১

ঝ. ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব উপাস্যকে ডাকে; তোমরা তাদের গালি দিও না।" -সূরা আল আনআমঃ ১০৯

এ ব্যাপারে কুরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা যেতে পারে; কিন্তু তা করতে হবে সুন্দরভাবে, উত্তম পন্থায়ঃ

"সুন্দর (Fair) পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বাহাছ করো না।"

-সূরা আল আনকাবুতঃ ৪৬

ঞ. প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তার নিজের কাজের জন্যই দায়ী, একের কাজের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে মন্দ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হয়, কোনো ভার বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না।" -সূরা আল আনআমঃ ১৬৫

www.pathagar.com

"কোনো ফাসেক পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না বুঝে-শুনে কোনো দলের ক্ষতি করে বসো, আর নিজের কাজের জন্য পরিতাপ করো।"

-সূরা আল হুজুরাতঃ ৬

"এমন কোনো ব্যাপারের পেছনে পড়ো না, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।"

-সূরা আন নিসাঃ ৫৮

ট. অভাবীদের অভাব পূরণ করা রাষ্ট্রের এবং বিত্তশালীদের দায়িত্ব

"এবং তাদের সম্পদে সাহায্য প্রার্থী বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।"

-সূরা আয যারিয়াতঃ ১৯

ঠ. সকল নাগরিকের সাথে সমান আচরণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব

"ফেরাউন যমীনে ঔদ্ধত্য করেছে, যমীনের বাসিন্দাদেরকে নানা দলে বিভক্ত করেছে, তাদের একদলকে দুর্বল করে রাখতো সে .... নিশ্চিত সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পর্যায়ভুক্ত ছিল।" -সূরা আল কাসাসঃ ৪

নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকার

এ ব্যবস্থায় নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকারসূত্র এইঃ

ক. সরকারের আনুগত্য করা নাগরিকের দায়িত্বঃ

"আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তাদের তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আম্‌র।" - সূরা আন নিসাঃ ৫৯

খ. সুশাসন মেনে চলা নাগরিকের কর্তব্যঃ

"সংস্কার-সংশোধনের পর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"

-সূরা আল আরাফঃ ৫৬

"যারা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি এইঃ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা গুলিবিদ্ধ করা হবে.....।"

-সূরা আল মায়েদাঃ ৩৩

www.pathagar.com

গ. সরকারের ভাল কাজে সহযোগিতা করা নাগরিকের দায়িত্বঃ

"ভাল কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা সহযোগিতা করো।"

-সূরা আল মায়েদাঃ ২

ঘ. রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কাজে জান ও মাল দিয়ে সাহায্য করা নাগরিকের দায়িত্বঃ

"তোমাদের কী হয়েছে? আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য বলা হলে তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাকো। .... তোমরা যদি বেরিয়ে না পড়ো, আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে এনে দাঁড় করাবেন, তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। ..... তোমরা বেরিয়ে পড়ো-হালকা হও বা ভারী হও। এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" -সূরা আত তাওবাঃ ৩৮-৪১

বৈদেশিক রাজনীতির মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) সম্পর্কে কুরআন মজীদে যেসব হেদায়েত দেয়া হয়েছে, তা এইঃ

(ক) চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। চুক্তি ভঙ্গ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে সে ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষকে পূর্বাহ্নে অবহিত করতে হবেঃ

"চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ করো, চুক্তি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" - সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩৪

"আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, যখন তোমরা অঙ্গীকার করো। পাকা-পোক্ত শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। .... সে মহিলার মতো হয়ো না, যে আপন শ্রম-মেহনত দ্বারা সুতা কেটে পরে তা টুকরো টুকরো করে ফেলে। এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশি ফায়দা হাসিল করার জন্য তোমরা নিজেদের কসমকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যম করো না। আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের মতবিরোধের রহস্য উন্মোচন করবেন।" -সূরা আন নাহলঃ ৯১-৯২

www.pathagar.com

"দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী-পরহেযগারদের পছন্দ করেন।"

-সূরা আত তাওবাঃ ৭

"মুশরিকদের মধ্যে তোমরা যাদের সাথে অঙ্গীকার করেছো, অতপর তোমাদের সাথে ওফাদারীতে তারাও ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্য করেনি, তবে তাদের অঙ্গীকার মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো।"

-সূরা আত তাওবাঃ ৪

"(আর যদি শত্রুর এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানরা) তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। অবশ্য এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে এ সাহায্য করা যাবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।"

-সূরা আল আনফালঃ ৪২

"কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের যদি খেয়ানত (চুক্তিভঙ্গ)- এর আশংকা হয়, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারো। অবশ্য সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে (তা করবে)। আল্লাহ নিশ্চয়ই খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না।"

-সূরা আল আনফালঃ ৫৮

খ. কাজ-কর্মে বিশ্বস্ততা এবং সততাঃ

"তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা-প্রবঞ্চনার মাধ্যম করো না।"

-সূরা আন নাহলঃ ৯৪

"এবং কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটুকু ক্ষিপ্ত না করে, যাতে তোমরা বেইনসাফী করে বসো। ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার নিকটবর্তী।"
-সূরা আল মায়েদাঃ ৮

গ. যুদ্ধের বিষয়ে চুক্তির মর্যাদা দানকারীকে মর্যাদা দিতে হবেঃ

"যদি তারা (অর্থাৎ দুশমনের সাথে মিলিত মুনাফিক মুসলমানরা) না মানে, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করো; যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা করো। .... তাদেরকে বাদে, যারা এমন কোনো জাতির সাথে মিলিত হয়েছে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।" -সূরা আন নিসাঃ ৯০

www.pathagar.com

ঘ. যুদ্ধে প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধি করতে হবে (যদি মুনাফেক না হয়)ঃ

"তারা যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়ো।"

-সূরা আল আনফালঃ ৬১

ঙ. দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্তিঃ

"যমীনে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-বাহাদুরী (প্রতিষ্ঠা করতে) চায় না, চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে; পরকালের নিবাস তো আমরা শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো; শুভ পরিণাম পরহেযগারদের জন্য।" -সূরা আল কাসাসঃ ৮৩

চ. শত্রুভাবাপন্ন নয়, এমন শক্তির সাথে বন্ধুসুলভ আচরণঃ

"যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের নিবাস থেকেও তোমাদেরকে বের করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে বারণ করেন না। ইনসাফকারীদেরকে আল্লাহ নিশ্চিত পছন্দ করেন।" -সূরা আল মুমতাহিনাঃ ৮

ছ. সদাচারীদের সাথে সদাচারঃ

"ইহসানের বিনিময় ইহসান ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে?"

-সূরা আর রহমানঃ ৬০

জ. অপরাধীকে পরিমিত শাস্তি প্রদানঃ

"সুতরাং যারা বাড়াবাড়ি করে, তোমরাও তাদের সাথে ততটুকু বাড়াবাড়ি করো, যতটুকু তারা করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" -সূরা বাকারাঃ ১৯৪

"আর যদি প্রতিশোধ নিতেই হয় তবে ততটুকু, যতটুকু তোমাদেরকে উত্যক্ত করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্যধারণ করো, তবে ধৈর্য-ধারণকারীদের জন্য তাই উত্তম।" -সূরা আন নাহলঃ ১২৬

"আর অন্যায়ের বিনিময়ে ততটুকু অন্যায়, যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। অতপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং শুধরে নেয়, তার বিনিময় আল্লাহর যিম্মায়। আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেন না। নির্যাতিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর যুলুম করে। যমীনে না-হক ঔদ্ধত্য করে। এসব লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" -সূরা আশ শূরাঃ ৪০-৪২

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

কুরআনের এ ষোলটি দফায় রাষ্ট্রের যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে, তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো এইঃ

এক. একটি স্বাধীন জাতি সম্পূর্ণ স্বেচছাপ্রণোদিত হয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে, তাঁর অধীনে কর্তৃত্ব- সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খেলাফতের ভূমিকা গ্রহণ করে সেসব বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলি কার্যকরী করবে, আল কুরআন এবং রাসূলের মাধ্যমে তিনি যা দান করেছেন। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষ থেকে বুঝে শুনে এহেন ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। কোন জাতির ইচছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শের ভিত্তিতে কখনও ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা।

দুই. সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্য বিশেষিত করার সীমা পর্যন্ত সে রাষ্ট্র থিয়াক্রেসী (Theacracy)- এর বুনিয়াদী দর্শনের সাথে একমত। কিন্তু সে দর্শন কার্যকরী করার ব্যাপারে থিয়াক্রেসী থেকে তার পথ ভিন্ন হয়ে যায়। ধর্মীয় যাজকদের কোনো বিশেষ শ্রেণীকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার ধারক বাহক করা এবং হিল ও আকদ-এর সমস্ত ক্ষমতা এ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র দেশের সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত ঈমানদারকে (যারা স্বেচছায় সজ্ঞানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আর্তসমর্পণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) আল্লাহর খেলাফতের ধারক-বাহক প্রতিপন্ন করে। 'হিল ও আকদ'-এর চূড়ান্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে তাদের হাতে ন্যস্ত করে।

তিন. ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, অথবা খলিফা, ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মতামতের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে মননিত অথবা নির্বাচিত হবেন। এই মনোনয়ন বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে বা প্রাধান্য থাকবে অথবা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। কিন্তু দেশ পরিচালিত হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন প্রশাসন, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতিসহ একটি রাষ্ট্রের যতগুলি বিভাগ আছে সবই পরিচালিত হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জনকল্যাণকে সামনে রেখে কোরআনের

www.pathagar.com

সমুদয় আদেশের প্রতিফলন ঘটবে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে। যদি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার স্পষ্ট সমাধান পবিত্র কালামেপাকে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে রাসূলের ছুন্নাহ অর্থাৎ হাদিসকে কোরআনের জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ঠিকরেখে যেভাবে রাসুল (দঃ) সমাধান করেছেন সেইভাবে সমাধান করতে হবে। এর পরেও যদি সমস্যার নূতনত্বের কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মতামত হাদিস এবং কোরআনের সাথে সমন্বয় করে সমাধান করতে হবে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকও যদি উক্ত সমস্যার সমাধানের বিষয় মতামত দিতে অক্ষম হয় সেক্ষেত্রে যিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী থাকবেন তার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মতামত ও হাদিস কোরানের জনকল্যানের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে সমন্বয় সাধন করে নিয়ে উক্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে ঠিক এইভাবেই রোজ কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের যুগ সমস্যার সমাধান করে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকবে। এটাই ইসলামী রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। যা আমাদের প্রিয় রাসুল (দঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের এটাই পদ্ধতি। ইজমা (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকের মতামত) কিয়াস (নেতার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান)।

চার. ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র পরিচালনা স্বভাবতই তাদের কাজ হতে পারে, যারা তার মৌলিক দর্শন এবং বিধি-বিধান স্বীকার করে। কিন্তু তা স্বীকার করে না- এমন যতো ব্যক্তিই সে রাষ্ট্র সীমায় আইনের অনুগত হয়ে বাস করতে রাজী হয়, তাদেরকে সেসব নাগরিক অধিকার পুরোপুরিই দেয়, যা দেয় রাষ্ট্রের আদর্শ এবং মূলনীতি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকদেরকে। তবে ইসলামী আদর্শ বিরোধীদের নাগরিক অধিকার দিলেও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার বিরোধী।

পাঁচ. তা এমন এক রাষ্ট্র, যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানবজাতির যে কোনো সদস্য ইচছা করলে সেসব মূলনীতি স্বীকার করে নিতে পারে; কোনো প্রকার ভেদ-বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে সে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের যেখানেই কোনো

www.pathagar.com

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, নিশ্চিত তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র, তা আফ্রিকায়, এশিয়ায়; ইউরোপ বা আমেরিকায়; হোক সে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী কালো অথবা সাদা বা হরিদ্রা। এ ধরনের একটি নিরঙ্কুশ আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের বিশ্বরাষ্ট্রে (World State) রূপান্তরিত হওয়ার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেও যদি এ ধরনের অনেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও হবে ইসলামী রাষ্ট্র। কোনো জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সেসব রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা সম্ভব। কোনোও এক সময় তারা একমত হয়ে বিশ্ব-ফেডারেশন (world Federation)-ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ছয়. রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাহভীতি- পরহেযগারীর সাথে তা পরিচালনা করা সে রাষ্ট্রের মৌল প্রাণশক্তি (Real Spirit)। নৈতিক-চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বই সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি-একক মানদণ্ড। সে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী এবং 'আহলুল হিল ওয়াল আকদ'-এর নির্বাচনের ব্যাপারেও শারীরিক মানসিক যোগ্যতার সাথে নৈতিক পবিত্রতাও সর্বাধিক লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার সকল অভ্যন্তরীণ প্রশাসন বিভাগকেও পরিচালিত হতে হবে ন্যায়ানুগ-আমানত-সততা-বিশ্বস্ততা পক্ষপাতমুক্ত নির্ভিক ইনসাফ-সুবিচারের ভিত্তিতে। আর তার বৈদেশিক নীতিকেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সম্পূর্ণ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা, চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা, শান্তিপ্রিয়তা, আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং সদাচরণের ভিত্তির ওপর।

সাত. নিছক পুলিশের দায়িত্ব পালন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র নয়। শুধু আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা তার কাজ নয়; বরং তা হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র। সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ আর অন্যায়ের বিনাশ সাধনের নিমিত্তে তাকে কাজ করতে হবে।

আট. অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার সাম্য, আইনের শাসন, ভাল কাজে সহযোগিতা, খারাপ কাজে অসহযোগিতা, আল্লাহর সামনে দায়িত্বের অনুভূতি, অধিকারের চেয়েও বড় করে কর্তব্যের অনুভূতি, ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্র-সকলের এক লক্ষে ঐকমত্য, সমাজের কোনো ব্যক্তিকে জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদান-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে না দেয়া এসব হচ্ছে সে রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যমান (Basic Values)। জাতি, ধর্ম, বর্ন, দরিদ্র, নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ।

www.pathagar.com

নয়. এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র লাগামহীন এবং সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে নিরীহ দাসে পরিণত করতে পারে না, আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সামাজিক স্বার্থের দুশমন হতে পারে না। এতে ব্যক্তিকে একদিকে মৌলিক অধিকার দিয়ে এবং রাষ্ট্রকে ঊর্ধতন আইন এবং শূরার অনুগত করে ব্যক্তি সত্তার উদ্ভব-বিকাশের সকল সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে; ক্ষমতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে করা হয়েছে নিরাপদ; কিন্তু অপরদিকে ব্যক্তিকে নৈতিক নীতিমালার ডোরে শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তার ওপর এ কর্তব্যও আরোপ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করলে মনে-প্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে, ভাল কাজে তার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে, রাষ্ট্র শৃঙ্খলার ফাটল ধরান থেকে বিরত থাকবে, তার সংরক্ষণ কাজে জান-মাল দিয়ে যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে যেন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধও না করে। কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্র যদি ন্যায়ের পরিপন্থি কোন কাজ করতে চায় তখন কোন আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। বরং সেই অন্যায় প্রতিরোধ এবং উৎখাতের দায়িত্ব ও মুসলিম নাগরীকের।

ইসলামের শাসননীতি

ইতোপূর্বে কুরআন মজীদের যে রাজনৈতিক শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে, তা বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাজ। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে এবং হিজরতের পর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তা যে রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করে, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কুরআন মজীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর। ইসলামী শাসনব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে দেয়।

এক. আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং ঈমানদারদের শাসন হচ্ছে মূলত খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার তার কোনো অধিকার নেই। বরং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের উৎস

www.pathagar.com

থেকে উৎসারিত আল্লাহর আইনের অধীনে কাজ করা তার অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে এ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে আগের অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ ব্যাপারে একান্ত স্পষ্টঃ

সূরা আন নিসাঃ ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৫; সূরা আল মায়েদাঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭, সূরা আল আ'রাফঃ ৩; সূরা ইউসুফঃ ৪০; সূরা আন নূরঃ ৫৪, ৫৫এ সূরা আল আহযাবঃ ৩৬ এবং সূরা আল হাশরঃ ৭।

নবী (স) ও তাঁর অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ "আল্লাহর কিতাব মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর কিতাব যা হালাল করে দিয়েছে, তোমরা তাকে হালাল মনে করো, আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম মনে করো।"

"আল্লাহ তা'আলা কিছু বিধিবিধান নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করো না, কিছু হারাম বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না, কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা অতিক্রম করো না, ভুল না করেও কিছু ব্যাপার মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ো না।"

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবে না, পরকালেও হবে না সে হতভাগা।"

রাসূল (সঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না,- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"

"আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছি, তা গ্রহণ করো, আর যে বিষয় থেকে বারণ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"

দুই. সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

দ্বিতীয় যে মূলনীতির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত, তা হলো কুরআন-সুন্নাহর দেয়া আইন সকলের জন্য সমান, রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের ওপর তা সমভাবে প্রযোজ্য। তাতে কারো জন্য

www.pathagar.com

কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

"এবং তোমাদের মধ্যে আদ্‌ল-সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" -সূরা আশ শূরাঃ ১৫

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার-নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক আর তা হচ্ছে আদ্‌ল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দীনে কারও জন্য কোনো পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন-পর, ছোট-বড়, শরীফ-কমীনের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হালাল, তা সবার জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। আল্লাহর আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্তাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। নবী (স) নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ

"তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মাত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিহিত, (মুহাম্মাদের আপন কন্যা) ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।

হযরত উমর (রা) বলেনঃ

"আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আপন সত্তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখেছি।"

তিন. মুসলমানদের মধ্যে সাম্য

এ রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি ছিল, বংশ-বর্ণ-ভাষা এবং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। এ রাষ্ট্রের পরিসীমায় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না, অন্যের মোকাবিলায় কারো মর্যাদা খাটোও হতে পারে না।

www.pathagar.com

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
"মু'মিনরা একে অন্যের ভাই।" - সূরা আল হুজুরাতঃ ১০

"হে মানবজাতি! এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সম্মানার্হ, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে।"
-সূরা আল হুজুরাতঃ ১৩

নবী (স)- এর নিম্নোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেঃ
"আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলির দিকে তাকান।"

"মুসলমানরা ভাই ভাই। কারো ওপর কারো কোনো ফযীলত নেই তাকওয়া ছাড়া।"
"হে মানবজাতি! শোন, তোমাদের রব এক। অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের কেনো মর্যাদা নেই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদারও নেই কোনো শ্রেষ্ঠত্ব। হ্যাঁ, অবশ্য তাকওয়ার বিচারে।

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের জবাই করা জন্তু খায়, সে মুসলমান। মুসলমানের যে অধিকার, তারও সে অধিকার, মুসলমানের যে কর্তব্য, তারও সে কর্তব্য।"

"সকল মু'মিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মোকাবিলায় তারা সবাই এক। তাদের একজন সামান্যতম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে।"
"মুসলমানদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা যেতে পারে না।"

চার. সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

এ রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহভীরু, ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করা। কোনো ব্যক্তি নিজের

www.pathagar.com

ইচ্ছামত বা স্বার্থবুদ্ধি প্রোণোদিত হয়ে এ আমানতের খেয়ানত করার অধিকার রাখে না। এ আমানত যাদের হাতে সোপর্দ করা হবে তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেনঃ

"আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে, ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।" -সূরা আন নিসাঃ ৫৮

রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ
"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা- যিনি সকলের ওপর শাসক হন- তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

"যিনি মুসলিম প্রজাদের কাজ-কারবারের প্রধান দায়িত্বশীল, তিনি যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যান তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

"মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো পদাধিকারী শাসক যিনি নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেন না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন না; তিনি কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতের প্রবেশ করবেন না।"

"(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু যারকে বলেন,) আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদমর্যাদা একটা আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে; অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হক আদায় করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।"

"শাসকের জন্য আপন প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেয়ানত।"
"যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোনো পদ গ্রহণ করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহণ করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর করে নেবে, (যাতায়াতের) বাহন না থাকলে একটা বাহন গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়, সে খেয়ানতকারী অথবা চোর।" অর্থাৎ যিনি

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রধান তার আর্থিক সংগতি না থাকলে যতটুকু তার নূনতম প্রয়োজন তা রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে গ্রহণ করবে তার বেশী নয়। আর নূনতম প্রয়োজন না মিটিয়ে মনকষ্ট, শারিরীক কষ্ট নিয়ে দেশ শাসনে অসুবিধাও সৃষ্টি করা যাবেনা তাহলে সেটা অন্যায়। অর্থাৎ ভারসাম্য পূর্ণ ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তা রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান এবং তা রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান এবং জনগনের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সেটিই হচেছ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেনঃ
"যে ব্যক্তি শাসক হবে, তাকে সবচেয়ে কঠিন হিসেব দিতে হবে, আর সবচেয়ে কঠিন আযাবের আশংকায় পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসক হবে না, তাকে হালকা হিসেব দিতে হবে, তার জন্য হালকা আযাবের আশংকা আছে। কারণ শাসকের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর যুলুমের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

হযরত উমর (রা) বলেনঃ
"ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরীর বাচ্চাও হারিয়ে যায় (বা ধ্বংস হয়) তবে আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

পাঁচ. শূরা বা পরামর্শ সভা

এ রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতে হবে। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনাও করতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ
"আর মুসলমানদের কাজকর্ম (সম্পন্ন হয়) পারস্পরিক পরামর্শক্রমে।"
-সূরা আশ শূরাঃ ৩৮

"হে নবী! কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।"
হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)- এর খেদমতে আরয করি যে, আপনার পর আমাদের সামনে যদি এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যে সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ না থাকে এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি, তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেনঃ

www.pathagar.com

"এ ব্যাপারে দীনের জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইবাদত গুযার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী ফায়সালা করবে না।"

হযরত ওমর (রা) আরো বলেনঃ
"মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া যে ব্যক্তি তার নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্বের (ইমারাত) প্রতি আহ্বান জানায়, তাকে হত্যা না করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।"
অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রা)-এর এ উক্তি বর্ণিত আছেঃ
"পরামর্শ ছাড়া কোনো খেলাফত নেই।"

ছয়. ভাল কাজে আনুগত্য
ষষ্ঠ মূলনীতি- যার ওপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- এই ছিল যে, কেবলমাত্র মারুফ- ভালো কাজেই- সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে (মুসিয়াত) আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারোর নেই। অন্য কথায়, এ মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা ওয়াজিব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার তাদের কোনো অধিকার নেই; তা মেনে চলাও কারো উচিত নয়। কুরআন মজীদে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)- এর বাইয়াত- আনুগত্যের শপথ গ্রহণকেও মারুফ আনুগত্যের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো মাসিাত (পাপাচার)- এর নির্দেশ আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে নাঃ
"এবং কোনো মারুফ কাজে তারা আপনার নাফরমানী-অবাধ্যতা করবে না।"
-সূরা আল মুমতাহিনাঃ ১২

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য:
"একজন মুসলমানের ওপর তার আমীরের আনুগত্য করা- শোনা এবং মেনে চলা- ফরয; তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ তাকে কোনো মাসিয়াত- পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। মাসিয়াত এর নির্দেশ দেয়া হলে কোনো আনুগত্য নেই।
"আল্লাহর নাফরমানীতে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফ কাজে।"

www.pathagar.com

নবী (স)- এর বিভিন্ন উক্তিতে বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও তিনি বলেছেন, (যে আল্লাহর নাফরমানি করে, তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই), কখনো বলেছেনঃ

(স্রষ্টার নাফরমানীতে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই), কখনো বলেছেনঃ যে আল্লাহর আনুগত্য করে না তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই, কখনো বলেছেনঃ যে শাসক তোমাকে কোনো মাসিয়াত-এর নির্দেশ দেয়, তার আনুগত্য করো না।

হযরত আবু বকর (রা)- এর বক্তব্যঃ

"যে ব্যক্তিকে মুহাম্মদ (স)- এর উম্মাতের কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে লোকদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করেনি, তার ওপর আল্লাহর লানত-অভিসম্পাত।"

এ কারণেই খলিফা হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ভাষণেই ঘোষণা করেছিলেনঃ "যতক্ষণ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। যখন আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবো, তখন তোমাদের ওপর আমার কোনো আনুগত্য নেই।

হযরত আলী (রা)- এর বক্তব্য:

"আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা এবং আমানত আদায় করে দেয়া মুসলমানদের শাসকের ওপর ফরয। শাসক যখন এভাবে কাজ করে তখন তা শুনা ও মেনে চলা এবং তাদেরকে আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দেয়া লোকদের কর্তব্য।"

"আল্লাহর আনুগত্য করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তা মেনে চলা তোমাদের ওপর ফরয- সে নির্দেশ তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আল্লাহর নাফরমানী করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তাতে আল্লাহর সাথে মাসিয়াত বা পাপাচারের ক্ষেত্রে কারো জন্য আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে।"

www.pathagar.com

সাত. পদমর্যাদার দাবি এবং লোভ নিষিদ্ধ

এটাও ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি যে, সাধারণত রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদ, বিশেষত খেলাফতের জন্য সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অযোগ্য-অনুপযুক্ত, যে নিজে পদ লাভের অভিলাষী এবং সে জন্য সচেষ্ট।

পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ হয়েছেঃ "আখেরাতের ঘর আমি তাদেরকে দেবো, যারা যমীনে নিজের মহত্ব খুঁজে বেড়ায় না, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।" -সূরা কাসাসঃ ৮৩

রাসুল (সঃ) এর বক্তব্যঃ

"আল্লাহর শপথ, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদমর্যাদা দেই না, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে।"

"যে ব্যক্তি নিজে তা সন্ধান করে, আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশি খেয়াতনকারী।"

"আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গ্রহণ করি না, যে নিজে উক্ত পদের অভিলাষী।"

"আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আবদুর রহমান! সরকারী পদ দাবি করো না। কেননা চেষ্টা তদবীর করার পর যদি তা তোমাকে দেয়া হয়, তবে তোমাকে তার হাতে সঁপে দেয়া হবে, আর যদি চেষ্টা তদবীর ছাড়াই তা লাভ করো, তবে তার হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।"

আট. ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য

এ রাষ্ট্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য এই যে, কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদণ্ডানুযায়ী ভাল ও সদগুণাবলির বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন করবে। কুরআন মজীদে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"(মুসলমান তারা) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" -সূরা আল হাজ্জঃ ৪১

www.pathagar.com

"এমনি করে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত (বা ভারসাম্যপূর্ণ পথে অবিচল উম্মাত) করেছি, যেন তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।" -সূরা আল বাকারাঃ ১৪৩

"তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের (সংশোধন এবং পথপ্রদর্শনের) জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।"

এছাড়া যে কাজের জন্য মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল আদিষ্ট ছিলেন, কুরআনের দৃষ্টিতে তা ছিল এইঃ
"দীন কায়েম করো এবং তাতে বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" -সূরা আশ শূরাঃ ১৩

অমুসলিম বিশ্বের মুকাবিলায় তাঁর সকল চেষ্টা সাধনাই ছিল এ উদ্দেশ্যেঃ
"দীন যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়।"
-সূরা আল আনফালঃ ৩৯

অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের মতো তাঁর উম্মাতের জন্যও আল্লাহর নির্দেশ ছিলঃ
"তারা নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে।" -সূরা আল বাইয়্যেনাঃ ৫

এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কাজ ছিল, দীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে কায়েম করা, তার মধ্যে এমন কোনো সংমিশ্রণ হতে না দেয়া, যা মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী নীতি সৃষ্টি করে। এ শেষ বিষয়টি সম্পর্কে নবী (স) তাঁর সাহাবী এবং স্থলাভিষিক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেনঃ
"আমাদের এ দীনে যে ব্যক্তি এমন কারো বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

"সাবধান! নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বেদআত, আর সকল বেদআতই গুমরাহী পথভ্রষ্টের অন্তভূক্ত।
"যে ব্যক্তি কোনো বেদআত উদ্ভাবককে সম্মান করে, সে ইসলামের মূলোৎপাটনে সাহায্য করে।"
এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর এ উক্তিও দেখতে পাই যে, তিন ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে বেশি না- পছন্দ, তাদের একজন হচ্ছে সে ব্যক্তিঃ
"যে ইসলামে কোনো জাহেলী রীতিনীতির প্রচলন করতে চায়।"

www.pathagar.com

নয়. আমর বিল মারুফ ও নাহ্ই আনিল মুনকার এর অধিকার এবং কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশেষ মূলনীতি- যা তাকে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেয়- তা হচেছ মুসলিম সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে, নেকি ও কল্যাণের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোনো ভুল এবং অন্যায় কাজ হতে দেখবে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটা শুধু অধিকারই নয়, বরং অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছেঃ

"নেকি এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য করো এবং গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে সাহায্য করো না।" -সূরা আল মায়েদাঃ ২

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য সঠিক কথা বলো।"

-সূরা আল আহ্যাবঃ ৭০

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ন্যায় বিচারে অটল-অবিচল থাকো এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও- তোমাদের সাক্ষ্য স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরূদ্ধে যাক না কেন।"

-সূরা আন নিসাঃ ১৩৫

"মুনাফিক নারী-পুরুষ পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, ভাল কাজ থেকে বারণ করে। .... আর মু'মিন নারী-পুরুষ একে অন্যের সাথী, তারা ভাল কাজের নির্দেশ দান করে আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" -সূরা আত তাওবাঃ ৬৭-৭১

আল কুরআনে ঈমানদারদের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উক্ত হয়েছেঃ

"নেকির নির্দেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী।" -সূরা আত তাওবাঃ ১১২

এ ব্যাপারে নবী (স)- এর এরশাদ এইঃ

"তোমাদের কেউ যদি কোনো মুনকার (অসৎকাজ) দেখ, তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পার, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে, তাও যদি না পার, তবে অন্তর দ্বারা (খারাপ জানবে এবং বারণ করার আগ্রহ রাখবে), আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"

www.pathagar.com

"অতপর অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থানে বসবে। তারা এমন সব কথা বলবে, যা নিজেরা করবে না, এমন সব কাজ করবে, যার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাদেরকে। যে হাতের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মু'মিন; যে জিহ্বার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মু'মিন; অন্তর দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মু'মিন। (ঈমানের এর চেয়ে ক্ষুদ্র সামান্যতম পর্যায়ও নেই)।"

"যালেম শাসকের সামনে ন্যায় বা সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"
"যালেমকে দেখেও যারা তার হাত ধরে না (বাধা দেয় না) তাদের ওপর আল্লাহর আযাব প্রেরণ দূরে নয়।"

"আমার পরে কিছু লোক শাসক হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে আমার নয় এবং আমি তার নই।"

"অনতিবিলম্বে এমন সব লোক তোমাদের ওপর শাসক হবে, যাদের হাতে থাকবে তোমাদের জীবিকা, তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে, কাজ করলে খারাপ কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ তার মন্দ কাজের প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যায় বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না। সত্যকে বরদাশত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্য পেশ করে যাও। তারপর যদি তারা তার সীমালঙ্ঘন করে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি এজন্য নিহত হবে, সে শহীদ।"

"যে ব্যক্তি কোনো শাসককে খুশি করার জন্য এমন কথা বলে, যা তার প্রতিপালককে নারায করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দীন থেকে খারিজ হয়ে যায়।"

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংজ্ঞা

আল কুরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইলামী রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান না হলেও তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র। কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে হলে দেশের সকল নাগরিককে কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক হতে হবে তেমন কোন কথা নেই। বস্তুত, সমূহবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র অংশই কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে দেশগুলো কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রের নীতি এবং আদর্শ অনুসারে পরিচালিত এবং শাসিত বলেই কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র এক নয়। কোন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক এমন কি সকল নাগরিক মুসলমান হলেও সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র নাও হতে পারে। তবে তাকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। মুসলিম অধ্যুষিত হলেই কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হয় না।

ইসলামী সাম্যঃ

সাম্যবাদ কথাটি খুবই মুখরোচক। সাম্যবাদের কথা বলে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের জন্য সর্বহারা মিস্‌কিন শ্রেণীর সমর্থন ও সাহায্য আদায় করা খুবই সহজ। সাম্যবাদের গালভরা বুলিতে মুগ্ধ হয়ে নুন-তেল-লাকড়ি সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ মরীচিকার পিছনে ছুটে।

মানব ইতিহাসে মানুষের বহু আকাঙ্খিত সাম্যের সত্যিকার বাস্তবায়ন শুধুমাত্র একবারই হয়েছিল, তা হলো মদীনার ইসলামী সাধারণতন্ত্রে। শুধু এ শতাব্দীর নয়, মানব ইতিহাসে কখনও রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন কর্মচারী সমান বেতন নেন নি। একমাত্র মদীনার সাধারণতন্ত্রেই ছিল উল্লেখযোগ্য এ ব্যতিক্রম।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহাম্মদ (সা) ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা) তিন দিনের উপবাসী হয়ে পিতার নিকট এলে আল্লাহর উপর নির্ভর করার এবং ধৈর্য ধরার উপদেশ পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মুসলমানদের সাধারণ তহবিল হতে কিছুই পাননি। বরং পিতা সাত দিন পর্যন্ত এক বেলা পেট ভরে খেতে পারেন নি শুনে কন্যা নিজের ক্ষুধার কথাই ভুলে গিয়েছিলেন।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহাম্মদ (সা) অন্ধকার ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। কারণ ঐ অন্তিম রজনীতে তাঁর ঘরে প্রদীপের তেল কেনার পয়সা ছিল না। জীবনের শেষ মুহূর্তে আপন পরিজন কেউ তাঁর চেহারা মুবারক দেখতে পান নি। এহেন প্রয়োজনেও মুসলিমদের সাধারণ তহবিল হতে তেল কেনার পয়সা গ্রহণ করা হয়নি।

প্রথম খলীফা আবু বকরকে (রা) নতুন কাপড় দিয়ে দাফন করা হয়নি। তাঁর পরিধেয় দু'খন্ড বস্ত্র ধুয়ে এবং প্রয়োজনীয় তৃতীয় খন্ড বস্ত্র কিনে তাঁর দাফন করা হয়।

খলীফা উমর (রা) মৌলিক প্রয়োজনের অধিক একদিন হালুয়া খাওয়ার জন্য পয়সার পরিমাণ বেতনও বায়তুলমাল হতে নিতেন না। তাঁর স্ত্রী কিছু কিছু করে পয়সা জমিয়ে একদিন হালুয়া তৈরি করেছেন দেখে সে পরিমাণ অর্থ তিনি নিজ বেতন হতে কমিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর বাড়িতে আর হালুয়া তৈরি হতে না পারে।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন তদানীন্তন আরবের সবচেয়ে বিত্তশালী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রার মান ছিল অন্যান্য সাধারণ মুসলিমের ন্যায়। তিনি নিজ পয়সায় মুসলিম খিলাফতের বহু জায়গায় পানীয় জলের কূপ খনন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজের বাড়িতে কোন কূপ খনন করান নি। তাঁর স্ত্রী, কন্যা অন্যান্য মহল্লার মেয়ের ন্যায়ই পাড়ার সাধারণ কূপ হতে পানি সংগ্রহ করতেন।

বিদ্রোহীরা বাড়ি ঘেরাও করার পর তাঁর বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। আজকাল আমাদের দেশের সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা যেরূপ সুবিধা ভোগ করে থাকে, আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) ততটুকু সুবিধা ভোগ করতেন না।

হযরত আলী (রা) খলীফা থাকাকালে এমন খাদ্য মুখে তুলেননি যা খিলাফতের দরিদ্রতম ব্যক্তি খেতে পায়।

www.pathagar.com

কেন ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানগণ এমন কৃচ্ছ্র তা সাধনা করতেন? কারণ তাঁরা ছিলেন জনগণের খাদিম। খাদিমের জীবনযাত্রার মান মনিবের জীবনযাত্রার মান হতে উন্নত হতে পারে না। তাই সরকারি কর্মচারীদের জীবন যাত্রার মানও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান হতে উন্নত ছিল না।

এই সাম্যবাদ শুধু যে সরকারি কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল তা নয়। বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং বিত্তশালী ব্যক্তিকে সাম্যের অনুশীলন করতে হতো। প্রতিবেশী অভুক্ত জেনে আহার করলে কোন ব্যক্তি মুসলিম থাকতে পারে না।

কলকারখানায় উচ্চতম আমলা এবং নিম্নতম শ্রমিকের বেতনের পার্থক্য কিরূপ হবে তার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন সুযোগ সুবিধা কী হবে তা নিম্নস্তর নির্ধারণ করা আছে। মালিক এবং কর্মচারীর সম্পর্কের নিকৃষ্টতম সম্পর্ক হলো মনিব এবং দাসের সম্পর্ক। একজন দাস যে অধিকার পেতে পারে কর্মচারী তার থেকে কম পেতে পারে না।

দাসদের মজুরি এবং প্রাপ্য সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে, মনিব যেরূপ খাবার খাবে, যেরূপ বস্ত্র পরবে, যেরূপ বাড়িতে থাকবে, দাসকেও তেমনি দিতে হবে। তা'হলে বর্তমান 'বাংলো' এবং 'বস্তি' ব্যবস্থা থাকতে পারে কীভাবে?

কোন কলকারখানার মালিক বা ম্যানেজারের এমন কোন খাবার খাওয়ার অধিকার নেই বা এমন কোন বস্ত্র পরিধানের অধিকার নেই যা তার কলকারখানায় সর্বনিম্ন কর্মচারীদেরকে দিতে পারে না। এই যে বিধান, তার কাছে বিংশ শতাব্দীর কোন কোন রাষ্ট্রে প্রবর্তিত সীমিত সাম্যবাদের তুলনা কোথায়? কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় মানস ও জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হওয়ায় আমরা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানতে চাই না বা জানি না। পরিণামে অযথাই হীনমন্যতায় ভুগি।

সরল জীবনযাত্রাঃ

মদীনার ভাতের থালা, রুটির বর্তন এবং আবরু ঢাকার কাপড়ের সাম্য বর্তমান যুগে অবাস্তব নয়। একজন সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যানতো তার অর্ডারলির চার গুণ খেতে পারবে না, বরং পরিশ্রম বেশি করে বলে শ্রমিক বা মেহনতি মানুষেরাই বেশি খেতে পারে।

www.pathagar.com

একই প্রকার কাপড় সকলের পরাও অবাস্তব নয়। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং সাধারণ সিপাই বা মেজর জেনারেল এবং সাধারণ সৈনিক একই প্রকার কাপড় পরলে তাদের যোগ্যতার তারতম্য হয় বলে শোনা যায়নি।

আমাদের মতো গরিব দেশে সরল জীবনযাত্রা রাষ্ট্রীয় নীতি না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। সর্বপ্রথম বিলাসিতা হারাম না হলে পর্যাপ্ত অর্থ দেশের উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় করা যাবে না। বিদেশী ঋণ এবং খয়রাতের উপর নির্ভর করে দেশ উন্নত করা যায় না। মোজাইক ফ্লোর, কার্পেট, দামী স্যুট, দামী চশমা, ঘড়ি, সোনার অলংকার, বিলাস ভবন, বিবাহ শাদীতে বিরানী- কাবাবের ছড়াছড়ি- এগুলো না হলে কী আসে যায়? অথচ এ অর্থ উন্নয়ন কাজে ব্যয়িত হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

যাদের ধন সম্পদ আছে তাদেরকে যদি বলা হয় তোমরা হযরত উসমানের (রা) মতো চলো, সর্বপ্রকার বিলাসিতা নিষিদ্ধ করে আইন করা হয় এবং তার প্রয়োগ করা সেটাই হবে যুক্তিসঙ্গত। আর তার প্রয়োগ শুরু হতে হবে নেতা উপ-নেতা ও উচচ আমলাদের স্তর হতেই।

পূর্ণ কর্মসংস্থান নীতিঃ

ইসলামী বিধানমতে কোন মানুষেরই জীবনের একটি মুহূর্ত অযথা অপব্যয় করার অধিকার নেই। সকলকেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ অথবা আখিরাতের কল্যাণ- এ দুয়ের জন্যই সময় ব্যয় করতে হবে। বেকারত্বের মাধ্যমে সময়ের সবচেয়ে বেশি অপচয় হয়। এর হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে কে দেবে?

ইসলামী রাষ্ট্রে সকলকেই খেটে খেতে হবে। ব্যক্তি যদি স্বীয় চেষ্টায় কর্মসংস্থান করতে না পারে, সরকারকে অবশ্যই তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ব্যর্থতার জন্যে শুধু এ জগতে নয় পরকালেও ক্ষমতাসীনদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ অথবা আখিরাতের কল্যাণ- এ দুয়ের জন্যই সময় ব্যয় করতে হবে। বেকারত্বের মাধ্যমে সময়ের সবচেয়ে বেশি অপচয় হয়। এর হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে কে দেবে? সেইজন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগেই কর্মসংস্থান করতে হবে।

www.pathagar.com

ভূমি ব্যবস্থাঃ

ভূমি অন্যান্য সম্পদ অপেক্ষা আলাদা। কারণ এটা মানবের জৈবিক সর্বাধিক মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এক কোটি টাকা অব্যবহার্য রাখলে সমাজের যতটুকু ক্ষতি হয়, একশত একর জমি অনাবাদী রাখলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রাসাদ অব্যবহার্য থাকলে সমাজের তেমন কী আসে যায়? কিন্তু জমি অনাবাদী থাকলে বা জমিতে উৎপাদন ঠিকমত না হলে আদম সন্তান খাদ্য হতে বঞ্চিত হয়।

খাদ্যাভাবে জর্জরিত দেশে ঐ ভূমি ব্যবস্থাই ইসলাম সম্মত, যা ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের পরিপন্থি নয় এবং যে ব্যবস্থায় উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। যদি জমি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে রাখলে উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি হয়, তাই হবে ইসলামী নীতি। কিন্তু যদি জমি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকলে উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়, তবে রাষ্ট্র সে ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।

আমাদের দেশে দেখা গেছে, তিন একরের কম যে সমস্ত কৃষকের জমি এবং যারা নিজেরা লাঙ্গল কাঁধে নেয়, তাদের জমির উৎপাদনই বেশি। সে পরিপ্রেক্ষিতে জমি বড় কৃষকদের হাতে রাখা জুলুম।

চুক্তিবর্গা এবং নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে একসনা ইজারা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য না রেখে নির্দিষ্ট টাকা বা শস্যের বিনিময়ে চাষীকে জমি চাষ করতে দেয়া হয়। সে জমির শস্য খরায় পুড়ে গেল কি পাকা ধান ঘরে তোলার আগে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাতে কিছুই যায় আসে না। সুদ যে কারণে হারাম একই কারণে চুক্তিবর্গা বা জমির ইজারা হারাম। মালিকী মাযহাবে ভাগী বর্গা জায়েজ, কিন্তু হানাফী মাযহাবে সর্বপ্রকার ভাগী বর্গা হারাম। যেহেতু আমাদের দেশের অধিবাসীরা হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত, তাই এদেশে ভাগী বর্গাও নিষিদ্ধ হতে হবে।

রাসূল কারীম (স) সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোন জমি তিন বছর অনাবাদী রাখে সে জমিতে তার কোন অধিকার থাকে না। তাঁর এ হাদীস আইনে পরিণত হলে যারা জমি বছরের পর বছর অনাবাদী রেখে দিয়েছেন, তাতে তাদের কোনই অধিকার থাকবে না।

www.pathagar.com

শিক্ষাঃ

ইসলামী রাষ্ট্রে শিক্ষা অবশ্যই হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হতে হবে। কারণ জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে ফরজ। এ ফরজ আদায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই এর জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। এ ফরজ আদায়ে ব্যর্থ হলে শুধু ব্যক্তি নয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকেও আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হতে হবে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। এজন্য সরকারি অর্থ দিয়ে যেটা সম্ভব করার পর বাকি দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজের স্বেচছাশ্রম দিয়ে করা সম্ভব। এজন্য একটি আইন পাশই যথেষ্ট। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসাবে জনগণকে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। প্রত্যেক ধর্মে নৈতিকতা ও ভাল কাজের কথা বলা হয়েছে। মানুষের অকল্যাণ না করার কথা বলা হয়েছে। দায়িত্বশীল সৎ এবং সভ্য মানুষ হতে শিক্ষা দিয়েছে। তাই ধর্মীয় শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা উচিত।

যদি সরকার আইন পাস করে দেয় যে প্রতিটি শিক্ষিত লোককে নিজ ব্যয়ে বা নিজ তত্ত্বাবধানে বছরে অন্তত একটি লোককে শিক্ষা দিতে হবে তাতে তো তিন চার বছরের মধ্যেই নিরক্ষরতা দূর হয়ে যাওয়া সম্ভব। এ কাজ করতে পারে মজবুত এবং একমাত্র আদর্শবাদী সরকারই। ইসলামী রাষ্ট্রে তা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে।

সুদমুক্ত অর্থনীতিঃ

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত সৎ জীবনযাপন একরূপ অসম্ভব। যেমন ধরুন অনৈসলামিক রাষ্ট্রে সুদ ছাড়া চলাই যায় না। মাথা গোজবার একটু আশ্রয় নির্মাণের জন্যে টাকা দরকার হলে ব্যাংক হতে সুদে তা ধার করতে হবে। বৃহৎ ব্যবসা বাণিজ্য সুদী কারবার ছাড়া সম্ভব নয়। ঘর নাইবা বানাবেন, ব্যবসা নাইবা করলেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার মধ্যেও ঢোকে সুদ। আমরা কজন মানুষ এ পাপ হতে বেঁচে থাকতে পারি? কিন্তু আমরা কি সত্যিই এ পাপ করতে চাই?

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে সুদ-মুক্ত অর্থনীতি ব্যবস্থার মাধ্যমে। এককালে বলা হতো সুদ ছাড়া অর্থনীতি চলে না। এ ধারণাটা এ যুগে অচল। সুদ বিহীন ব্যাংক ভালোভাবে চলছে লিবিয়া এবং সৌদি আরবে। যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে সুদ বিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হতে পারে। আমাদের দেশেও ইসলামী ব্যাংক সুদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানসহ আজ মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি অমুসলিম বিশ্বেও ইসলামী ব্যাংকের শাখাগুলো সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থার মহান আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। বরং আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংক সবচেয়ে ভাল করছে এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইসলামী ব্যাংকের শাখাগুলি ভাল করছে। এখন অনইসলামী ব্যাংকগুলিও ইসলামী শাখা বা বুথ খুলে ব্যবসায় টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এছাড়া বীমা কোম্পানিগুলো ইসলামী হয়ে ভাল করায় অন্যান্য বীমা কোম্পানি ইসলামী শাখা খুলে বিশেষ ব্যবস্থায় ইসলামী কার্যক্রম চালু করে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। পাতিশিয়াল বুদ্ধিজীবীরা ইসলাম বললে নাক শিটকিয়ে ব্যাঙ্গ করে বলতো সেকেলে মতবাদ, এখন দেখছে এবং বলছে যে টিকে থাকতে হলে ইসলামী ব্যাংক ব্যাবস্থা চালু করার বিকল্প নেই।

বাক স্বাধীনতাঃ

বাকস্বাধীনতা খাদ্য বস্ত্রের ন্যায় মানুষের মৌলিক অধিকার। ক্ষমতার মসনদে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এই মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ সাধারণ অসাধারণ আমলার তো দূরের কথা, খোদ রাষ্ট্রপ্রধানেরও নেই।

বাক স্বাধীনতার নীতিমালা কায়েম করে গেছেন ন্যায়দর্শী খলীফা-চতুষ্টয়। হযরত আলীর নিকট কয়েক ব্যক্তিকে ধরে আনা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা এক জায়গায় বসে খলীফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। খলীফা তাদের ছেড়ে দিতে বললে কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানালো। খলীফা বললেন, তাদের ষড়যন্ত্র আলোচনার পর্যায়ে আছে। তা বাস্তবায়নের জন্যে পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করেনি, শুধু আলোচনার জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া বা আটকে রাখা যায় না। কর্মচারীরা জানালো যে, অপরাধ নিরোধের জন্যে তাদেরকে আটকে রাখা দরকার। হযরত আলী (রা) তাদের উপদেশ দিলেন খলীফার পাহারায় তাদেরকে আরও সতর্ক হতে।

www.pathagar.com

কা'ব (রা) নামে এক নবদীক্ষিত সাহাবী শিশুর ন্যায় সরল এবং ফেরেশতার ন্যায় নিস্পাপ মহান খলীফা হযরত উসমানকে (রা) বায়তুল মালের সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তার পরামর্শ দিচিছলেন। উপস্থিত ছিলেন তেজস্বী সাহাবী হযরত আবুজর গিফারী (রা)। তাঁর পরামর্শ বিপ্লবী সাহাবী আবুজর গিফারীর মনঃপুত হয়নি। তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁর প্রতিবাদে কা'ব নিবস্ত না হওয়ায় তিনি এতো রাগান্বিত হয়েছিলেন যে সাহাবী কাবকে (রা) ইয়াহুদী সন্তান বলে তিরস্কার করেন। এবং খলীফাকে ভুল পরামর্শ দেয়ার অপরাধে নিজেই হাতের আসা (লাঠি) তুলে মারতে শুরু করেন। সাহাবী কাব আশ্রয়ের জন্যে খলীফার পিছনে দাঁড়ান। হযরত আবুজর গিফারীর (রা) লাঠির আঘাতে শুধুমাত্র সাহাবী কাবের মাথা হতে ফিনকি দিয়ে রক্তই ঝরেনি, বরং বৃদ্ধ খলীফা হযরত উসমানের (রা) দেহেও কয়েক ঘা পড়েছিল। কিন্তু এ অপরাধের জন্যে আবুজর গিফারীকে (রা) জেলে যেতে হয়নি বা জবাবদিহিও করতে হয়নি।

অধিকন্তু খলীফাকেই জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়েছে। খিলাফতের যুগে বায়তুল মালের আহরিত সম্পদ খলীফা, সরকারি কর্মচারী, জনতা, নির্বিশেষে সমানভাবে বিতরিত হতো। একবার বায়তুল মালে কিছু কাপড় এসেছিল। সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হওয়ায় দেখা গেল ভাগে পাওয়া কাপড়ে কারও জোব্বা হয় না, হয় মাত্র ফতুয়াজাতীয় জামা। পরবর্তীতে জুমু'আয় হযরত উমরের (রা) গায়ে দেখা গেল ঐ কাপড়ের জোব্বা। আর যায় কোথায়। খুৎবা দিতে উঠার পর তাঁকে থামিয়ে দিল এক বেদুইন। এ ব্যাপারে খলীফার জবাব সন্তোষজনক হওয়ায় তাঁকে খুৎবা পাঠ করতে দেওয়া হয়েছিল। আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, সকলের ন্যায় খলীফা পুত্র আবদুল্লাহও একখণ্ড কাপড় পেয়েছিলেন। খলীফার জামার খন্ডতালি এবং একটি মাত্র জামা থাকায় পিতা-পুত্রের প্রাপ্ত দু'টুকরা একত্রিত করে খলীফা একটি জোব্বা তৈরি করেছিলেন।

কড়া কঠোর ও ন্যায়ানুগ শাসননীতিঃ

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কড়া ও কঠোর শাসননীতি। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, "আপনাদের কাছে যে সবচেয়ে

www.pathagar.com

দুর্বল, আমার কাছে সে হবে সবচেয়ে শক্তিশালী। কারণ তার যা অন্যের কাছে প্রাপ্য, তা আমি কড়ায় গন্ডায় আদায় করে দেব। আপনাদের কাছে যে সবচেয়ে শক্তিশালী; আমার কাছে সে হবে সবচেয়ে দুর্বল। কারণ তার যে দেয় আমি তা পূর্ণমাত্রায় আদায় করে নেব।" রাসূল (সা)- এর ওফাতের অব্যবহিত পরে সিরিয়ায় একটি অভিযান পাঠাবার পর মদীনা প্রায় বীর মুজাহিদ-শূন্য হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় আরবের সমস্ত ভণ্ডনবী একযোগে মদীনা আক্রমণ করে। অনেক আলাপ আলোচনার পর ভণ্ড নবীরা একমাত্র যাকাত ভিন্ন ইসলামের সকল আহকাম মেনে নিতে রাজী হয়।

একমাত্র হযরত ইবনে আব্বাস ভিন্ন মজলিসে শুরার সকলেই ঐ নাজুক পরিস্থিতিতে ভণ্ড নবীদের দাবি মেনে নিতে সম্মত হন। খলীফা তখন হযরত উমরকে (রা) তাঁর মত জিজ্ঞেস করেন। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নিতে রাজী হন। বৃদ্ধ খলীফা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরেছিলেন। কিন্তু উমরের (রা) মত শোনার পর তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে হযরত উমরের (রা) নিকট এসে তাঁর দাড়ি ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বললেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুমি ছিলে সাহসী আর আজ ইসলাম তোমাকে করে ফেলেছে কমজোর। আল্লাহ্‌র কসম! বিদ্রোহীরা যদি একটি খেজুরের রশি পরিমাণ যাকাত দিতেও অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্দে অবতীর্ণ হব। কারণ মৌলিক বিষয়ে কোন আপোষ হতে পারে না।

হযরত আবু বকরের (রা) আমলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অরাজকতা এবং বিশৃংখলার মানসিকতা ছিল না। হযরত উমরের (রা) আমলে তা করার কারও সাহস ছিল না। খলীফার চাবুকের ভয়ে অনিচছাকৃত ত্রুটি সম্বন্ধে সকল সাহাবী সন্ত্রস্ত থাকতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (সা)-এর অতি প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি সদা সর্বদা রাসূলের (সা) কাছেই পড়ে থাকতেন এবং ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস তিনিই বর্ণনা করেছেন। খলীফা উমর (রা) তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান।

ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খলীফা দেখেন যে হযরত আবু হুরায়রার (রা) উটের পিঠে বেশ কিছু মাল সামান এবং তাঁর পায়ে জুতা। কোন প্রশ্ন না করেই

www.pathagar.com

তিনি এমন সম্মানিত সাহাবীকে চাবুকাঘাত করতে শুরু করলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বুঝতেও পারেননি কেন তাঁর উপর এমন শাস্তি নেমে আসছে।

খলীফার ব্যবহারে প্রতিবাদ জানালে খলীফা প্রশ্ন করলেন, তাঁর উটের পিঠে এতো মাল সামান কোথা হতে এলো। হযরত আবু হুরায়রা (রা) জানালেন যে লোকজন তাকে ইয়েমেন ত্যাগকালে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছে। খলীফা বললেন, হাদিয়া নয়, এ হলো ঘুষ। কারণ যখন তিনি হযরত আবু হুরায়রাকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠান, তখন তাঁর পায়ে জুতা ছিল না। আজ তিনি জুতো পরিহিত। যদি লোকজন তাঁকে সত্যিকার হাদিয়া হিসেবেই দিত তবে কেন গভর্নর হওয়ার পূর্বে তাঁকে হাদিয়া দেয় নি যাতে জুতা পরতে পারতেন। খলীফা বুঝালেন তাঁকে যা হাদিয়া বলে দেয়া হয়েছে, তা তাঁর সরকারি ক্ষমতার জন্যই। হযরত আবু হুরায়রা (রা) সুক্ষ্ম ব্যাপারটি না বুঝার অক্ষমতাকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং খলীফাকে বলেন আপনি আমাকে আরো চাবুক মারুন। আমার দেহ রক্তাক্ত করে দিন, যাতে আমার পাপের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়।

হযরত মু'য়াবিয়া (রা) এর বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে হযরত আবুজর গিফারীর (রা) প্রতিবাদের জবাবে হযরত উসমান (রা) বলেছিলেন যে, মু'য়াবিয়াকে তো গভর্নর তিনি নিয়োগ করেননি, করেছিলেন হযরত উমর (রা)। তখন আবুজর গিফারী (রা) বলেছিলেন যে মু'য়াবিয়া (রা) হযরত উমরকে যতটুকু ভয় করত, হযরত উমরের উট-চালক তার শতাংশের একাংশ করতো না।

শাসন-নীতি কঠোর এবং কড়া না হলে সমাজে অরাজকতা ও উচছৃংখলতা বেড়ে যায়, জুলুম কায়েম হয়, মজলুমের আহাজারী সোজাসুজি আল্লাহর আরশে গিয়ে পৌছে। পরিণামে গোটা সমাজের উপর নেমে আসে নানা গজব। ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা আপাত দৃষ্টিতে ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর হলেও তাই প্রয়োজন। কারণ তাতে সমাজে ইনসাফ কায়েম থাকে। অপরাধ প্রবণতা কমে। এদেশে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। মজলুম বিচার পায় না। বিচার ব্যয়হীন এবং তাৎক্ষণিক না হলে বিচারের নামে হয় প্রহসন ও অবিচার।

ইসলামের শাসন-নীতির মূল ভিত্তিই হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। এ নীতি কায়েম নিচ থেকে নয়, উপর থেকে। আল্লাহ আল্-কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না বা হুকুম

www.pathagar.com

পরিচালনা করে না তারা ফাসেক এবং জালেম। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামী বিধান বহির্ভূত শাসন ও সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে আইন মেনে চলা কুফ্‌র, জুল্‌ম ও ফাসাদ সৃষ্টি করার সমতুল্য অপরাধ।

সেবা ও সততার নীতি বাস্তবায়নঃ

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের গুরুভার কাঁধে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ভাবতেন, তিনি কি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছেন? মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশ দিয়ে যান তাঁর জমি বিক্রি করে, তিনি খিলাফত হতে যে টাকা বেতন বাবদ গ্রহণ করেছিলেন, তা যেন সম্পূর্ণ ফেরত দেয়া হয়।

হযরত উমর (রা) গমের বোঝা কাঁধে নিয়ে অভাবী মানুষের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের অভাবের কথা শুনতে চাইতেন। এরূপ দায়িত্বশীল খলীফাও গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে বহন করছেন কিনা তা ভেবে শিশুর ন্যায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলতেন। বেদুঈনের স্ত্রীকে তাঁবুর মধ্যে সন্তান প্রসব করার সময় নিজের স্ত্রীকে ধাত্রী হিসাবে, সেবিকার ভূমিকায় নিয়োজিত করে সেবক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে গরীবের প্রতি খলিফার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির কি আর আছে?

রাসূল কারীম (সা) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে নৈতিকতা দায়িত্ববোধ কর্তব্যানুরাগ সৃষ্টি করতে সচেতন ছিলেন। তাঁর দরবারে লোকজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে বসে থাকতেন। যে কথা অন্যরা শুনেনি এমন নতুন কথা থাকলে তাঁরা মুখ খুলতেন। অন্যথায় চুপ করে থাকতেন। তাঁরা কাজ করতেন, ভাবতেন, শুনতেন বেশি, কথা বলতেন কম। বাইরে কোন আগন্তুক রাসূলের (সা) মজলিসে এসে আশ্চর্য হয়ে ভাবতো অতোগুলো লোক বসে আছে কিন্তু কথা বলছে না কেন। নবীর মাহফিল অনেক সময় বোবা মানুষের মাহফিল বলে মনে হতো।

বর্তমানকালের আমলা শাসক নেতাদের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য ঠিক উল্টো। তাঁরা কথা বলেন বেশি, কাজ করেন কম। তাঁরা ভুলে যান যে আল্লাহ জিহব দিয়েছেন একটি কিন্তু হাত পা কান দিয়েছেন দুটি করে, যাতে মানুষ শুনে বে এবং কাজ করে আরো বেশি।

www.pathagar.com

রবুবিয়াত বা প্রতিপালনের মনোভাব নিয়ে শাসন পরিচালনাঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এর রবুবিয়াত বা প্রতিপালনবাদী রূপ। ইসলামী রাষ্ট্র ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে যা আধুনিক রাষ্ট্র করে না। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রে প্রতিপালনের চেষ্টা কিছুটা করা হয়, কিন্তু তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বতন্ত্র সত্তা, মানব মর্যাদা থাকে না। সে প্রতিপালন খাঁচার মধ্যে পাখি পোষার মতো- খামারে পশু পালনের মতো যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে পশুকে জবাই করা যায়।

সকল নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। এটা শুধু কথার কথা, শুভ ইচছা বা নীতিবাক্য নয়, আল-কুরআনভিত্তিক অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। এর তাত্ত্বিক- ভিত্তি আল-কুরআন এবং বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে মদীনার ইসলামী খিলাফতে।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির জন্যে বিশ্বে অফুরন্ত সম্পদ ছড়িয়ে রেখেছেন যা মানুষ জন্মগত অধিকার হিসাবেই পাবে (সূরা ত্বা-হাঃ ১১৮-১৯) আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে তিনি আপন সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নন। কিন্তু তবু কেন দিকে দিকে অনাহারে হাহাকার দেখা যায়?

আল্লাহ শুধু বিশ্বে সম্পদ ছড়িয়েই রাখেন নি; এ সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন জীবন-বিধান। এ জীবন-বিধান লঙ্ঘন করে গুটি কয়েকের সীমাহীন লোভ-লালসা বলগাহীন ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক শোষণের রাজত্ব কায়েমের জন্যই মানবতার এই দুর্গতি।

মানুষের কাছে স্রষ্টার প্রথম পরিচয় ইলাহ বা আল্লাহ নামে, রব (প্রতিপালক) নামে। মানুষকে বলা হয়েছে "পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে"। "তোমার আল্লাহর নামে পড়"- বলা হয়নি।

'নুষের কাছে রব বা প্রতিপালকের নামে প্রথম পরিচয় দেয়াই তো স্বাভাবিক। 'ম তো মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। তারপরেই হবে আল্লাহর অস্তিত্বের আনুগত্য। আল্ কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহর নিরানব্বই নামের মধ্যে এ রব

www.pathagar.com

বা প্রতিপালক নামটিই সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত হয়েছে। কারও কারও মতে এটাই ইস্‌মে আযম।

কোনো শিশুকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না, কে তার মা। মাতৃস্তন-সুধা পান করতে করতেই সে বুঝতে পারে, কে তার মা। তেমনি সারা বিশ্বেও ছড়িয়ে রাখা আল্লাহর সম্পদ ভোগের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারবে তার স্রষ্টাকে।

যে শিশু তার মাতৃ-দুগ্ধ হতে বঞ্চিত, সে হয়ত তার মাকে মা বলে না-ও জানতে পারে। তেমনি পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বান্দাহকে তার হক হতে বঞ্চিত করে থাকে, তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর সৃষ্টি-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না হলে অথবা তার দেয়া সম্পদ গুটি কতক লোকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকলে লক্ষ লক্ষ লোকের দারিদ্র অনিবার্য। বর্তমান বিশ্বে হয়েছেও তাই।

আল্লাহ যে নিজেকে রব বা প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছেন, এ প্রতিপালনের দায়িত্ব কীভাবে পালিত হবে? এক কালে আল্লাহ ইয়াহুদীদের জন্যে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়ে দিতেন। তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন রাব্বুল 'আলামীনের রবুবিয়াতের বা প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রতিপালিত হবে তাঁর খলীফার মাধ্যমে। প্রতিটি মানুষই আল্লাহর খলীফা; তবে পরিবারের কর্তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিপালনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। যদিও প্রতিটি মানুষই আল্লাহর খলীফা, কিন্তু সকলকে খলীফা বলা হয় না। ইসলামী রাষ্ট্রে খলীফা বলা হয় রাষ্ট্রপ্রধানকে। কারণ, ব্যক্তি-খিলাফতের সামগ্রিক রূপ রাষ্ট্রীয় খিলাফত। রাষ্ট্রীয় খিলাফত জনগণের প্রতিপালন তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জনগণ যদি ব্যক্তিগত এবং স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন না মেটাতে পারে তবে রাষ্ট্রকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের বাস্তবায়নঃ

বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে আজকাল প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রভাবে নানা তন্ত্র- মন্ত্রের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বে অজ্ঞতার জন্য রাজনীতি-অসচেতন বহু পথহারা ব্যক্তি স্বীয় জীবনাদ বেহেশ্‌তি সৌন্দর্য-সুখ ও শান্তি-নিকেতন হতে বিচ্যুৎ। হন্যে হয়ে তারা শা

www.pathagar.com

সন্ধানে ঘুরে বেড়াচেছ। কিন্তু ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে হতাশা ও ব্যর্থতার দোযখ-যন্ত্রণায় ভুগছে।

কোন মুসলিম সন্তানের পক্ষে কি একই সঙ্গে ইসলামে বিশ্বাসী এবং অন্য ইজমে দীক্ষিত হওয়া সম্ভব?

ইসলাম অতীত ইহিহাসে বহুবার, বিশেষভাবে দু'বার দুটি বিশেষ ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমত, আব্বাসীয় সম্রাট মামুনের আমলে মু'তাজিলা ফিতনা। দ্বিতীয়ত, দিল্লীর সম্রাট আকবরের আমলে দীনে ইলাহী ফিতনা। আর বিংশ শতাব্দীর ফিতনা হলো গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ।

আল-কুরআন কোন আংশিক জীবন ব্যবস্থা দেয় নি। আল্লাহ ও রাসূলের (সা) উপর ঈমান রেখে কোন মুসলিম যদি শুধু সুষ্ঠু আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা মেনে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ দার্শনিক বা নেতার দর্শনকে গ্রহণ করে; তা পুরাপুরি শির্ক। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা বাতিল, যুগের অনুপযোগী এবং অন্য কোন পণ্ডিত যা বলেছেন তাই যুগোপযোগী এবং সঠিক পন্থা- এরূপ বিশ্বাস করার মানেই হলো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা এবং আল্লাহর বিধান অপেক্ষা অন্য বিধান শ্রেষ্ঠ মনে করা। এরূপ বিশ্বাস নিয়ে একজন কীভাবে মু'মিন থাকতে পারে? কখনও তা পারে না।

হযরত মুহাম্মদই (সা) এর জীবন আমাদের জন্য একমাত্র 'সুন্দরতম আদর্শ' বা জীবনাদর্শের বাস্তব রূপ। অন্য কোন বিশ্ব-প্রতিভাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আদর্শ হিসাবে বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আদর্শ মনে করে কীভাবে কিয়ামতের দিন তাঁর শাফা'আত কামনা করবে?

সংশয় ও দ্বিধার মধ্যে না থেকে, আসুন আমরা আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে ামাদের একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করি এবং সামাজিক, র্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদকে (সা) একমাত্র বাস্তব র্শ হিসেবে গ্রহণ করে সিরাতুল মুস্তাকিমে দৃঢ় থাকি। আল-কুরআনের পবিত্র ম যেনো আমাদের সকল মানবিক বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির বিপরীতে ধর্ম তথা -বিধানের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ঘোষণায় সাবধান বাণী হিসেবে কাজ করে যায়

www.pathagar.com

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।" এই বাণীতে বিশ্বাস স্থান করি।

আজকের এই আধুনিক যুগে তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির যুগে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থাই বিশ্বে শান্তি আনায়ন করতে পারে।

কোরআন ও হাদিসকে ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে অর্থাৎ জনগণের মতামত ও নেতার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জনকল্যাণ ও সৃষ্টির কল্যানের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে যুগ সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান দেওয়া একমাত্র ইসলামী জীবন বিধান দিয়েই সম্ভব অন্য কোন আদর্শ দিয়ে নয়। আসুন মহা বিজ্ঞানময় কোরআনকে বাস্তবায়িত করে বিশ্বের সন্ত্রাস দমন ও ভূলুণ্ঠিত মানবতা পুনরুদ্ধার করে ভূস্বর্গ রচনা করি। যেখানে থাকবেনা খুন, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ, শিশু ধর্ষন, অন্যের দেশ মিথ্যা অজুহাতে জবর দখল, মানব সভ্যতা বোম্বিং করে গুড়িয়ে দেওয়ার দানবী ঔদ্ধত্ত জাতি-ধর্ম-বর্ন- আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সব মানুষের প্রেম-প্রীতির এক মহা মিলনমেলা হবে বিশ্ব সমাজের একমাত্র আদর্শ। মহান সৃষ্টিকর্তার অতি প্রিয় সৃষ্টি এই মানুষ শুধু ধর্ম এবং বর্ণের কারণে কেউ কারো শত্রু হতে পারে না। মানুষ জন্মগত ভাবেই একজন আর এক জনের অতি আপন অতিপ্রিয়। আসুন ইসলামী রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষের একটি অস্থায়ী স্বর্গ রচনা করি।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়
ইজমার রাজনৈতিক ভূমিকা

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ইজমার প্রসঙ্গটি প্রথমত আসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। ইসলামে আইন প্রণয়ন একটি জটিল বিষয়। বস্তুতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নির্ধারণ করার মধ্যেই সমস্যাটি নিহিত। পারিভাষিক অর্থে সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় 'সমন্বয়ের সর্বশেষ স্থান বা কেন্দ্র' এবং 'শেষ কথা বলার কর্তৃপক্ষ' ইত্যাদি। বার্কারের মতে সাধারণ অর্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা জনমতের প্রাবল্য আর আলোচ্য ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব কথাটি এক নয়। এটা হচেছ বিশেষ এক ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যাকে বলা যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং অধিকার। অপরদিকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের দিক থেকে আইনের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ। যতগুলো বিষয় এর আওতায় আসে তার সবগুলো ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা বা এক্তিয়ার। এ দ্বারা কোন বিষয়ে যে কোন উপায়ে কাজ করার খামখেয়ালী ক্ষমতাকে বোঝায় না, এটা হচেছ কোন আইনগত বিষয় আইনসম্মত উপায়ে চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করার বৈধ ক্ষমতা। নিজে প্রকৃতিগতভাবে বৈধ বিধায় যে সকল ক্ষেত্রে আইনগত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই সে সকল ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্বকে সম্প্রসারণ করে না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ইসলামের একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় হলো সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে। ইসলামের উৎকর্ষ যুগের আকর সাহিত্য সমূহে এই প্রত্যয়কে অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী আইন সম্পর্কীয় তত্ত্বসমূহে এই ধারণার ভিত্তি পাওয়া যায়। কুরআন হচেছ আইনের প্রধান উৎস। অন্য তিনটি উৎস যথাক্রমে সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস ঐশী মর্যাদায় অভিষিক্ত। সুন্নাহ বলতে হাদীসকেই বোঝানো হতো, যাকে বলা হতো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর নাযিলকৃত অপ্রকাশ্য ওহী। সুপরিচিত হাদীস অনুসারে ইজমাকে মনে করা হয় অভ্রান্ত। কিয়াস যেহেতু উপরিউক্ত উৎসসমূহের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে সেহেতু এটাকেও পরোক্ষভাবে অভ্রান্তরূপে গণ্য করা হয়। আইনের এই উৎসসমূহের মূলে যে পদ্ধতি ক্রিয়াশীল তা হচেছ ওহীর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ- আইনের একমাত্র উৎস, যা সন্দেহাতীতভাবে অভ্রান্ত উৎস হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্যই নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর উর্ধ্বে- এই ধারণার ফলশ্রুতি। এ কারণে ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হিসাবে, যা মুসলমানদের জীবনে সর্বব্যাপী এবং সকল কাজ-কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে। আল-আহকামুল খামসাহ অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধান হচেছ আল্লাহ তা'আলা যে সর্বশক্তিমান সে ধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। ধর্ম-দর্শন বিশেষ করে আইন শাস্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে আইনের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা যে সবকিছুর উর্ধ্বে- এই ধারণাও বিকাশ লাভ করে। খিলাফতের ধারণার মধ্যেও এই তত্ত্বের কম-বেশি প্রতিফলন দেখা যায়।

আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে সার্বভৌমত্বকে- সর্বোচচ সার্বভৌমত্ব এবং প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্ব এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব হলো সংবিধান এবং প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্ব হলো আইন পরিষদ। ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বেও এ বিষয়টি অনুরূপ। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলা এর অর্থে সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মানুষের তৈরি কোন আইন কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তথা আল্লাহ তা'আলার বাণীর পরিপন্থী হতে পারবে না। কুরআন এখানে জনগণের ইচ্ছার উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। কুরআন এখানে মূল্যবোধ ও চেতনার ক্ষেত্রে সংবিধানের ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় যে কুরআন বা আল্লাহ তা'আলা সরাসরি আইন প্রণয়ন করে দিচেছন না। জনগণই আইন প্রণয়ন করছে। সুতরাং ব্যাপকার্থে প্রত্যক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে উম্মাহ্র কাছে। তবে আল্লাহ্র আইনের আলোকে যেহেতু সমগ্র জাতি একত্রে আইন প্রণেতার ভূমিকা পালন করতে পারে না সেহেতু উম্মাহ্র পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন শেষ পর্যন্ত ব্যাপকার্থে জনমত দ্বারা গৃহীত আইন যা কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামের জনকল্যাণ মূলোক আদর্শকে সামনে রেখে যা প্রণীত আইন তারই প্রয়োগ হচেছ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই উম্মাহ্ কর্তৃক গৃহীত ইজমা হিসেবে পরিচিত।

ইসলামে আইনের মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আইন কি "আল্লাহ তা'আলার নাজিলকৃত হুকুম, আল্লাহ তা'আলার ইচছা ও ধারাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত, যা মুসলিম সরকারের ইচছানুসারে বিন্যস্তকৃত বা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং মুসলিম সমাজ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়"- এরূপ কিছু নাকি পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া বিকাশমান একটি ব্যবস্থা। ইসলামী

www.pathagar.com

আইন তত্ত্বের চিরায়ত উৎকর্ষের যুগের আকর গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, ফিকাহ সাহিত্যে পূর্ব থেকেই ইসলামী আইন সুবিন্যস্তরূপে রয়েছে। সমস্যার প্রতি এরূপ গোঁড়া এবং জড় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আইনের আধুনিক মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আর এই বিরোধের ফলেই ইজমা সম্পর্কিত ধারণায় আধুনিকতাবাদের উদ্ভব হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আধুনিকতা পন্থীগণ এই মতের প্রবক্তা। শরী'আহ আইনের এই স্থবিরতার কারণে বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম দেশে আইনের উৎকর্ষ যুগের (Classical) তত্ত্বানুসারীদের সাথে আধুনিকতাপন্থীদের চরম বিরোধ চলছে। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এই প্রতিক্রিয়া এতোই চরম রূপ ধারণ করেছে যে তারা শুধু ফিকাহ্ অথবা রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ নয়, এমনকি কুরআনকেও কঠোর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের আওতায় আনতে চান- অথচ কুরআন হচেছ ইসলামী আইনের প্রধানতম উৎস। আইনের সংস্কারের প্রতি উগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, কারণ চরমপন্থার পরিণতি চরমপন্থাই হয়ে থাকে। অথচ উগ্রপন্থা সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। অন্য একটা সমাধান এই হতে পারে যে, ইসলামের শিক্ষাসমূহকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেমন- পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয়- যা আসলে অবাস্তব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সুস্পষ্টভাবে এই বিভাজন কে করে দেবেন। এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো প্রায় নিশ্চিতভাবে উপরোক্ত দুটি শ্রেণীর আওতায়ই পড়বে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের কুরআন ও সুন্নী অপরিবর্তীত থাকবে পরিবর্তনশীল হচেছ ইজমা এবং কিয়াস। রোজ কেয়ামাত পর্যন্ত ইসলামী বিধানকে যুগোপযোগী করে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক দেশ অঞ্চল ও যুগের প্রয়োজনকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এবং মজলিসে শুরার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। যেমন কোন ডাক্তারের সামনে রোগীর প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এরপরই ডাক্তার রোগীর দেহের রোগ সম্বন্ধে সম্যক ধারনা করতে পারেন এবং ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে পারেন যা দিয়ে রোগীর দেহের রোগ নিরাময় হতে পারে। তেমনি সমস্যাগুলি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এবং পরামর্শ সভার সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তারা কুরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতি আদর্শ ঠিক রেখে যুগ সমস্যার সমাধানের জন্য বিষয় ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং তা বাস্তবায়ন করলে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। যে কার বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসের মৌলিক বিষয়ে যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে তা ঠিক থাকবে কিন্তু আজকের দিনের আনুবিক অস্ত্র রকেট জঙ্গি বিমান, কম্পিউটার

www.pathagar.com

ইমেইল, মোবাইল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী নীতি, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভূমিকা আফগানিস্তানে তাদের বিনা অপরাধে আক্রমন ও দখল, ইরাকে হামলা ও দখল, ফিলিস্তিন লেবানন ইরান বসনিয়া কসভো, চেচনিয়া কাশ্মীরের কথা ফেকাহ শাস্ত্রের লেখক ইমামদের সময় হয়নি। এ বিষয় গুলিতে ফেকাহ্-র ইমামদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে বাস্তবতার আলোকে আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের প্রয়োজন হলে বিকশিত ও যুগোপযোগি করে নিতে হবে। (প্রয়োজন না হলে নয়) এই হচেছ ফেকার বিষয় সিদ্ধান্ত। আর বাকি রোজ কেয়ামত পর্যন্ত কোরআন সুন্না ঠিক রেখে ইজমা এবং কিয়াসের মাধ্যমে যুগ সমস্যার সমাধান করে ইসলামী রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকবে। এ পদ্ধতি বলবত থাকবে, রোজ কেয়ামাত পর্যন্ত।

কুরআন নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক এক ইসলামী সমাজ গড়তে ও আইনের কঠোর প্রয়োগ ভিত্তিক সমাজ গড়তে চায়। ইসলাম একদিকে মানবিক গুনাবলির বিকাশ সাধন করে একটি মানুষকে সর্বগুণে গুণান্বিত করতে চায় পাশাপাশি চরিত্রের স্খলনী ঘটলে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে দিয়ে একটি সভ্য সমাজ উপহার দিতে চায়। কোরআনে নৈতিকতার উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশী।

খোলাফায়ে রাশেদুনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁরা জনমতের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। প্রাথমিক যুগের এই খলীফাগণ সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা জ্ঞানী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বলা হয়ে থাকে যে, আবু বকর (রা) মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে উমর (রা)-কে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন নি। তিনি এটা এজন্য করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সুক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও ভাল মতামত দিতে সক্ষম এমন একজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। একবার তাঁকে কিছু আইনগত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল যা তাঁর জানা ছিল না। তিনি এ ব্যাপারে লোকদেরকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করতে কোন দ্বিধা করেননি। প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, খোলাফায়ে রাশেদুন কোন বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে জুমার খুতবাকালে এবং হজ্জের সমাবেশে জনগণের সাথে মতবিনিময় করতেন। জানা যায় তাঁরা কোন এলাকা জয়ের নিমিত্ত সেনাবাহিনী প্রেরণকালে মুসলমানদের সাথে আলোচনা করতেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানে জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সমালোচনা করার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল খোলাফায়ে রাশেদুনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

ইরাকের (বিজিত) ভূমি সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণের প্রশ্নে উমর (রা) কর্তৃক জনগণের সাথে সরাসরি আলোচনা করা একটি সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা। জানা যায় যে, কয়েক দিন ধরে ঐ প্রাণবন্ত আলোচনা চলেছিল। যেহেতু উমর (রা) এভাবে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে দূরে সরে এসেছিলেন সেজন্য তাঁকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যাই হোক যেহেতু উম্মাহ্র সকলের সাথে যখন তখন ব্যাপক মত বিনিময় করা সম্ভব ছিল না তাই প্রথম যুগের খলীফাগণ সাধারণত বিশ্বস্ত ও যোগ্য লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। সে সময়ে এই পরিষদকে বলা হতো আহলে শুরা এবং মধ্য যুগে যা পরিচিত ছিল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' নামে।

খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগে শুরা কাউন্সিল আইন প্রণয়নকারী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা উম্মাহ্র প্রতিনিধিত্ব করতেন, যদিও কোন আনুষ্ঠানিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদেরকে নেয়া হতো না। কিন্তু তাদের উপর সমগ্র জনগণের পূর্ণ আস্থা ছিল। যেহেতু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছিল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কেন্দ্রিক। সেহেতু তাঁর প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কেরামই ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। তাই নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না। মানুষ শুধু লক্ষ করতো রাসুল (সঃ) কাকে বেশি বিশ্বাসী বা আস্থাভাজন করেন। এ ব্যাপারে হুজুরের মুখের কথা এবং চোখের ইশারা-ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। এ ব্যাপারে ব্যালট বা হাত তুলে সমর্থনও ছিল বেয়াদবীমূলক কাজ। তাই তখনকার অবস্থা আর বর্তমানের অবস্থা এক বানিয়ে ফেললে ভুল হবে। সেদিন বিনা নির্বাচনেই রাসূল (সঃ)-এর চোখের ইশারাই যথেষ্ট ছিল তাই রাসূল (সঃ) এর আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই মুসলিম উম্মাহ্র বৈধ প্রতিনিধি ছিলেন এবং মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তবে আজকের পৃথিবীতে অবশ্যই নির্বাচনের প্রয়োজন আছে আর তা হতে হবে ইসলামী মূল্যবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী জনগণের ভোটের মাধ্যমে। তা না হলে শীত কালের মাসালা গরম কালে দেওয়ার মত হবে। এই প্রক্রিয়া হচেছ প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার পূর্বসূরী। এ থেকে যে কেউ সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে, প্রথম যুগের খিলাফত ব্যবস্থা ছিল জনগণের সরকার। কারণ খলীফাগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সাথে সরাসরি কিংবা তাদের প্রতিনিধিগণের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতকে জনগণের সরকার বলা যেতে পারে যে, তারা নির্বাচিত হতেন জনসাধারণের সম্মতি অনুসারে রাসূল (সঃ) এর আস্থাভাজন হিসাবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শুরার সদস্যগণ উম্মাহ্র প্রতিনিধিত্ব করতেন কি না? এই পরিষদের সদস্যগণ

www.pathagar.com

স্পষ্টতই যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত হতেন কিন্তু মনোনয়নের এই প্রক্রিয়া আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার হুবহু অনুরূপ ছিল না। সাধারণ জনমতের বাইরেও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর আরেকটি প্রভাবশালী মতামত থাকে। এই প্রভাবশালী মতের প্রতিনিধিত্ব করে কোন একটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এর পরিচালকগণ, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকার এবং সমাজের প্রেসার গ্রুপ বা প্রভাবশালী দল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের প্রতি খলীফাগণের অবশ্যই আস্থা ছিল এবং তাদের সাথে সময়ে সময়ে পরামর্শ করা হতো। জানা যায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে আবু বকর (রা) মুহাজির ও আনসারগণকে বিশেষ করে উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা) আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), মু'আয বিন জাবাল (রা), উবাই বিন কা'ব (রা), যায়দ বিন ছাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবীগণকে পরামর্শের জন্য আহবান করতেন। আবু বকর (রা)- এর খিলাফতকালে এরা আইনগত প্রশ্নে রায় প্রদান করতেন এবং জনসাধারণ তাঁদের দেয়া আইন বিষয়ক মতামতের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করতো। এগুলোকে বলা হতো 'পরামর্শ সভা' এবং 'রায় প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ', অন্য কথায় 'আহলুর রায়' এবং 'আহলুল ফিকহ'। আবু বকর (রা) এর খিলাফতকালে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে উমর (রা) কর্তৃক আপত্তি জানানোর বিষয়টি একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা। একটি বিবরণ মতে জানা যায় যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিজ্ঞ লোকদের (কুররা) নিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এতে প্রবীণদের পাশাপাশি যুবক বয়সের লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগে পণ্ডিতবর্গ ও জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা সাধারণ রেওয়াজ ছিল। তবে খিলাফত ব্যবস্থার যে মূল সূর সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি, তা থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলীফা চূড়ান্ত মত প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন, যদিও তিনি পরামর্শ সভার মতামত গ্রহণ করতেন। পরামর্শদাতাগণের মতামত গ্রহণ করা তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল না। এক অর্থে এই পদ্ধতিতে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্য ছিল জনমত সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল খলীফার হাতে। সাধারণত তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুসরণ করতেন।

পবিত্র কোরআনে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আমীরকে (উলীল আম'রি) মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) যাঁকে রাসূল (সা) মদীনার বাইরে কোন স্থানে একটি বাহিনীর প্রধান করে প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছিলেন, তাঁর সাথে আম্মার বিন ইয়াসিন (রা)- এর মধ্যে ঝগড়া কালে আয়াতটি নাযিল হয়। আমীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তফসীরকারগণ বিভিন্নস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে এর অর্থ হচেছ 'নেতা', 'জিহাদের সেনাপতি', 'আলিম' ও 'বিচারকগণ', 'রাসূল (সা)- এর সাহাবীগণ', 'আবু বকর (রা)', 'উমর (রা)' এবং 'সুলতান'। আল তাবারীর মতে এর সঠিক অর্থ হচেছ 'শাসক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ'। কারণ বেশ কয়েকটি সহীহ্ হাদীস অনুসারে রাসূল (সা) বলেছেন যে, 'রাজনৈতিক নেতৃত্ব (আইম্মাহ্) তথা শাসকদেরকে মান্য কর।" লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 'উলীল আমর' শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বা শাসকদেরকে বোঝায় না। কারণ পবিত্র কুরআনে একই পরিভাষা অন্য প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে আলোচ্য পরিভাষা দ্বারা সর্বোচ্চ প্রতিভা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণকে বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যারা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। পরন্তু রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় রাসূল (সা) নিজে ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক বা শাসন কর্তৃপক্ষ ছিলেন না, যার কথা কুরআন উল্লেখ করতে পারে। যাই হোক, আলোচ্য পরিভাষা দ্বারা শাসক ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর সুযোগ আছে। আলোচ্য আয়াতখানা মুসলিম রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ কর্তৃক মূল কর্তৃত্ব তথা শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের গুরূত্ব বোঝানোর জন্য বহুলভাবে উদ্ধৃত হয়েছে- যদিও সে শাসক জোর করে ক্ষমতা দখলকারী কিংবা স্বৈরশাসক হয়ে থাকে। তবে কোন শাসক যদি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) এর আদর্শের পরিপন্থি কোন হুকুম দেয় তবে তা মান্য করা যাবে না বরং তার প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও উৎখাত করতে হবে।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়
ইসলামী আইনে মানবিক অবদান

ইসলামী আইনের উৎস এবং বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে, ইসলামী আইনকে যেমন ঐশী আইন (ওহী) তেমনি মানবিক আইন (ফিক্‌হ), উভয়ই বলা সঙ্গত মনে হয়। এ দুটো পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ওহী মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, ওহী তাই জ্ঞানের পরিপূরক। মানুষের জ্ঞান সীমিত, ঐশীজ্ঞান মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। ঐশিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে চলার পথকে আলোকিত করেছে। যারজন্য মানুষ পাচেছ সঠিক পথের দিশা।

ব্যক্তিগত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিপাল্য যাবতীয় ইসলামী আইনের নাম এক কথায় শরীয়ত। শরীয়তের মর্মার্থ বিশদভাবে জানা বা উপলব্ধি (ফিক্‌হ) করাই ইসলামী আইন তাত্ত্বিকগণের (ফকীহ্) লক্ষ্য। কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে বা কোন্ কোন্ উৎস (উসূল) থেকে সেই উপলব্ধি বা জ্ঞান আহরণ করা যাবে তা নির্ধারণ করাই তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। ফলে ইসলামী আইনতত্ত্বকে 'উসূলে ফিকহ্ বা ধর্মীয় জ্ঞান বোধের উৎস এবং নীতি বলা হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীনের ওহীই সেই জ্ঞানবোধের আদি উৎস। রক্ষণশীল মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সা) কাছে যে পবিত্র বাণী পাঠিয়েছেন জ্ঞানের ও বোধের উৎস শুধু সেই বাণী বা ওহী। ওহীর দুটি রূপঃ এক. কুরআনের আয়াতরূপে আল্লাহ্‌র অকাট্য বাণী; দুই. মুসলমান জাতির একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ নেতা হিসেবে হযরতের আচরণ, কার্যকলাপ ও বিচার-সিদ্ধান্তের সমষ্টি। এসব বিধানকে এক কথায় সুন্নাহ্ বলা হয়। সুতরাং ওহী এবং সুন্নাহ্ই হচেছ, সকল জ্ঞানের উৎস।

মানুষের জীবনে বা সমাজে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, ফকীহ ও আলিমবৃন্দ তার সমাধান দিয়েছেন, তাঁরা আইনের কিতাবও লিখেছেন, এই সব আইনের কিতাবে যত কথা আছে তার সবই কুরআন বা সুন্নায় পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে আল কুরআন ও সুন্নায় যে সব নির্দেশ আছে, তার মধ্যে ইসলামী আইন সম্ভারের খুটিনাটি নেই, তবে মোটামুটিভাবে সমগ্র ইসলামী আইনের মূল কাঠামো সেখানেই বর্তমান। ওহীর মধ্যে যেসব সমস্যার

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট সমাধান ছিল না, প্রথম দেড় শতকের মধ্যে ইসলামী আইনতাত্ত্বিকগণ সেসব ক্ষেত্রে আইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যাকালে প্রায় অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। সেসময় কুরআন ও সুন্নাহর সর্বজনমান্য আদেশগুলোকে তখনকার সমাজের প্রচলিত প্রথা বা দেশাচারের সংশোধনী হিসেবেই কেবল মেনে চলা হত।

সেদিনের আইনতাত্ত্বিকগণ মনে করতেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওহীতে যে নির্দেশ আছে তাতেই তারা বাধ্য, এর বাইরে তাদের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। কোন প্রশ্ন উঠলে ওহীর নির্দেশের অনুপস্থিতিতে তাঁরা তাঁদের বিবেক অনুযায়ী সমাধান দিতেন। তাঁরা আরও মনে করতেন, ওহী প্রচলিত আইনকে সংশোধন করে সাধারণভাবে নতুন কিছু দেয় না।

কোনো বিশেষ বিষয়ে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত আদেশে বাতিল ঘোষণা করা না হয়ে থাকলে, সেই রীতিনীতি সেকালে সাধারণের চোখে আইনের মর্যাদা পেত। নতুন পরিস্থিতিতে যখন কোন বিশেষ সমস্যা দেখা দিত তখন ফকীহ্ বা বিচারকের বিবেচনায় যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হত, সেভাবেই তার সমাধানের নির্দেশ দেয়া হত।

নিজস্ব বিবেচনায় শরীয়তের যে কোনো নির্দেশকে প্রাসঙ্গিক মনে করে তার ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের আপন মতামত (রায়) প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এক কথায় সেই প্রাথমিক যুগে ইসলামী আইনের ভিত্তি ছিল দুটিঃ সমস্ত আইন-কানুন ছিল তাঁর ঐশী প্রত্যাদেশ আর মানবিক সিদ্ধান্তের যোগফল। এক্ষেত্রে কুরআন হাদিস ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রণীত হত।

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়
ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ভূল ধারণা দূর করা দরকার। অনেকের ধারণা ইসলামী অর্থনীতি মানে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে আরব দেশে যে অর্থ ব্যবস্থা চালু ছিল তার পুনরুজ্জীবন করা। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়, যারা ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করতে চান তারা কোনো বিগত দিনের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান না। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা আধুনিকই মনে হবে এবং সে ব্যবস্থায় আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) ও সাংগঠনের (Methods of Organisation) নিয়মই অবলম্বন করা হবে। একথা মনে করা ভুল হবে যে, উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি বিদ্যা কোনো বিশেষ আদর্শের উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে যে কোন অর্থনীতিতেই এসব উদ্ভাবন ও পদ্ধতিকে সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আদর্শিক অর্থব্যবস্থা বলতে কী বুঝায় বা ইসলামী অর্থনীতি বলতেই আমরা কী বুঝতে চাই তাও পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে বলে থাকেন, ইসলামের কোনো অর্থব্যবস্থা নেই এবং একটি চিরন্তন নৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকাও উচিত নয়। যদি ব্যবস্থা (System) বলতে অর্থনীতির প্রতিটি দিকের ব্যাপারে বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলি বুঝানো হয় তাহলে, অবশ্য বলা যেতে পারে যে, ইসলামে কোনো অর্থব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যবস্থা (System) বলতে কতকগুলো মূলনীতি ও মূল্যবোধও বুঝানো যেতে পারে যা একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করে থাকে। মূলনীতি বা মূল্যবোধের দৃষ্টিতেই অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতাকে (Laissez-faire) পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ও সামাজিক মালিকানাকে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়েছে। ইসলামে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ থেকে অনেক বেশি বিস্তারিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলি রয়েছে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকতে পারে না বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইসলামী অর্থনীতির ইসলামিত্ব (Islamicness) হচেছ তার মূল্যবোধ এবং সে সবের প্রয়োগ নীতিতে। অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রধান

www.pathagar.com

ইসলামী মূলনীতি হচেছ সুদ নিষিদ্ধ হওয়া, সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের দুঃস্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা (যাকাত), ব্যবসা করা ও জীবিকা অনুসন্ধানের অধিকার।

অর্থ ও সম্পদের জমাকরণের (Concentration) বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব (ইসলামের মীরাসী ব্যবস্থা) এবং অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির প্রতিরোধ ('আমরু বিল মা'রুফ-ও নাহী 'আনিল মুনকার)। আমরা পরে দেখতে পাব যে, ইসলামী রাষ্ট্র নাহী 'আনিল মুনকার (দুর্নীতির প্রতিরোধ) এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমকালীন সব অর্থনৈতিক জুলুম ও অনাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

এ- প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় পরিস্কার করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, কোন সমস্যার কেবল একটিই ইসলামী সমাধান হতে পারে কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে একই সমস্যায় বিভিন্ন ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র একই সমস্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারে। কোন লেখকের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতির বিধান (Details) রচনা করে সেটিকে একমাত্র মডেল বা সে বিষয়ে চূড়ান্ত কথা মনে করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক দাবি। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ থেকে পাওয়া বিধানের অতিরিক্ত বিশদ বিধান তৈরি করার জন্য লেখকরা যে ইজতিহাদ করবেন তাতে ব্যাপক মতপার্থক্য হতে পারে। সুতরাং গত হাজার বছরের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ মডেল তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য তৈরি থাকতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে এসব মতপার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার মধ্যে ভূমি-সংস্কার, অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা, সুদবিহীন অর্থনীতির সঠিক মডেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুদ যে নিষিদ্ধ এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য থাকতে পারে না, কেননা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারাই তা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগের জটিল অর্থনৈতিক সম্পর্কাদি সামনে রেখে কীভাবে একটি সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে। কেউ হয়তো বর্তমান ব্যবস্থাকেই সংস্কার করে রাখতে চাইবেন, অন্যরা হয়তো বর্তমান ব্যবস্থাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যভাবে নতুন পদ্ধতিতে বর্তমান ব্যাংকের কাজগুলো করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করবেন। ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব মতপার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ঐক্যের গুরুত্ব লাঘব করা নয়। তবে ঐক্য ও সমঝোতা কেবল পরেই আসতে পারে, পূর্বে নয়।

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দেখা দরকার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব কী? ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাবান করা হলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, সুনীতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুর্নীতির প্রতিরোধ করে' (কুরআন ২২ঃ৪১)। সুনীতির প্রতিষ্ঠা করা ও দুর্নীতির প্রতিরোধ করা ইসলামী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুনীতি ও দুর্নীতি শব্দ দুটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক. সব ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমরু বিল মা'রুফ-এর সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং নাহি 'আনিল মুনকার-এর অর্থ হবে অর্থনৈতিক জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে দান করা হয়েছে। অবশ্য কী ধরনের অর্থনৈতিক পন্থা ও উপায়কে জুলুম গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উপর। পার্লামেন্টের এ ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে খর্ব করা যাবে না। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মজুদদারী, কার্টেল, মনোপলি, চোরাচালান ও অন্য সব অন্যায় অর্থনৈতিক পন্থা বন্ধ করে দিতে পারে। এসব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আইন তৈরি করা সরকারের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তেমনিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিলে ইসলামী সরকার এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, জাতীয় সম্পদকে বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা, মূল শিল্পগুলো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গড়ে তোলা, আকাশ ও পানি দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইন রচনা করতে পারেন। এ ক্ষমতাবলে ইসলামী সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য যাকাত, খারাজ ও উশরের অতিরিক্ত কর ও শুল্ক ধার্য করতে পারেন।

www.pathagar.com

অন্যদিক থেকে বিচার করলেও আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে একই সিদ্ধান্তে পোঁছাতে পারব। ইসলামী আইন রচনার তিনটি ভিত্তি হচেছ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ। ইজতিহাদ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিয়াস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত হচেছ ইজতিহাদের অন্যতম পদ্ধতি (systematic inference)। ইজতিহাদের অন্য উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচেছ 'ইসতিহসান' বা 'ইসতিসলাহ' অর্থাৎ, আইনের এমন ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা যাতে জনগণের মঙ্গল ও সুবিধা হয়। এখন দেখা যেতে পারে যে শরী'আতে কেন সুদ ও জুয়াকে হারাম করা হলো, কেন যাকাতকে ফরজ করা হোল এবং কেনই বা অর্থ যাতে ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হলো? স্পষ্টতই আল্লাহ তা'য়ালা সুদ ও জুয়াকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেই নিষিদ্ধ করেছেন। সুদ হচেছ সমাজে শোষণমূলোক পদ্ধতির প্রবর্তন ও জনগনের রক্ত ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে ধনিদের এবং সরকারের কোষাগার পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা। তেমনিভাবে যাকাতকে সমাজের জন্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কল্যাণকর হওয়ার কারণেই ফরজ করা হয়েছে। যাকাত হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে অর্থশালী ও বিত্তশালী মানুষ তার অর্থবিত্তের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে একদিকে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র অভাবী এতিম মিসকিনদের আর্থিক সাহায্য সহায়তার মাধ্যমে তাদের অভাব দূর করতে পারায় সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরিভূত হয়ে সুসম অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অর্থ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন আর মানুষ তার অর্থের হক আদায় করে এর মাধ্যমে পরীক্ষায় পাস করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এ থেকেই স্পষ্ট কিয়াস করা যায় যে, ক্ষতিকর অর্থনৈতিক নিয়ম ও পন্থাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর অর্থনৈতিক পন্থাকে পছন্দ করেন। কাজেই কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় যে, সমাজ ও ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হচেছ ক্ষতিকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎখাত করা এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

শরী'আত ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের মত নিচে উল্লেখ করা হলোঃ আল্লাহ তা'য়ালার নবী পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যা হচেছ গোটা সৃষ্টির কল্যানের জন্য মূলনীতি। যখনই এবং যেভাবেই একটি বিষয় উপলব্ধি করা যাক বা স্থিরীকৃত হোক তাতে ইসলামী আইনের একটি বিষয় প্রমাণিত হয়। আল্লাহর নাযিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ সবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচেছ সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। যেভাবেই আইন রচনা করা হোক না কেন, আইনকে সত্য ও ইনসাফের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আইনের আসল লক্ষ্য কীভাবে আইন পাওয়া গেল তা নয় আইন কতটুকু কল্যানের নিশ্চয়তা দিল এটিই মৌলিক বিষয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদের কিছু আইন দিয়ে কতকগুলো উদাহরণ স্থাপন করেছেন এবং আইনের কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি দিয়েছেন। আমরা তাই ন্যায়সঙ্গত নীতি ও আইনকে শরী'আতের অংশ মনে করি- শরী'আতের বরখেলাফ হওয়া মনে করি না। এ সবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার, আসলে এগুলো শরী'আতেরই অংশ, তবে শর্ত এই যে, এগুলি ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। "ইলম আল মুয়াক্কিস, ৩য় খন্ড ৩০৯-৩১১ পৃষ্ঠা, নাজাত উল্লাহ সিদ্দিকী কর্তৃক Some Aspects of Islamic Economy-তে উদ্ধৃত।" এই উদ্ধৃতিটি বর্তমানকালে ইসলামী আইন রচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি করা আইনের ধর্মীয় প্রকৃতি এ থেকে স্পষ্ট হয়।

আরো একদিক থেকে আমরা ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারি। শরী'আতের পরিভাষায় ফরজে কেফায়া বলা হয় সেসব সামাজিক ফরজকে যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়, কিন্তু যা সমাজকে অবশ্য করতে হয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাতিবি লিখেছেনঃ "ফরজে কেফায়ার" অর্থ এগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়, এগুলো গোটা সমাজের দায়িত্ব। এর উদ্দেশ্য হচেছ সব সাধারণ জনকল্যাণকর কাজগুলো অব্যাহত থাকার ব্যবস্থা করা যার অবর্তমানে ব্যক্তিস্বার্থও নিরাপদ থাকে না। এগুলো পূর্ব উল্লেখিত ব্যক্তিগত ফরজগুলোকে পূর্ণ ও শক্তিশালী করে। কাজেই এগুলো অত্যন্ত জরুরি কাজ। ফরজে কেফায়াগুলি সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এজন্যই এসব দায়িত্ব ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় নাই, কারণ তাহলে এগুলো ব্যক্তিগত ফরজে পরিণত হতো। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের সব দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও সাধারণ মানুষের বিষয় অনেক বড় ব্যাপার।

www.pathagar.com

সে জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দায়িত্ব সমাজের উপর অর্পণ করেছেন। এটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ভিত্তি। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মানব কল্যান ও সৃষ্টির কল্যাণ সাধনই হচেছ আসল কথা।

(আল মুয়াফিকাত ফি উসুলিশ শরীয়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৮, মকতবা তিজারিয়াহ্, মিসর) জিহাদ, ইসলামের প্রচার, সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শিল্প ও খিদমত (Industries and services) ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন- শাফেয়ী, হাম্বলী, ফিকাহ-পন্থী অনেক ফকীহ এবং গাজজালি ও আল-জাওযীর মতে এসব শিল্প হচেছ ফরজে কেফায়া, কেননা (জাতির) অর্থনৈতিক জীবন এসব শিল্প ছাড়া চলতে পারে না। (আল হিসাব ফিল ইসলাম পৃ. ১৭)। কাজেই দেখা যাচেছ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খিদমত ও শিল্পগুলো কায়েম রাখা সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব।

পরিশেষে দেখা যেতে পারে যে, ইসলামী সরকারকে কী কী অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রথমত, সরকারকে অবশ্যই ইসলাম কর্তৃক ব্যক্তিকে দেয়া সব অর্থনৈতিক অধিকার হেফাজত করতে হবে, যাতে একজন অন্যজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। ইসলামের দেয়া ব্যক্তিগত আমানত-মালিকানাকে সরকার হেফাজত করবেন। তেমনিভাবে সব জায়েয ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম যাতে ব্যক্তি বিনা বাধায় করতে পারে তার সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা সরকার করবেন। কেননা, আল্লাহপাক কুরআনের ঘোষণার মাধ্যমে ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও প্রত্যেককে জীবিকার সন্ধান করতে বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির জায়েয পন্থায় ব্যবসা করার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক পেশা অবলম্বন করে জীবিকা তালাশ করার অধিকার ইসলামে রয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতেও বলা যায় যে, অতীতে ইসলামী সরকার কৃষি কাজ, শিল্প ও অন্যান্য ব্যক্তিগত পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উপর হস্তক্ষেপ করে নি, অবশ্য যদি শরী'আতের সীমার মধ্যে এ সব করা হয়ে থাকে। বরং উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, আজকের ইসলামী সরকারকে এসব ব্যক্তিগত ও মিলিত বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সর্বক্ষণ কড়া নজর

www.pathagar.com

রাখতে হবে যাতে এসব স্বাধীনতা ভোগ করে কেউ অন্যের উপর জুলুম অথবা সামাজিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে না পারে। কোন রকম জুলুম হলে "নাহি 'আনিল মুনকার"-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারকে অন্যায় মজুদদারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, একচেটিয়া ব্যবসা, কার্টেল, বিদেশী পুঁজির অপব্যবহার, শিল্প ও কৃষি শ্রমিকের উপর শোষণ ইত্যাদি সব বন্ধ করে দিতে হবে। সরকার শিশু ও নারী কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ এবং সঠিক মানের দ্রব্য উৎপাদন করতেও ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বাধ্য করবেন।

তৃতীয়ত, সমাজ হতে দারিদ্র দূর করার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, দারিদ্র মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। কাজেই এ বিপজ্জনক দুরবস্থাকে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্যে সরকারকে শিল্প স্থাপন ও অন্যান্য কার্যক্রম হাতে নিতে হবে যাতে সমাজে বেকার না থাকে। খাদ্যের বিনিময়ে কাজ- নানা ধরনের কার্যসূচি হাতে নিতে হবে যাতে জনশক্তিকে ব্যবহার করে কাজগুলো করে নেওয়া যায়। অবশ্য অসহায় শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য বাধ্যতামূলোক প্রাথমিক শিক্ষাসহ সার্বজনিন শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসমস্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করতে হবে।

চতুর্থত, সরকারকে যোগান ও মূল্য ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে বাজারের উপর হস্তক্ষেপ করতে হবে। ইসলাম শরী'আতের সীমার মধ্যে ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমর্থন করে। যেমন আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- মূল্য, ভাড়া, বেতন, লাভ ইত্যাদির কোন হার বা পরিমাণ ইসলাম নির্ধারিত করে দেয়। এগুলো সাধারণভাবে যোগান ও স্থিতিশীল অর্থনীতিতে কোনো জুলুম হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে কুরআনের অন্যান্য ইসলামী নিয়ম-কানুন কার্যকরী করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব।

পঞ্চমত, ফরজে কেফায়া হিসাবে ও জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় ভারী ও অন্যান্য শিল্প সরকার স্থাপন করবে। শিল্প স্থাপন করার জন্য ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কর ও শুল্ক সরকার ধার্য করবেন। সুষম ও সুবিচারমূলক অর্থনীতি কায়েম করার জন্য 'আমর বিল মা'রুফের প্রয়োজনে সরকার প্রয়োজনীয় কর ও শুল্ক ধার্য করতে পারবেন।

আশা করি উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়েছে যে, আজকের যুগে ইসলামী সরকার যুগের শত জটিলতার মোকাবেলা করে একটি সুষম, ন্যায়সঙ্গত

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও উন্নত অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম। এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'য়ালা ইসলামী সরকারকে দিয়েছেন। ইসলামী নীতির আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলা এ যুগের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবেলা করে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বাধুনিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআন হাদিসকে ইজমা ও কিয়াস অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের মানব কল্যাণের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে অর্থনীতিকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে। তাহলেই সুদমুক্ত সুষম বন্টন ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির মাধ্যমে স্থিতিশীল সরকার গঠন করা সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্র বা বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সূদমুক্ত, উৎপাদনমুখী, সুসম বন্টন, সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার মত সরকারী এবং বেসরকারী খাতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মুজুরী নির্ধারন করে ইনছাফ পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। মালিকের মান অনুযায়ী শ্রমিকের থাকা খাওয়া এবং পরিধানের বস্ত্রসহ জীবন মান ঠিক রেখে তা করতে হবে। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক সূদখোরদের হাত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করে উন্নত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনভাবে অর্থনীতি প্রণয়ন করতে পারে। যাতে করে কুরআনের মূল বক্তব্য জনকল্যান সাধিত হতে পারে।

www.pathagar.com

একবিংশ অধ্যায়

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে খুৎবার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ভূমিকা

খুৎবা অর্থাৎ বক্তৃতা। এই খুৎবা জুম্মার নামাযে সপ্তাহে একদিন বৎসরে দুই ঈদের দুই দিন এবং পৃথিবীর মুসলমানদের কাবা শরীফে হজ্জের সময় একদিন ইমাম সাহেবগণ দিয়ে থাকেন। এই খুৎবার আলোচ্য বিষয় হবে সপ্তাহে একদিন পাড়া মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে যখন জুম্মার নামাযে ইমাম সাহেব খুৎবা দিবেন তখন তার খুৎবার বিষয়বস্তু থাকবে মসজিদ ভিত্তিক এলাকার সব সমস্যা। দেশের সমস্যা এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা। এরপর ঐ সব সমস্যার বিষয়ে মুসলমানদের কি করণীয় তার দিক নির্দেশনা দিবেন। বছরে দুই ঈদের জামাতে ঈদগাহের আরো বৃহৎ পরিসরে ঈদগাহ এলাকার মুসল্লিদের এবং সমাজ ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা পর্যালোচনা করবেন ও সমাধানের দিক-নির্দেশনা দিবেন। বছরে এক দিন সারা পৃথিবীর মুসলমানরা যখন কাবা শরীফে হজ্জের বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে যোগদান করবেন সেখানে ঈমাম সাহেব মানব জাতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা ও তা সমাধানের দিকনির্দেশনা দিবেন। এই খুৎবা দেওয়ার মত যোগ্যতা যাদের থাকবে তারাই এই সব জামাতের ইমাম হিসাবে মনোনীত হবেন। ইসলামী সমাজ হচেছ জামাত ভিত্তিক আর জামাত মানেই তার নেতা যা দিকনির্দেশনা দিবেন সেই অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মসজিদের ইমাম ঈদগাহ, আর কাবার ঈমামই। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক হবেন। এটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। তাই ইমাম যে খুৎবা দিবেন সে খুৎবা হতে হবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে সেই খুৎবার ভূমিকা অপরিসীম হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খুৎবা যদি হয় দেড় হাজার বছর আগের সব ঘটনায় পরিপূর্ণ বর্তমান সময়ের কোন কথা কোন সমস্যা যদি তুলে ধরা না হয় তাহলে ঐ খুৎবার কোন গুরুত্ব নেই। এই বিষয়ে উদাহরন হিসাবে বলা যেতে পারে আজ দুপুরে আপনার ক্ষুধা লেগেছে। আর সেজন্য আপনার খাবার খাওয়া দরকার। কিন্তু আপনি যদি খাবার না খেয়ে এই আলোচনা করেন যে সাহাবাকেরামগণ পরটা ঘি ভেজে উটের মাংস দিয়ে কি সুন্দর ভাবে খেতেন আর খাওয়ার সাথে সাথে হজম হয়ে যেত আর সেই মাংসের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা ভীষণ যুদ্ধ করতেন। এই গল্প কি আপনার ক্ষুধা মিটাবে? না মিটাবে না। কারণ এখানে কোন গল্পের কাজ নয় এখানে প্রয়োজন খাদ্যের। ইরাক আর আফগানিস্তানে বুশ ব্লেয়ার আর ইহুদীবাদীদের যুদ্ধ কৌশল নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

করতে হবে সেখানে গিয়ে যদি খুৎবায় ইমাম সাহেব মহিলাদের হায়াজ নেফাস আর মেসোয়াকের সমস্যা নিয়ে খুৎবা দেন তাহলে তো কাজ হবে না। যদি পায়খানার পর পাথরের কুলুপ ব্যবহারের মসলা দেন তাতেও কাজ হবে না। হ্যাঁ হায়েজ নেফাস ঢিলা কুলুফের আর মোছায়াক মার্কা বক্তৃতাও দিতে হবে তবে যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা দিতে হবে। বর্তমান মুসলমানদের ইমাম সাহেবরা ইহুদীবাদীদের শিখিয়ে দেওয়া বা লিপিবদ্ধ করে দেওয়া যে খুৎবা জুম্মার নামাজে, ঈদের জামাতে এবং হজ্জের জামাতে বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশ্যে যে খুৎবা দেওয়া হয়ে থাকে তা বীর মুজাহিদ মুসলমানদের ভেড়ার জাতিতে পরিণত করার খুৎবা। বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে খুৎবা দেওয়া হয়ে থাকে তা শুনলে ঘুম আসে অথবা বিরক্তির উদ্রেক হয়। তাই রাসূল (সঃ)-এর দেওয়া খুৎবার প্রচলন করে মুসলিম মিল্লাতকে জাগিয়ে তোলার মত খুৎবার প্রচলন করা দরকার। আর তা পাঠ করবেন ব্যাঘ্র সাবক মুসলিম মুজাহিদ ইমামগণ। ইমাম নিযুক্তির সময় প্রত্যেক এলাকায় মুসল্লিদের স্বচেতন থাকতে হবে যেন মসজিদ কমিটির ভেড়াগুলি ইমাম হিসাবে ভেড়ার সরদার নিয়োগ করার মাধ্যমে বীরের জাতিকে ভেড়া বানানোর সুযোগ না পায়।

হ্যাঁ শত্রু সেনাদেরকে গুলির অভাবে গুলি না করে পাথর মারার খুৎবা দিলেও অন্তত কিছু কাজতো হবেই। যেমন ফিলিস্তিনী শিশু ও যুবক বা ইহুদীদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামনে পাথরের টুকরা নিয়ে এগিয়ে যায় বুক পেতে দিয়ে শহীদ হয়। তাই যা বলছিলাম তাহলো খুৎবা হচেছ এমন একটি জিনিস যা বাস্তবের সাথে মিল থাকতে হবে। শীত কালের মসলা গরম কালে আর গরম কালের মসলা শীতকালে দিলে কাজ হবে না। কোন কিছু পড়লেই নেকী হবে আর সেই নেকীতে বেহেস্তের দরজা খুলে ফেরেস্তারা বসে থাকবে রিসিভ করার জন্য ফুলের মালা নিয়ে। এভাবে আল্লাহ্‌কে আর তার ফেরেস্তাদেরকে বোকা ভাবলে ভুল করা হবে। কাজ ছাড়া কথায় কোন ফল পাওয়া যাবে না। কথায় ফল পাওয়ার মত মসলা যা আছে সব ইহুদীদের তৈরি করা। কথায়ও পুর্ন্য আছে সেটা হল কাজের কথা বলে কাজে উদ্বুদ্ধ করলে নেকী হবে। সেই নেকী করে বা তজবীর দানায় বা ক্যালকুলেটার দিয়ে গোনা যেতে পারে। কিন্তু কাজ ছাড়া অর্থ না যেনে অথবা অর্থ জানারও চেষ্টা না করে মনে মনে সন্দেস খাওয়ার মতো কোন কিছু পড়লেই কোন নেকী হবে না। হ্যাঁ যদি এই চিন্তায় পড়া হয় যে আমি পড়ে অর্থ বুঝে তা কাজে লাগাব তাহলে কাজে লাগালে তারপর নেকী হবে।

www.pathagar.com

যেমন আমি যদি ভাবি যে অমুক বড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ খাব তাহলে অসুখ সারবে না। হ্যাঁ ওষুধ কিনে পরিমাণ মতো এবং নিয়ম মতো ঔষধ খেলে রোগ সেরে যেতে পারে। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন করার পরও ওষুধ পরিমাণ মতো এবং নিয়ম মতো না খেলে অসুখ সারবে না। আল্লাহ্-র ধর্ম ইসলাম কি এতই অবৈজ্ঞানিক হতে পারে যে গল্প করলে বা রসগোল্লা খাওয়ার চিন্তা করলে পেট ভরে যাবে? বা মিষ্টি লাগবে? বর্তমান যত ওয়াজ যত খুৎবা দেওয়া চলছে তা সবই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বা অযৌক্তিকভাবে তাই বর্তমানে ইসলাম কিতাবে আর মুসলমান করবে। ইসলাম উত্তর মেরুতে, আর মুসলমান দক্ষিণ মেরুতে অবস্থান করছে। পৃথিবীর সব মানুষের অংকে দুই আর দুই চার হয় কিন্তু মুসলমানদের অংকে দুই আর দুই ১০ (দশ)ও হতে পারে। সেজন্য বলতে হবে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক আর একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের বরাত দিয়ে বলছে, যে দুই আর দুই ১০ (দশ) আর এই কথা বলে বক্তা যদি কোনরকম চোখের পানি ফেলে বলতে পারেন, তাহলে তো কোন কথাই নেই। বরং শ্রোতারা বক্তার সাথে চোখের পানি ফেলে চিৎকার করে বলা শুরু করবে এত বড় একটি অসম্ভব কথা অংকশাস্ত্রে ইসলামই সংযোজন করতে পারলো যা কোন দিন কোন ধর্মের লোক কোন বৈজ্ঞানিক সংযোজন করতে পারেনাই আর পারবেও না। সাথে সাথে আহম্মকের মত এটাও বলবে যে এই রকম যত অসম্ভব রকম অংক আর বিজ্ঞান এ সবই ইসলামের অবদান এবং মুসলিম মনিশীরাই আহম্মকের মতো এই কাজগুলি করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। এই হচেছ পৃথিবীতে ইসলামের ও মুসলমানদের অবস্থা। এই জিনিস নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ইহুদীদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব? তাই মুললমানদের প্রথম ইসলাম কি জিনিস, মুসলমান কি? আল্লাহ কি? আল্লাহ রসুল কে? মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্য কি? সত্য কি? এসব বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে। তারপর সত্যের বুঝ বা প্রকৃত বুঝ আসার পর বাস্তবতার ভিত্তিতে মসজিদ, ঈদগাহ্ ও কাবাতে ইসলামের আদর্শে রাসুল (দঃ) এর আদলে সাহাবায়ে কেরাম গণের আদলে বাস্তব ভিত্তিক খুৎবা দিতে হবে। সেই খুৎবা সমাজ, রাষ্ট্র ও আদর্শ বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে তথা আদর্শ বিশ্ব ব্যবস্থায় খুৎবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান

পরম দয়ালু ও দাতা মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তার এই মহান সৃষ্টির মাঝে তার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে পাঠিয়েছেন। সমস্ত মাখলুক কে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে। এই সৌরজগত তাও শুধু মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। এই সৌর জগতের রাজা হল মানুষ আর সব প্রজা। মানুষের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দেশ্য করেই মহা কৌশলীর মহা বিজ্ঞানীর এই বিশ্ব সৃষ্টি। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয়। আর মানুষের কল্যানের জন্যই ধর্ম। ধর্মের কল্যানের জন্য মানুষ নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর যুগে যুগে ধর্মীয় আদর্শ নিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ এসেছেন মানুষ কে তার এই পৃথিবীতে চলার সঠিক পথ দেখানোর জন্য। মানুষ যখন ইবলিশ শয়তানের ধোকায় পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে ঠিক তখনই সৃষ্টিকর্তা পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। কোন পথ প্রদর্শকই ছোট না এবং মানুষকে খারাপ পথ দেখাননি। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেন নি। আদিতে পৃথিবী ছিল অভাবনীয় উত্তপ্ত। তাই মানুষের জীবন ধারনের উপযোগী করার জন্যই এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন।

এক এক যুগে এক এক শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করে প্রাণী এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী ছিল প্রথমে অসম্ভব রকম উত্তপ্ত পানিতে পরিপূর্ণ। সেই পানিতে কোন প্রানিরই জীবন ধারণ সম্ভব ছিল না। কোটি কোটি বছর কেটে যায় শুধু উত্তপ্ত পানি ছাড়া আর কিছু ছিল না এই পৃথিবীতে। সেই উত্তপ্ত পানিকে শীতল করে প্রানীর জীবন ধারণের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা প্রটো প্লাজম সৃষ্টি করেন। কোটি কোটি বছর এই পৃথিবীর পানিতে শুধু প্রটোপ্লাজমই অবস্থান করেছে অন্য কোন প্রানী সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়নি এই জন্য যে কোন প্রানী সৃষ্টি করা হলে মুহুর্তের জন্যও সেই প্রানী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে পারতো না। এর পর প্রটো প্লাজমের দীর্ঘকাল পানিতে অবস্থানের ফলে পানি কিছুটা শীতল হতে থাকে। তখন সৃষ্টিকর্তা মাছ সৃষ্টি করেন। মাছ এই পৃথিবীর পানিতে দীর্ঘকাল বিচরন করতে করতে পানির উত্তপ্ততা আরো কমতে থাকে। তখন পানির ভীতর থেকেই বর্তমান পৃথিবীর পূর্বাংশের স্থলভাগ জেগে

www.pathagar.com

উঠতে উঠতে বিশাল এই স্থলভাগের সৃষ্টি হয়। তার পর কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয় এই পৃথিবীতে। তারপর মহান রাব্বুল আলামীন স্থলভাগে সৃষ্টি করেন গাছপালা তরুলতা ইত্যাদি। এইভাবেও কেটে যায় কোটি কোটি বছর। তারপর গাছ পাতা তরুলতা এই উত্তপ্ত পৃথিবীর উত্তপ্ততা শোষন করে নিয়ে শীতল করার পর প্রানির জীবন ধারনের উপযোগী হওয়ার পর সৃষ্টি করা হয় ডাইনোশর। ডাইনোশরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণীর জীবন ধারনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় কিন্তু উত্তপ্ত পরিবেশে জীবন ধারনকারী ডাইনোশর শীতল পরিবেশে জীবন রক্ষা করতে না পারায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডাইনোসর সৃষ্টিই করা হয় উত্তপ্ত পরিবেশে জীবন ধারনের উপযোগী করে যা শীতল পরিবেশে জীবন ধারনের উপযোগী নয়। সরিসৃপ যেটি পরে সাপ এবং ঘোড়েল হিসাবে আমরা এখনও দেখে থাকি সেটিকে সৃষ্টি করা হয় এরও বহুকাল পরে তারপর সৃষ্টি করা হয় বানর। এইভাবেও কেটে যায় কোটি কোটি বছর। তারপর এই পৃথিবী নামক গ্রহে বনমানুষের সৃষ্টি করা হয় তারপর বহু বছর পর মানুষের জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পরিবেশ যখন সৃষ্টি হয় ঠিক তখনই সৃষ্টি করা হয় আদমকে। এই সৃষ্টির বিষয়ে ডারউইনের যে মতবাদ তা ভ্রান্তিপূর্ণ। ডারউইন বলেছেন প্রটো প্লাজম থেকে মাছ মাছ থেকে সরিশৃপ সরিশৃপ থেকে বানর তারপর বন মানুষ তারপর ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছে। আসলে বিষয়টি তা নয়। প্রত্নতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান। প্রত্ন তাত্বিক খনন এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই পৃথিবীতে মাটির প্রথম স্তরে মাছের ফসিলের অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তার ও লক্ষ লক্ষ বছর পরে এসে দেখা যায় সরিশৃপ, তারও বহু বছর পরের স্তরে এসে পাওয়া যায় বানরের ফসিল। তারপর বনমানুষ বহু বছর পর এই পৃথিবীতে মানুষের ফসিলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই যে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি খনন করে স্তর বাই স্তরে ঘনন করে প্রত্ন তাত্বিক পরীক্ষা করে ফসিলের বয়স বের করে এই মতবাদ দিয়েছেন ডারউইন। ডারউইন বলেছেন মানুষের পূর্ব পুরুষ মাছ, সরিশৃপ এবং বানর। আসলে তা নয়। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টির আইটেমের রূপ পালটায়নি। মানুষের পূর্ব পুরুষ মাছ ও না সরিসৃপ ও না বানরও না। মানুষ মানুষই মাছ মাছই সরিসৃপ সরিশৃপই বানর বানরই। সৃষ্টির কোন আইটেম কালের বিবর্তনে অন্য কোন রূপ পরিগ্রহ করে

www.pathagar.com

নাই। বরং পৃথিবীর অসম্ভব রকম উত্তপ্ততার কারনে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই মাছ, পূর্বে ডাইনোশর, সরিশৃপ এবং বানর পাঠানো হয়েছিল। এই সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা একই সাথে। রেখে দিয়েছিলেন আলমে আরূহায় বা রূহের জগতে। আজও সব কিছু সৃষ্টি হচেছ রূহ আসছে রূহের জগত থেকে। আর এ সৃষ্টি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পিত উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাহক ডারউইন এর ভুল মতবাদ প্রত্ন তাত্বিক বিজ্ঞানের উপর ভর করে এই পৃথিবীতে টিকে ছিল। মানুষ মনে করতো প্রত্ন তত্ত্ব যেহেতু বিজ্ঞান তাই ডারউইনের মতবাদও বুঝি বিজ্ঞান। আসলে ডারউইনের মতবাদ আদৌ কোন বিজ্ঞান নয়। অথচ সেই বিজ্ঞান নামধারি শয়তানের ধোকায় পড়ে লেখা ভ্রান্ত মতবাদ পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে যুগযুগ ধরে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে মানুষের পূর্ব পুরুষ মাছ, সরিশৃপ এবং বানর। মাছ সরিশৃপ আর বানরের উপর সৃষ্টিকর্তার কোন আদেশ নিষেধ থাকতে পারেনা তাই আমরা যেহেতু তাদের বংশধর তাই আমাদের উপর ও সৃষ্টিকর্তার কোন আদেশ নিষেধ প্রযোজ্য না। এইভাবে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য বিহীন পশু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি দেখিয়ে মানুষ সুনির্দিষ্ট লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি নয় দেখিয়ে মানুষকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইহুদীবাদী ডারউইনের এ এক গভীর ষড়যন্ত্র মূলোক মতবাদ সৃষ্টি। বিশ্ববাসীকে তাই বুঝতে হবে যে ডারউইনের মতবাদ এক ষড়যন্ত্র। মানুষ মহান আল্লাহ-র প্রিয় সৃষ্টি। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন উদ্দেশ্য করে যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। আর তাকে বানরের বংশধর বানিয়ে বানর বা পশুর আচরন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হল। আর এইভাবে ডারউইনের মতবাদ; হেগেলের দ্বান্দিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে ডাসক্যাপিটাল লিখলেন কার্ল মার্কস। এঙ্গেলস তাকে আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করলেন এরা দুই জনই ইহুদী ছিলেন। এইভাবে আধুনিক বিশ্বের মানুষের কাছ থেকে তার প্রিয় সৃষ্টি কর্তাকে সরিয়ে নিয়ে মানুষকে এতিম করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

হে মানুষ আপনারা শুনুন মানুষ উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি নয়, তা হতে পারে না। সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব নিয়ে এই পুস্তকে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। তার থেকে মহা কৌশলী সৃষ্টি কর্তার সন্ধান আপনাদের পাওয়ার কথা। আর এখানে মানুষ কে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি বলে প্রমান করার ইহুদীবাদী চক্রান্ত সম্বন্ধে এই জন্যই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হলো যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রিয় এবং উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা মাফিক সৃষ্টি, উদ্দেশ্যহীন নয়।

এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। তাহলো এই বিশ্ব সংসার আল্লাহর। আমরা যেমন প্রত্যেকেই এক একটি সংসারের গার্জিয়ান বা পিতা ঠিক তেমনি মহান সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্ব সংসার। জাতি, ধর্ম, বর্ন, সাদা কালো নির্বিশেষে সব মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে সমান প্রিয়। এর মধ্যে ভালবাসার বিষয় কোন ভেদাভেদ নেই, কম বেশী নেই। মা বাবার কাছে যেমন সব সন্তান সমান, সৃষ্টিকর্তার কাছে তেমনি সব মানুষ সমান। তবে হ্যা খারাব মানুষ তার কর্মকান্ডের জন্য আল্লাহর কাছে ততোটুকু খারাব যতটুকু সে খারাব কাজ করেছে ততোটুকুই, তার চেয়ে বেশী ও না কমওনা। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন সুবিচারক। আমরা যেমন সব সন্তানকে সমান ভালবাসি কিন্তু খারাব কাজ করলে শাসন ও করি আবার খাবার সময় খেতে না দিয়ে পারিনা। তেমনি মহান আল্লাহ পাক সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন কিন্তু অপরাধ করলে তার শাস্তি দেন আবার ক্ষমার যোগ্য হলে ক্ষমাও করেন কিন্তু আহার বন্ধ করেন না।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিশ্ব ব্যবস্থায় অমুসলিমদের বা মুসলিমদের অবস্থা হবে একই রকম। মৌলিক অধিকার থাকবে সবার সমান। খাওয়া পরা বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা ধর্ম পালন ধর্ম প্রচার, এককথায় মানবাধিকারের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাই সমানভাবে ভোগ করবে সবাই। তবে শাসন যন্ত্রের মৌলিক দায়িত্ব বা প্রধান দায়িত্ব মুসলিমদের হাতে থাকবে। তবে সব ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় শাসনে যাতে করে যার যার ধর্মের লোকেরা সুযোগ সুবিধা আদায় বা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে পারে। এক কথায় একজন পিতার বড় সংসারের সব সদস্য যেমন সংসারের সুযোগ সুবিধা পায় এক্ষেত্রেও তাই পাবে তবে সবচেয়ে যে সন্তানটি বেশী দায়িত্বশীল সংসারের প্রধান দায়িত্ব সেই পালন করে থাকে এখানেও ইসলামের মহা বিজ্ঞানময় পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

www.pathagar.com

গ্রহণ করার কারণে মুসলমান বেশী দায়িত্ববান হওয়ার কারণে তাকেই দেশ ও সরকারের প্রধান দায়িত্ব অর্পন করা হবে। একটি সংসারের দৃষ্টিকোণ থেকেই সকলকে আপন ভেবেই ভালবেসেই হিংসা করে নয় ঘৃণা করে নয় শুধুমাত্র দায়িত পালনের আদর্শ জ্ঞানার্জনের কারণেই মুসলমান প্রতিনিধি প্রধান দায়িত্ব পালন করবে।

বিষয়টি এরকম যেমন একটি লোকের ৫টি সন্তান তার মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায়ও সচেতন ও দায়িত্বশীল হিসাবে সবাই সমান হয়না। তাই যে যেমন দায়িত্বশীল সচেতন তাকে যেমন পিতা যোগ্যতানুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করে থাকেন। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলমান দায়িত্বশীলরাই প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন। কারন ইসলামী আইন কানুন যানা বুঝা পালন করা, পালন করানো, বাস্তবায়ন করা একমাত্র দায়িত্বশীল মুসলিম ছাড়া সম্ভব না, তাই মানুষের কল্যান করা এবং বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য প্রধান দায়িত্বগুলি অবশ্যই মুসলমানদের হাতে থাকতে হবে।

এর কারণ হিসাবে বলা যায় ইসলামী আইন কানুন আদর্শ মানবতা বাদ ও অত্যাধুনিক যা যুগোপযোগী করে রোজকেয়ামত পর্যন্ত যুগ সমস্যার সমাধানের জন্য ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে কোরান ও হাদিসের সাথে সমন্বয় সাধন করে রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মত বাস্তবায়নের জন্য এবং মুসলিম আইন বিশারদ ছাড়া এটার বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব না। তার মানে এই নয় যে অন্য ধর্মের প্রতি বৈষম্য মূলোক নীতি প্রদর্শন তা নয়। কারণ ডাক্তার না হওয়া পর্যন্ত রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া যায় না। বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার কে ও ক্যানসার রোগ চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া যায় না তাতে ব্যারিস্টার বলতে পারেনা যে আমাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কারণ তিনি ক্যানসার রোগী চিকিৎসা করলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারবেন না। তাই যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক কারণে মুসলিম নেতা বিশ্ব পরিচালনায় প্রধান দায়িত্বশীল থাকবেন।

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয়নবীর উদাহরন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেছিলেন তখন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। তখন ইহুদী খৃস্টান ও মুসলমানদের কে নিয়ে মদিনাকে রক্ষার জন্য বা মদিনা শাসনের জন্য

www.pathagar.com

একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যেটাকে ঐতিহাসিক মদিনা সনদ হিসাবে ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত সনদের শর্তানুযায়ী মদিনার সব সম্প্রদায়ের সভাপতি হিসাবে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। আভ্যন্তরীন বিবাদ মিমাংসা, শালিশ বিচার ভালমন্দ সুখে দুঃখে এবং বর্হিশত্রুর আক্রমন থেকে মদিনাকে সব সম্প্রদায়ের মানুষ প্রিয় নবী (দঃ) এর নেতৃত্বে রক্ষা করবে, মদিনা গড়ার জন্য কাজ করবে এই ছিল মদিনা সনদের সারমর্ম। এর থেকে আমরা যে শিক্ষাটি নিতে পারি তাহলো ইসলামী রাষ্ট্রের সব মানুষ যদি মুসলমান হয়- তাহলেতো কথাই নেই, যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান হয় আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু হয়, সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান এবং সরকার প্রধান মুসলমান হবেন, এছাড়া রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলি ইসলামী আইন বিশারদ দায়িত্বশীলরা পালন করবেন আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সব ধর্মেরই প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারবে। বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মানবতা বিরোধী শয়তানী শক্তির বিপক্ষে থাকবে ইসলামী দেশ সমূহের অবস্থান ও ভূমিকা আর সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব ধর্মের মানবতাবাদীদের সমন্বয়ে জোট গঠন করে বিশ্ব শাসন করবে মুসলমানরা তারও প্রধান দায়িত্বে থাকবে বিশেষজ্ঞ মুসলিম দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। আর অন্যান্য সব ধর্মের লোকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

তবে মুসলমানদের আসল দায়িত্ব সমগ্র মানব জাতির সামনে মহান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান উপস্থাপন করা, তার পর যত মানুষই তা সাদরে গ্রহণ করুক না কেন তাহলে মুসলিম জাতির দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে, তাদের দায়িত্ব পালনের হাত থেকে রেহাই পাবে, নইলে দায়িত্ব হীনতার অপরাধে আল্লাহ্‌র কাছে মুসলমানরা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা সমগ্র মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আর তা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত যুগ সমস্যার আলোকে ইজমা ও কিয়াসের মাধামে কোরান ও হাদিসের আলোকে দেশ ও বিশ্ব শাসন করতে পারবে। তার সব ধরনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ইসলামের রয়েছে।

ইহুদী, খৃস্টীন, হিন্দু, বৌদ্ধ, ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মে রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকায় মনুষ্য রচিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিয়ে দেশ ও বিশ্ব শাসন করতে চায় এটা তাদের

www.pathagar.com

অপরাধ নয়। কারণ তাদের ধর্মে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন আদর্শ নেই। ইসলামে মহা বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকার কারণে ইহুদী ও খৃস্টান দার্শনিকরা ধর্ম থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আনা হবে না বলে মসলা দিয়েছে, কারণ তাদের ধর্মে ঐ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বিজ্ঞ মুসলিমরা তো আর ইহুদী খৃস্টানদের ঐ রাষ্ট্র বিজ্ঞানানুযায়ী ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাদ দিতে পারেনা। যদি বাদ দেয় তাহলে তা হবে একটি অবৈজ্ঞানিক কাজ। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত কাজের জন্যই সংশ্লিষ্ট কর্মী বাহিনীর নৈতিকতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দরকার। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম সমস্ত কর্মী বাহিনীও জনগনকে সেই শিক্ষা দিয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচেছ একটি মহা বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানেই তা নেই যা ইসলামে আছে। ইসলাম তার নাগরিকদের সদগুন সৃষ্টি ও অসদ গুন পরিহার করার সব ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং নিয়মিত অনুশিলনের ব্যবস্থা করে। এই রকম একটি উন্নত যৌক্তিক জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত করতে পারা আর কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূত পূর্ব উন্নয়ন সাধন করলেও উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা প্রশিক্ষন ও অনুশীলনের আদর্শ উপস্থাপন না করায় অবাদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারছেনা বরং তা দিয়ে অবাদে মানুষ হত্যা করে চলেছে। যদি নৈতিকতার শিক্ষা এবং মৃত্যুর পর জবাব দিহিতার শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে নর পশুর মত অবাদে মানুষের মত এত সুন্দর সৃষ্টি এই ভাবে মারনাস্ত্র দিয়ে হত্যা করতে পারতো না। বোমারু বিমান দিয়ে একের পর এক বিশ্বের নিরপরাধ মানুষ গুলিকে বোমা মেরে হত্যা করতে পারতো না। হাজার হাজার বছর ধরে তিলে তিলে সৃষ্টি করা সভ্যতা বোমারু বিমান থেকে বম্বিং করে গুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করতে পারতো না। নৈতিকতার শিক্ষা প্রশিক্ষন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকলে মুসলিম হওয়ার অপরাধে শিশুদের মাথার খিলু কুকুরের উপাদেয় খাদ্য বলে কুকুরকে খাওয়াতে পারতো না। পরিবারের সবার সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলিম মা বোন পুত্র বধুকে ধর্ষন করে হত্যা করে অট্টহাসি দিতে পারতো না। আজকের এই ঝনঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা দিয়ে বিশ্ব শাসন করলে বৈজ্ঞানিক কারনেই পৃথিবীতে শান্তি আশা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ইসলামে মানুষের এবং সৃষ্টির কল্যান সাধন করাই ইবাদাত বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ, তাই মুসলমানই যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে পানি পানি না করে অন্যকে পানি দিয়ে নিজে মৃত্যু বরন করে ত্যাগের সর্বোচচ আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছে। ত্যাগের শিক্ষার অগ্রপথিক ইসলাম ও মুসলমান, আর ত্যাগই পারে বিশ্বে শান্তি আনায়ন করতে, ভালবাসা প্রেম প্রীতির মাধ্যমেই সম্ভব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আর তার সর্বোচচ শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ইসলাম মানব জাতিকে একটি আদর্শ পরিবার হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কালেমায়ে তৈয়্যেবার মাধ্যমে আহবান জানিয়েছে। ইসলামের ধারনা বিশ্ব পরিবার। মহান সৃষ্টিকর্তা তার গার্জিয়ান বা অবিভাবক। সকলের শান্তি প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই যে ধর্মে নৈতিকতা শিক্ষা প্রশিক্ষন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে সেই ইসলাম ধর্মের অনুসারিরাই ইসলামী রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রধান নেতৃত্ব ও প্রধান কর্মী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের যোগ্যতানুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে এবং রাষ্ট্রে ও বিশ্বে তাদের সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা ধর্ম প্রচার ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা মুসলমানদের মতই ভোগ করতে পারবে। এটাই ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থার মূলকথা বা ইসলামী মতবাদ।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অধীন কোন দেশ, কোন মহাদেশ ও বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হলে যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক কারণেই একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ও কল্যাণমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত তিন ধরনের ব্যবস্থা চলছে। একটি অবাধ গণতন্ত্র, একটি সমাজতন্ত্র, আর তৃতীয় একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা- যা রাসূল (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা যা মদিনায় সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। যার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ছিলেন স্বয়ং হুজুর পাক (সঃ) নিজে। পরবর্তীতে হুজুর পাক (সঃ) এর ওফাতের পর চার খলিফাতুল মুসলিমীন যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন। তারপর আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) তা পুত্র এজিদকে উত্তরাধিকার হিসাবে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে খেলাফাত ব্যবস্থার কবর রচনা করেন। তিনি

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথায়ও কখনও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না শুধু মাত্র মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ রয়েছে তা ছাড়া কয়েকটি দেশে মহিলাদের পর্দা প্রথা আছে এ ছাড়া রাষ্ট্রের কোথায়ও ইসলামের নাম গন্ধও নেই। বরং কাফেরদের দালালী করা বা সহযোগিতা করার যথেষ্ট নজির রয়েছে। এছাড়া ইরানে ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর সেখানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। বর্তমান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে ইসলামী কল্যান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল হিসাবে বিশ্বের বুকে তুলে ধরা যায়। যদি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা হয় বা ইসলামী কল্যানমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে তার মডেল হবে ইরান। সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, কালোবাজারী, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, ঘুষ, জুয়া, মদ, সহ সব ধরনের নেশা, ব্যাভিচার, অনাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা, খুন, রাহাজানী, অবিচার, অত্যাচার বন্ধসহ সব ধরনের অনিয়ম ও শোষণের অবসান ঘটানো ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সাথে সাথে ন্যায় ও দ্রুত সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আইনের শাসন, সাম্য মৈত্রী, মানবতা, সহনশীলতা, শোষণহীন পক্ষপাতহীন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, অনাহার, অধাহারের অবসান ঘটিয়ে সুখি সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা এবং বেহায়াপনার অবসান ঘটিয়ে সত্য উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করে শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র বা ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা বিশ্বব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তাহলো রাষ্ট্র কায়েম করার আসল উপাদান হলো মানুষ। কারা শাসিত হবে এবং কারা শাসন করবে। কাদের সুখশান্তির জন্য শাসন করবে। সেই মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। মানুষকে বুঝতে পারলেই মানুষের দ্বারা শাসন এবং শোষণ বুঝতে সহজ হবে।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দুটি বিশেষ গুণ দিয়ে। তার একটি হচেছ পশুত্ব আর একটি হচেছ মনুষত্ব। মানুষ শিশু অবস্থায় যখন মায়ের পেট থেকে

www.pathagar.com

ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে থাকে নিষ্পাপ। দিন যতই যায় ততোই সে পৃথিবীর পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়তে থাকে। পৃথিবীর মানুষের স্বার্থপরতা দেখে মানুষ স্বার্থপর হতে শেখে। মানুষের মধ্যে অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা। তাই মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে স্বার্থপর হয়ে ওঠে তারপর ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রেও সে স্বার্থপর হতে শুরু করে। এর সাথে অদম্য আকাংখা যোগ হয়ে সে পৃথিবীটাকে গ্রাস করতে চায়। তাকে গোটা পৃথিবীর বাদশা বা রাজা করে দিলেও সে সন্তুষ্ট হতে পারেনা। সে আরো চায় চাওয়ার যেন শেষ নেই। একশত বছর আয়ু পেলেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তাকে হাজার বছর আয়ু দিলেও পৃথিবীর সব সম্পদ পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেও সে আরো চায়। সে ভাবতে চায়না খুব অল্প সময়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে যত সম্পদই যোগাড় করিনা কেন এর সামান্যই ভোগ করা যাবে। আর বাকি কোন সম্পদই মৃত্যুর সময় সাথে নিয়ে যাওয়া যাবেনা এগুলি কোন কাজেই আসবেনা। এই সম্পদ যদি খারাব উপায়ে উপার্জন করা হয় আর খাবার পথে ব্যায় করা হয় তাহলে জীবনে এ সম্পদ সুখতো দেবেইনা বরং দুঃখের একমাত্র কারণ হয়ে দাড়াবে। এইটা মানুষ বুঝতে চায়না। মানুষ বুঝতে চায় না যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অনাহারে বা অর্ধাহারে রেখে সম্পদের পাহাড় গড়া মহা অপরাধ। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, মানুষের ক্ষতি করা মহাপাপ। মৃত্যুর পরে এটাই দুঃখের একমাত্র কারণ হয়ে দাড়াবে তা মানুষ বুঝতে চায়না। মানুষ উপরোল্লিখিত জিনিষগুলি বা বিষয়গুলি যদি বুঝতে পারতো, তাহলে কি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারতো? না পার তো না। কারণ মানুষ জন্মগতভাবেই স্বার্থপর। সে নিজের সুখের জন্য শান্তির জন্য, নিজের ভালোর জন্য সবকিছু করতে চায়। তাই সে যদি বুঝতে পারতো তাহলে অবশ্যই উল্লিখিত খারাপ কাজগুলো সে করতো না। সে ভাল কাজগুলো অবশ্যই করতো নিজের ভালর জন্যই।

উল্লিখিত বিষয়ে মানুষের মাঝে সঠিক বুঝ আসলে মানুষ মানুষের সম্পদ লুট করতো না, কোন দেশ অন্য দেশ দখল করতো না। বিনা কারণে যুদ্ধ করে মানুষ হত্যা করতো না। জুলুম নির্যাতন শোষণ বঞ্চনা করতো না। কিন্তু মানুষের বুঝ নেই বলেই এসব কর্মকান্ড মানুষ করে চলেছে অবিরত।

www.pathagar.com

এ বিষয়গুলোর শিক্ষা দিয়ে একজন মানুষকে যদি প্রকৃত মানুষ হিসাবে তৈরি করা যায় তাহলে ঐ মানুষের সমন্বয়ে যদি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এবং বিশ্ব গড়ে তোলা যায় তাহলে সেই মানুষ, সেই পরিবার, সেই সমাজ, সেই রাষ্ট্র সর্বপরি গোটা বিশ্ব হতে পারে সুখি সমৃদ্ধশালী শান্তি এবং কল্যানের আবাসভূমি বা ভূস্বর্গ।

এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার মতো কোন ব্যবস্থা অবাধ গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাজার অর্থনীতিসহ বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের ধারণার মধ্যে বর্তমান নেই। বরং গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, অগ্রসর হয়ে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে এবার গোটা পৃথিবীটা গ্রাস করার জন্য গ্লোবালাইজেশনের মৌলিক ধারণা দিয়ে শুভংকরের ফাঁকিতে বিশ্ববাসীকে ফেলে দিয়ে গোটা বিশ্বকেই ইহুদীরা গ্রাস করতে চায়। এই স্বার্থপরতার শিক্ষা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন ভাল শিক্ষা তাদের কাছে নেই। সমাজতন্ত্র হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, খুন আর রাহাজানি শিক্ষা দিয়েছে। সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের নামে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিজেই নিজের ভিত্তি নিয়ে ধসে পড়েছে। যা এখন মানব জাতির বোঝা হয়ে পড়েছে। মানুষের কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যান মানবতা, মহানুভবতা, শিষ্টাচার, পরোপকার শিক্ষা দেওয়ার মত কোন আদর্শ, কল্যাণের বা শান্তির কোন আদর্শ তাদের পুস্তকে বা দর্শনে উপস্থিত নেই।

এ কল্যাণের বা শান্তির আদর্শ আছে কোথায়? একমাত্র ইসলামে। যে শিক্ষা পেলে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে যেতে পারে। একজন মানুষ সত্যিকার মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে। সেই শিক্ষা ইসলাম মানুষকে দিয়েছে। মানুষের ভেতরের পশুত্ব দূরীভূত হয়ে একজন মানুষ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তা ইসলামী আদর্শে বর্তমান রয়েছে, আর তা হাতে কলমে আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমে মানবতার আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। তারপর তা অন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনিভাবে ভাল মানুষের সমন্বয়ে ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং ভাল সমাজের মাধ্যমে ভাল রাষ্ট্র বা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তারপর তার প্রিয় সহকর্মী খলিফাতুল মুসলিমীনগণ হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। মানুষ যদি অন্যের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ দেখতে পায়, অন্যের ক্ষতির মধ্যে নিজের ক্ষতি দেখতে পায় তাহলে সুন্দর সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব গড়ে ওঠা সম্ভব। ইসলাম এই

www.pathagar.com

শিক্ষাই মানুষকে দেয়। এইটিই ইসলামী শিক্ষা, এটাই ইসলাম, এটাই ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থার মূলমন্ত্র। তাই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র তথা ইসলামী কল্যাণমূলক বিশ্বব্যবস্থার মূলমন্ত্র অনুযায়ী বিশ্ববাসীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায়। আর তা চায় রসূল (সঃ) এর জমানার মতো।

ইসলামী রাষ্ট্রের এবং ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হচেছ, বিশ্ববাসীকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মুসলমান করা। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ মুসলমান না হবে ততোদিন ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখা। যেসব সমাজ বা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, সেসব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যান্য সংখ্যালঘুরা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। ধর্ম প্রচারেরও পূর্ণ অধিকার থাকবে। তবে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের যার যার ধর্মের সুবিধার জন্য ও সার্বিক বিকাশের জন্য কাজ করার অধিকার থাকবে। সংসদে যার যার ধর্মের প্রতিনিধিত্বও করতে পারবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী সমাজ যেসব যায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সব যায়গায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশ, মহাদেশ বা অঞ্চলে সমাজের অবস্থানুযায়সী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, আর সব রাষ্ট্র বা বিশ্ব সমাজ বা কল্যাণমূলক বিশ্বমানব সংঘ গড়ে তুলে মানবতার কল্যাণে সব ধর্ম এবং বর্ণের মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মানজনকভাবে মূল্যায়ন করে। মানবতার কল্যাণে যেহেতু ইসলামী চিন্তা অত্যাধুনিক ও কল্যাণকর তাই মানব জাতির কল্যাণেই ইসলাম ধর্মের আদর্শ শিক্ষা ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিন্তু অন্যান্য ধর্মও অবহেলিত থাকবে না কারণ এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সব মানুষই সৃষ্টিকর্তাকে মান্যকারী হিসাবে ভাই ভাই। সৃষ্টিকর্তার পরিবারভুক্ত। শুধুমাত্র নাস্তিকতাবাদিরা ছাড়া। নাস্তিকতাবাদিদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পাবে না। কারণ তারা আল্লাহ্‌র নাফরমান বান্দা তারা শুধু খেতে পরতে পারবে তাছাড়া তাদের নাস্তিকতাবাদ প্রচার করতেও পারবে না। তাদের সমস্ত মৌলিক অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রে থাকবে। মানবতার শত্রু নাস্তিকরা, তাদের আদর্শ মানবতার জন্য ক্ষতিকর, তাই ঐ নাস্তিকতার আদর্শ সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য থাকবে।

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম মানব জাতিকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছে। তাই কালেমায়ে তৈয়্যেবার মাধ্যমে বলা হয়েছে কোন মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া আর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) তার একমাত্র প্রেরিত নবী বা রাসুল। এর মাধ্যমে মানব জাতিকে রাসুল (দঃ) এর একক নেতৃত্বে একটি মাত্র প্লাটফর্মে আনার জন্য এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা, রুজিদাতা, আইন ও বিধান দাতা পরম দয়ালু ও দাতা, মেহেরবান মহান আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্ব করার আহবান যানান হয়েছে।

কালেমায়ে তৈয়্যেবার আহবানে সাড়া দিয়ে যারা ইমান এনে মুসলমান হয়েছে এবং হতে থাকবে সেই বিশ্ববাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়েছে তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচিছন্ন হয়ো না। আর আল্লাহর সে নেয়ামত স্মরন করো, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন। পরে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তারই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের কিনারায় উপনিত হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে সে মারাত্মক অবস্থা থেকে বাচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ এভাবেই তার আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।

(সূরা আলে- ইমরান ১০৩)

রাছুলে আকরাম (দঃ) এরশাদ করেন; পরস্পর দয়া প্রদর্শন ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ঈমানদার গণের উপমা হলো একটি দেহের মত। দেহের কোন অংশে ব্যাথা অনুভূত হলে তার সমস্ত দেহেই বেদনা অনুভূত হয়। সে অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বোখারী, মুসলিম, মিশকাত)

হুজুর পাক (দঃ) আরো এরশাদ করেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। তার উপর জুলুম করবেনা তাকে শত্রুর কবলে ছেড়ে দেবে না। যে মুসলিম তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরনে আত্ম নিয়োগ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন সংকট দূরিভূত করবে, তার বদলে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা রোজ হাশরে তার সমুদয় অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে মুসলমান অন্য মুসলমানদের দোষ ঢেকে রাখবে। আল্লাহ্ পাক রোজ কেয়ামাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। (বোখারী, মুসলিম, মিশকাত)

আল্লাহ্পাক অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেনঃ
তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ যারা লোকদেরকে কল্যানের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে এবং এসকল লোকই হবে সফল কাম এবং তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা আলে-ইমরান ১০২-১০৫)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেনঃ
আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আর প্রতিটি দলই তাদের নিজেদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দে নিমগ্ন রয়েছে।
(সূরা আর-রূমঃ ৩১-৩২)

আল্লাহ পাক রাসূল (সঃ)- কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ
নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত ও খন্ড বিখন্ড করেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে (হে রাসূল) কোন ব্যাপারেই আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।” (সূরা আল আনআম- ১৫৯)

আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেনঃ
আর আল্লাহ ও তার রাছুলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না। কারণ, তাহলে তোমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রান বায়ু (শক্তি প্রতিপত্তি) নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতত্রব তোমরা (ঐক্য ও সমঝতার খাতিরে) ধৈর্য্য ধারণ করো। (সূরা আন-ফাল্: ৪৬)

আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেনঃ
“মানব মন্ডলী (আদিতে) একটি মাত্র উম্মাহ্ (আদর্শিক জনগোষ্ঠী) ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে নবীগনকে প্রেরন করলেন এবং লোকেরা যে সব বিষয়ে মত পার্থক্য ও মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল সে সব

www.pathagar.com

বিষয়ে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য তিনি তাদের (নবীদের) সাথে সত্যতা সহকারে কিতাব নাজিল করলেন। বস্তুতঃ যাদের নিকট অকাট্য নিদর্শনাদি এসেছিল তাদের কাছে তা আসার পরই কেবল নিজেদের মধ্যে (পরস্পর) ঔদ্ধত্যবশতঃ তারা সে ব্যাপারে মত বিরোধ ও মত পার্থক্য করেছিল। সত্যের মধ্য থেকে যে ব্যাপারে তারা মত পার্থক্য ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে ব্যাপারে মুমিনদের কে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২১৩)

আল্লাহ্ পাক আহলে কিতাবদের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্য আয়াতে এরশাদ করেনঃ

"(হে নবী) বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সর্বতোভাবে সমান, (তা হচেছ এই) যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না ও তার সাথে অন্য কোন কিছুকেই শরীক করবোনা এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া আমাদের মধ্যে কতক কতককে রব হিসাবে গ্রহণ করবনা। অতঃপর তারা যদি ফিরে যায় (এ আহবানে সাড়া না দেয়) তাহলে (হে ঈমানদারগণ তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলমান (আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পিত)।

(সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

"নিঃসন্দেহে মু'মিনগণ ভ্রাতৃ সম্প্রদায়। (সূরা আল- হুজুরাতঃ ১০)

উপরোল্লিখিত কালামে পাকের আয়াত সমূহে মানব জাতির ঐক্য মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে।

বলেছেন কে আল্লাহ? যেখানে আল্লাহ বলেছেন সেখানে আমাদের বিচার বিশ্লেষনের বা বিবেচনার কি থাকতে পারে?

মানুষের বিপদ কখন হয়? মানুষ যখন আল্লাহ্র থেকে বেশী বুঝা শুরু করে তখন।

www.pathagar.com

মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কি কি প্রয়োজন, কিসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি? তা তিনিই ভাল যানেন। আমরা মানুষ আমাদের অতো যানার দরকার কি? আল্লাহ বলেছেন ব্যাস আর কিছু ভাবা চিন্তার দরকার কি? বুঝা ভাল তবে বেশী বুঝা ভাল না বিশেষ করে আল্লাহ্র চেয়ে বেশী বুঝার চেষ্টা করা মোটেও ভাল না।

আমরা যদি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, লালন ও পালনকর্তা রুজিদাতা জীবন হরনকারী এবং বিধানদাতা এইটা বুঝতে পারি, আমরা যদি আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারনা করতে পারি, তাহলে আল্লাহর কথা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সাহস পাবনা। এছাড়া মানুষকে আল্লাহ কত ভালবাসেন আর তার কতটা কল্যান কামনা করেন এই ধারনা থাকলে আল্লাহর আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের মানসিকতা এবং সাহস কোনটাই হবে না। সেইজন্য জ্ঞানার্জনের দরকার। বিশেষ করে পবিত্র কোরআন পড়া দরকার।

আল্লাহকে চেনা দরকার। দুনিয়াতে মানুষের সুখশান্তি অর্জনের যত চেষ্টা তার ৯৯ ভাগ চেষ্টা হওয়া দরকার আল্লাহকে চেনার জন্য। আল্লাহকে চিনতে পারলে বাকি ১ (এক) ভাগ চেষ্টায় রুজী রোজগার দালান কোঠা গাড়ী বাড়ী অর্থ সম্পদ সুখ শান্তি সব কিছু অর্জিত হয়ে দুনিয়াটা একটি ভূস্বর্গ হওয়া সম্ভব।

যাহক তারপরও আমি মানব জাতির ঐক্য ও মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি হল এবং কিভাবে অনৈক্য দুর করে ঐক্য সৃষ্টি করা যায় আর ঐক্য সৃষ্টি হলে তার থেকে কি কি কল্যান আমরা পেতে পারি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তবে এই পুস্তকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার এ জাতীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

মানবজাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

মানব জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি থাকলে দ্বন্দ্ব সংঘাত মারামারি কাটাকাটি হানাহানি সন্ত্রাস রাহাজানী খুন খারাবী থাকতোনা। কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না দুনিয়াতে অশান্তির সৃষ্টি হতো না। কোন মতবাদ কোন থিওরি যত বিচার ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থনীতি সমাজনীতির নামে শাসন শোষন

www.pathagar.com

অত্যাচার জুলুম নির্যাতন কিছু থাকতো না। মানুষ মানুষের জন্য কাজ করতো বিপদে আপদে পাশে এসে দাড়াতো, কোন শত্রুতা করতোনা। মানব জাতির ঐক্য থাকলে কত ভাল হতো আর ঐক্য না থাকায় কি কি খারাব হয়েছে, তা লিখেই পৃথিবীতে সকল বই পুস্তক মহাগ্রন্থ রচিত। বিষয় একটি তাহল মানব জাতির ঐক্য ও সংহতি না থাকার ফলাফল। ঐক্য থাকলে সমস্যা থাকতো না ঐক্য নাই তাই কোটি কোটি সমস্যা। পৃথিবীতে যত সমস্যা তা অনৈক্যের কারণে। পৃথিবীর যত অর্থ সম্পদ তার ১০০ ভাগের এক ভাগ মানুষ ভোগ করেছে বাকি বা করছে ৯৯ ভাগ ব্যায় হয়েছে বা হচেছ অনৈক্য সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনকল্পে। এনৈক্য থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ, শোষন জুলুম নির্যাতনের উৎপত্তি। আর মানব জাতির সমগ্র কর্মক্ষমতা কাজে না লাগাতে দেওয়া ক্ষমতার অপচয় অপব্যবহার অর্থের অপচয় অপব্যবহার দেশ ধ্বংস মানুষ ধংস অর্জিত সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস এসব কিছুর উৎপত্তি মানব জাতির অনৈক্য থেকে।

তাই মানব জাতির ঐক্যের জন্য পবিত্র কালামে পাকে কালেমায়ে তৈয়্যেবার মাধ্যমে আহবান যানানো হয়েছে।

বলা হয়েছে কোন মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তার প্রিয় নবী ও রাছুল।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সঠিক পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্বে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান যানানো হয়েছে কালেমায়ে তায়্যেবায়। কিন্তু মানব জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়নি। তার জন্য ব্যার্থতা মুসলমানদের। হুজুর পাক (দঃ) এর ওফাতের পর ইহুদীবাদীদের প্ররোচনায় মুসলমানরা দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যায়। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব সংঘাত আর অনৈক্য অব্যাহত রয়েছে। মাঝে মধ্যে একটু ভাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আবার দ্বন্দ্ব সংঘাত। ইতিহাস জুড়ে এ হচেছ বাস্তবতা। তাই ঘর সামলাবে না ভাল কাজ করবে বা গঠন মূলোক কাজ করবে? মুসলমানদের সিংহাসনের তলে সব সময় আগুনের চুলা জ্বালানো ছিল। সব সময় ভয় আর আসংকা কখন ক্ষমতা যায় আর থাকে। মুসলিম ইতিহাস এরকমই তাই ভাল কিছু করা বা স্থায়ীভাবে কিছু করা সম্ভব হয়নি। তথাপি ইমানদার মুত্তাকি মুসলমানদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইসলাম এশিয়ার কিছু দেশে আফ্রিকার কিছু দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আর ইউরোপ আমেরিকাসহ কিছু

www.pathagar.com

কিছু দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আর অধিকাংশ দেশে উল্লেখ করবার মত নয় এমন সংখ্যক লোকের মধ্যে ইসলাম পৌঁছেছে। অথচ মুসলমানদের দায়িত্ব হলো পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের আদর্শ পৌঁছে দেওয়া শুধু বানী নয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে মুসলমান করার জন্য প্রত্যেকের কাছে ইসলামের বানী, ইসলামের আদর্শ ও কল্যান পৌঁছে দিয়ে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো হচেছ মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। অথচ মুসলমানরা সে দায়িত্ব তো পালন করছেই না বরং নিজেরা শিয়া ছুন্নি খারেজি রাফেজী মোতাজেলা আহলে হাদিস করে নিজেরা নিজেদের মসজিদে বোমা মেরে মুসল্লি হত্যা করে আসছে এবং করছে। এই হচেছ মুসলমানদের অবস্থা। মুসলমানরা যদি ইসলামের বানী, ইসলামের মহান আদর্শ মডেল, মানব জাতির কাছে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারতো তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান মানুষ ইসলামের মহান আদর্শ গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেত। যাহক দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এখনই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের আমিয় বানী পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের সুমহান আদর্শ নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে মুসলিম যুবক মুজাহিদদের। ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম কল্যানের ধর্ম ইসলাম সত্য ধর্ম ইসলাম অকল্যান ও অশান্তি প্রতিরোধের ধর্ম এই বানী মানব জাতির কাছে এখনই পৌঁছে দিতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে মুসলিম নর নারী আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ পাক আহবান জানিয়েছেন মানব জাতির ঐক্য ও শান্তির। এ আহবান মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব মুসলমানদের। এ দায়িত্ব পালন না করলে রোজ কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মুসলিম জাতিকেই কৈফিয়ত দিতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এর উম্মাত হিসাবে এ দায়িত্ব আমাদেরকেই পালন করতে হবে। মানব জাতিকে সত্যের পথে কল্যানের পথে ঐক্যের পথে আমাদের আহবান জানিয়ে তা কার্যকর করতে হবে। মানব জাতি ইসলামের এ ঐক্যের আহবানে সাড়া দিয়ে যদি এক কাতারে সামিল হয় তাহলে মানব সভ্যতার নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে, পৃথিবীটা ভূস্বর্গে পরিনত হবে।

www.pathagar.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শের সফল প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্বের সকল প্রচার মাধ্যমের ৯০% এরও বেশি নেটওয়ার্ক। তাদের যা ইচ্ছা, যা পরিকল্পনা, তা একযোগে পরিকল্পিত উপায়ে তাদের প্রচার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একযোগে প্রচার করা হয়। তাদের তৈরি করা নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা আছে। প্রচারের সাথে সেইগুলো স্বাভাবিকভাবে যুক্ত করা হয়। যেমন- সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসবাদ দমন, মৌলবাদ, মৌলবাদী ইত্যাদি। এগুলোর সাথে আরো যোগ করা হয় ফতোয়া, ফতোয়াবাজী, ধর্মীয় আদর্শ বলতেই যা বুঝানো হয়। মধ্যযুগীয় বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ইত্যাদি। ইসলামী স্বাধীকার, বা স্বাধীনতার আন্দোলনগুলোকে তারা বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নেতৃবৃন্দকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বা সন্ত্রাসী নেতা হিসাবে। এভাবে যে বহুমুখী সব কলা-কৌশল তারা অবলম্বন করে থাকে সেইসব কলা কৌশলের প্রেক্ষিতে উদ্ভুত পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন মাধ্যমে এবং বহুমুখী প্রচার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। বিশ্ববাসীর চোখের ঘুম হারাম করেছে এই সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশ্বটাকে চরম অস্থিতিশীল করে রেখেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানী, ধর্ষনসহ এমন কোন অপকর্ম নেই যা তারা করছেনা। এক কথায় পৃথিবীটাকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগি করে রেখেছে। এঅবস্থা থেকে উত্তরন ঘটিয়ে তাদের গৃহীত সকল কলাকৌশল এবং প্রচার মাধ্যমের উপযুক্ত মোকাবেলা করার মত বিশ্বব্যাপী প্রচার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। সর্বাধুনিক প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রচারের উপর বিপ্লবী আন্দোলন এবং গন অভ্যুত্থানের অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই বিশ্বের সকল বেতার টেলিভিশন পত্র পত্রিকা, পোষ্টার ব্যানার ফেস্টুন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে প্রচারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। আর প্রচার করতে হবে পত্র পত্রিকায়, বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে। এছাড়া সারা পৃথিবীতে পাড়ায় মহল্লায় ঘরে ঘরে আদর্শ সুশিক্ষিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী দিয়ে সার্বক্ষনিক প্রচার চালাতে

www.pathagar.com

হবে। বিশ্বের সব টিভি চ্যানেলে এ্যাকাধীক আদর্শ ভিত্তিক টকশো করতে হবে প্রতিদিন। এইভাবে বহুমুখী প্রচার মাধ্যমে পরিকল্পিত ইসলামী আদর্শ প্রচার এবং দৈনন্দিন বিশ্ব সমস্যা তুলে ধরে, তার সমাধানের দিক নির্দেশনা দিতে হবে প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে। মূল আদর্শ ও দর্শন ছাড়াও প্রতিপক্ষের প্রচারের মোকাবেলা প্রতিদিন নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়ে বিশ্বে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচার নেটওয়ার্ক এবং তার অধীনে মহাদেশীয় এবং দেশীয় প্রচার সেল তৈরীর মাধ্যমে সুন্দর একটি বিপ্লবী প্রচার সেল গঠন করে প্রচার চালাতে হবে। আর এ সবই পরিচালনা করতে হবে বিপ্লবী আদর্শের কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতৃত্বে। প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী বিশ্বের প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যমে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একাজে প্রতি ঘন্টার জন্য একটি করে গ্রুপ প্রত্যেক মিডিয়াতে প্রস্তুত থেকে যথাযথ জবাব এবং দিক নির্দেশনা মূলোক বক্তব্য (যা কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই প্রাপ্ত) প্রদান করবে। বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলিতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পন্থায় এবং পদ্ধতিতে যদি প্রচার চালানো যায় তাহলে অতি অল্প সময়ে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদের দেয়াল ধসে পড়বে। সেখানেই নির্মিত হবে নতুন শান্তির অট্টালিকা। যার মাধ্যমে বসবাস করবে শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী। আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ববাসীর চরিত্র হনন করছে এবং মানব জাতিকে ভুলপথে পরিচালনা করছে। তাই যুগের দাবি হচেছ সাম্রাজ্যবাদীদের ভোগ বিলাসের সংস্কৃতিতে সম্মানিত নারী জাতিকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং সাথে সাথে ইসলামী সংস্কৃতি এবং সভ্যতার এক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী তার সফল প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার যুগান্তকারী সংযোজন ঘটিয়ে সুসভ্য মানব জাতি করে গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার প্রতিকার

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা পরিকল্পিত উপায়ে একটি একটি করে মুসলিম দেশ বিভিন্ন অজুহাতে দখল করতে চায় তার প্রমান হিসাবে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। প্রথমে টুইন টাওয়ার নিজেরা ধ্বংস করে মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে আফগানিস্তান আক্রমন করল। তাদেরকে লাদেনের সহযোগিতার অপরাধ আর মহিলাদের বোরখা পরার অপরাধে আফগানিস্তানকে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর বিমান থেকে বৃষ্টির মত বোম্বিং করে গুড়িয়ে দিল। মহিলাদেরকে বোরখার ভিতর থেকে বের করে জোরপূর্বক ধর্ষন করে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার শিক্ষা দিল। এর পর দেশটির উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রইল। ভোট বিহিন নির্বাচন করে শৈরাচারের মানষপুত্র পৃথিবীর নিকৃষ্ট দালাল কারজাইয়ের মাথায় একটি টুপি পরিয়ে মুসলমান সাজিয়ে আফগানিস্তানের শাসক বানিয়ে দেশটি পরিচালনার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। এরপর ইরাকে আনুবিক অস্ত্র এবং রাসায়নিক অস্ত্র আছে বলে এবং লাদেনের সহযোগিতার কথা বলে ইরাক আক্রমন করল বুশ ব্লেয়ার বাহিনী। এই সব খোড়া অজুহাত মার্কিনীরা এবং ইউরোপিয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দরা মিথ্যা প্রমান করল যা বিশ্ববাসীর সামনে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলোক ভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ইরাক আক্রমন ঠেকানো গেলনা। তারা ইরাক আক্রমন করে মার্কিন এবং ন্যাটোবাহিনীর যুদ্ধ বিমান থেকে ইরাকে বোম্বিং করে ইরাকের দালান কোঠা, ঘরবাড়ী আবাল বৃদ্ধ বনিতা নারী শিশু ও নীরিহ বেসামরিক লোকগুলিকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিসিয়ে দিল। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে বন্দি করল, বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করলো। বিশ্ব বিবেক চেয়ে চেয়ে দেখল, ডুকরে কেঁদে উঠল, কিন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের অপ্রতিরোদ্ধ এই আগ্রাসন থেকে ইরাকীদেরকে রক্ষা করতে পারলোনা। কোন অপরাধ ছাড়াই আফগান এবং ইরাকীদের শাস্তি দেওয়া হল। নির্মূল করা হল, দুইটি মুসলিম দেশের নীরিহ মুসলিম নাগরিকদের। কিন্তু বুশ ব্লেয়ারের বিচার হল না, তাদের ফাঁসি দেওয়া হল না। নূরী আল মালিকির মত

www.pathagar.com

একটি সাম্রাজ্যবাদী দালাল কে ভোট বিহিন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসিয়ে ইরাকীদের গনতন্ত্র, এবং গণহত্যা চালিয়ে মানবাধিকার ধুলিস্যাত করে দিয়ে মানবাধিকার শিক্ষা দেওয়া হল। বিশ্ববাসী বুঝে ও না বুঝার ভান করে রইল। ইরান মনে করল সাদ্দাম ছুন্নি মুসলমান ওকে মারে মারুক। আমাকেতো আর কিছু বলছেনা। আসলে শিয়া আর ছুন্নি বলে কোন কথা নেই। মুসলমান মুসলমানই। এরা ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের শত্রু। শিয়া ছুন্নি উপাধি ইহুদীদেরই দেওয়া। মুসলমান কখনও শিয়া এবং ছুন্নি হয়না। রাছুল (দঃ) এবং খলিফাতুল মুসলিমীনরা শিয়া ও ছুন্নি ছিলেন না। পরবর্তীতে ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির জন্য ২টি প্রধান ফেরকাসহ আরো অনেক গুলি ফেরকা তৈরী করে দ্বন্দ্ব সংঘাতও বাধিয়ে দেয়। আজও সেই কাজটিই তারা করে চলেছে। ইরাকের শিয়া মসজিদে, ছুন্নি মসজিদে, ইহুদী চর দিয়ে বোমা মারিয়ে সংঘাত বাধিয়ে দিচেছ। আর বোকা শিয়া এবং বোকা ছুন্নিরা কানে হাত না দিয়ে চিলের পিছনে ছুটে, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করে মরছে। এখন মুসলমানদের প্রধান কাজ হচেছ শিয়া ছুন্নি ঐক্য গড়ে তোলা এবং যৌথভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবেলা করা। এছাড়া মুসলমানদের বাচার আর কোন পথ খোলা নেই। যাহক যা বলছিলাম তা হল ব্রাক্ষ্মানী স্টাইলে একটি একটি করে মুসলিম দেশ হামলা করছে সাম্রাজ্যবাদীরা, আর অন্য মুসলিমদেশ গুলিকে বলছে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। সন্ত্রাসী দমনে তোমরা আমাদের সাথেই থাক। আমরা তোমাদের কে কিছু বলবনা। কিন্তু বোকা মুসলমানরা বোঝার চেষ্টা করছে না যে স্পেনে যেভাবে মুসলমানদের কে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নারী শিশু সহ সমস্ত মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও,আই,সি ভূক্ত সব মুসলিম দেশগুলিকে নিবৃত্ত রেখে, একটি একটি করে দেশকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আক্রমন করে দখল করে নিয়ে ভোট বিহীন দালাল সরকার বসিয়ে বিশ্বের সব মুসলিম মহিলাদের বোরখা খুলে জোর পূর্বক ধর্ষন করে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করছে। মুসলিম ভাইয়েরা এখনও সময় আছে শিয়া ছুন্নি ছাড়ুন, ডান বাম ছাড়ুন। ইহুদীবাদী মার্কিনীদের দালালী ছাড়ুন, নইলে কেউ বাচতে পারবেন না। একে একে সবাইকে ধরবে। এখনও ভুলের মধ্যে আছেন, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন সব মুসলমান আল্লাহর বান্দা রাছুল (দঃ) এর উম্মাত, পবিত্র কোরআনের

www.pathagar.com

আদর্শ নিয়ে এক কাতারে সামিল হোন, ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সাধারন মানুষ এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। রাশিয়া, চীন, ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণকে মানবতার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ করুন।

এশিয়াকে মুসলিম বিশ্বের পাশে দাড় করানোর জন্য খুব বেশী কষ্ট করা লাগবেনা। ইতিমধ্যে মার্কিনীদের অভিশাপ জর্জ ডব্লিউ বুশের বেপরোয়া নীতির বিরুদ্ধে রাশিয়া চীন এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ সোচচার হয়ে উঠেছে। এই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হলে সর্বপ্রথম নিজেদেরকে শিয়া ছুন্নি ভুলে গিয়ে আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মাত ও আল কোরানের আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রথমে ইহুদীবাদীদের প্রতিরোধ এবং উৎখাত করতে হবে। তারপর মতভেদ থাকলে আলোচনা করে ফায়ছালা করা যাবে। মৃত্যুর পরে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন তুমি মুসলমান ছিলে কিনা? শিয়া কি ছুন্নি তা জিজ্ঞাসা করা হবে না। তাই আসুন দলমত জাতি ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে মুসলিম জাতি সর্ব প্রথম ঐক্যবদ্ধ হই, তারপর এশিয়ার বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলি। আমেরিকা ইউরোপের সাধারন মানুষকে সাথে নিয়ে মানবতার শত্রু ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। পৃথিবীর মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেই শয়তানী শক্তিকে চিরদিনের জন্য।

আর এ জন্য ইতিমধ্যেই আওয়াজ উঠা শুরু করেছে। এই সেদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ইং পর্যন্ত এ বিষয়ে কয়েকটি সংবাদ তুলে ধরা হল। দৈনিক যুগান্তরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্প্রতিক একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইরাকের পর ইরান আক্রমনের জন্য অজুহাত তৈরী করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ন্যাটো বাহিনীকে সাথে নিয়ে এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচেছ। যে কোন মুহুর্তে ইরান আক্রমন করতে পারে। এরপর আক্রমন করবে পাকিস্তান। তার জন্যও অজুহাত তৈরী করা হচেছ। এরপর একে একে মুসলিম বিশ্বের সবকটি দেশে হামলা করে গণতন্ত্র আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেখাবে গণতন্ত্র কাকে বলে এবং মানবাধিকার কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি। এখনও সৌদি আরব

www.pathagar.com

কুয়েত সহ মুসলিম দেশগুলির শাসকরা ইসরাইলী ইহুদী আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ দালালী করে চলেছে। তাই ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য কিছু পন্থা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাহল ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিনীদের ঘাড়ে সোয়ার হয়ে বিশ্ব শাসন করছে। সাথে নিয়েছে ইউরোপীয়দের। এই দুইটি মহাদেশ কে ঐক্যবদ্ধ করে এই বৃহৎ দুইটি শক্তিকে সাথে নিয়ে এবং এশিয়ার শিল্পন্নত দেশ গুলিকে সাথে নিয়েছে। তারপর মুসলিম বিশ্বের সৌদি আরব কুয়েত সহ কতিপয় মুসলিম দেশের শাসকদের কে এক নং দালাল হিসাবে কাজে লাগিয়ে শিয়া ছুন্নি বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে ব্রাক্ষ্মানী স্টাইলে দুর্বল করে রেখে একটি একটি করে দেশ ধরে ধরে মারছে। এর বিপক্ষে রুখে দাঁড়াতে গেলে মুসলিম দেশগুলিতে শিয়া ছুন্নির বিভেদ তুলে দিতে হবে। সব মুসলমান ভাই ভাই বুশ ব্লেয়ারের ফাসি চাই এই শ্লোগানে বিশ্ব মুসলিমকে এক কাতারে দাড় করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের শাসকরা ইহুদীদের দালালী করলেও মুসলিম বিশ্বের জনগনকে এক কাতারে আনতে হবে। একই শ্লোগানে মুখরিত করতে হবে মুসলিম বিশ্ব। এরপর দুই তৃতীয়াংশ জন বসতির এশিয়ার বৃহৎ শক্তি রাশিয়া, চীন, ভারত এবং মুসলিম বিশ্বের সমন্বয়ে একটি নতুন এশিয়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এশিয়ার অন্যান্য দেশকে সাথে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের মত এশিয় ইউনিয়ন বা এশিয়া ফেডারেশন গঠন করে এক মুদ্রা ও বাজার সৃষ্টি করতে হবে। আমেরিকা এবং ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ যুদ্ধের বিপক্ষে তাই ঐ দুই মহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এবং আদর্শবাদী কিছু নেতৃবৃন্দের সমর্থন পাওয়া যাবে। কারণ মাঝে মধ্যেই সেখানে যুদ্ধ বিরোধী মিছিল মিটিং শ্লোগান ঘেরাও কর্মসূচী দেওয়া হয় মানবতা বিরোধী এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য। সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ আসলে ইসলামী আদর্শ বিরোধী যুদ্ধ। ইহুদীবাদীদের নীলনক্সা অনুযায়ী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। নাম দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ। আসলে এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, অন্যান্য প্রতিনিধিরা এবং ইউরোপের নেতৃবৃন্দ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা চালিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। আসলে এ আলোচনা হচ্ছে অশান্তি সৃষ্টির আলোচনা। যখন শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করতে যায়

www.pathagar.com

তখন এ শয়তানগুলো এসে শান্তির পথে বাধ সাধে। এসে বলে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, শান্তি সৃষ্টি করতে হবে। আসলে ওদের শান্তি মানেই অশান্তি আর অশান্তি মানেই হলো শান্তি। ইবলিশ শয়তানের যে কাজ দুনিয়াতে অশান্তি করা সেই কাজটিই করছে আমেরিকা এবং ইউরোপে তথাকথিত সভ্য নামের অসভ্য নেতৃবৃন্দ। তাই বিশ্ব মুসলিম তথা মানবতাবাদী বিশ্ববাসীকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

এ আন্দোলন এ ঐক্য আজ এশিয়া মহাদেশের সময়ের দাবী। এ আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে সবাই তা গ্রহণ করবে। এ অঞ্চলে জাপান, চীন, রাশিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যার যা সম্পদ আছে তা নিয়ে উন্নয়নের সমন্বিত প্রোগ্রাম করতে হবে। কারো প্রযুক্তি কারো প্রাকৃতিক সম্পদ, কারো মানব সম্পদ, এসব কিছু কাজে লাগাতে পারলে বিশ্ব শাসন করবে এশিয়া। কেন এশিয়ানদের কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী করতে হবে। এশিয়া ফেডারেশন করে এক মুদ্রা এক বাজার ট্রানজিট সুবিধা সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারলে অতিদ্রুত বিকশিত হবে এশিয়ার অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি সহ সমাজ সভ্যতা। এর সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আহবান জানানোর সাথে সাথে যুক্ত হবে আফ্রিকা মহাদেশ। তারা যুগ যুগ ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। আফ্রিকায় রয়েছে প্রচুর পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদ, আর মানব সম্পদ। মানব সম্পদ এখন তাদের জন্য সমস্যা হয়ে আছে। তাদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষন দিয়ে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে এশিয়া আফ্রিকা জোটের দেশগুলির শিল্প কলকারখানায় কাজে লাগিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া আফ্রিকায় শিল্প বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। যুদ্ধের হুমকি তখন কমে যাবে। মার্কিনীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ইহুদীদের গুলি করার রাজনীতি তখন বন্ধ হয়ে যাবে। তখন এশিয়া আফ্রিকার সম্পন নিয়ে মার্কিনীদের কোষাগার পূর্ণ করার প্রবনতা এবং সুযোগ থাকবেনা। তখন মার্কিন অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে। পরের টাকায় পোদ্দারী করা ফাও মাদবরী করা, অজুহাত খাড়া করে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তা মিটানোর জন্য মোড়ল গিরি করার সময় ফুরিয়ে যাবে। তখন এশিয়ানরা হবে বিশ্ব শক্তি। ইউরোপিও এবং মার্কিনীরা এশিয়ার নেতাদেরকে বলবে বিশ্ব নেতা। এশিয়ার

www.pathagar.com

চীন, রাশিয়া, ভারত, জাপান এবং মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি দেশ এবং অবিভক্ত কোরিয়া দিবে বিশ্ব নেতৃত্ব। তখন যেমন কথায় কথায় মার্কিনীরা ইউরোপিওদের সাথে নিয়ে এশিয়ার দেশগুলিতে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে মোড়লগিরি আর শালিশ দরবার করতে আসে ঠিক তখন এই ভাবে এশিয়ার নেতারা আমেরিকা ও ইউরোপ শাসন করবে। শুধু বুদ্ধির অভাবে ঐক্য হচেছনা। ঐক্য হলেই শক্তি হবে। আর শক্তি হলে শাসন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে এখন যেহেতু এশিয়ার নেতারা সোচছার হয়ে উঠেছে, তাই এখনই সময়। ঐক্যের আহবান যানালেই তাতে সাড়া পাওয়া যাবে। যেহেতু মুসলিম বিশ্বের সমস্যা এখন প্রকট। তাই মুসলিম দেশ ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার মত দেশগুলি থেকে আহবান যানানো দরকার। এ ব্যাপারে ইরান এবং পাকিস্তান প্রধান উদ্যোক্তা হলে ভাল হয়। কারণ এই দুইটি দেশ যে কোন মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদীরা পরপর আক্রমন করবে। সময় হাতে নেই। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচেছ। এখনই আহবান জানানো উচিৎ। এ ব্যাপারে এই দুই দেশের নেতারা এখনই এশিয়ার প্রধান শক্তিধর দেশগুলি ছফর করে আহবান জানাতে পারেন। আহবান জানালে ফল পাওয়া যাবে। এছাড়া আমেরিকা ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ এবং নেতৃবৃন্দ ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ধংষাত্বক যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসকে পছন্দ ও সমর্থন করেনা তার প্রমান সে দেশের নেতৃবৃন্দরা এবং জনগন আন্দোলন, সংগ্রাম করে বক্তব্য, বিবৃতি, দিয়ে প্রমান দিয়ে চলেছেন। বিশ্বে এখন ২ টি ধারা চলছে। একটি ন্যায় আর একটি অন্যায়। ন্যায়ের পক্ষে বিশ্ববাসী অন্যায়ের পক্ষে মুষ্টিমেয় ইহুদীবাদী অস্ত্র ব্যবসায়ী ও কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী দালালরা রয়েছে। তথাপী এ মুষ্টিমেয় ষঢ়যন্ত্রকারীদের কাছে বিশ্ববাসী আজ জিম্মি। ওদের বুদ্ধি, ওদের চাতুরতা, ওদের ষঢ়যন্ত্রের কাছে, বিশ্ব মানবতা আজ ভুলন্ঠিত। বিশ্বমানবতা পুনরুদ্ধারের এ কৌশল প্রয়োগ করে দেখুন ফলাফল অতিদ্রুত পাওয়া সম্ভব। আসুন মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করি, এত ক্রন্দন, এত অশ্রু, এত আর্তচীৎকার আর সহ্য করা যায় না। জাতীসমূহের সরকারগুলি মূলোতঃ ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। তাই আসুন রাষ্ট্রীয় ঐক্য এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশীয় ঐক্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার বিরূদ্ধে মুসলিম বিশ্বে এবং পাশাপাশি সর্বপ্রথম এশিয়া এবং আফ্রিকার

www.pathagar.com

জনগণকে এক দুই মহাদেশের ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী দালাল সরকার সমূহের বিরুদ্ধে মানব জাতির বিরুদ্ধে শোষণ জুলুম নির্যাতন নিপিড়ন ধর্ষন হত্যা জাতি নির্মূল সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে ভূলুণ্ঠিত মানবতা পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করি। গড়ে তুলতে হবে বিপ্লবী আন্দোলন বিশেষ করে এ আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে সর্ব প্রথম গতি পাবে এবং আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। সেই জোয়ারের প্লাবনে মুসলিম বিশ্বের বিগত দেড় হাজার বছরের ইহুদীদের দালাল সরকারগুলি বা পা চাটা কুত্তাগুলি ভেসে গিয়ে যার যার দেশের নিকটবর্তী সাগরের ঢেউয়ের সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের এবং এদের বংশধরদের ঐ বিষাক্ত রক্ত আর কোনদিন রোজ কিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে খুজে পাওয়া যাবে না। এরপর মুসলিম নেতাদের আহবানেই এবং বিপ্লবী বীর মুজাহিদদের বিপ্লবী আন্দোলন এবং জিহাদে শরিক হবে উল্লেখিত এশিয়া আফ্রিকার দেশ ও ইউরোপ আমেরিকার সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানবতাবাদী মানুষগুলি। এজন্য প্রথম আহবান মুসলিম নেতাদের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। সেজন্য অতিসত্তর স্বল্প সময়েই এবং রাছুল (সঃ) এর ভবিষ্যত বানীর সেই মহান নেতার আগমন ঘটতে যাচেছ যা এখন শুধু অল্পকিছু সময়ের ব্যাপার। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, অন্যায় কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। ন্যায়ের বিজয় এবং প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, এবং সুনিশ্চিত।

www.pathagar.com

ষড়বিংশ অধ্যায়

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদের পাপের ফল ঝরে পড়ার অপেক্ষা

কোন ফল যখন পেকে যায় তখন সে ফলটি স্বাভাবিকভাবেই আর গাছে থাকতে পারে না, সে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। তেমনি ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ফলও পেকে গেছে। তাই গাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়বে।

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাপি অন্যায় অত্যাচার, শোষন, নিপীড়ন, নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধংসের বিভীশিখার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মানব জাতির বসবাসের অনুপযোগী করে রেখেছে বিশ্বটাকে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী, ইহুদীবাদীদের মোনাফেকি, আর ধোকাবাজি, বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববাসী তাদের ধোকা আর মোনাফেকি করার সুযোগ আর দিবে না। ওদের ধোকাবাজির পথ এখন স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। ওরা মানুষের কাছে ধোকা দেওয়ার সুযোগ আর পাবে না। ফল পেকে গাছ থেকে যেভাবে ঝরে পড়ে ঠিক তেমনিই ওদের মোনফেকি আর ধোকার কারণে পাপের ফলে পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর মানুষ থেকে ওরা বিচিছন্ন হয়ে ঝরে পড়বে।

ধোকাবাজির পথ আজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর দেশে দেশে ওরা তাবেদার সরকার বসিয়ে রেখেছে। এখন পৃথিবীর শোষিত বঞ্চিত মানুষ বিশ্বের দেশে দেশে ওদের তাবেদার সরকারগুলোর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। সেইদিন আর বেশি দূরে নয়, যে দিন পৃথিবীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিশ্ববাসী মুসলমানদের হাতে তুলে দিবে। ইসলামের মহান আদর্শ হবে বিশ্বমানবমন্ডলীর পরিচালনার একমাত্র দর্শন। আজকের ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক কারণেই মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরম দয়ালু ও দাতা, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন কর্তৃক-প্রদত্ত মহা বৈজ্ঞানিক বিধান ইসলামই মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণের জন্য, বিশ্ব ব্যবস্থাপনার একমাত্র দর্শন হিসাবে, বিশ্ব পরিচালনায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে।

www.pathagar.com

উৎখাত হবে ইহুদীবাদী, শয়তানী মার্কা ধোকাবাজি মোনাফেকির নীল নক্সার মানব বিধ্বংসী শোসণ ও নির্যাতনমূলক সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের। সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও কল্যানের মহান আদর্শ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ইসলাম। প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বজনীন মানবাধিকার। ধ্বনিত হবে না আকাশে বাতাসে অবিরল অত্যাচারীতে ক্রন্দর রোল। পৃথিবীটা অনুভূত হবে ভূস্বর্গ হিসেবে। জ্বলন্ত কড়াইতে আর নিরীহ মানুষকে কখনও ভাজা হবে না। ফুটন্ত পানিতে মানবতাকে চুবিয়ে আর হত্যা করা হবে না। ইসলামের মহান আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিটি ব্যক্তি, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র আর বিশ্ব সমাজ পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম প্রীতির বন্ধনে হবে আবদ্ধ, পৃথিবীতে রচিত করবে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে প্রাণহীন আধুনিক সভ্যতা। প্রাণ পাবে যান্ত্রিক সভ্যতার ফসিল। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রিয় সৃষ্টি পাবে স্বার্থকতা। ফুলে ফলে সুভাষিত ও সুশোভিত হবে বসুন্ধরা। অত্যাধুনিক মরনাস্ত্র হবে ধ্বংস। পৃথিবীর সকল অর্থ বিনিয়োগ হবে মানবতার কল্যাণে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্পদ গুটি কয়েক মানুষের কাছে থাকবে না পুঞ্জিভূত। অর্ধাহারে অনাহারে মরবে না কোন মানব সন্তান তার পিতামাতার সামনে। সৃষ্টি হবে না কোন হৃদয় বিদারক দৃশ্য। সাম্য শান্তি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্ব মানবমন্ডলী হবে আবদ্ধ। মানুষ মানুষের মনিব আর মালিক থাকবে না। মানুষ হবে শুধু মানুষেরই জন্য।

মহান সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র মানুষের মালিক বা মনিব হিসেবে বিশ্ববাসী বিবেচনা করবে। ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী হুংকারে বিশ্ববাসীকে আর সন্ত্রস্ত থাকতে হবে না।

বিশ্ববাসীর সেই কাঙ্খিত শান্তি স্বস্তি নিশ্চিত হওয়ার প্রত্যাশায় রইল আজ শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী। অন্যায় অসত্য অসুন্দরের হবে পরাজয়। ন্যায় সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠিত হবে এই মাটির পৃথিবীতে। এটাই নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের প্রত্যাশা। বঞ্চিতদের এ আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে বিজয় শু সময়ের ব্যাপার বিজয় সুনিশ্চিত ইনশাল্লাহ। নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়াফাত হুন ক্বারির।

www.pathagar.com

সপ্তবিংশ অধ্যায়

একবিংশ শতাব্দী হবে মানব জাতির শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, কল্যাণ ও গৌরবের

সারা পৃথিবী এখন পরিণত হচেছ এক গ্লোবাল ভিলেজে। দেশে দেশে মানুষে মানুষে দূরত্ব কমে যাচেছ। অপরিচয়, ব্যবধান কমে আসছে। এক দেশের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে আরেক দেশের মানুষ। ভাষাগত, আচার-ব্যবহারগত পার্থক্যও কমে আসছে মানুষের। ধীরে ধীরে এ পৃথিবী সকল মানুষের হয়ে উঠছে। সারা পৃথিবী যেন হয়ে উঠছে মানুষের নিজের দেশ। মানুষে মানুষে ভাষা ও সংস্কৃতির এ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বিশ্ব সভ্যতার উন্নতিও ত্বরান্বিত হচেছ। মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছে বিশ্বনাগরিক। ফলে এক দেশের মানুষ শিখছে অন্য দেশের ভাষা। অর্থনীতিই শুধু নয়, ভাষা ও সংস্কৃতিও মানুষের জীবনের আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে। এক-দেড় দশক আগেও যেসব শব্দ আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল এখন সেসব শব্দ আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক শব্দ হয়ে উঠছে। এসএমএস, ইন্টারনেট, ই-মেইল, সফটওয়্যার এসব শব্দের সঙ্গে আমাদের প্রায় কোন পরিচয়ই ছিলো না। আজ গ্রামের সাধারণ মানুষও এসএমএস, ই-মেইলের অর্থ বোঝে। এভাবে বোধহয় সব সময় এ পরিবর্তন লক্ষ্য করি না, কিন্তু আমাদের অজান্তেই এই ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটছে। আর এ পরিবর্তনের মূলে আছে বিশ্বায়নের নতুন চিন্তা।

আমাদের দেশের মানুষ খাল-বিল-ডোবা থেকে ধরতো ট্যাংরা, খলশে, পুঁটি মাছ, বর্ষা মৌসুমে কিনতো পদ্মার ইলিশ, এখন তারাই কেনে সিলভার কাপ, নাইলোটিকা, কারফু। কয়েক দশক আগেও এ দেশের মানুষ এসব মাছের নামই জানতো না। এখন নালইলোটিকা, সিলভারকাপ তাদের মুখে মুখে। এই কাঁঠালচাঁপা, রজনীগন্ধা, কদম কেয়ার দেশে এখন কতো জাতের বিদেশী ফুল। এভাবেই এক দেশের ফুল, এক দেশের ফল অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে। একেই বোধহয় বলে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়। গত শতকের শেষ দিক থেকেই পৃথিবী জুড়ে এ ভাব-বিনিময়, লেনদেন ও আদান-প্রদান শুরু

www.pathagar.com

হয়েছে। মানুষ হয়ে উঠছে একই সঙ্গে নানা দেশের নাগরিক, সারা পৃথিবীর মানুষ। কবির ভাষায়, 'দেবে আর নেবে, মিলিবে-মেলাবে'- একুশ শতকের পৃথিবীর এ হচেছ মর্মবাণী।

বিশ্বমানুষের জন্য এই আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা খুব অল্প সময়ের নয়। ইসলাম আন্তর্জাতিকবাদের চেতনা বিগত দেড় হাজার বছর মানব জাতির সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্পদ তা যেই মানুষেরই হোক বা যেই দেশেরই হোক তা পৃথিবীর সকল মানুষেরই সম্পদ, এ মতবাদ এ মতাদর্শ প্রথম ঘোষিত হয় আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের মরুভূমির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক। এই ঘোষণার পর প্রায় অর্ধেক পৃথিবীব্যাপি তা বাস্তবায়িত হয়। খলিফাতুল মুসলিমীনদের সময় পর্যন্ত তার মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য সহ বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে তা ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যাহত হয়। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের মধ্যে নানা ফেরকা বা উপদল সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও সংঘাতের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে দেয়। যার দরুন গোটা পৃথিবীতে সেই ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ বাস্তবায়িত হতে পারে না। তবে আন্তর্জাতিকতাবাদের এ আহবান মুসলমানরা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। তাই আজও দুনিয়ার সব অমুসলিম দেশে ও দলে দলে অমুসলিমরা ইসলামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। তবে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারনা সেই দেড় হাজার বছর পূর্বের ধারণা নিয়েই তথ্য প্রযুক্তি এই চরম উৎকর্ষতার যুগে এসে তা পূর্ণতা লাভ করতে যাচেছ। এখন তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের সেই মহান আদর্শ সাথে না থাকায় ইহুদীবাদী শয়তানদের বিভেদ নীতি মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব আর ভালবাসার নীতি পরিহার করে হিংসা আর বিদ্যেশের নীতি গ্রহণ করায় গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা বাস্তবায়নের পক্ষে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। বিশ্ববাসীকে বিশ্বায়নের স্বাদ পেতে হলে মানুষে মানুষে বিভেদ রাখলে চলবে না। মানুষকে ভালবাসতে হবে কাছে টেনে নিতে হবে। একের দুঃখে অন্যকে ব্যথিত হতে হবে এসে দাড়াতে হবে তার পাশে। মুখে বিশ্বায়ন বোগলে ইট থাকলে চলবে না। আমার কাছে অস্ত্র থাকবে অন্যেরা থাকবে নিরস্ত্র। আমি খেয়ে থাকব আর অন্যেরা থাকবে অনাহারী সাম্রাজ্যবাদীদের এ দ্বিমুখী নীতি থাকলে চলবেনা। সবার প্রতি সমান

www.pathagar.com

ব্যবহার সমান অধীকারের নীতি বিশ্ববাসীর জীবনে বাস্তবায়িত হতে হবে। তাহলেই বিশ্ব হবে গ্রাম। বিশ্বের মালিক পরম দয়ালু ও দাতা মহান সৃষ্টিকর্তার এ সংসারের সকল মানুষ নিয়েই তার বিশ্ব সংসার। এর মধ্যে কেউ তার আপন কেউ তার পর নয়। তার কাছে সাদা কালো ধণী-নির্ধন নেই। পিতার কাছে কানা খোড়া সাদা কালো সব সন্তান যেমন সমান তেমনি সৃষ্টিকর্তার কাছেও মানুষ মাত্রে সবই সমান। তাই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশ্ব সংস্কারকদের এই রকম ধারনা আর আদর্শ এবং মমত্ববোধ নিয়ে কাজ করলেই বিশ্বায়নের আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব। লেনিন রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তাহীন নাস্তিকতাবাদী সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়। নানা কারণে এ আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ পৃথিবীব্যাপী সেভাবে প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। বরং গত শতকের পঞ্চাশ-ষাট ও সত্তর দশকব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যদিয়ে দেশে দেশে মানুষে মানুষে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভেদ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে উত্তেজনা। গানবোট ডিপ্লোমেসি, স্টারওয়ার পৃথিবীর জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে থাকে। বিশ্বশান্তি এসে দাঁড়ায় হুমকির মুখে। এ উত্তপ্ত সংঘাতময় বিশ্বে আন্তর্জাতিকতাবাদের তত্ত্ব সেভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি সত্য, কিন্তু এ মৌল প্রেরণা শেষ পর্যন্ত বিশ্বায়ন নীতির ভিত্তি রচনা করেছে। পৃথিবী থেকে এখন স্নায়ুযুদ্ধের যুগ শেষ হয়েছে, দেশে দেশে মানুষে মানুষে সন্দেহ-অবিশ্বাসও কমে এসেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপনের ফলে গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চালু হয়েছে অভিন্ন মুদ্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছে আসিয়ান, আফ্রিকায় আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে বাড়ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও লেনদেন। এসবই এক সহযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করার নিদর্শন। একুশ শতকের বিশ্বে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি দেশই নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করছে। এ উদ্যোগের সঙ্গে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি আজ সময়ের দাবি। এই দাবি সামনে রেখে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোও তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে। এ যুগে কোনো দেশের পক্ষেই একলা

www.pathagar.com

চলার নীত অনুসরণ করে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের এই সহযোগিতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রতিটি দেশেরই কাজে লাগানো উচিত। অবাধ বাণিজ্য, অবাধ জ্ঞানচর্চা ও অবাধ বিজ্ঞান প্রযুক্তির খোলামেলা পরিবেশ তৈরী হলে তাতে মানুষের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে অবাধ তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজকের দিনে কোনো দেশের পক্ষেই বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। অবাধ তথ্য প্রবাহ এই উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চার পথকে আরো প্রশস্ত করেছে। এই মুক্ত বিশ্বের অবাধ জ্ঞানচর্চার সুফলকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর অনেক সমস্যা সমাধানের পথই সহজ হবে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আগামী এপ্রিলে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ চলছে। ইতোমধ্যেই সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সবচেয়ে বড়ো কথা দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনে ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে এবং এসব দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে- একথা নিঃসন্দেহই বলা যায়।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মূল সমস্যা দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য নিরসনে এই অঞ্চলের দেশগুলির মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। একুশ শতকের পৃথিবীর যে সাফল্য ও সমৃদ্ধি তার পাশাপাশি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে অবশ্যই এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা ও বিরোধ কমিয়ে আনতে হবে। সবার উপরে স্থান দিতে হবে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা। ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের মনে নতুন উপলব্ধি ও চেতনার জন্ম দিতে পারে। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ ও উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক লেনদেন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও এখনো এ অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের

www.pathagar.com

জীবন দারিদ্র্যসীমার নিচে। এই বাস্তবতার আলোকেই এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করতে হবে। দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগও এই অঞ্চলের বিশ্বমানের শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ যতোই আলোকিত ও উন্নত হয়ে উঠবে এ অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথও ততোই সুগম হবে। এজন্যই আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি আজ এতো গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও এশিয়ার অন্যান্য দেশ নিয়ে ইউরোপিও মডেলে এশিয় ইউনিয়ন অভিন্ন মুদ্রা ও বাজার সৃষ্টি করতে হবে। এশিয়াকে কার্যকরীভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়ার উপরে ছড়ি ঘুরানোর দিন শেষ হয়ে যাবে। তখন সম্মানজনক অবস্থান নিয়ে এশীয় নেতৃবৃন্দ আফ্রিকা মহাদেশকে সাথে নিয়ে এশিয়া আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বর্তমান জনসংখ্যার সমস্যাকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে এশিয়া আফ্রিকাকে একটি মহাশক্তি হিসাবে দাঁড় করানো সম্ভব হবে। তারপর এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার দিকে হাত বাড়ালে সে হাত ফিরত আসবেনা। তখন সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার মানুষকে সাথে নিয়ে গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব জাতির কল্যান সাধন করা সম্ভব হবে। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। কারণ আজ মুখে যারা বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র, আর মানবাধীকারের জিগির তুলে ফেনা বের করছেন তাদের বোগলে ইট। তারা ইহুদীবাদী মানবতার শত্রু অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পাঁচাটা দালাল বা তাবেদার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিচালক ইহুদী ব্যাংকার এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। তারা মার্কিনীদের পাশাপাশি ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার শিল্পন্নোত দেশের সরকারগুলো গঠন এবং পরিচালনায় ভূমিকা রাখছে। তাদের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্ব পরিচালনা করছে। তাই এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার, মানবাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন সাধন করে একটি ভূস্বর্গ রচনা করা সম্ভব। আসুন একটি মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে নতুন আলোর পথ দেখাই।

www.pathagar.com

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রণকৌশল

ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব শাসন এবং শোষণের অব্যাহত স্টিম রোলার গোটা মানব জাতির উপর চালিয়ে দেওয়ার কারণে বিশ্ব বাস্তবতা যা সৃষ্টি হয়েছে তা হচেছ বিশ্ববাসী আজ দিশেহারা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাল মন্দের সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পশুত্ব এবং মনুষত্ব বিদ্যমান। তাই মুসলিম উম্মাহ্র উপর ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের অব্যাহত অত্যাচার নির্যাতন হত্যা সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে দেখে বিশ্ব বিবেক আজ স্তম্ভিত ও হতবাক। কি করে **একটি জাতি নির্মূলের জন্য এই রকম অন্যায়ভাবে একটির পর একটি দেশে দখল গণহত্যা নির্যাতন চলতে পারে?**

তাই কতিপয় মুসলিম দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার শাসক গোষ্ঠী ছাড়া বাকি অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসক যারা আগে সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করতো তাদেরও চৈতন্যদয় হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ্ শিয়া সুন্নি কুর্দি সহ সব মাজহাব সব তরিকার মানুষ ভিতরে ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্ব বাস্তবতা তাই বলে। বিশ্বের চেহারা দেখে তাই মনে হয়। বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ আমেরিকার অন্যান্য অমুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী আদর্শ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। গোটা পৃথিবী জুড়েই **মহান ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচারের ফলে** প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলামের অমিয় বাণীতে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন। আর তাই দ্রুত ইসলামী উম্মাহর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। ইহুদীবাদী সাম্রাজ্য বাদীরা ইসলামকে ঠেকানোর জন্য শান্তির ধর্ম ইসলামী আদর্শকে যতই সন্ত্রাস বলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ততোই ইসলামের ন্যায় সত্য সুন্দর ও অমিয় বাণীতে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করছেন। মুসলমানরা অস্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু অস্ত্র তৈরির মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যতই কাফেররা মুসলিম দেশ দখল করছে ততোই মুসলিম দেশগুলো অত্যন্ত সংগোপনে সামরিক প্রস্তুতি নিচেছ শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে। মুসলমানদেরকে সারা দুনিয়ায় কাফেররা মারছে, হত্যা করছে, অত্যাচার করছে, আর মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই শক্তিশালী প্রতিরোধকারী,

www.pathagar.com

মুজাহিদ হিসাবে তৈরি হচেছ। এখন বাস্তবতা হলো এই যে বিশ্ব মুসলিমের কোন যোগ্য নেতা আবির্ভূত হয়ে যদি মুসলিম উম্মাহ্কে সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানায়, তাহলে বিশ্বে ইসলামী বিপ্লব ঠেকাবার কোন শক্তি কোন ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের থাকবে না। আন্দোলনের বানের পানিতে ভেসে যাবে পৃথিবীর সব জঞ্জাল। সব ইহুদীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীদের সৃষ্টি করে দেওয়া বিভিন্ন দল উপদল আর ফেরকার দেওয়াল সাধারণ মুসলমানরা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে ফেলবে। যারা মুসলিম দেশের শাসক বা কতিথ ইহুদী দাবেদার ভণ্ড নেতা এ বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধী টু শব্দটি করবে তাকে সাধারণ মুসলমানরা পায়ের নিচে পিস্ট করে মেরে ফেলবে। টাকা দিয়ে গুলি কিনে গুলি করে মারবে না।

কাজেই বিশ্ব বাস্তবতা এখন এমনই যে ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র বিশ্বে অত্যন্ত উর্বর বীজ দিলেই ফসল হবে। এখন বীজ ফেলানোর জন্য একজন উপযুক্ত নেতার আহবানের অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মুসলিম জাতি ও ইসলামী বিপ্লব। বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ইহুদীবাদীদের সৃষ্টিকরা বিভেদের দেওয়াল ভাঙ্গার জন্য হাতড়ি নিয়ে প্রস্তুত সব দল উপদল আর ফেরকার নেতারা। তাদের চোখ খুলে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, এসব দল উপদল আর ফেরকা ইহুদীদের দ্বারা সৃষ্টি তাই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার আর হওয়া যাবেনা তা সবাই বুঝে ফেলেছে। তাই সবার হাতে আজ হাতুড়ি। মুসলিম উম্মাহ্কে জেলে বন্দি করে রেখে একটি করে দেশ আক্রমন করছে আর দখল করছে। মুসলিম উম্মাহ্র হাতে আজ তালা আর দেওয়াল ভাঙ্গার সাবল আর হাতুড়ি। মুখে নজরুলের কবিতা কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল করবে লোপাট শিকল পূজার পাষান বেদী, ওরে ও তরুন ইশান বাজা তোরা প্রলয় বিশান, ধ্বংস নিশান উড়ক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী, লাথিমার ভাংরে তালা যতসব বন্দিশালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

নজরুলের এই কবিতার ছন্দের তালে তালে পৃথিবীর সব দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের জেলের দেওয়াল ভাঙ্গার জন্য বীর মুসলিম মুজাহিদরা কেন্দ্রীয়ভাবে হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। আখেরী নবীর উম্মাত শেষ জামানায় মানব জাতির নেতা ইমাম মাহদী (আঃ) এর হুকুম

www.pathagar.com

দেওয়ার সাথে সাথে বিজলীর মত চমকে উঠবে গোটা বিশ্ব আর সাথে সাথে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে গোটা বিশ্বে ইহুদীবাদের তখতে তাউস।

সেদিন নজরুলের আর একটি কবিতার ছন্দ উচচারিত হবে মুসলিম বীর মুসলিম মুজাহিদদের মুখে, আমি বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপিড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাশে ধ্বনিবেনা, অত্যাচারিতের খড়্গ কৃপান ভীম রন ভূমে রনিবেনা, মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।

সেই মহান নেতারও জন্ম হয়েছে শুধু আত্মপ্রকাশের সময়ের ব্যাপার মাত্র আর কিছু নয়। আমরা অপেক্ষা করছি সে আহবানের। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি পথ চেয়ে। পরম করুণাময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহর সহায় হোন এই প্রত্যাশায় রইলাম।

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবেক বানদের অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

ইহুদীবাদীদের পা-চাটা কুত্তা, মানবতার শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ইরাক নীতি আফগান নীতি ফিলিস্তিন লেবানন, কাশ্মীর ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভূমিকা এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশ ও ইউরোপ আমেরিকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ দেখে খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবেকবান সাধারণ মানুষ ও সরকার সমূহের প্রতিনিধিরা ইহুদীবাদী বুশ-ব্লেয়ারের বিশ্ব নীতির সমালোচনা করছে এবং প্রতিবাদ, প্রতিরোধের চেষ্টা করছে অহরহ।

এমতাবস্থায় শয়তানীর বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ শক্তির পাশে এসে দাঁড়াবে বিশ্বের সব দেশের সব ধর্মের বিবেকবান, সাধারণ মানুষ এবং ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

সব মিলিয়ে অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূলে। যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার এই যুগে, তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় ও বিস্ময়কর উন্নতির, ফলে ইহুদীবাদীদের পরিকল্পনায় মানব জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই মানবতাবিরোধী শাসন ও শোষণের এ অভিযান প্রতিমূহূর্তে বিশ্ববাসী দেখতে যানতে ও বুঝতে পারছে। তাই মানবতার স্বপক্ষের সম্মিলিত শক্তির মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার এ বিপ্লবী

www.pathagar.com

আন্দোলন সফল পরিনতি পাওয়ার সব ধরনের উপায় উপাদান বিশ্বে বর্তমান। কাজেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনিবার্য কারণেই অমানবিক শাসন, অন্যায় অত্যাচার, অসত্য, অসুন্দর দূরীভূত হয়ে ন্যায় সত্য সুন্দর শান্তির সুবাতাশ বইবে এবং জ্ঞানের আলোয় মানব জাতি উদ্ভাসিত হবে মানব জাতির মুক্তি নিশ্চিত হবেই ইনশাল্লাহ্।

এগিয়ে আসুন মুসলিম উম্মাহ। এগিয়ে আসুন বিশ্বের বিবেকবান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রগতিশীল সভ্য কল্যাণকামী মানুষেরা। আসুন মানবতাবাদের সপক্ষের সম্মিলিত শক্তি বিশ্বের ভূলুণ্ঠিত মানবতা পুনরুদ্ধার করি। উৎখাত করি শয়তানী শাসন, উৎখাত করি বিগত তিন হাজার বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া মানবতার বিরুদ্ধে ইহুদীবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার জগদ্দল পাথরকে হযরত ঈসা মসিহ (আঃ)-কে শুলে চড়ানো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মুসলিম খ্রিস্টান হিন্দু নেতৃবৃন্দ হত্যার নীল নক্সা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী ইহুদীবাদীদের ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করি। ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে পৃথিবীর সকল শহর নগর জনপদ আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষের হত্যাকারীদের পৃথিবীর মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করি। সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করি মানবতা। যেখানে মানুষ মানুষের জন্য কাজ করবে। মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। মানুষ মানুষের জন্য এই আদর্শে বিশ্ববাসীদের রাজত্ব কায়েম হবে। যেখানে ধর্ম কোন ফ্যাক্টর হবে না। সবার উপর মানুষ সত্য এই চিন্তায়, মানুষ, আল্লাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয় সৃষ্টি এক আল্লাহর নির্দেশে সব ধর্মের মানুষ সৃষ্টিকর্তার জয়গানে পৃথিবীটাকে মুখরিত করবে। যে পৃথিবীতে থাকবে না কোন ঘৃণা, হিংসা বিদ্দেশ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, সন্ত্রাস, নির্যাতন, জুলুম, বর্বরতা। থাকবে শুধু ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, উদারতা, দয়া, মমতা, মানুষ মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরার ক্ষেত্রে বিচার করবে না ধর্মীয় পার্থক্য। মহান সৃষ্টিকর্তার এই বড় সংসারে সবাই তার সংসারের সদস্য। সবাই সৃষ্টিকর্তার সমান প্রিয় (এক একমাত্র নাস্তিক ছাড়া)। এমন একটি স্বর্গীয় রাজ্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার জন্য আসুন বিশ্ববাসী একটি বার আমাদের সব ক্ষমতা, সব যোগ্যতা, সব সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাই। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

www.pathagar.com

উনত্রিংশ অধ্যায়

আত্মসংশোধন ও নাফসের সাথে সংগ্রাম

- আমরা নিজেদের সংশোধন না করা পর্যন্ত সমাজ দেশকে সংশোধন করতে পারবো না।
- প্রত্যেককেই নিজ থেকে শুরু করতে হবে এবং স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও আমলকে ইসলামের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে।
- যদি আপনারা এটাই চান যে ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক তাহলে নিজেদের থেকেই শুরু করুন।
- আপনারা নিজেদেরকে ঠিক করুন, আপনাদের দেশও সমাজ তখন ঠিক হয়ে যাবে।
- আমাদের প্রত্যেকের জন্যে যা জরুরী তাহলো নিজেদের থেকেই শুরু করা এবং বাহ্য দিকের ওপর সন্তুষ্ট না হওয়া। অন্তর (কলব) থেকেই শুরু করতে হবে, নিজেদের মগজ থেকেই শুরু করতে হবে। প্রত্যেকদিন এ চেষ্টায় থাকতে হবে যে, আমাদের পরবর্তী দিনটা যেনো আগের দিন থেকে ভালো হয়।
- সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবার জন্যেই অত্যাবশ্যক হলো চরিত্র বিজ্ঞান, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর দিকে পথ পরিক্রমার মতো ইসলামী আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করা। আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের এ ভাগ্য দান করুন। এটাই জিহাদে আকবর (সর্বোচ্চ জিহাদ)।
- জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধিই মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।
- আমাদের আমলনামা আল্লাহর দরবারে খোলার আগেই আমাদের নিজেদের লক্ষ্য করে দেখা উচিত।
- এমন কাজই করবেন যাতে এখান থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবেন তখন যেনো আল্লাহতায়ালার দরবারে উজ্জ্বল চেহারায় দাঁড়াতে পারেন।
- আমাদের সবারই কর্তব্য পবিত্র অন্তর হওয়া। তবেই খোদার নূর ও কুরআনের নূর কাজে লাগাতে পারবো।

www.pathagar.com

- নিজেদের অবশ্যই পবিত্ররূপে গড়ে তুলুন তবেই ইসলামী বিপ্লব করতে পারবেন। আত্মগঠনের অর্থ হলো আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরন করা।
- যদি আমরা নিজেদের সংশোধন করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দুনিয়াতে রফতানী (তথা পরিব্যাপ্ত) হয়ে যাবে।
- আত্মার সংস্কার ও গড়নই হলো সকল বিনির্মাণের পটভূমি। পুনঃনির্মাণের জিহাদ স্বয়ং ব্যক্তি থেকে শুরু করতে হবে।
- নিজেদের অবশ্যই গড়ে তুলুন। বিনির্মাণ জিহাদকে নিজেদের (আত্মা) থেকে শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। যদি নিজেদের থেকে শুরু করেন তাহলে যাই করবেন তাই হবে খোদায়ী কাজ।
- অভ্যন্তরীণ (আত্ম) বিপ্লব করতে হবে আমাদের। আমাদের আত্মাগুলোকে বদলে ফেলতে হবে। এতো দিন যদি আমাদের মনমগজ শয়তান ও তাগুতের অধীন থেকে থাকে তাহলে এখন বদলাতেই হবে।
- যে মন বিশুদ্ধ হয়নি সেখানে জ্ঞান হচেছ অন্ধকারের পর্দা।
- এটা খোদায়ী দায়িত্ব যে, মনে মনে যদি আমাদের কেউ কাউকে অপছন্দ করেও থাকি তথাপি কার্যক্ষেত্রে, আচরণে এবং প্রচারে নিজেদের মনের ইচছার বিরুদ্ধেই আমল করবো।
- জ্ঞান যদি আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অর্জিত হয় তাহলে এ জ্ঞানের অনিষ্টকারিতা মূখর্তার চেয়েও জঘন্য।
- তখনই বক্তব্য প্রভাবশীল হয় যখন তা পাক ও বিশুদ্ধ অন্তর থেকে বের হয়ে আসে।
- এ 'আমিত্ব' কে যদি মানুষ পদতলে পিষ্ট করতে পারে আর সেখানে কেবল 'তারই' (আল্লাহর) স্থান হয় তাহলে মানুষ সব কিছু সংশোধন করতে পারবে।
- কখনো কখনো তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, কখনো বা এরফান (মা'রেফাত) সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে পৌছায় আবার কখনো চরিত্র (আখলাক) বিষয়ক জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়। শুধু জ্ঞান দিয়ে হয় না, আত্মশুদ্ধি আবশ্যক।

www.pathagar.com

- তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞানও যদি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা হবে অন্ধকারের পর্দারাজি।
- আল্লাহ না করুন। মানুষ নিজেকে গড়ে তোলার আগেই যেনো সমাজ তার দিকে ছুটে না আসে। জনগণের ভেতর যেনো তার প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠে। কেননা তাহলে সে নিজেকে ডুবাবে, নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল সে-ই সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী।
- এ জগত আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। যদি এখানে দিন ফুরিয়ে যায় তাহলে আপনার সুযোগ শেষ হয়ে গেলো। তখন আর নিজের নাফসের অনাচারকে সংশোধন করতে পারবেন না।
- আমার এ ভয় হচ্ছে যে, ওরা (ধর্মপ্রাণ জনতা) আমাদের কারণে ও আমাদের কথা শোনার জন্যে বেহেশতে চলে যাবে অথচ আমরা নিজেদের সংশোধন ও বিশুদ্ধ না করার কারণে যাবো জাহান্নামে।
- প্রকৃত ঈদ হচেছ তখনই যখন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হবে এবং নিজের অন্তরকে সংশোধন করতে পারবে।
- যতক্ষণ না কোন জাতি ও সমাজ নিজেকে সংশোধন ও সংস্কার করতে পারবে ততক্ষণ তা মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না।

ঈমান ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

θ ঈমান যদি অন্তরে প্রবেশ করে তাহলে সব কিছুই সংশোধন হয়ে যাবে।

θ আল্লাহর প্রতি ঈমানই হলো নূর। আল্লাহর প্রতি ঈমানের কারণে মুমিনের সামনে থেকে যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

θ ঈমানের অর্থ হলো এই যে, যে সমস্ত বিষয় আপনাদের বুদ্ধিমত্তায় অনুভূত হবে এবং সে সমস্ত বিষয়কে আপনাদের কলবও জানবে সে সবকে বিশ্বাস করা।

θ যারা আল্লাহর সাথেই অবস্থান করে, আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ পাক তাদেরকে সকল অন্ধকার থেকে বের করে আনেন ও নূরের বাস্তবতায় পৌঁছে দেন।

www.pathagar.com

- জেনে রাখুন জ্ঞানের সত্যতা ও ঈমান যা জ্ঞানেরই পৃষ্ঠপোষক তার সত্যতাই হচেছ নূর (আত্মিক জ্যোতি)।
- জেনে রাখুন ঈমান আধ্যাত্মিক পূর্ণতাগুলোরই একটি পূর্ণতা (কামালাত)। এ পূর্ণতার জ্যোতির্ময় সত্যতা খুব কম লোকই অবগত হতে পারে। এমন কি খোদ মুমিনরাও যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ও প্রকৃতির আধারে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ স্বীয় ঈমানের নূর এবং আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাদের যে মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারিত আছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না।
- একটি দেশের যাবতীয় কল্যাণ ও উন্নতি তা বৈষয়িক ক্ষেত্রেই হোক কিংবা আধ্যাত্মিক, আর নৈতিক ক্ষেত্রেই হোক এর উৎস হচেছ ঈমানের উপস্থিতি।
- হুমকি ও প্রলোভন তাদের ওপরই প্রভাব ফেলে যাদের ঈমান নেই।
- ঈমানের দাবীদারদের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু মুমিন খুবই কম।
- জনগণের ঈমানের দিকটি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সকল কাজই সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়।
- সংখ্যাস্বল্পতায় অসুবিধে নেই, দৃঢ় ঈমানই গুরুত্বপূর্ণ।
- সৌভাগ্যের যা মাপকাঠি তাহলো এই যে, মানুষকে মুমিন হতে হবে, ছবরের অধিকারী হতে হবে এবং অন্যদেরকে (ছবর, ধৈর্য ও অধ্যবসায়) করতে ও সত্য বলতে দীক্ষা দান করতে হবে।
- আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে, কেউ আধ্যাত্মিক ভিত্তির অধিকারী নয় অথচ জনগণের জন্যে চেষ্টা করে থাকে।
- মুসলিম জাতির মাঝে আধ্যাত্মিকতা দৃঢ় করার চেষ্টা করুন। কেননা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই কেবল আপনারা নিজেদের হেফাজত করতে পারবেন এবং উন্নতির সোপানগুলোকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।
- আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলো হলো চিরন্তন মূল্যবোধ।
- যাবতীয় দুর্দশা ঈমানের দুর্বলতা এবং ইয়াকিনের কমজোরি থেকে জন্ম নেয়।
- শরাফতী (মান-সম্মান) তাকওয়াতে নিহিত রয়েছে।
- আধ্যাত্মিক ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা সহজতর।
- যারা আল্লাহর জন্যে কাজ করেন তাদের কখনো পরাজয় নেই। যারা দুনিয়ার জন্যে কাজ করে তাদের লোকসান ও পরাজয় রয়েছে। কেননা,

www.pathagar.com

যদি এরা সফল না হয় তাহলে ভালো করেই পরাজিত হলো এবং নিজেদের জীবনটাকেই বৃথা শেষ করলো।

- আমাদের সকল আশা-ভরসাই আল্লাহর। আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ নই। আল্লাহর ওপর ভরসা করেই সকল সমস্যার সমাধান করবো।
- আমি নিশ্চিত যে, মুসলিম জাতি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকতে ততোদিন কোন শক্তিই এর ক্ষতি করতে পারবে না।
- আমাদের জাতি যদি আল্লাহর জন্যে এবং পয়গাম্বর আকরামের সন্তুষ্টির জন্যে এগিয়ে চলে তাহলে তাদের যাবতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।
- মনে করবেন না যে এখন হোয়াইট হাউজ ও ক্রেমলিন শান্তিতে বসে আছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় জীবন চালাচেছ। বরং এরা অশান্তি ও অস্থিরতায় জীবন কাটাচেছ। এ অস্থিরতা-অশান্তি এজন্যে যে, তারা শয়তানের অনুসারী। আর শয়তান কখনো চায় না যে মানুষের অন্তরে স্থিরতা ও শান্তি আসুক।
- যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তৎপরতায় ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ঈমান বজায় থাকে ও আল্লাহর জন্যেই আমল করা হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বের জটিলতম সমস্যাদিও সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তাকওয়া

- যার তাকওয়া অধিক, যার খোদাভীতি বেশী এবং যে আল্লাহর জন্যে খেদমত করে যায় সেই সকলের ওপরে।
- সবাই ভাই ভাই ও সমান সমান। তবে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ছায়াতলে, সদগুনে এবং উত্তম কার্যকলাপে নিহিত।
- যা মৌলিক ও আসল তা তাকওয়া। তবে এ তাকওয়াই যদি মূর্খ লোকের কাছে থাকে তাহলে তা কখনো ক্ষতি ডেকে আনে।
- যদি জ্ঞান, তাকওয়া এবং বিপ্লবী ও ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের বিজয় অনিবার্য। খোদা না করুন, যদি এসব পর্যায়ে অবহেলা করে থাকেন তাহলে এর দায়-দায়িত্বও আপনাদের ওপর বর্তাবে।
- জাতি যদি মুত্তাকী হয় তাহলে দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ আসে তা থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারবে।

www.pathagar.com

ইখলাছ

- অন্তরকে নিয়্যতের খুলুছিয়াত ও মনকে সত্যতার অলঙ্কারে সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করবো।
- খালেছ নিয়্যত ব্যতীত কোন ইবাদতই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হবে না।
- নিজেদের সংযুক্ত করে দিন ওই অবিনশ্বর সত্তার (আল্লাহর) সাথে এবং নিজেদের কাজকর্মকে খোদায়ী কাজকর্মে পরিণত করুন। আল্লাহতায়ালার হুকুম-আহকামের দিকে মনোযোগ দান করুন।
- কার্যকলাপের পূর্ণতা (উন্নতি) ও সৌন্দর্য নিয়্যত, অন্তরের গ্রহণ ও সীমা-পরিসীমা (খোদায়ী) সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল।
- যে পর্যায়ে ও যে অবস্থানেই থাকুন না কেনো চেষ্টা চালিয়ে যান, আন্তরিক নিষ্ঠাকে (ইখলাছ) বাড়ান এবং নাফসের খায়েশ ও শয়তানী ওসওয়াসাকে হৃদয় থেকে বের করে দিন। তাহলেই আপনার জন্যে সাফল্য আসবে, সত্যের দিকে পথ খুঁজে পাবেন, আপনার সামনে হেদায়েতের পথ খুলে যাবে এবং খোদাতায়ালা আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবেন।
- আপনার চিন্তা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করুন। তাহলেই নিহত হওয়াতেও ভয় পাবেন না আর হত্যা করতেও ভয় পাবেন না। মূলকথা হলো স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে খালেছ করুন।
- আপনার আপনাদের নিয়্যতকে আল্লাহর জন্যে খালেছ করার চেষ্টা করুন। তখন নিহতই হোন বা হত্যাই করুন নাজাত প্রাপ্তদের দলভূক্ত হবেন।
- চেষ্টা করুন আপনাদের কাজ যেনো আল্লাহর জন্যে হয়, এবং তৎপরতা যেনো আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়।

পছন্দনীয় আখলাক

- আখলাক (সচ্চরিত্র) দিয়ে জনগণকে বিনম্র করুন। অন্তরের বিনয়ই মাপকাঠি। যদি পারেন জনগণের হৃদয় জয় করুন। এ বিষয়টিই আল্লাহর দরবারে স্থায়ী হবে।
- আল্লাহর বান্দাদের (জনগণ) সাথে বন্ধুত্ব করুন এবং আন্তরিক ভালোবাসা দেখান। কেননা তাঁরা আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত প্রাপ্ত এবং তাদের অন্তর ইসলাম ও ঈমানের পোশাকে সজ্জিত।

www.pathagar.com

আত্মপ্রত্যয়

- আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আমাদের সবই আছে, কারো চেয়ে আমরা মোটেও কম নই। আমরা যে আমাদের নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি (আত্ম বিস্মৃতি) সেই হারানো নিজেকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।
- আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পরপরই আত্মপ্রত্যয় হচেছ কল্যাণের উৎস।
- আমাদের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ফিরে পাওয়ার চিন্তা ও চেষ্টায় থাকতে হবে।
- লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যখন সুমহান হয় তখন সে পথের কোন কষ্টকেই মানুষের পাত্তা দেয়া উচিত নয়।
- কোন শক্তিকেই ভয় করবেন না। আল্লাহ যখন আপনাদের সাথে আছেন তখন সবকিছুই আপনাদের সাথে রয়েছে।
- আল্লাহর উপর ভরসার কারণে কোন কিছুকেই ভয় করবেন না।
- যার সাথে খোদা আছেন সে তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই ডরায় না।

স্বল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে জীবন

- আধ্যাত্মিকতা ইসলামের ভিত্তি। আধ্যাত্মিকতাকে দৃঢ় ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। যতদূর সম্ভব আড়ম্বরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা পরিহার করুন।
- নিজেদের সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করুন এবং ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রতি মনের বন্ধন ত্যাগ করুন।
- আভিজাত্য ও ভোগ বিলাসিতার জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে মানবিক ও ইসলামী মূল্যবোধগুলোকে হেফাজত করা যায় না।

ছবর

- ছবর সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং ধ্বংস ও পতন থেকে নাজাত লাভের মূল উৎস।
- ছবর মানুষের জন্য বালা মুছিবতকে সহজ করে দেয়, মুসকিল আসান করে এবং দৃঢ়তা ও সংকল্পকে শক্তিশালী করে।
- লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যতো বড় ও বৃহৎ হবে সে পথে কষ্ট, ক্লেশও ততো বেশী হবে। কিন্তু মানুষের উচিত হবে সব সহ্য করা।
- যদি আমরা অটল ও অবিচল থাকি তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থন ও শক্তি পাবো।

www.pathagar.com

তাওবা

- যে কেউ যে কোন কাজই করুন না কেনো তথাপি তাওবার অবকাশ রয়ে গেছে। তাওবার দুয়ার খোলা আছে। আল্লাহর রহমত ব্যাপক।
- তাওবার বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। সে সব শর্ত পূরণ না হলে আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন না।
- তাওবার বসন্তকাল হলো যৌবন বয়স। কেননা সে সময় গুনাহের বোঝা কম থাকে, অন্তরের ময়লা হালকা থাকে এবং তাওবার শর্ত স্বল্প ও সহজ থাকে।
- যারা তাদের জীবনের পঞ্চাশ কিংবা সত্তরটি বছর গীবত ও মিথ্যায় কাটিয়ে দিলো এবং অপরাধে নিমজ্জিত হয়ে দাড়ি পাকিয়েছে তারা অনুতাপে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং গুনাহ পরিত্যাগের কঠিন সংকল্প হারিয়ে ফেলে।
- কার্যত তাওবা করুন। কেননা শুধু মুখে মুখে 'আতুবু ইলাল্লাহু' উচচারণ করলেই তওবা বাসবায়িত হয় না। বরং অনুশোচনা, অনুতাপ এবং গুনাহ ত্যাগের কঠিন পণ আবশ্যক।

আত্মপ্রীতি ও প্রবৃত্তির পূজা থেকে আত্মরক্ষা

- শয়তানের মিরাস (উত্তরাধিকার) প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকুন।
- হক ও সত্য থেকে দূরে থাকার মাপকাঠি হলো প্রবৃত্তির খায়েশের আনুগত্য।
- প্রবৃত্তিগত রোগ-শোকের গুরুত্ব দৈহিক রোগ শোকের চেয়ে হাজার হাজার গুণে বেশী।
- প্রবৃত্তির খায়েশের সামনে যদি একটি দুয়ার খুলে দেন তাহলে বাধ্য হয়েই তার সামনে আরো বহু দুয়ার খুলে দিতে হবে।
- হে প্রিয় রাছুলের উম্মাত জেনে রেখো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও অনুরোধের কোন অন্ত নেই। এর লক্ষ্যমাত্রার কোন পরিসমাপ্তি নেই।
- মানুষ বা সমাজের ওপর শক্তিধরদের পক্ষ থেকে যে কোন দুঃখ-মুছিবতই নেমে আসুক না কেনো তা ওদের প্রবৃত্তির খায়েশ ও স্বার্থপরতারই পরিণতি।

www.pathagar.com

θ মানুষের বাতেনী শয়তান স্বয়ং মানুষই। সে মানুষেরই নাফসানিয়াত ও মানুষেরই কামনা-বাসনা।

θ মানব জাতির ওপর যত বিপর্যয় নেমে এসেছে এবং মানব জাতির সেই আদি থেকে এ পর্যন্ত আর শেষতক যত বিপর্যয়ই আসবে সবার মূল্যেই রয়েছে আত্মপ্রীতি বা প্রবৃত্তির খায়েশ।

θ মানুষের অধঃপতন মানুষের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই।

θ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রীতি ও প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর শিকলে আবদ্ধ থাকবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (সংগ্রাম) ও আল্লাহর বিধানের প্রতিরক্ষা করতে পারবেন না।

θ মানুষ যত ভুল ভ্রান্তি ও গুণাহ্ করে তার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তির খায়েশ।

θ যে কোন মানুষ ও যে কোন কর্মকর্তার জন্যে যা বিপজ্জনক তাহলো নাফসের খায়েশ ও আত্মপ্রীতি।

θ আমাদের সবচেয়ে বড় সংকটই হলো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকট, ক্ষমতালিপ্সার সংকট এবং নাম প্রীতির সংকট।

θ মানুষের নাফ্স (প্রবৃত্তি) যে কোন খোদাদ্রোহীর চেয়ে বড়। নাফসের লালসা মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

θ যা মানুষের কোমরকে ভেঙ্গে দেয় তা হচেছ স্বয়ং মানুষেরই প্রবৃত্তি। প্রধান হওয়ার প্রতি মানুষের মোহ এবং যা কিছু মোহনীয় তার প্রতি মানুষের মোহ তাকে এমন স্থানে নিয়ে পৌঁছায় যে যদি নবী করিম (সাঃ) ও তাকে ধরতে আসেন সে তারও (নবীর) দুশমন হয়ে দাঁড়ায় এবং এমন কি যখন সে বুঝতে পারে যে আল্লাহ তাকে ধরতে (সাহায্য করতে) চাচেছ তখন সে আল্লাহরও দুশমন হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও ক্ষমতার লালসা

θ দুনিয়াতো এটাই যার মাঝে আমরা ডুবে আছি। দুনিয়া আমাদেরকে উন্নতি ও পূর্ণতার উৎস (আল্লাহ) থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে নিজেদের নাফ্স ও নফ্সানী লিপ্সায় আবদ্ধ করে।

θ নাফ্স্ (প্রবৃত্তি) দুনিয়ার প্রতি যতোবেশী আকৃষ্ট হবে ততোবেশী আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে যাবে।

www.pathagar.com

- যাবতীয় আত্মিক, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং আল্লাহতায়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিস্মৃতি।
- যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে সে জ্ঞানই দুনিয়া পূজারীর হস্তগত হলে তা তাকে মহাপরাক্রমশালীর দরবার থেকে সম পরিমাণে দূরে সরিয়ে দেয়।
- পার্থিব বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও দুনিয়া গড়ার প্রতি হৃদয়ের মনোযোগ যতোবেশী হবে অবমাননা ও দারিদ্র্যের ময়লা ততোবেশী আপতিত হবে এবং অভাবের কালো ছায়া তাকে আরো ঘনীভূত করে পাকড়াও করবে।
- হে প্রিয় মানুষ তুমি যদি দুনিয়া কামনা থেকে নিজেকে ফেরাতে চাও তবে তোমারই মত দূর্বল সৃষ্টি মানুষের কাছে অন্ততঃ আবেদন করো না।
- দুনিয়ার প্রতি মনের টান ও মোহ মানুষকে মানবিক কাফেলা থেকে বিরত রাখে আর বস্তু সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণমুক্ত হওয়া ও আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগ মানুষকে মানবিক পদমর্যাদায় পৌছায়।
- দুনিয়ার নিকৃষ্টতা এটাই যে মানুষ এমন কি একটি তাসবিহ কিংবা একটি বইয়ের প্রতিও লালায়িত হবে।
- দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে তার মানবিক মর্যাদা ও আবেগ-অনুভূতি থেকে বিচিছন্ন করে দেয়।
- যদি কেউ আল্লাহর জিয়াফতে (দাওয়াতে), উপস্থিত হতে চায় তবে তাকে তার সাধ্যমতো দুনিয়া বিমুখ হতে হবে এবং মনকে দুনিয়া থেকে বিচিছন্ন করতে হবে।
- ধনিকরা প্রকৃতপক্ষে এমন দরিদ্র যাদের মুখোশ হলো ধনসম্পদ এবং নিরভাবের পোশাকে এরা মূলতঃই অভাবী।
- বস্তু সামগ্রীর প্রতি মোহ থেকে বের হয়ে আসা এবং আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগ দান মানুষকে মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করে।
- জেনে রাখুন। এ দুনিয়ার অপূর্ণতা, দোষত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে তা আল্লাহ তায়ালার মানদণ্ডে কোন মর্যাদা ও কল্যাণের স্থানও নয় আবার আযাব ও শাস্তির জায়গাও নয়।
- মৃত্যুর ভয় তাদেরই যারা দুনিয়াকে নিজেদের আবাস ভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং চিরন্তন স্থান আখেরাত ও আল্লাহর রহমতের পরশ সম্পর্কে অজ্ঞ।

www.pathagar.com

θ কি আধ্যাত্মিক ও কি পার্থিক পদমর্যাদা যা কিছুই মানুষ অর্জন করুক না কেনো একদিন সবই ছিনিয়ে নেয়া হবে। তবে সে দিনটাও অজ্ঞাত।

θ খোদার সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে তার কোন পরাজয় নেই। পরাজয় তারই যার কামনাই দুনিয়া।

θ শহিদানরা ইসলামের জন্যে ও ইসলামী স্বার্থে নিজেদের জান বিলিয়ে দেবে অথচ আমরা কিছু ওদের খুনের বদৌলতে এসব পদে আসীন হবো ও পরস্পর যুদ্ধবিবাদ করবো। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কবিরা গুনাহ।

θ ক্ষমতার মোহ যারই থাকুক না কেনো তা শয়তান থেকে প্রাপ্ত।

θ আমাদের ঘরবাড়ি কেমন, আমাদের জীবনমান কেমন প্রভৃতির প্রতি এত লেগে থাকবেন না। বরং মানবিক গুণ ও সম্মানের প্রতি ধাবিত হোন এবং ওসব তাৎপর্যের পিছু ছুটে যান যা আপনাদের বিজয়ী করে দিতে পারে।

θ দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়াদি ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এ জগতের জয়-পরাজয় এবং সুখ-দুঃখ কয়েক দিনের মাত্র, সামান্যকালই টিকে থাকবে।

আমিত্ব ও স্বার্থপরতা

θ বিশ্বে যত বিপর্যয় ও অনাচার দেখা দেয় সবই স্বার্থপরতা থেকে সৃষ্ট।

θ বিশ্বে যত অপরাধ-অপকর্ম দেখা দেয় সবই অমিত্বের ফল।

θ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কেবল নিজেকেই দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হেদায়েতের পথ খুঁজে পাবে না।

θ এতে কোন সন্দেহ করবেন না যে, যে-ই দাবী করে 'আমি' সে 'আমি'টাই শয়তান।

θ জেনে রাখুন, আত্মম্ভরিতার দোষ নাফসানী খায়েশ থেকে সৃষ্ট।

θ আমিই সব, "আমি বৈ অন্য কেউ নয়" এসব ধারণা সবার ভেতরেই থেকে যায় যদি না আত্মাকে পবিত্র করা হয়।

θ মানুষ কত অজ্ঞ হতে পারে যে এসবকে (দুনিয়াবী) পদ-পদবী বলে মনে করছে এবং কত দুর্বল হতে পারে যে, এ সরকার ও সরকারগুলোকে শক্তি বলে মনে করতে পারে।

θ চেষ্টা করুন যাতে আমিত্বের পর্দা ছিন্ন করতে পারেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সেরা ও পরাক্রমশালী খোদার অপরূপ সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে পারেন। কেবল

www.pathagar.com

তখনই যে কোন মুশকিল আসান ও যে কোন দুঃখ-কষ্টে সুখে পরিণত হবে।

θ আমিত্বের বড়াই শয়তানের সম্পত্তি।

θ যতোদিন মানুষের মাঝে স্বার্থপরতা থাকবে ততোদিন যুদ্ধ, অনাচার, জুলুম ও অত্যাচারও থাকবে।

θ খোদা না খাস্তা আত্মম্ভরিতা ও গর্বের সাথে যদি কাজকর্ম করা হয় তাহলে তা-ই হয়ে দাঁড়াবে মানুষের পরাজয়ের কারণ।

θ এটা হতে পারে না যে মানুষ আত্ম-পূজারীও হবে আবার খোদাপরাস্তও হবে। এও হতে পারে মানুষ নিজের স্বার্থও দেখবে আবার ইসলামের স্বার্থও দেখবে। এ দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতেই হবে।

θ অন্যান্য মানুষের তুলনায় আমি যদি নিজেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করি তাহলে এটা হবে চিন্তার বিকৃতি এবং তাত্মার অধঃপতন।

θ মানুষ যে কোন কাজ হাতে নেবে যদি তা থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মপূজাকে বাদ দিতে পারে এবং কল্যাণকে নজরে রাখে ও আল্লাহকে হাজের নাজের জানে তাহলে সফলও হবে, আবার আত্মপূজার বালা মুছিবত থেকেও নিরাপদ থাকবে।

θ স্বার্থপরতাই বিবাদ-বিসম্বাদের জন্যে দায়ী, আর এ স্বার্থপরতাও মানুষের নাফস্ থেকে সৃষ্টি হয়।

θ দু'ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছেঃ কখনো এমন হয়ে দাঁড়ায় যে মানুষ এমন ব্যাখ্যা দান করে যাতে নিজেকে প্রদর্শনের ইচছা নিহিত থাকে। এ নাফ্সই হচেছ শয়তান। আবার মানুষ একসময় নিজের কথা বলে অন্যদের পথ প্রদর্শন করতে চায় আর এ নাফ্স্ই হচেছ রহমান (খোদায়ী)।

θ মানুষের নাফসানী খায়েশ এটা চায় যে, যা কিছু ঘটবে তাকেই সে নিজে করেছে বলে বড়াই করবে আর এটা হলো আত্মপূজার ফল। এই যে মতভেদ ও বিভেদ পরিলক্ষিত হয় সবই ঈমানের দুর্বলতার ফল।

θ কোন মানুষই দাবী করতে পারবে না যে, আমার কোন দোষ-ক্রটি নেই। যদি কেউ এ ধরনের দাবী করে বসে তাহলে এটাই তার সবচেয়ে বড় দোষ।

www.pathagar.com

- বিজয়ের গর্ব হচেছ এমন বিরাট মারণ রোগ যা বাতেনী শয়তান আল্লাহর বান্দাদের অন্তরে জন্মিয়ে থাকে যাতে তাকে সত্য পথ থেকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।
- গর্ব ও অবহেলা মানুষকে অধঃপতনে নিয়ে যায়।
- বড়াই শয়তানের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
- যার অজ্ঞতা অধিক ও বুদ্ধি বিবেক ত্রুটিপূর্ণ তার অহংকারই বেশী। যার জ্ঞান-প্রজ্ঞা অধিক, আত্মা বিরাট ও বক্ষ উদার সে তত বিনয়ী।

দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ

- এর চেয়ে কোন ত্রুটিই বড় নয় যে মানুষ তার নিজের দোষ ত্রুটি বুঝতে পারে না এবং সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকে এবং নিজের ভেতর দোষ-ত্রুটির ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।
- কোন অন্তরের দোষ-ত্রুটি মানুষকে বিপথগামী করে, নাফসানী খায়েশ সবকিছুকে বরবাদ করে দেয় এবং কেবল অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।
- মানুষের গোপনীয়তা যা-ই হোক না কেনো তা প্রকাশ করা ইসলাম বিরোধী কাজ।

অমনোযোগিতা

- এক মুহূর্তেও আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী হবেন না। শক্তিমত্তার উৎস সম্পর্কে অমনোযোগীতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

হতাশা ও নৈরাশ্য

- কক্ষনো কোন ব্যাপারে নিরাশ হবেন না। কারণ কোন কিছুই এক মুহূর্তে ঠিক হয়ে যায় না। এছাড়া মহৎ কার্যাবলী ধীরে ধীরেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- হতাশা শয়তানের সৈন্য, আর আশা-ভরসা আল্লাহর সৈন্য। তাই সদাসর্বদা আশাবাদী হবেন।

সামাজিক অনাচার ও বিপথগামিতা

- আম্বিয়া কেরাম চিকিৎসকের মতো ছিলেন এবং সমাজকে নিরাময় ও সুস্থ করতে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

- যদি চারিত্রিক বিকৃতি না থাকে তাহলে বর্তমানকালের সমরাস্ত্রগুলো মানব জাতির জন্য ক্ষতির কোন কারণই নয়।
- যে বিষয়টি আমাদের গ্রহকে (পৃথিবী) ধ্বংসের গহীন খাদে ঠেলে দিচ্ছে তা হলো চারিত্রিক বিপথগামিতা।
- যে সমাজকে কলুষিত করে এবং অনাচার ও নোংরামী থেকে হাত গুটাবে না তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। কেননা সে একটা ক্যান্সার পিণ্ডের মত যা সমাজকে বিপর্যস্ত করে।
- মাদকাসক্তকে নাজাত দান কোন ব্যক্তির নাজাত নয়, বরং ইসলামের নাজাত।
- কোন মুসলমানের অবমাননা করা ও দীনী ভাইয়ের বদনাম ছড়ানো কোন দীনী কাজ নয়। এটা বরং দুনিয়া পূজা ও নাফ্স্-পূজা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তা শয়তানেরই কুমন্ত্রণা যা মানুষকে অন্ধকারময় পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।
- মুসলমানকে কষ্ট দেয়া ও মুমেনকে জ্বালাতন করা মস্ত বড় কবিরা গুনাহ।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

- সকল জনতার উপর ফরজ হচেছ, ন্যায়ের আদেশ দান ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।
- সত্যের প্রতি আহবান সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। কেননা, তা ন্যায়ের প্রতি আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ স্বরূপ।
- যদি কোন জালিম মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে তাহলে জাতির আলেম সমাজ, জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের দায়িত্ব হলো তাকে অমান্য ও তার অন্যায়ের বিরোধিতা করা।
- আমরা ও আপনারা- সবারই দায়িত্ব হলো সকল কাজে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যদি এমন কোন কর্মকর্তাকে দেখা যায়, যে অন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে ঠেকানোর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে চিহ্নিত করে দিতে হবে। এজন্য সমস্যা সংকটকেও বরণ করে নেয়া আবশ্যক।
- আপনারা যদি প্রথম থেকেই ফ্যাসাদ না ঠেকান তাহলে অসম্ভব নয় যে ফ্যাসাদ আর ঠেকানোই যাবেনা।
- যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম এবং যা জাতি ও ইসলামী দেশের গতিপথের বিরোধী মুসলমানদের সম্মানের পরিপন্থী তা যদি দৃঢ়ভাবে না ঠেকানো হয় তাহলে আমরা সবাই দায়ী হবো।

www.pathagar.com

নেফাক ও মুনাফেক

θ মুনাফেকরা কাফেরদের চেয়েও অধম।

θ ইসলামে মুনাফেকদের বেশী করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে মুনাফেকরাই কুফরীর দৃষ্টান্ত।

θ ইসলামে মুনাফেকদের উৎখাত কিম্বা সংশোধনের জন্য যত জোর দেয়া হয়েছে কাফেরদের ব্যাপারে এতো বলা হয়নি। মানুষ জানে যে, কাফেরের সাথে কি করা উচিত। কিন্তু মুনাফেকদের সাথে কি করবে তা বুঝে উঠতে পারে না।

θ সুরায়ে মুনাফেকীনে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং বলা হয়েছেঃ ওরা আপনার সামনে এসে দীনদারীর কথা ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু ওরা মিথ্যা বলেছে। ওরা মুসলমান নয়, এরা মুনাফেক (কপট)।

θ আজ আমরা যে সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়েছি এবং ওই সমস্ত মুনাফেক যারা ইসলামের শ্লোগান দেয় এবং ইসলামের কোমর ভেঙ্গে দিতে তৈরী হচেছ তা মুসলমানদের কাজকে কঠিন করে দিচেছ। এদের (মুনাফেক) সমস্যা সমাধান অত্যন্ত কঠিন।

θ তোমরা (মুনাফেক) ও তোমাদের সমর্থকদের সবচেয়ে বড় দোষ ও ভুল হচেছ এই যে তোমরা না ইসলাম ও এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, না মুসলমান জাতি ও তাদের আত্মত্যাগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত আছো।

θ যদিও মুনাফেক নেতারা আমেরিকা ও ইউরোপের কোলে আশ্রয় নিয়ে ভোগ বিলাসিতায় মত্ত রয়েছে তথাপি এরা প্রতারণা ও ছলচাতুরির মাধ্যমে কতিপয় মানুষকে বিভ্রান্ত ও এদের চিন্তাক্ষমতাকে রহিত করে দিয়েছে।

θ ওরা যারা ইসলামের দাবী করে অথচ হাসপাতালে আগুন দেয় ও আহতদের মাথা কেটে নেয় এদের চিনে রাখুন; এরা মুসলমান নয় বরং এরা মুনাফেক।

θ ধিক্ তোদের হে শয়তানের অনুচররা! ধ্বংস হোক তোদের হে আন্তর্জাতিক আত্মবিক্রেতারা! তোরা কখনও বিজয়ী হতে পারবিনা।

θ আমার মনে হয় না যে আপনারা এমন কোন দল বা গোষ্ঠী খুঁজে পাবেন যারা মুনাফেক দলটির মতো এতো ব্যাপক অপরাধযজ্ঞ ও ইতরামীতে হাত দিয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর জন্য উত্থান

θ আল্লাহর জন্য উত্থানেই (আন্দোলন) সব কিছু রয়েছে। আল্লাহর জন্য উত্থান আল্লাহর মা'রেফাত (জ্ঞান) এনে দেয়।

θ মানুষ যখন আল্লাহর দীনকে বিপদে দেখতে পায় তখন তার অবশ্য কর্তব্য হচেছ আল্লাহর জন্য উত্থান করা।

θ মৃত্যুকে ভয় করবেন না। কেননা হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে।

θ সবাই উঠে দাঁড়ান, আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়ান। ব্যক্তিগতভাবে শয়তানের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো হলো নিজের বাতেনী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা। আর সামাজিক ও সার্বিকভাবে উত্থান বা উঠে দাঁড়ানো হলো শয়তানী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো।

θ "আন্ তাকুমু লিল্লাহে মাছ্না ওয়া ফুরাদা" অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আল্লাহর জন্য কিয়াম (উঠে দাঁড়ান) করুন। আল্লাহর মা'রেফাত লাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়ান এবং আল্লাহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সামাজিকভাবে উঠে দাঁড়ান।

θ আল্লাহর জন্য উত্থানে পরাজয় নেই।

0 যদি আমরা কোন দিন নিজেদের ভরসাকে আল্লাহর উপর থেকে উঠিয়ে নেই এবং নিজেদের শক্তির উপর ভরসা স্থাপন করি তাহলে জেনে রাখুন সেদিন এমন দিন হবে যখন আমরা পরাজয়ের দিকে পা বাড়াবো।

θ এমন চেষ্টা চালাবেন আপনাদের অভ্যুত্থান এবং এ আন্দোলন যাতে খোদায়ী আন্দোলন হয়; আল্লাহর জন্য হয়।

θ আল্লাহ তায়ালার সামনে যাবতীয় শক্তি শূন্য বলেও গণ্য নয়।

θ আমরা ভয় পাইনে। কেননা আমরা আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি (কিয়াম করেছি)।

θ আল্লাহর জন্য আন্দোলনে কোন লোকসান নেই, এতে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি নেই।

θ যে আন্দোলন আল্লাহর জন্য হয় এবং যে আন্দোলন আধ্যাত্মিক ও আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় তার কোন পশ্চাদপসরণ নেই।

θ যে জাতি আল্লাহর জন্য আন্দোলনে নেমেছে সে দেশ আল্লাহর জন্যেই অটল অবিচল থাকবে এবং আল্লাহর জন্য এর যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

θ নিজেদেরকে আপনারা ওই শক্তির উৎসের উপর নির্ভরশীল করুন। যে ফোঁটা বা বিন্দুসমূহ! নিজেদের সমুদ্রে পৌঁছে দেয়।

www.pathagar.com

আন্দোলনের আহবান

θ ইসলামী দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর প্রতি আমার এই আহবান আপনারা এ আশা পোষণ করবেন না যে, আপনাদের মহান উদ্দেশ্য তথা ইসলাম ও ইসলামের বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাইরে থেকে সাহায্য আসবে। আপনারা নিজেরাই এ প্রাণবিধায়ক বিষয় বাস্তবায়নে উঠে দাঁড়ান। কেননা তা আপনাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করবে।

θ জাতিগুলোর উচিত অভ্যুত্থান করা এবং নিজেদেরকে তাদের সরকারসমূহ ও বড় বড় শক্তির হাত থেকে নাজাত দেয়া।

θ আশা করি যে, অন্যান্য দেশের মুসলমানরা অতিতের মুসলমান জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবে এবং পাশ্চাত্যের মুখ গুঁড়ো করে দেবে ও নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াবে। এছাড়া তারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের অতীত গৌরব ফিরে পাবে।

θ হে বিশ্বের সর্বাঞ্চলের বীর মুসলমানরা! অলসতার ঘুম থেকে জেগে উঠুন আর ইসলাম ও ইসলামী দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের ও ওদের অনুচরদের হাত থেকে উদ্ধার করুন।

θ বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কি এটা কলঙ্কের কথা নয় যে, এতো সব সামরিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ থাকতে তারা শতাব্দীর দাম্ভিক পরাশক্তিবর্গ এবং জল ও স্থল দস্যুদের আধিপত্যের কাছে মাথানত করবে!

θ জাতিগুলোরই উচিত আন্দোলনে নামা ও অভ্যুত্থান করা এবং দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে নিজেদের নাজাত দেয়া।

θ জাতিগুলোর উচিত উঠে দাঁড়ানো। কেননা তারা যদি বসে থাকে এবং এ প্রত্যাশা করে যে, তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক অভাব মোচনের জন্য অন্যরা আসবে ও কাজ করবে তাহলে তা হবে ভুল।

θ মুসলমানদের কর্তব্য হচেছ ইসলামের রাস্তায় উঠে দাঁড়ানো এবং ইসলামকে ধ্বংস ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভোগ করার জন্য যে সব শক্তি চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া।

θ ইসলামী সমাজের অভিজ্ঞ দরদীরা যারা নিপিড়িত মানুষের সাথে রক্তপর্ণ করেছেন তাদের একথাটা অনুধাবন করা উচিত যে, তারা সবেমাত্র পথের শুরুতে রয়েছেন।

www.pathagar.com

θ ইসলামের সকল জাতির উচিত সজাগ, সচেতন ও সতর্ক হয়ে মাঠে নামা এবং যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী অনুচর ইসলামের সকল জাতিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর আধিপত্যের অধীন করতে চায় তাদের স্তব্ধ করে দেয়া।

θ অত্যাচারী দূরাচারী সরকারের সামনে নীরবতা পালন ইসলামী জাতির জন্য কলঙ্কজনক।

θ মুসলিম জাতিগুলোর উচিত স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে আমাদের মুজাহিদদের আত্মত্যাগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা এবং আজাদী ও মানবিক জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হওয়া।

θ অতীত মুসলমানদের বিজয় নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যান্য উৎপীড়িত মজলুম জাতির, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর জন্য উত্তম আদর্শ। কেননা বিজয় প্রমাণ করে যে, কিভাবে একটি জাতি ইসলামের আদর্শের ওপর ভরসা করে মহাশক্তির ওপর বিজয় লাভ করতে পারে।

ইসলামী বিপ্লব

θ ইসলামী বিপ্লব বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সকল বিপ্লবের সেরা ও সর্বোত্তম বিপ্লব।

θ আমাদের মহান ইসলামী বিপ্লবে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হওয়ার আগে আধ্যাত্মিক ও রুহানী বিপ্লব হতে হয়।

θ এ বিষয়টি জেনে রাখুন যে, আমরা যে বিপ্লব করতে যাচিছ এরকম বিপ্লব এ পর্যন্ত আর হয়নি।

θ আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী জানবাজ মুমিন মুজাহিদ ভাইরা এগিয়ে নিয়ে যাচেছ।

θ আমাদের দুশমনদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, বিশ্বের কোন বিপ্লবই আমাদের বিপ্লবের মত কম ক্ষতিতে ও ব্যাপক সাফল্য নিয়ে এগিয়ে যায়নি। যা ইসলামের বরকত বই অন্য কিছু না।

θ বিশ্বের মুসলিম যুবক শ্রেণী ও জনতার বিপ্লব খোদায়ী বিপ্লব ও আসমানী আন্দোলন যা কুরআন ও ইসলামকে জিন্দা করার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

θ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের প্রতিরক্ষা করবো এবং এ প্রিয় জীবনাদর্শকে অক্ষত রাখার জন্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকবো। কেননা, এ বিপ্লব বিশ্বের মজলুমদের নাজাত ও জালিমদের দমনের কারণ। অন্যদিকে নফ্সানী খায়েশ হচ্ছে শয়তানের সম্পদ।

θ আজ পর্যন্ত আপনারা এমন কোন বিপ্লব খুঁজে পাবেন না যা সংগঠিত হতে যাচ্ছে।

θ বিপ্লব একটি শিশুর মতো যাকে অবশ্যই লালন করতে হয়। একে লালন-পালন ও বড় করার জন্য পরিচর্যা আবশ্যক।

θ মুসলিম জাতিকে দৃঢ়সংকল্প হতে হবে যে, যা তারা হস্তগত করতে যাচ্ছে তা যেনো হস্তচ্যুত না হয়।

θ আমাদের পবিত্র ইসলামী বিপ্লব মুসলিম বিশ্বে লুটতরাজ ও স্বৈরতন্ত্রের আয়ু নিভিয়ে দিবে।

θ বিপ্লবের পথে ও এর বিজয়ের জন্য নিজে আত্মত্যাগী হওয়া ও কোরবানী দান (স্বজনকে) মজলুমদের উদ্ধারের জন্য সে বিপ্লবের পথে ওই কোরবানী অনিবার্য।

θ যারা ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকৃতভাবে দেখায় আপনারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং সত্য যে রকম বিদ্যমান সেটাকেই তুলে ধরুন যাতে ইনশাআল্লাহ সকল ইসলামী ভূখন্ডে সত্য বাস্তবায়িত হয় এবং বাতিল (অন্যায় ও অসত্য) আপনা আপনি সকল ইসলামী রাষ্ট্র, এমনকি ইনশাল্লাহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র থেকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

θ এ আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে যান এবং নিজেদের মনে নৈরাশ্যের কোন স্থান দেবেন না। কেননা, নৈরাশ্য শয়তানের সৈন্য।

θ চেষ্টা করবেন যাতে "উড়ে এসে জুড়ে বসার দল" এবং "দীনকে দুনিয়ার কাছে বিক্রেতার গোষ্ঠী" আমাদের বিপ্লবের উজ্জ্বল চেহারাকে বিকৃত করতে না পারে।

θ আপনারা এমন এক বিপ্লবী আন্দোলন করছেন দুনিয়াতে যা বিরল নজীরবিহীন।

θ আমরা আমাদের বিপ্লবকে তলোয়ারের মাধ্যমে হোক তা চাইনে, বরং তা প্রচারের মাধ্যমেই হোক।

www.pathagar.com

θ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী জনগণ প্রমাণ করেছেন যে, তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা বরদাশত করতে পারবে কিন্তু বিপ্লবের পরাজয় ও এর নীতিমালার কোন ক্ষতি তারা কখনো সহ্য করবে না।

θ আমাদের উচিৎ ত্যাগীদের সঠিক মূল্যায়ন করা।

θ একটি মহান বিপ্লবের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাই বিজয়ের ও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিদর্শন।

θ আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য কোন আশঙ্কা করি না। বিপ্লব তার পথ পেয়ে গেছে ও সামনে এগুচেছ এবং তা কারো উপর নির্ভরশীল নয়।

θ আমি আপনাদের মাঝে থাকি আর নাই থাকি সবার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে দুশমন ও অন্যদের হাতে পড়তে দেবেন না।

θ যতক্ষণ মুসলমানদের ওপর থেকে পরাশক্তিবর্গের হাত খাটো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই, আমাদের শ্লোগান চলবেই, আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবেই এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হবো।

θ আমরা আমেরিকার সামনে এক অপদস্থ গোলাম হিসাবে আছি কিন্তু সে যিল্লতির অবসান ঘটিয়ে ইযযত পেয়ে সমউচু করে দাড়ানো পর্যন্ত এবং মানবতার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

θ আমাদের ভেতরে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ পরিবর্তন খোদায়ী পরিবর্তন।

θ মুসলমান জাতির পেছনে আল্লাহর হাত আছে।

θ আমাদের জাতি পেটের জন্য আন্দোলন করে না আমাদের জাতি এসব ফালতু জিনিসের জন্য বিপ্লব করেনা।

θ অন্যান্য আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনের এদিক থেকেই ফারাক রয়েছে যে, এ আন্দোলন গণভিত্তিক ও ইসলামী।

θ পবিত্র বিপ্লব হচেছ ইসলামী বিপ্লব। এদিক থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বিশ্বের মুসলমানগণ এতে প্রভাবিত হবে এবং এ বিপ্লবের স্রোতে সামিল হবে।

www.pathagar.com

মতভেদ ও অনৈক্য

- θ অনৈক্য আসে শয়তান থেকে আর একতা ও সংহতি আসে রহমান (আল্লাহ) থেকে।
- θ হে, আমার প্রিয়জনেরা! শয়তানের প্ররোচণাস্বরূপ যে মতভেদ তা থেকে বিরত থাকুন।
- θ যদি আপনারা আমার সাথে ও আমি আপনাদের সাথে মুকাবিলা করি তাহলে অন্যরা এ থেকে সুযোগ নেবে এবং আমাদের হাতে কিছুই আসবেনা।
- θ যা আমাদের সবচেয়ে বেশী আঘাত হানে তাতো আভ্যন্তরীণ অনৈক্য।
- θ যে সমস্ত বিষয় থেকে অনৈক্যের দুর্গন্ধ আসে তা নিঃসন্দেহে শয়তানের কাছ থেকে আসে।
- θ পরাশক্তিবর্গ যুদ্ধ ও সামরিক আগ্রাসন চালিয়েও কিছু করার ব্যাপারে নিরাশ হয়েই শয়তানীতে হাত দিয়েছে এবং আপনাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করতে ও আপনাদের ভেতর অনৈক্য স্থাপন করতে চাচেছ।
- θ আজ নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ আত্মহনন ও আত্মহত্যার শামিল। আজ বিভেদ সৃষ্টিও আত্মহত্যা।
- θ আজ মতভেদ যার মুখ থেকেই এবং যে কোন অস্তিত্বের কাছ থেকেই আসুক না কেন এ মুখ শয়তানের মুখ।
- θ আমি সমগ্র মুসলিম সমগ্র জাতিকে সতর্ক করছি, যদি এ সমস্ত মতভেদ সৃষ্টির অনুসরণ করেন আর তা যে কোন লোক থেকেই সৃষ্টি হোক না কেনো, তাহলে আপনাদের জাতি আমেরিকার থাবায় গিয়ে পড়বে।
- θ জাতীয়তাবাদের চেয়েও বিপজ্জনক ও দুঃখজনক হচেছ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে শিয়াদের এবং অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি এবং ইসলামী ভাইদের ফেতনামূলক ও শত্রুতামূলক প্রচার-প্রপাগাণ্ডা।
- θ আজ আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় গুণাহ হচেছ অনৈক্য সৃষ্টি ও মুনাফেকীর জন্মদান।

www.pathagar.com

θ যদি আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দের ফারাক থাকে ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মপতপার্থক্য থাকে তাহলে আমাদের উচিত একত্রে বসা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করা এবং মনের কথা প্রকাশ করে সমাধান করা।

θ দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদকে ভালো পরিবেশে ভ্রাতৃত্বপূর্ণভাবে সমাধান করুন।

θ আজ যে কোন বিষয় সম্মানিত মুসলিম জাতিকে মুল পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে তা-ই শয়তানী কাজ এবং শয়তানের উস্কানিতেই উত্থাপিত।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

θ যে কোন সংস্কার ও পরিশুদ্ধির শুরুই হচেছ স্বয়ং মানুষ।

θ মানুষ যদি ঠিক হয় দুনিয়ার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

θ এ মানুষ, এ দ্বিপদ প্রাণী দুনিয়ার বুকে যত ফেৎনা ও ফ্যাসাদ করে থাকে অন্য কোন সৃষ্টি তা করে না। এ দ্বিপদ প্রাণীর জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ যত প্রয়োজন অন্য কোন প্রাণীর তত প্রয়োজন নেই।

θ প্রতিটি লোক যেমনি তার নিজ থেকে সংশোধন শুরু করার দায়িত্ব বহন করে তেমনি অন্যদের সংশোধনের দায়িত্বও প্রাপ্ত।

θ আম্বিয়া কেরামের ওপর যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সব এজন্যেই নাযিল হয়েছে যে, এই যে সৃষ্টি (মানুষ) একে খোদায়ী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অধীনস্থ করবে যাতে সে সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে। কেননা একে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হলে সে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে।

θ বিশ্বটা একটি পাঠশালা আর এ পাঠশালার শিক্ষক হচেছন আম্বিয়া ও আউলিয়য়ে কেরাম।

θ ইসলামে সকল বিষয়ই মানুষ গড়ার পটভূমি।

θ মানুষের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমেই দুনিয়া সংশোধিত হয়ে যাবে।

θ জগতের ভিত্তিই মানুষের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে।

θ শুধুমাত্র শিক্ষার কোন ফায়দা নেই, কখনো বা এতে ক্ষতি রয়েছে।

θ মানুষের উপর যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি আপতিত হয় তার বেশীর ভাগই এসমস্ত অপরিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ও অপবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এসে থাকে। এরা জ্ঞান ঠিকই অর্জন করে তবে তাকওয়া (খোদাভীতি) অধিকারী হয় না।

www.pathagar.com

- বিদেশী শত্রুর সাথে সংগ্রামের সর্বোত্তম ও কার্যকরী পথ হচ্ছে দীন ও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সজ্জিত হওয়া এবং অস্ত্রের ঝংকার খালি করে জ্ঞান বিজ্ঞানে পূর্ণ করা। তবে অস্ত্রের ঝংকার ও থাকবে শুধু ইহুদীবাদী মার্কিনী শয়তানদের জন্য।
- দীনি প্রশিক্ষণ দান করুন। এ প্রশিক্ষণহ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফায়দা নেই। শুধু জ্ঞানে ক্ষতি রয়েছে।
- দীনি শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন।
- জনগণকে যে শিক্ষাদান করছেন তা যেনো লক্ষ্যসম্পন্ন হয় সে চেষ্টা করবেন।
- যারা জনগণকে নির্দেশদান ও পরিচালনা করতে চায় তাদের উচিত কথা ও কাজে এক হওয়া।
- আপনারা যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের সবারই জানা উচিতঃ প্রথমতঃ এ পেশা হলো খোদায়ী পেশা। খোদা তায়ালা হচেছন আসল শিক্ষক তথা আম্বিয়াকে কেরামের মুরুব্বী। তাই এ পেশা হচেছ খোদায়ী পেশা। দ্বিতীয়তঃ তরবিয়ত বা দীনী প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধি শিক্ষার অগ্রজ।
- শিক্ষা ও দীনী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন ইসলাম, ইসলামী জাতি ও দেশের প্রতি খেয়ানাত করার শামিল। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
- দুনিয়াতে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা হচেছ একটি বাচচাকে বড় করে তোলা এবং সমাজকে একজন মানুষ (আদর্শ) উপহার দেয়া।
- আজকের শিশুদের মধ্যে থেকেই আগামীকালের জ্ঞানী-গুণী মানুষ গড়ে উঠবে।
- এমন কেউ দাবী করতে পারে না যে, আমার শিক্ষা লাভের প্রয়োজন নেই এবং আমার নৈতিক প্রশিক্ষণের কোন আবশ্যকতা নেই। রাসূলে খোদারও শেষ দিন পর্যন্ত এ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য রসূলের প্রয়োজন আল্লাহ পাক মিটিয়েছেন। আমাদের সবারই এ প্রয়োজন রয়েছে।
- মুসলিম জাতি ও দীনদার চিন্তাশীলদের এ সত্য মেনে নেয়া আবেশ্যক যে, সাংস্কৃতিক শুদ্ধি অর্জন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত

www.pathagar.com

সংস্কার সাধন ও পরিশুদ্ধি অনিবার্য বিষয়। তাদের উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিপথগামিতা ঠেকানো।

θ লক্ষ্য রাখবেনঃ বিদ্যালয়ের সময়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা, এ সময়ই শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে থাকে।

θ বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশোধন তখনই সহজ হয়ে যাবে যখন আমাদের সন্তানদের স্কুল জীবনেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

θ স্কুলের প্রচার পরিকল্পনার ভেতর 'ভাষাকেও' রাখতে হবে, বিশেষ করে পৃথিবীতে অধিক প্রচলিত ভাষাসমূহ।

θ দেশের মুক্তির জন্যে দরদী প্রাণ দীনদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর উচিত প্রিয় শিশু ও যুবকদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। কেননা এদের সঠিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপরই মুসলিম উম্মাহ্ এবং বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করে।

জ্ঞান ও জ্ঞানী

θ সত্যিকারের জ্ঞান হচেছ আসমানী পথ নির্দেশক আলোকবর্তিতা, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের সোজা পথ এবং তার কাছে মর্যাদা লাভের স্থান অধিকার করার জ্ঞান।

θ যে জ্ঞান পরোয়ারদেগারের নামে শুরু হয় তা-ই হেদায়েতের নূর।

θ জ্ঞানচর্চার ব্যাংকারও একটি প্রতিরক্ষামূলক বাংকার অর্থাৎ সমগ্র ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা।

θ জ্ঞান-প্রজ্ঞার ছায়াতলে যে জীবন তা এতই মধুর এবং বই-পুস্তক, কলম ও অভিজ্ঞতাসমূহ এতই স্মৃতিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী যে জীবনের সকল দুঃখ-যাতনা ও ব্যর্থতাকে বিস্মৃত করে দেয়।

θ আমাদের মুসলিম জাতি যদি জ্ঞান শিক্ষা করে, সভ্যতা-সংস্কৃতি শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক দিক নির্দেশ লাভ করে তাহলে কোন শক্তি-ই একে শাসন করতে পারবে না।

θ মানুষ তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং একইভাবে শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতি। এমন কোন মানুষ নেই যার জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন এবং শিক্ষা-দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

- কুরআনের ভাষায় জ্ঞানের অনেক প্রশংসা এসেছে। তবে এর সাথে সাথেই তাকওয়ার কথা এসেছে।
- মূল্যবোধের মাপকাঠি দু'টিঃ জ্ঞান ও তাকওয়া (খোদাভীতি)।
- যার মাঝে জ্ঞান ও তাকওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান।
- আপনারা ও আমরা যদি মনে করি যে, জ্ঞানই সৌভাগ্যের উৎস, সে যা-ই হোক না কেনো, তাহলে বিরাট ভুল হবে।
- জ্ঞান যদি কোন দুষ্ট অন্তরে বা মগজে প্রবেশ করে, বিশেষতঃ চারিত্রিক দিক থেকে, তাহলে এর ক্ষতিসমূহ অজ্ঞ লোক থেকেও অধিক হবে।
- পরিতাপ ওই জ্ঞানপিপাসীর (তালেবে ইল্‌ম্‌) যার অন্তরে জ্ঞান নোংরামী ও অন্ধকার নিয়ে আসে।
- আপনারা জেনে রাখুনঃ যে কোন ধরনের জ্ঞানী যদি চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জন না করে এবং ইসলামী আখলাকের অধিকারী না হয় তাহলে সে ইসলামের জন্য উপকারী তো নয়ই বরং ক্ষতিকারক।
- জ্ঞানী যদি পূতপবিত্র না হয়, হোক না সে ইসলামী হুকুম- আহকামের আলেম (জ্ঞানী), হোক না সে তাওহীদ বিষয়ক আলেম, সে তার নিজের, নিজ দেশের, জাতির ও ইসলামের জন্য উপকারী তো নয়ই বরং ক্ষতিকারক।
- যদি ভাড়াটে আলেমরা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ও আমাদের একতাকে বিনষ্ট না করতে পারে ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয়ী হবই- এবং ইসলামী সরকার ও রাষ্ট্রগুলো তথা মুসলিম উম্মাহ বিজয়ী হবেই।
- ইসলামের প্রতি অসাধু জ্ঞানীর অনিষ্টতা অন্য সব অনিষ্টতার চেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিস্তর।
- যদি আলেম (জ্ঞানী) অসাধু হয় তাহলে বিশ্বটাই বিপর্যস্ত হবে।
- বহুলোক আছে যারা জ্ঞানী, অতিজ্ঞানী! কিন্তু যেহেতু ইসলামী প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা নেই সেহেতু তাদের অস্তিত্ব ইসলামের জন্য অনিষ্টকর।
- আমাদের জ্ঞানীরা যেন পাশ্চাত্যকে ভয় না পায়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যেন পাশ্চাত্যকে ভয় না পায়, আমাদের যুবকরাও যেন ভয় না পায়। তাদের সংকল্প করা উচিত যে, তারা পাশ্চাত্যের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

θ মানব জাতি যতদিন মেশিনগান, কামান ও ট্যাঙ্কের ছায়ায় জীবন যাপন করতে চাইবে ততদিন মানুষ হতে পারবে না ও মানকিতা সমুন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌছুতে পারবে এবং মানুষ যখন জ্ঞান প্রজ্ঞার পূর্ণতায় আরোহণ করবে যখন মেশিনগানের উপর কলম বিজয়ী হবে। তখন মানব জাতির ভেতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এতোই উন্নত হবে যে, মেশিনগানগুলো পরিত্যাজ্য হবে এবং কলমেরই হবে রাজত্ব ও জ্ঞানেরই হবে সর্বাঙ্গন।

ওলামা ও দীনী শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা

θ আলেম সমাজ মুসলিম জাতির অবস্থার উন্নতি বৈ অন্য কিছু চায় না।

θ আলেমরা জনগণের পিতা! তারা সন্তানদের প্রতি আকৃষ্ট ও স্নেহপরায়ণ।

θ রুহানী আলেমরা ইসলামী আইন-কানুনের বাস্তবায়ন চায়।

θ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যদি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত না থাকতো তাহলে এতদিনে দীনের চিহ্নই মুছে যেতো। ভবিষ্যতেও যদি তারা না থাকেন তাহলে বিদেশী শত্রুদের মুকাবিলায় এই যে বিশাল বাধ তা ভেঙ্গে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের সামনে রাস্তা সর্বাধিক প্রসারিত হবে।

θ প্রিয় ফকীহরা (ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ মুজতাহিদ আলেমগণ) যদি না থাকতেন তাহলে মা'লুম ছিল না যে, সাধারণ জনগণকে কুরআন, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে কি জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো।

θ আলেম ছাড়া ইসলাম চিকিৎসা ছাড়া চিকিৎসার মত।

θ তারা (আলেমরা) ইসলামের মূর্তপ্রতীক, তারা কুরআনের নিদর্শন এবং নবী আকরামের প্রতিভূ।

θ রুহানী আলেমগণ মানব জাতির মুরুব্বী হিসাবেই আম্বিয়া কেরামের জায়গায় বসেছেন এবং আম্বিয়াদের পক্ষ থেকেই অধিষ্ঠিত, সনদপ্রাপ্ত।

θ কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ও ইতিহাসে দীনী মাদ্রাসাগুলো ও দীনদার আলেমরাই ছিলেন আগ্রাসন, বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তির মুকাবিলায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণতম মজবুত ঘাঁটি।

θ আলেম সমাজই তাদের ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সবসময় সামাজিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর পুরোভাগে ছিলেন।

www.pathagar.com

θ ইসলামের সংগ্রামী আলেমরাই সব সময় বিশ্ব লুটেরাদের বিষমাখা তীরগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন এবং ঘটনার প্রথম তীরগুলোর এদের হৃদপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করেছে।

θ গৌরব ও প্রশংসা আলেম সমাজ ও দীনী মাদ্রাসার ওসব শহীদের প্রতি যারা যুগে যুগে যুদ্ধের সময় লেখাপড়া, বাহাছ-বিতর্ক ও মাদ্রাসার আকর্ষণীয় রশিকে ছিঁড়ে ফেলেছেন, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রকৃত সত্তার পায়ে ঢেলে দিয়েছেন এবং হালকা পাখায় ভর করে আরশবাসীদের মেহমান হয়েছেন ও আসমানবাসীদের সমাবেশে কবিতা (খোদাপ্রেমের) শুনিয়েছেন।

θ আলেম সমাজের চিরন্তন বীরত্বগাঁথা রচয়িতাদের প্রতি সালাম, যারা তাদের জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক কিতাবকে (রেসালা) শাহাদতের দম্ (ফুৎকার) ও খুনের কালি দিয়ে লিখে গেছেন এবং জনগণকে হেদায়েত, ওয়াজ ও খুৎবা দানের মিম্বরে নিজেদের জীবন প্রদীপ দিয়ে শবচেরাগ মুক্তা (রাতে আলো দেয় যে মুক্তা) নির্মাণ করে গেছেন।

θ যারা দীনী মাদ্রাসাসমূহ ও পীর মাখায়েখদের শেষ রাতের দোয়া-মুনাজাত ও আরেফ-অলীদের যিকিরের হল্কা (সমাবেশ) হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তারা ও সমস্ত মনীষীর অস্তিত্বের নিগূঢ়ে শাহাদাতের আরজু ও পিপাসা বৈ অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করেননি।

θ আলেম সমাজ এক বিশাল শক্তি। খোদা না খাস্তা এদের হস্তচ্যুত করা হলে ইসলামের স্তম্ভগুলো ধসে যাবে আর দুশমনের অত্যাচারী ক্ষমতা বাধাহীন হয়ে উঠবে।

θ পীর-মাশায়েখ ও আলেম সমাজ এক খোদায়ী শক্তি। এদের হারাবেন না।

θ ওলামায়ে কেরামের চেষ্টা-প্রচেষ্টাতেই ইসলাম এ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

θ আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আলেম সমাজ ব্যতীত অন্যরা যদি বিপ্লবী তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের পুরোধায় থাকে তাহলে আমেরিকা ও বিশ্ব লুটেরাদের মুকাবিলায় জিল্লতি, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই থাকবেনা।

θ যে কোন খোদায়ী ও গণ আন্দোলন এবং বিপ্লবের অগ্রভাগে প্রথমেই এসেছেন ইসলামের আলেম সমাজ যাদের কপালে খুন ও শাহাদাতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

www.pathagar.com

- কোন্ গণআন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবকে খুঁজে পাবে না যাতে দীনী মাদ্রাসাগুলো ও আলেম সমাজ শাহাদাত বরণে অগ্রগামী ছিলেন না, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেননি এবং খুন রাঙা ঘটনা প্রবাহের শহীদানের কবরগুলোর আস্তরণের নীচে স্বীয় পবিত্র দেহগুলোকে বিছিয়ে দেননি?
- একমাত্র আলেম সমাজ ব্যতীত জনগণকে কোন বিষয়ে মনোযোগী করা যাবে না। দীর্ঘ ইতিহাসে অবদান যা কিছু রয়েছে সবই আলেম সমাজ ও জনগণের। যখনই এ দু'টিকে ময়দান থেকে তাড়ানো হয়েছে তখ্নই এসেছে কেবল দুর্নীতি ও অশান্তি।
- প্রকৃতই ইসলাম আশা করা যায় সত্যিকার আলেমদের কাছ থেকে এছাড়া ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, আল্লাহর সত্য পথের ডাকে ও জনগণের খুন রাঙা সংগ্রামের পথে তারাই প্রথম কোরবানী দেবেন এবং জীবন পাতার শেষ সীলমোহর এঁকে দেবেন শাহাদাতের।
- আলেম সমাজ হামেশা শক্তিমদমত্তদের বিরুদ্ধে ছিলেন।
- কর্তব্যপরায়ণ আলেম সমাজ ও পীর মাশায়েখ জোঁক-প্রবৃত্তির পুঁজিপতিদের ও রক্ত পিপাসুদের সাথে কোন কালেই ওদের সাথে আপোষ রফা করেনি আর করবেও না।
- সম্মানিত মুসলিম জনগণের জানা উচিত, সাধারণতঃ আলেমদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রচারণা রয়েছে তার উদ্দেশ্য বিপ্লবী আলেমদের ধ্বংস করা।
- আলেম সমাজ ও অন্যান্য মুসলমানের অপরাধ এটাই যে তারা কুরআন, ইসলামের মান-সম্মান ইসলামী আদর্শের প্রতিরক্ষা করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।
- আলেম সমাজ না থাক্লে কেউ-ই ইসলামকে রক্ষা করতে পারবে না।
- আলেম সমাজের পরাজয় ইসলামেরই পরাজয়।
- যদি আলেমদের পরাজিত করা হয় তাহলে তা ইসলামেরই পরাজয় হবে।
- আলেম সমাজ যদি পরাজিত হয় তাহলে ইসলামী বিশ্ব পরাজিত হবে।
- আপনারা মানুষ সংশোধন করতে চাচেছন অথচ মোল্লা-মৌলভী ছাড়া তা সংশোধিত হবে না।
- আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখ ছাড়া ইসলামের অর্থ হচেছ আমরা ইসলামকেই চাই না।

www.pathagar.com

- যুবকদেরই কর্তব্য হলো মহা সম্মানিত আলেম সমাজ ও পীর-মাশায়েখদের প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট থাকা।
- চেষ্টা করবেন যাতে আপনাদের ইসলাম আলেম সমাজ থেকে জুদা না হয়।
- শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আলেমদের প্রতি ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। এই আলেমরা যদি না থাকে তাহলে ইসলামই উচেছদ হয়ে যাবে।
- জাতির কর্তব্য হলো আলেমদের আনুগত্য করা এবং আলেম বিরোধী কথাবার্তা ও প্রচারণা যা হচেছ তাতে কান না দেয়া। মনে করতে হবে এ প্রচারনা শত্রুদের।
- পীর-মাশায়েখদের মাদ্রাসাগুলো সমাজ ও জনগণেরই অংশ।
- দীনী মাদ্রাসাগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে মুসলিম উম্মাহ্ ঠিক হয়ে যাবে।
- গুণ-জ্ঞান, সংগ্রাম, বীরত্ব এবং সত্য ও দীনের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার দাবীদারদের সংখ্যা প্রচুর ছিল ও আছে কিন্তু প্রকৃত গুণী-জ্ঞানী, মুজাহিদ এবং সত্য ও বাস্তবতার প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠরা খুবই অল্প।
- যখন কলমগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়, মুখগুলোকে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং কণ্ঠনালীগুলোকে চেপে ধরা হয় তখন হক কথা বলা ও মিথ্যা-বাতিলকে প্রত্যাখ্যানে মোটেও আলেম সমাজ বিরত থাকেন না।
- দুষ্কৃতকারীদের জানা উচিত যে একজন আলেমকে হত্যা করলে শত শত আলেম সে জায়গা দখল করবে। তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার ইসলামী, জ্ঞানপূর্ণ ও দর্শন-প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব সব চলে যাবে না।
- আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবাননে আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে বসনিয়া হারজে গোভিনায়, চেচনিয়ায় বড় বড় আলেমদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হচেছ। বীর সন্তান ও চিরঞ্জীব আলেমের শাহাদতের ফলে প্রিয় ইসলামের বিরাট ক্ষতি হচেছ যা কোন কিছুতেই পূরণ হবে না।
- আমরা অতীব প্রিয় সন্তানদের হারিয়েছি এবং তাদের শোকে বসেছি। তারা এমন সব ব্যক্তিত্বের ছিল যারা সারা জীবনের ফসল।
- এমনসব সন্তান লালন-পালন করতে পারায় মহান ইসলাম, মানবকুলের মুরুব্বীগণ ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি মুবারকবাদ জানাচিছ। এরা এদের অস্তিত্বের অনির্বাণ আলোতে মৃতদের দিয়েছেন প্রাণ এবং অন্ধকারকে করেছেন আলোকময়।

www.pathagar.com

- যদি মনে করে থাকেন যে, সমগ্র দুনিয়ায় এদের মত ইসলামের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ ও জনগণের সেবার অন্তর ভরপুর একজনকেও খুঁজে পাবেন তাহলে তা হবে অবাস্তব।
- মুসলিম উম্মাহ্ এমন এক ভাণ্ডার যেখানে জ্ঞান ও তাকওয়া প্রতিপালিত হয়।
- মুসলিম উম্মাহ্ থেকেই সারা বিশ্বে জ্ঞান রফতানী হয়েছে ও হচ্ছে।
- মুসলিম উম্মাহ্ জ্ঞানের কেন্দ্র, তাকওয়ার কেন্দ্র এবং শাহাদাত ও বীরত্বের কেন্দ্র।

পীর মাশায়েখ ও আলেম সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য

- আজ পীর-মাশায়েখ ও আলেম সমাজ এবং যারা এ পবিত্র পোশাকে ভূষিত হয়েছেন তাদের দায়-দায়িত্ব এতোই যে- দীর্ঘ ইতিহাসে আলেম সমাজের উপর তা অর্পিত হয়নি।
- সম্মানিত আলেমদের উপর দায়িত্বের যে বোঝা তা অন্যদের উপর নেই।
- ইসলাম ও কুফরীর এ সংঘর্ষে জাতির সবারই দায়িত্ব রয়েছে। তবে আলেমদের দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।
- ইসলামের আলেমদের কর্তব্য হলো যখনি ইসলাম ও কুরআনের জন্য বিপদ অনুভব করবেন তখনি তা মুসলমান জনগণকে জানানো হচ্ছে অত্যাচারীদের একচেটিয়াবাদ ও অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তাদের এ অনুমতি দেয়া উচিত নয় যে, বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত থাকবে আর এদের পাশে লুটেরা অত্যাচারী ও হারামখোরের দল ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যে জীবন কাটাবে।
- ফকীহ্দের (মুজতাহিদ) উচিত স্বীয় জিহাদ ও সংগ্রাম এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসকদের লাঞ্ছিত ও নড়বড়ে করে দেওয়া আর জনগণনকে সজাগ-সচেতন করা যাতে সজাগ মুসলমানদের গণআন্দোলন অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটাতে ও ইসলামী শাসন প্রবর্তন করতে পারে।

www.pathagar.com

θ আমাদের সবার, আলেম সমাজ, নিপিড়িত জাতি সকল ও ইতিহাসের সমস্ত অত্যাচারিতের উচিত সংগ্রামে নামা এবং এই সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের রুখে দাড়ানো।

θ দীনী মাদ্রাসাগুলো এবং আলেম সমাজের উচিত সবসময় সমাজের চিন্তা-ভাবনা ও ভবিষ্যত প্রয়োজনের নাড়িকে স্বীয় হাতের মুঠোয় রাখা এবং সদা সর্বাদা ঘটনাসমূহের কয়েক কদম আগেই অবস্থান করা আর প্রতিক্রিয়া দেখানোর শক্তি-সামর্থ্যও সাথে রাখা।

θ একজন ফকীহের উচিত একটি মহান ইসলামী সমাজ এবং এমন কি অনৈসলামী সমাজকেও পরিচালনার বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি ও বিচক্ষণতার অধিকারী হওয়া। একজন মুজতাহিদের (ফকীহ) যা উচিত তাকে সেই ইখলাছ (নিষ্ঠা), তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার অধিকারী হওয়া ছাড়াও প্রকৃতপক্ষেই পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হওয়া।

θ দীনী মাদ্রাসাগুলোতে মুত্তাকী ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত শিক্ষকদেরই উচিত ছাত্রদের গড়ে তোলা।

θ দীনী মাদ্রাসাগুলোতে যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন তাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে মাদ্রাসাগুলো পবিত্র থাকে।

θ আপনারা যদি এটা চান যে, আপনাদের মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত হোক তাহলে দীনী মাদ্রাসায় যারা রয়েছে (ছাত্রগণ) এদের গড়ে তুলুন।

θ দীনী মাদ্রাসাগুলো যদি পবিত্র ও কর্তব্যপরায়ণ হয় তাহলে মুসলিম উম্মাহ্কে নাজাত দিতে সক্ষম।

θ স্কুলসমূহ ও মাদ্রাসাসমূহের ব্যাপারে আরজ করছি যে, তাকওয়াবিহীন (পরহেজগারীহীন) জ্ঞানের অপকারিতা না থাকলেও উপকারিতা মোটেও নেই।

θ আপনারা যারা জনগণকে আখেরাতের দিকে ও বিভিন্ন গুণাবলী অর্জনের দিকে দাওয়াত করছেন তাদের উচিত প্রথমে নিজেদেরই পদক্ষেপ নেয়া যেন আপনাদের দাওয়াত হয় সত্যনিষ্ঠ দাওয়াত।

θ আমি প্রায়ই হয়তো বা বেশীর ভাগ সময়ই এ আশঙ্কা পোষণ করি এবং এ আশঙ্কা থেকে কখনো বা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি যে, এমন আবার হয়ে যায়

www.pathagar.com

কিনা যে, আমাদের কারণেই জনগণ যাবে বেহেশতে আর আমরা যাবো জাহান্নামে।

- আমাদের এ আশঙ্কা হয় যে, আমাদের উপর তথা আলেম সমাজের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা হয়তো সঠিকভাবে পালন করতে পারবো না।
- আমরা যদি খোদা না খাস্তা আলেমসুলভ পরিবেশ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসি এবং বৈষয়িক দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি অথচ এরপরও আলেম বলে নিজেদের জাহির করি তাহলে এতে হয়তো শেষ পর্যন্ত আলেম সমাজেরই পরাজয় ঘটবে।
- আপনাদের আলেম সমাজকে আল্লাহতায়ালা শক্তিশালী করুন। খোদা না খাস্তা আপনাদের কার্যকলাপ যদি এমন হয় যে, আপনারা জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবেন, যদিওবা দীর্ঘসময় পর, তাহলে সেদিন আর ফ্যান্টমের (বোমারু বিমান) প্রয়োজন হবে না, স্বয়ং জনগণই আপনাদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারাবে এবং তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।
- এমন যেন না হয় যে, জুমা নামাজের ইমাম যখন রাস্তায় বের হবেন তখন তার জন্য রাস্তা খালি করা হবে (ট্রাফিক পুলিশ লাগিয়ে) এবং প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালানো হবে। এ ধরনের বিষয়াদি সমাজে তার মান-সম্মানকে নষ্ট করে দেবে। ইমাম হবেন খলিফাতুল মুসলিমীনদের মত। বিনম্র মাটির মানুষ।
- খোদা না খাস্তা জনগণ যদি দেখে যে মহোদয়গণ (আলেম সমাজ) তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাদের চলাফেরা আলেমদের মত নয়, তাহলে আলেমদের সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে ধারণা রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। আর এ ধারণা বদলে যাওয়ার অর্থ ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ধ্বংস হওয়া।
- আলেম সমাজের জন্য এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য এর চেয়ে অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক কিছু আর নেই যে তারা ভোগবিলাসে মন দেবে এবং দুনিয়ার পথে পা বাড়াবে।
- আলেমদের জন্য দুনিয়ার প্রতি মোহের মত আর কোন নোংরা বিষয় হতে পারে না এবং দুনিয়া পূজার মত অন্য কোন ব্যবস্থাই আলেমদের নষ্ট করতে পারে না।

www.pathagar.com

- যখন আড়ম্বর বেড়ে যাবে তখন অন্তঃসারশূন্য হবে।
- আলেমরা সব সময় মজলুম ছিলেন। মজলুমদের চেহারা খুবই জনপ্রিয়। দেড়হাজার বছর আপনারা যত মজলুম হয়েছেন ততই জনপ্রিয় হয়েছেন।
- আলেমদের উচিত হেদায়েত ও নসিহতমূলক ভূমিকা পালন করা, শাসকের ভূমিকা যেন না হয়।
- জনগণ যদি আমাদের মাঝে ক্রটি দেখতে পায় এবং আমাদের কারো কারো ভুলের জন্য যদি জনগণ আলেম সমাজ থেকেই মন ফিরিয়ে নেয় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব কারো ব্যক্তিগত নয় বরং তা হবে ইসলামী দায়-দায়িত্ব সমগ্র আলেম সমাজের দায় দায়িত্ব।
- কোন আলেম যদি বাঁকা পথে পা বাড়ায় তাহলে বলে বেড়াবেঃ "আলেম সমাজই এ ধরনের।" এটা বলবে নাঃ "অমুক খারাপ"।
- আলেম সমাজ সম্পর্কে খারাপ ধারনা ও আলেমদের পরাজয় হবে ইসলামেরই পরাজয়।
- আমার উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে বলুনঃ উগ্রপন্থার পরিণতি ভালো হয় না।
- মহান পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের প্রতি আমার আবেদনঃ যুব সমাজের প্রতি স্নেহশীল ও পিতৃপ্রতিম হোন।
- দুশমনেরা দীর্ঘকাল থেকেই আলেমদের ভেতর অনৈক্য সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে গাফেলতী সব কিছুকে বরবাদ করে দেবে।
- আলেমদের অনৈক্য জাতির অনৈক্য ডেকে আনে, ব্যক্তিগত অনৈক্য নয়।
- আমি আলেমদের প্রতি সতর্কবাণী উচচারণ করছি যে, খোদা না খাস্তা আপনাদের ভেতর যদি কেউ ইসলামী বিধি-বিধানের বিপরীতে কাজ করে তাহলে তাকে নিষেধ করুন আর যদি মান্য না করে তবে তাকে আলেম সমাজ থেকে বের করে দিন।
- আলেম সমাজ পীর মাশায়েখদের যদি কোন ক্রুটি প্রকাশিত হয় তাহলে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।
- আলেম সমাজের যে বিষয়টি মোটেও পরিত্যাগ করা এবং প্রচারণার কারণে ময়দান ছেড়ে দেয়া উচিত নয় তাহলো বঞ্চিত ও নগ্নপদ জনতার প্রতি

www.pathagar.com

সমর্থন দান। কেননা, যারাই এ বিষয় পরিত্যাগ করবে সে ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচারই পরিত্যাগ করলো।

θ খলিফাতুল মুসলিমীনদের জীবনের সাথে আজকের আলেমদের জীবনের তুলনা করা প্রয়োজন। তখনই ভালো করে বুঝবো যে, আমরা নিজ হাতেই নিজেদের কত অনিষ্ট করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষিত সমাজ

θ বিশ্ববিদ্যালয়ই সকল পরিবর্তনের উৎস।

θ দেশের সকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতে।

θ বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

θ কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি সংশোধিত হয় তাহলে দেশটি সংশোধিত হয়ে যায়।

θ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জানা উচিত তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সব সময়ের জন্যই তাদের দেশের বীমা করে ফেললো।

θ আমাদের সব সময় এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী হতে হবে যাতে তা দেশের জন্য উপকারী হয়।

θ বিশ্ববিদ্যালয়কে সব কিছুর আগে ইসলামী হতে হবে। তা এ জন্যেই যে, দেশ যত মার খেয়েছে এর সবই ওই লোকদের হাতে যারা ইসলামকে জানতো না।

θ বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী হওয়ার অর্থ স্বাধীন-স্বতন্ত্র হওয়া, নিজেকে পাশ্চাত্য থেকে বিচিছন্ন করা এবং সকল আধিপত্যবাদীদের থেকে শতর্ক হওয়া। যাতে আমরা একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাধীন কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী হতে পারি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা চালু করা অপরিহার্য।

θ প্রিয় ছাত্ররা! পাশ্চাত্যমুখিতা থেকে বের হয়ে আসতে আপনারা নিজেরাই চেষ্ট করুন, আপনাদের এ হারানো বিষয়কে খুঁজে বের করুন আর আপনাদের হারানো বিষয় তো স্বয়ং আপনারাই ভাল যানেন।

www.pathagar.com

- আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে আল্লামুখী করুন, আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যান এবং সকল শিক্ষাই গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে সকল শিক্ষাই আল্লাহ্‌র জন্য গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর প্রধান ভাষা সমূহ এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অবশ্যই শিখতে হবে। দেশ এবং দুনিয়া পরিচালনা করতে হবে। তবে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি থাকতে হবে।
- আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়বাসীরা মানুষ তৈরী করার চেষ্টা করুন। যদি মানুষ গড়ে তুলতে সক্ষম হন তাহলে নিজেদের নাজাত দিতে পারবেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়কে নৈতিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র করুন। জ্ঞানার্জন ছাড়াও এ প্রশিক্ষণ আবশ্যক। যদি কোন পণ্ডিত লোকের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা না থাকে তাহলে সে হবে ক্ষতিকারক।
- বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ গড়ার কেন্দ্র হওয়া উচিত।
- বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রকৃতপক্ষেই বিশ্ববিদ্যালয় হয়, বিশ্ববিদ্যালয় যদি ইসলামী হয় অর্থাৎ পড়াশুনার সাথে সাথে সেখানে আত্মিক পবিত্রতাও বাস্তবায়িত হয়, নৈতিক নিষ্ঠা থাকে তাহলে এরা যে কোন দেশকেই সৌভাগ্যে পৌঁছাতে পারে।
- ভালো বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতিকেই সৌভাগ্যবান করতে পারে আর কোন অনৈসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অসৎ বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতিকেই পিছিয়ে দিতে পারে।
- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত মানুষ বের হয় তারা দেশের জন্য অনিষ্টকারী নয় উপকারী।
- কোন জাতির জন্য যত কল্যাণ আসে বা অনিষ্টতা আসে; স্বাধীনতা বা অধীনতা, স্বৈরাচার বা মুক্তি, মুখাপেক্ষিতা ও শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ইত্যাদি নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিতদের আত্মিক প্রশিক্ষণের উপর।
- বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের সব কিছু চালায়; বিশ্ববিদ্যালয়ই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রশিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লুটেরাদের ইখতিয়ারে থাকে তবে দেশই ওদের ইখতিয়ারভুক্ত হয়ে যায়।
- বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং নৈতিকতা মহামানব তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামানব তৈরী করলে দেশও মহাদেশ হবে। জাতিও মহান জাতি হবে।

www.pathagar.com

θ বিশ্ববিদ্যালয় গুলি গোটা বিশ্বেই সকল বিষয়ের পুরোভাগে রয়েছে এবং দেশের শক্তি-সামর্থ্য ও সহায়-সম্পদ এরই উপর নির্ভরশীল। তাই আপনারা কঠিন পরিশ্রম করে গুমবাহী ও পাশ্চাত্যের দিক থেকে এগুলোর মুখ ফেরান।

θ বক্তা, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের উচিত আমাদের আসল দুশমন ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের নিরাশকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

θ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হলে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ আবশ্যক।

θ আশা করি, এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারী হবেন যা মানব জাতির উপকারে আসবে।

θ ইনশাআল্লাহ্ এমন দিন আসুক যখন বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য লোকজন আগমন করবে।

θ আমি আশা করি, আপনারা এটা অনুধাবন করে থাকবেন যে, মুসলমানদের সকল সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়েছে।

θ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত সজাগ হওয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উচিত পাশ্চাত্য পূজা থেকে মুক্ত হওয়া। প্রাচ্য অঞ্চলকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

θ যদি আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিক না হয় তাহলে ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের নিরাশায় পরিণত হবে।

θ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরোধী হওয়া উচিৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছিয়ে রাখার এবং উপনিবেশবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিতন হওয়ার বিরোধী হওয়া উচিৎ।

θ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যদি আমরা অবহেলা প্রদর্শন করি ও তা যদি আমাদের হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে আমাদের সব কিছুই হারাবো।

θ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি শান্তি না থাকে ও সেখানে শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ বজায় না থাকে তাহলে কেমন করে চিন্তাবিদগণ তাদের চিন্তাদর্শনকে আমাদের যুব সমাজের মাঝে ছড়াতে পারবেন এবং এদের বুদ্ধিমত্তাকে চিন্তাশীল ও বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে পারবেন?

www.pathagar.com

θ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি জ্ঞানী-পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ শূন্য হয় তাহলে স্বার্থসন্ধানী বিদেশী সমগ্র দেশে ক্যান্সারের মত শিকড় গেড়ে বসবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক লাগামসমূহে হস্তক্ষেপ করবে আর আমাদের অভিভাবক সেজে বসবে।

θ জনগণ যে সমস্ত মারাত্মক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে তার বেশীর ভাগই এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যারা সব সময় নিজেদের বড় মনে করতেন ও করছেন।

θ সকল প্রজন্মের প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, নিজেকে প্রিয় দেশকে ও "মানব গঠনকারী ইসলামকে" নাজাত দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিপথগামিতা পাশ্চাত্য-পূজা থেকে রক্ষা করুন এবং পাহারা দিন।

θ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কখনো বিপথে গমনের অনুমতি দেবো না এবং যেখানেই বিপথগামিতা দেখবো সেখানেই দ্রুত তা ঠেকানোর চেষ্টা করবো। আর এ জীবনদায়ক বিষয়টি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যুবকদের শক্তিধর হাতে সম্পন্ন হতে হবে।

θ জ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রতি সালাম। এরা জাতির পথ চলা ও নির্দেশনার আলোকবর্তিকা এবং উন্নতি, সৌভাগ্য, মাহাত্ম্য ও ফজিলতের পথে অগ্রসরমান।

θ সে কৃতি যুবকদের প্রতি সালাম যারা তাদের জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে প্রিয় ইসলামী জাতির উন্নতি ও সম্মানের জন্য সচেষ্ট রয়েছেন এবং মানবিক ও ইসলামী লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের কষ্ট সহ্য করা থেকে পিছপা হননি।

θ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ ও পুনর্গঠনের জন্য সব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ, সুযোগ-সুবিধাগুলোর কেন্দ্রীকরণ ও সঠিক পথে পরিচালনা এবং উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও অভিজ্ঞদের সার্বজনীন উৎসাহ দান যারা মূর্খতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সৎসাহসী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানগত একচেটিয়াবাদের ধূম্রজাল ভেদ করতে পেরেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহ্‌কে নিজ পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন।

θ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে যাতে পশ্চিমা জ্ঞানের আর প্রয়োজন না হয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সম্পর্ক

θ আমাদের দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোর স্বাধীনতা স্বকীয়তার উপর নির্ভরশীল।

θ মনে রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা যদি সংশোধিত হয় মুসলিম উম্মাহ্ও আগামী দিনে বিশ্ব শাসন করবে।

θ যেমনি দীনী শিক্ষার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি আধুনিক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি জাতির সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই একটি জাতির অধঃপতন ও দুর্গতি এসে থাকে এবং সৌভাগ্যও হাতছানি দিয়ে ডাকতে পারে যদি শিক্ষা ব্যবস্থা হয় আদর্শ।

θ দীনী মাদ্রাসাগুলো থেকে এমন আলেম বেরিয়ে আসতে হবে যে সার্বিক অর্থেই দীনদার ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং মানুষ গড়ার কেন্দ্র বলে পরিগণিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও মানুষ গড়ার কেন্দ্র হতে হবে।

θ শিক্ষক সমাজ ও প্রিয় বীর ছাত্রদের উচিত আলেম সমাজ ও দীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সমঝোতামূলক সম্পর্ক যত বেশী সম্ভব গড়ে তোলা ও দৃঢ়তর করা এবং বিশ্বাসঘাতক দুশমনদের চক্রান্ত ও প্রতারণা সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া সর্বদা সচেতন থাকা।

θ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীনী দিবা বিভাগ খোলা এবং ব্যাপকতরকরণে সচেষ্ট হোন।

θ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত দীনী মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা আর মাদ্রাসারও উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার বন্ধনকে শক্তিশালী করা।

শিক্ষক

θ শিক্ষকতার পেশা নবীদেরই পেশা। পয়গাম্বর আকরাম (সঃ) সকল মানুষের শিক্ষক। তারপরই সকল মানুষের শিক্ষক হচেছ হযরত সাহাবায়ে কেরামল

θ শিক্ষকের দায়িত্ব হচেছ আল্লাহ্র দিকে সমাজকে পরিচালনা করা।

θ আপনারা শিক্ষকগণ এতো বেশী সম্মানজনক পেশার অধিকারী যা কিনা আল্লাহরই পেশা। শিক্ষক হচেছন এমন এক আমানতদার যিনি অন্যান্য আমানতদার থেকে ভিন্ন। কেননা, তার আমানতের বিষয় হচেছ স্বয়ং মানুষ।

www.pathagar.com

- একটি জাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নিহিত রয়েছে শিক্ষকদের হাতে।
- আপনারা খুবই লক্ষ্য রাখবেন যে, আনপারা কোন সাধারণ লোক নন। বরং আপনারা এমন এক প্রজন্মের শিক্ষক যাদের উপর মানব জাতির ভবিষ্যত ক্ষমতা ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে দেয়া হবে।
- আপনাদের পেশা হলো শিশুদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়া।
- সকল শিক্ষককে এ চিন্তা করতে হবে যে, তাদের আত্মশুদ্ধ হতে হবে। নিজেদের অবশ্যই পবিত্র করতে হবে যাতে তাদের কথা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলে।
- শিক্ষকরা নিজেরাই যদি আত্মসংশোধিত না হন এবং একটি সঠিক শিক্ষার অধিকারী না হন তাহলে যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেনা।
- কোন সমাজের কল্যাণ ও অধঃপতন ওই সমাজের শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে।
- সকল কল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের উৎস হলো বিদ্যালয় আর এসবের চাবি হচ্ছে শিক্ষকরা।
- ইসলামী দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্বরূপ এই কিশোর শ্রেণী হচ্ছে শিক্ষকদের হাতে আমানত।

সাক্ষরতা

- নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমরা সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবো।
- সকল নিরক্ষরকে সাক্ষরতা লাভে ও সকল ভাই-বোনকে শিক্ষা দানে উঠে পড়ে লাগতে হবে।
- মুসলিম উম্মাহ্ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার ইসলামের ছায়াতলে পরিচালিত এটা লজ্জাকর বিষয় যে, তারা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। কেননা, ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণকে ফরজ করে দিয়েছে।
- ইতিহাসের দীর্ঘ এ সময়ে আমাদের উপর যত সমস্যা সংকট নেমে এসেছিল সবই জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে ঘটেছিল। ওরা জনগণের অজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগায় এবং এ জনতাকেই গণস্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে। যদি এদের জ্ঞান থাকতো, লক্ষ্য- উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান বিরাজ করতো তাহলে এদেরকে এদেরই কল্যাণ বিরোধী পথে সংঘবদ্ধ ও পরিচালিত করতে পারতো না। আমাদের মুসলিম উম্মাহ্-র শিক্ষিত ভাই বোনদের দায়িত্ব হবে অশিক্ষিত ভাইবোনদের কে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নেওয়া। স্থানীয়ভাবে পন্থা এবং পদ্ধতি ঠিক করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী দল ও সমিতি

θ আশা করি যে, মুসলিম উম্মাহ্ একটি ইসলামী দলে এবং একটি দেহে পরিণত হবে।

θ সমগ্র ইসলামী দেশই একটি ইসলামী দল আর সে দল হলো খোদায়ী দল।

0 ইসলামী দল হলো সেই মহা ইসলামী দলের শাখা যার নেতৃত্বে থাকবেন হযযত ইমাম মাহাদী (আঃ) স্বয়ং।

θ জনগণের কাছে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করুন। ইসলামী দলগুলোর উচিত আমাদের হাতে যে অমূল্য রত্ন রয়েছে এবং যা অন্য কারো হাতে নেই সেই কুরআন শরীফ এবং আমাদের হাতে অপর যে মানিক রয়েছে যা দুনিয়ার আর কারো হাতে নেই সেই সুন্নাহকে সর্বত্র পরিচিত করানো।

θ ইসলামী দলগুলো যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেকের প্রতি আমার আহ্বান পারস্পরিক সম্পর্ক বেশী মজবুত করুন এবং যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোক এদের মাঝে অনৈক্য ও ফাটল ধরাতে চায় তাদের উৎখাত করুন এবং জনসমক্ষে তাদের চেহারা ফাঁশ করে দিন আর ইসলাম ও এর মুক্তিদায়ক বিধি-বিধানকে নিজেদের কর্মসূচী ও পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে স্থান দিন।

θ এই ইসলামী দলগুলো আপনাদের জন্য খুবই উপকারী। যদি কেউ বলে বসে যে, এই ইসলামী দলগুলো অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াশীল তবে বুঝতে হবে যে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ তারা আমাদের সবাইকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বেড়াচেছ।

θ আপনারা নিজেরাই যদি নিজেদের সংশোধন না করেন এবং ইসলামী দল বলে নিজেদের নামকরণ করে যদি নিজেরাই ইসলামী না হোন তাহলে অন্যদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে সক্ষম হবেন না।

θ আপনাদের ইসলামী দলগুলোর সদস্যবর্গের দুটি দায়িত্ব রয়েছেঃ প্রথমতঃ নিজেদের ইসলামী করা আর দ্বিতীয়তঃ যেখানেই ইসলামী দল রয়েছে সেটাকে ইসলামী করা।

0 ইসলামী দলগুলোকে অবশ্যই ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে।

θ আমি অবশ্য ইসলামী দলগুলোর প্রতির আহবান যানাই যাতে তারা ইসলামী হওয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করে এবং কোন ব্যাপারেই যেন হস্তক্ষেপ না করে। ইসলামী দল ১০০ (একশত) টি হওয়াতেও আপত্তি নেই তবে সবাইকে একসাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

সমাজে নারীর ভূমিকা

- সমাজে নারীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নারী মানবজাতির আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের প্রতীক।
- নারী মানব জাতির মুরুব্বী।
- নারীর কোল থেকেই পুরুষ মে'রাজে গমন করেছেন।
- নারীই একমাত্র সৃষ্টি যে তার কোল থেকে এমন সব মানুষ সমাজের হাতে তুলে দিতে পারে যাদের বরকতে একটি সমাজ শুধু নয় বরং বহু সমাজ অটল সংগ্রামী ও সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধগুলোর অধিকারী হতে পারে।
- সমাজে·নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়েও উর্ধ্বে। আর তা এ কারণে যে, নারী সার্বিক দিক থেকে একটি সক্রিয় শ্রেণী হওয়া ছাড়াও অন্য সব সক্রিয় শ্রেণীকে নিজেদের কোলে লালন-পালন করে থাকে।
- আমি নারী সমাজের ভেতর এমন এক বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যা পুরুষদের ভেতরকার পরিবর্তনের চেয়েও ব্যাপক।
- বর্তমান বিশ্বে গৌরবোজ্জ্বল নারীদের জন্য আমি গর্ববোধ করছি। কারণ তাদের মাঝে এমন পরিবর্তন এসেছে যে, পঞ্চাশ বছর ধরে বিদেশী চক্রান্তকারীরা থেকে শুরু করে এদের পা চাটা ভাড়াটেরা এবং নোংরা চরিত্রের কবি. লেখক ও ভাড়াটে প্রচার সংস্থাগুলো যে শয়তানী ষড়যন্ত্র এঁটেছিল সবই নস্যাৎ করে দিয়েছে।
- আমাদের যুগে নারীরা প্রমাণ করেছে যে, সংগ্রামে তারা পুরুষদের সমগামী, বরং তাদের চেয়েও অগ্রগামী।
- আমরা গৌরবান্বিত যে, আমাদের নারীরা কি ছোট কি বড়, কি যুবতী কি বৃদ্ধা সকলেই সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ময়দানে উপস্থিত রয়েছে এবং পুরুষদের পাশাপাশি ও এদের চেয়েও উত্তমভাবে ইসলামের অগ্রগতির পথে আর কুরআনে করীমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খেটে যাচেছ।
- আমি যখনই দেখতে পাই যে, সম্মানিতা নারীরা অটল অবিচল ইচছা ও মনোবল নিয়ে লক্ষ্য পথে সব ধরনের দুঃখকষ্ট, এমন কি শাহাদাত বরণেও তৈরী তখন আমি নিশ্চিত হই যে, এ পথ বিজয়ের দ্বারে পৌঁছে যাবেই ইনশাল্লাহ্।

www.pathagar.com

θ নারীরা আমাদের আন্দোলনের নেতা।

θ আপনারা নারীগণ পুরুষদের পাশাপাশি থেকে ইসলামের জন্য বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারেন।

θ আপনারা বোনের দল এ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।

θ প্রিয় বীরাঙ্গনা বোনেরা! আপনারা পুরুষদের পাশাপাশিতে অবস্থান নিয়ে ইসলামের বিজয়কে ছিনিয়ে আনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

θ আমাদের পুরুষেরা আপনাদের মতো সিংহী হৃদয় নারীদের বীরত্বের কাছে ঋণী।

θ আমরা আমাদের বেশীর ভাগ সাফল্যকে আপনাদের মতো নারীদের খেদমতের কাছে ঋণী বলে মনে করি।

θ পুরুষদের সেবাগুলোর বেশীরভাগই নারীদের সেবার কাছে ঋণী।

θ মুসলিম বিশ্বের নারীগণ এ আন্দোলনে পুরুষদের চেয়েও বেশী ভূমিকার অধিকারী।

θ আমাদের প্রিয় নারীদের কারণেই পুরুষরা শক্তি ও সাহস পাচেছ।

θ বিজয় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কারণেই হবে ইনশাল্লাহ।

θ মুসলিম বিশ্বে সংঘটিত সব পরিবর্তনের সেরা পরিবর্তন নারীদের মধ্যকার পরিবর্তন।

θ নারী ও যুবকদের ভেতরকার পতিবর্তন ছাড়া এ আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবের লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব না।

θ ইসলামী লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে জাতির নারীরা সামনের সারিতে রয়েছে সে জাতির কোন বিপদ নেই।

θ এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে যে, আমাদের মহীয়সী নারীরা অতীতে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এবং পরাশক্তিবর্গ ও এদের ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে এমন সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করছে যে, কোনকালেই পুরুষেরা এ পর্যন্ত এমন প্রতিরোধ ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে বলে লিপিবদ্ধ হয়নি।

θ মহান সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও গড়ে তোলার জন্য নারীদের অগ্রণী হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

- যদি মানুষ গড়ার মিস্ত্রী নারীদেরকে জাতিগুলোর কাছ থেকে দূর করা হয় তাহলে জাতিগুলো পতন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।
- কোন সমাজের কল্যাণ বা অধঃপতন নির্ভর করে ওই সমাজের নারীদের কল্যাণ ও অধঃপতনের উপর।
- আপনারা ইতিহাসের নর-নারীগণ বিশ্ববাসী ও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোকে শিক্ষা দিন কেমন করে অত্যাচারীদের উৎখাত ও সত্যকে প্রতিরক্ষা করার পথে অবিচল সংগ্রাম করতে হয়।

নারীর অধিকার

- ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা দান করেছে এবং নারী অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার গোড়াপত্তন করেছে।
- সমাজ জীবনের অঙ্গন থেকে নারীদের দূর তো করেইনি বরং তাদেরকে সমাজে উচচতম মানবিক মর্যাদায় আসীন করেছে।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সেই অধিকারই রয়েছে যে অধিকার পুরুষের রয়েছে। আর এ অধিকারগুলো হলোঃ শিক্ষালাভের অধিকার, কাজের অধিকার, মালিকানার অধিকার, ভোট দানের অধিকার ও ভোট পাওয়ার অধিকার।
- মানবিক অধিকারের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন ফারাকই নেই, কেননা উভয়েই মানুষ। পুরুষের মত নারীও তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।
- ভাগ্য ও কর্মতৎপরতা নির্বাচনে পুরুষের মত নারীও স্বাধীন।
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীও ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- জাহেলিয়াতের মাঝে যা ছিল তা থেকে ইসলাম নারীদের নাজাত দিয়েছে। ইসলাম নারীদের প্রতি যে খেদমত করেছে, আল্লাহ্ মা'লুম পুরুষদের প্রতি সে খেদমত করেনি।
- ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নারীর সংবেদনশীল ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম নারীকে এত উচচ মর্যাদায় সমাসীন করেছে যাতে সে সমাজে তার মানবিক মূল্যকে লাভ করতে সক্ষম হয় এবং "পণ্য হওয়া"

www.pathagar.com

থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোতে এ ধরনের বিকাশই দায়-দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়।

θ আজ নারীদের কর্তব্য তাদের সামাজিক ও দীনী দায়-দায়িত্ব পালন করা, সাধারণের শুচি ও পবিত্রতা রক্ষা করা আর এই গণ শুচিতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া।

θ ইসলাম যে কাজের বিরোধী এবং যা হারাম তা হলো অপকর্ম ও দুর্নীতি, তা নারীর পক্ষ থেকেই হোক বা পুরুষের পক্ষ থেকেই হোক এতে কোন তফাৎ নেই। যে সমস্ত অশ্লীলতা ও বিপর্যয় নারীদের হুমকি প্রদর্শন করে থাকে তা থেকে আমরা এদের মুক্ত করতে চাই।

θ আমরা চাই নারী তার সুউচ্চ মানবিক মর্যাদায় আসীন থাকুন, পণ্য হিসেবে নয়।

θ ইসলাম চায় না যে, নারীরা পুরুষের হাতে পণ্য বা পুতুল হিসেবে থাকুক। ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রতিরক্ষা করতে ও তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় মানুষ হিসেবে পেতে চায়।

θ ইসলাম চেয়েছে নারী ও পুরুষ তাদের মানবিক পদমর্যাদা সংরক্ষণ করুক।

θ ইসলামী নারীর অবশ্যই হেজাব (পর্দা) থাকতে হবে। বরং যে কোন পোষাক তার পর্দার (হেজাব) কাজ চালাবে নারী সে পোষাকই পরিধান করতে পারে।

নারী দিবস

θ যদি কোন দিবসকে নারী দিবস হতে হয় তাহলে হযরত ফাতেমা তুজ্জোহরা (রাঃ)-র পবিত্র জন্ম বিদবসের চেয়ে আর কোন্ দিন উত্তম ও গৌরবোজ্জ্বল হতে পারে না।

θ মুসলিম আজিমুশ-শান জাতি, বিশেষ করে মহান নারীদের প্রতি নারী দিবসে মুবারকবাদু জানাই, যে দিবস হলো সেই জ্যোতির্ময় সম্মানিতা সৃষ্টির জন্ম দিবস যিনি সকল মানবিক গুণাবলী ও বিশ্বে আল্লাহ্'র খলিফার সুউচ্চ মূল্যবোধগুলোরই অবকাঠামো।

মায়ের মর্যাদা

www.pathagar.com

- মাতৃত্বের সম্মানের মত আর কোন সম্মানও মর্যাদা নেই।
- সমাজের প্রতি মায়ের যে সেবা তা শিক্ষকের সেবার চেয়েও বড়, বরং সকলের সেবার ঊর্ধ্বে।
- শিশুর প্রথম বিদ্যালয়ই হচেছ মাতৃকোল।
- শিক্ষকের সান্নিধ্যের চেয়ে মায়ের কোলেই শিশুরা উত্তম শিক্ষা লাভ করে থাকে।
- মায়ের কোলই হচেছ বৃহত্তম শিক্ষা নিকেতন যেখানে শিশু শিক্ষা-দীক্ষা পায়।
- উত্তম মাতা উত্তম সন্তান গড়ে তোলে।
- মায়েরা যদি পবিত্র গুণের অধিকারী মা হয়ে থাকেন তাহলে তদ্রুপ গুণ সন্তানদেরকেই উপহার দিতে পারে।
- খোদা না খাস্তা মা যদি বিপথগামী হয় তাহলে তার কোলেই সন্তান বিপথগামী হিসাবে বড় হবে।
- আপনারা নারীগণ মাতৃসম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এ সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে আপনারা পুরুষদের চেয়েও বড়।
- জাতি ঠিক হওয়াটা আপনাদের উপর নির্ভরশীল, মায়েদের প্রতি নির্ভরশীল ও ঋণী মানব জাতির ধ্বংস কিংবা গঠন উভয়ই আপনাদের ওপর নির্ভর করছে।
- সে সব মায়ের প্রতি আল্লাহ'র করুণা বর্ষিত হোক যারা তাদের বীর যুবকদের সত্য ও ন্যায় প্রতিরক্ষার রণাঙ্গনে পাঠিয়েছে এবং তাদের উচচ মর্তবাপূর্ণ শাহাদাত লাভের ফখর করেছে।
- যে জাতির সিংহী হৃদয় বোন ও মায়েরা তাদের বীর যুবকদের শহীদী কাফেলায় মৃত্যুবরণে ফখর করে সে জাতির বিজয় নিশ্চিত।
- ইসলামী সন্তানদের বীর মায়েরা সুদীর্ঘ ইতিহাসের নারীকুলের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের স্মৃতিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন।
- মূলতঃ মায়ের পবিত্র কোল ও বাবার পরশ থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়ে যায় এবং এদের ইসলামী ও সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার উপরই মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের ভিত্-রচিত হয়।

www.pathagar.com

ধনী ও দরিদ্র

θ আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত যাতে দুনিয়া থেকে প্রাসাদবাসীদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য দূর হয়।

θ বেশীর ভাগ নীতিবিগর্হিত চরিত্রই বিলাসী অভিজাত শ্রেণী থেকে জনগণের মাঝে ছড়িয়েছে।

θ প্রসাদবাসীসুলভ স্বভাব-চরিত্র সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা ও ধার্মিকতার বিরোধী এবং উদ্ভাবন-আবিষ্কার, রচনা ও শ্রমের বিরোধী।

θ আমরা যখন আমাদের নিজস্ব অতিতের দিকে তাকাই তখন বিস্মিত হই যে, সেবকরা এতো সমৃদ্ধ এবং আমাদের দর্শন এতো সমৃদ্ধশালী। আরো বিস্মিত হই যখন দেখি যে যারা ইসলামের ফেকাহকে এতো সমৃদ্ধ করেছেন এবং দর্শন-প্রজ্ঞাকে এতো সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন তারা প্রাসাদবাসী ছিলেন না, বরং বস্তিবাসী-দরিদ্র ছিলেন।

θ প্রাসাদবাসী অভিজাতদের ভেতর যে অশান্তি ও নড়বড়ে অবস্থা বিরাজ করে তা বস্তিবাসী দরিদ্রদের মোটেও নেই। এ বঞ্চিত শ্রেণীর মনে যে শান্তি তা ওই তথাকথিত উপর তলার লোকদের মোটেও নেই।

θ আমরা চৌদ্দশত বছরের আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ে এই প্রাসাদবাসীদের (অভিজাত শ্রেণী) হাতে অনেক মার খেয়েছি। এদের ভেতর কমই ছিলো যারা দরিদ্র শ্রেণীর। আর এই কমসংখ্যক বস্তিবাসীই বহু বিপথগামীকে প্রতিরোধ করেছে।

θ যেদিন আমাদের নেতৃবৃন্দ খোদা নাখাস্তা বস্তিসুলভ চরিত্র বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে যাবে এবং প্রাসাদ সুলভ আচরণের প্রতি মুখ ফেরাবে সেদিনই তার ও তার সাথে যোগাযোগকারীদের পতন ঘনিয়ে আসবে।

θ হায়! প্রাসাদবাসীরা যদি দুঃখ-অভাবীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতো! হয়তো বা এতে অত্যাচারী মার্কিনী ও ইউরোপীও সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধযজ্ঞে ইন্ধন যোগাতো না।

θ আপনারা বস্তিবাসী বীর যুবা শ্রেণী প্রাসাদবাসীদের উপর সম্মানের অধিকারী আর আপনারাই ইসলামকে হেফাজত করে আসছেন এবং করতে থাকবেন।

θ বস্তিবাসী ও শহীদ পরিবারবর্গের মাথার একটি চুলও দুনিয়ার সকল প্রাসাদ ও প্রাসাদবাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের অধিকারী।

θ এই বস্তিবাসীরা ও এই নগ্নপদ সর্বহারারাই আমাদের সকল নেয়ামতের মালিক।

www.pathagar.com

- যদি এই বঞ্চিত সর্বসাধারণ সমর্থন না করতো তাহলে বিশ্বে ইসলামী আদর্শের দ্রুত প্রসার ঘটত না।
- যদি এই বঞ্চিত জনতা, গ্রামবাসী ও দরিদ্র শ্রেণীর হিম্মত না থাকতো, চেষ্টা-প্রচেষ্টা না থাকতো তাহলে দাম্ভিব ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বাধাগ্রস্থ হতো না। আজ বস্তিবাসী মুসলিম মুজাহিদরা বুকে মাইন বেধে গোটা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের ট্যাংকের সামনে আত্মহুতি দিয়ে ওদের গতিরোধ করে দিতে পারতোনা।
- তারাই আমাদের সাথে রয়েছেন যারা দারিদ্র বঞ্চনা ও শোষণের তিক্ততা ভোগ করছে।

শ্রম ও শ্রমিক

- একটি জাতির জীবন শ্রম ও শ্রমিকের কাছে ঋণী।
- মানব সমাজের বিশাল চাকা শ্রমিকদের শক্তিশালী হাতেই ঘুরছে ও চালু রয়েছে।
- শ্রমিক দিবস পরাশক্তিবর্গের আধিপত্যকে কবর দেয়ার দিবস।

কৃষি

- মুসলিম জাতির কৃষিকে সমৃদ্ধশালী হতে হবে। শত্রুদের কাছে হাত খাদ্যের জন্য হাত পাতা বন্ধ করতে হবে।
- আপনারা কৃষকরা জাতির বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্বীয় কৃষিকাজ অব্যাহত রাখুন।
- আপনারা জানেন যে, এখন আমরা খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। আমাদের নিজেদের উচিত এ অভাবকে মেটানো। আর এটা আমাদের কৃষকদের হিম্মতের উপর নির্ভর করে।
- যে কোন দেশে শ্রমিক ও কৃষক ওই দেশের মূল ভিত্তি। কোন দেশের অর্থনীতির ভিত্তি শ্রমিক ও কৃষকের প্ররিশ্রমের উপর নির্ভরশীল।
- কৃষক ও শ্রমিকরা দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি।
- আমরা যে কৃষি সংস্কার চাই তাতে কৃষক তার পরিশ্রমের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে এবং যেসব মালিক ইসলামী আইন-কানুন বিরোধী কাজ করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে।
- কৃষকদের জিহাদ এটাই যে তারা তাদের কৃষিকে শক্তিশালী করবে।

www.pathagar.com

নেতাই খাদেম

θ আপনাদের নেতাকে খাদেম বলুন নেতা বলার চেয়ে উত্তম হবে; নেতৃত্বের কোন ব্যাপার নেই, খেদমতগুজারী হলো বড় কথা; ইসলাম আমাদের খেদমত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

θ ইসলামে নেতৃত্বের প্রশ্ন নেই, ভ্রাতৃত্বই বড় কথা।

θ মুসলিম জনগন পরস্পর ভাই ভাই নেতাকেও ভাইয়ের মতই আচরণ করতে হবে।

θ আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার তৌফিক কামনা করি। যেন খাদেম হিসাবে আল্লাহ্ আমাদের কবুল করেন।

θ আমি আপনাদের মত প্রিয়জনদের সাথে খেদমতের সম্পর্ক ঘোষণা করতে চাই। যতদিন হায়াত পাবো আমি সবারই খেদমতগুজারী করবো। ইসলামী জাতিগুলোর, বিশ্ববিদ্যালয় ও আলেম সমাজের, দেশের সকল শ্রেণীর, সকল ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর ও বিশ্বের সকল মজলুমদের আমি খাদেম হিসাবে কাজ করতে চাই।

θ আমি মহান আলেম সমাজ ও ইসলামী জাতির খাদেমদেরই একজন। বিপজ্জনক সময়েও ইসলামের মহাস্বার্থে আমি ক্ষুদ্রতম লোকদের সামনেও মাথানত করতে ও খাটো হতে পারবো, সেখানে মহান ওলামা, কেরাম ও পীর-মাশায়েখের সামনেতো কথাই ওঠে না। আল্লাহ তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

θ আমি সবার জন্যে দোয়া করি, আমি সমগ্র জাতির খাদেম। আমি আশা করি যে, আমার খেদমত পুরো করতে পারবো এবং এ খেদমত পুরো করে যাওয়ার সুযোগ পাবো।

θ এই খাদেম আপনাদের প্রত্যেকের হাত চুম্বন করছে ও আপনাদের প্রত্যেককে সম্মান দেখাচেছ, আপনাদের প্রত্যেককে স্বীয় নেতা বলে জানে এবং বারবার বলেছি যে আমি আপনাদের সাথে একাত্ম।

θ আমি আপনাদের মাহাত্ম্য হেফাজত করতে এসেছি এবং আমি এসেছি আপনাদের দুশমনের ধরাশায়ী করতে।

θ আমার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

- θ আমি একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ নিয়েই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর কখনো যদি সাহায্যের প্রয়োজন মনে করি তখন মুসলিম জাতিই আমাকে সাহায্য করবে।
- θ আমার কাছে বিশেষ কোন স্থানের প্রশ্ন নেই। আমার কাছে যা বড় তাহলো জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যেখানেই এ সংগ্রাম উত্তমরূপে সম্পন্ন হবে আমি সেখানেই থাকবো।
- θ আমার কাছে নির্দিষ্ট স্থান বড় কথা নয়, বরং খোদায়ী দায়-দায়িত্ব পালনই বড় কথা, ইসলাম ও মুসলমানদের সুমহান কল্যাণ সাধনই বড় কথা।
- θ আমি এখন নিজের হৃদপিন্ডকে শত্রুদের বেয়নেটের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি কিন্তু তবু জোর জবরদস্তি মেনে নেয়া ও অত্যাচারের সামনে মাথানত করার জন্য মোটেও রাজি নই।

ঈমান ও আনুগত্য

আনুগত্যের জন্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন- আগের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, আল্লার আনুগত্যের নামই হচেছ ইসলাম। এখন আমি বলবো যে, মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে না, যতোক্ষণ না সে কতগুলো বিশেষ জ্ঞান লাভ করে এবং সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌছে।

সবার আগে মানুষের প্রয়োজন খোদার অস্তিত্ব সংক্রান্ত পূর্ণ প্রত্যয় লাভ। কেননা খোদা আছেন, এ প্রত্যয় যদি তার না থাকলো, তা হলে কি করে সে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে।

এর সাথে সাথেই প্রয়োজন খোদার গুণরাজী সম্পর্কে জ্ঞান। খোদা এক এবং খোদায়ীতে তাঁর কোন শরীক নেই, এ কথাটাই যদি কোন ব্যক্তির জানা না থাকে, তা হলে অপরের কাছে মাথা নত করা ও হাত পাতার সম্ভাবনা থেকে সে ব্যক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে? খোদা সব কিছু দেখছেন, শুনছেন এবং সব কিছুরই খবর রাখছেন, এ সত্য যে ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারছে না, সে নিজেকে খোদার না-ফরমানী থেকে কি করে দূরে রাখবে? এ কথাগুলো নিয়ে যখন ধীরভাবে চিন্তা করা যায়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ

www.pathagar.com

খোদার গুণরাজি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারে যা সরল পথে চলবার জন্য অপরিহার্য। তাহলে সরল পথে চলা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। সেই জ্ঞানও কেবল জানার সীমানার মধ্যে গন্ডিবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না বরং তাকে প্রত্যয়ের সাথে মনের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল করে নিতে হবে, যেন মানুষের মন তার বিরোধী চিন্তা থেকে এবং তার জীবন তার জ্ঞানের প্রতিকূল কর্ম থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

এরপর মানুষকে আরো জানতে হবে, খোদার ইচছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি? কি কি কাজ খোদা পছন্দ করেন যা সে করবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস অপছন্দ করেন; যা থেকে সে দূরে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে খোদায়ী আইন ও বিধানের সাথে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করলে মানুষের মন তার বিরোধী চিন্তা থেকে এবং তার জীবন তার জ্ঞানের প্রতিকূল কর্ম থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

এরপর মানুষকে আরো জানতে হবে, খোদার ইচছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি? কি কি কাজ খোদা পছন্দ করেন যা সে করবে এবং কোন্ কোন জিনিস অপছন্দ করেন; যা থেকে সে দূরে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে খোদায়ী আইন ও বিধানের সাথে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা মানুষের অপরিহার্য। এ খোদায়ী আইন ও বিধান অনুসরণ করেই যে খোদার সন্তোষ লাভ করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে পূর্ণ প্রত্যয় পোষণ করতে হবে। কেননা গোড়া থেকেই এ জ্ঞান না থাকলে সে আনুগত্য করবে কার?

আর যদি জ্ঞান থাকে, অথচ পূর্ণ প্রত্যয় না থাকে- অথবা মনে এ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, এ আইন ও বিধান ছাড়া আরো কোন আইন ও বিধান নিভূল হতে পারে, তা হলে কি করে সঠিকভাবে সে তার অনুসরণ করতে পারে?

মানুষকে আরো জানতে হবে, খোদার ইচছার বিরোধী পথে চলার ও তার পছন্দ মতো বিধানের আনুগত্য না করার পরিমান কি? আর তাঁর হুকুম মেনে চলার পুরস্কারই বা কি? এ উদ্দেশ্যে তার আখেরাতের জীবনের, খোদার আদালতে হাজির হওয়ার, নাফরমানীর শাস্তি লাভের ও আনুগত্যের পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রত্যয় থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবন সম্পর্কে অবগত নয়, তার কাছে আনুগত্য ও নাফরমানী উভয়ই মনে হয় নিস্ফল। তার ধারণা, শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তি আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি তা

www.pathagar.com

করে না, উভয়ের অবস্থাই এক। কেননা দুজনই তারা মাটিতে মিশে যাবে, তা হলে কি করে তার কাছে প্রত্যাশা করা যাবে যে, সে আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা ও ক্লেশ বরদাশ্‌ত করতে রাজী হবে এবং যেসব গুণাহ্‌ থেকে এ দুনিয়ায় তার কোন ক্ষতির আশংকা নেই তা থেকে সে সংযত হয়ে থাকবে? এ ধরনের ধারণা পোষণ করে মানুষ কখনো খোদায়ী আইনের অনুগত হতে পারে না। তেমনি আখেরাতের জীবন ও খোদার আদালতে হাজির হওয়া সম্পর্কে যার জ্ঞান রয়েছে, অথচ প্রত্যয় নেই, এমন লোকের ক্ষেত্রে মজবুত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে মানুষ কোনো বিষয়ে দৃঢ় মত হতে পারে না। মানুষ কোন কোন কাজ ঠিক তখনই মন লাগিয়ে করতে পারে, যখন প্রত্যয় জন্মে যে, কাজটি কল্যাণকর। আবার অপর কোন কাজ তারা তখনই বর্জন করবার সংকল্প করতে পারে যখন কাজটি অনিষ্টকর বলে তাদের পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে। সুতরাং বোঝা যাচেছ যে, কোন বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের জন্য তার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে যেমন জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, তেমনি সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছা চাই।

ঈমানের পরিচয়- উপরের বর্ণনায় যে জিনিসকে আমরা জ্ঞান ও প্রত্যয় বলে বিশেষিত করেছি, তারই নাম হচেছ ঈমান। ঈমানের অর্থ হচেছ জানা এবং মেনে নেয়া। যে ব্যক্তি খোদার একত্ব তাঁর সত্যিকার গুণরাজি, তৎসম্পর্কে প্রত্যয় পোষণ করে, তাকে বলা হয় মুমিন এবং ঈমানের ফল হচেছ এই যে, তা মানুষকে মুসলিম অর্থাৎ খোদার অনুগত ও আজ্ঞাবহ করে তোলে।

ঈমানের এ পরিচয় থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, ঈমান ছাড়া কোন মানুষ মুসলিম হতে পারে না। বীজের সাথে গাছের যে সম্পর্ক ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। বীজ ছাড়া গাছের জন্মই হতে পারে না। অবশ্যি এমন হতে পারে যে, বীজ জমীনে বপন করা হল; কিন্তু জমীন খারাপ হওয়ার অথবা আবহাওয়া ভালো না হওয়ার কারণে গাছ দূর্বল বা বিকৃত হয়ে জন্মালো। তেমনি কোন ব্যক্তির যদি গোড়া থেকে ঈমানই না থাকলো, তার পক্ষে মুসলিম হওয়া কি করে সম্ভব হবে? অবশ্যি এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে, কোন ব্যক্তির দিলের মধ্যে ঈমান রয়েছে; কিন্তু তার আকাংখার দুর্বলতা, অথবা বিকৃত শিক্ষা দীক্ষা ও অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে পূর্ণ ও পাকা মুসলিম হতে পারলো না।

www.pathagar.com

ঈমান ও ইসলামের দিক দিয়ে বিচার করলে গোটা মানব সমাজকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ

একঃ যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে এবং তাদের ঈমান তাদেরকে খোদার আদেশ-নিষেধের পূর্ণ অনুগত করে দেয়। যেসব কাজ খোদা অপছন্দ করেন, তা থেকে তারা এমন করে দূরে থাকে, যেমন মানুষ আগুনের স্পর্শ থেকে দূরে থাকে। যা কিছু খোদা পছন্দ করেন তা তারা তেমনি উৎসাহের সাথে করে যায়, যেমন করে কোন মানুষ ধন দৌলত কামাই করবার জন্য উৎসাহ সহকারে কাজ করে যায়। এরাই হচেছ সত্যিকারের মুসলমান।

দুইঃ যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে; কিন্তু তাদের ঈমান এতটা শক্তিশালী নয় যে, তা তাদেরকে পুরোপুরি খোদার আজ্ঞাবহ করে তুলবে। তারা কিছুটা নিম্নতর পর্যায়ের লোক হলেও অবশ্যি মুসলমান। তারা নাফরমান হলেও অবশ্যি মুসলমান। তারা নাফরমানী করলে নিজস্ব অপরাধের মাত্রা হিসাবে শাস্তির যোগ্য হবে; কিন্তু তারা অপরাধী হলেও বিদ্রোহী নয়। কারণ তারা বাদশাহকে বাদশাহ বলে মানে এবং তার আইনকে আইন বলে স্বীকার করে।

তিনঃ যাদের ঈমান নেই, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা এমন সব কাজ করে, যা খোদায়ী আইন মোতাবেক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা বিদ্রোহী, এদের প্রকাশ্য সৎকর্ম প্রকৃতপক্ষে খোদার আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তীতা নয়, তাই তার উপর নির্ভর করা চলে না। তাদের তুলনা চলতে পারে সেই শ্রেণীর লোকের সাথে যারা বাদশাহকে বাদশাহ বলে মানে না, তার আইনকে আইন বলে গণ্য করে না। এ ধরনের লোকের কার্যকলাপ যদি আইন বিরোধী নাও হয় তথাপি তাদেরকে বাদশহর বিশ্বস্ত ও তার আইনের অনুসারী বলতে পারা যায় না। তারা অবশ্যি বিদ্রোহীদের মধ্যেই গণ্য হবে।

চারঃ যাদের ঈমান নেই এবং কর্মের দিক দিয়ে যারা দুর্জন ও দুস্কৃতিকারী। এরাই হচেছ নিকৃষ্টতম স্তরের লোক, কেননা এরা যেমন বিদ্রোহী, তেমনি বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টিকারী।

মানব জাতির এ শ্রেণী বিভাগ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাফল্য নির্ভর করে একমাত্র ঈমানের বীজ থেকে। যেখানে ঈমান নেই সেখানে

www.pathagar.com

ঈমানের স্থান অধিকার করে কুফর- খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তা তার তীব্রতা বেশী হোক আর কমই হোক।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে- আনুগত্যের জন্য ঈমানের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হল। এখন প্রশ্ন হচেছ, খোদার গুণরাজি ও তাঁর পছন্দ করা আইন ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান এবং যে জ্ঞানের ওপর প্রত্যয় পোষণ করা যায়, তা অর্জন করার মাধ্যম কি?

আগেই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির সকল দিক ছড়িয়ে রয়েছে আল্লার কারিগরীর নিদর্শন। সেসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচেছ যে, এ কারখানা একই কারিগরের সৃষ্টি এবং তিনিই তাকে চালিয়ে যাচেছন। এসব নিদর্শনের ভিতরে দৃষ্টিগোচর হচেছ আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণের দীপ্তি। তাঁর হিকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরত, তাঁর দয়া, তাঁর প্রভুত্ব, তাঁর ক্রোধ- এক কথায় তাঁর এমন কোন গুণ নেই, যা তাঁর কর্মের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হচেছ ও বুঝতে গিয়ে বারংবার ভুল করছে। এসব নিদর্শন চোখের সামনে মওজুদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ বলছে, খোদা দু'জন; কেউ বলছে খোদা তিনজন, কেউ অসংখ্য খোদা মানছে; কেউ কেউ আবার খোদায়ীকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছে। তারা বৃষ্টি, হাওয়া আর আগুনের জন্যে আলাদা আলাদা এবং ঐ সমস্ত খোদার আবার একজন সরদার খোদা আছেন বলছে। তাদের অস্তিত্ব ও গুণরাজি উপলব্ধি করতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি বহুবার ধোঁকা খেয়েছে। এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও মানুষ নানা রকম ভুল ধারণা করে বসে আছে। কেউ বলে মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবে, তারপর আর কোনো জীবন নেই। কেউ বলে মানুষ এ দুনিয়ায় বারবার জন্ম নিতে থাকবে এবং নিজের কাজকর্মের শাস্তি অথবা পুরস্কার পেতে থাকবে।

খোদার ইচছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য যে আইনের অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য তা নিজের বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করা আরো বেশী কঠিন।

যদি কোন মানুষ সঠিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং উচচ পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, তাহলেও বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা গবেষণার পর সে এসব বিষয় সম্পর্কে একটা বিশেষ সীমানা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কায়েম করতে পারে।

www.pathagar.com

এরূপ অবস্থায়ও সে পুরোপুরি সত্য উপলব্ধি করছে বলে তার মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে না। অবশ্যি মানুষকে কোন পথ নির্দেশ না দিয়ে ছেড়ে দিলে তাতে তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পুরোপুরি পরীক্ষা হতে পারতো। সেই ক্ষেত্রে যেসব লোক নিজ চেষ্টা ও যোগ্যতা দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পথে পৌঁছাতো তারাই হতো সফল; আর যারা পৌঁছাতো না, তারা হতো ব্যর্থ কাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি। তিনি তাঁর আপন মেহেরবানিতে মানুষেরই মধ্যে এমন মানুষ পয়দা করেছেন, যাদেরকে তিনি দিয়েছেন নিজের গুণরাজি সম্পর্কে নির্ভূল জ্ঞান। দুনিয়ায় মানুষ যাতে খোদার ইচছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে তার পদ্ধতিও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের কাছে এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে। এরাই হচেছন আল্লার পয়গাম্বর। তাঁদেরকে জ্ঞান দানের জন্য খোদা যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচেছ অহী এবং যে কিতাবে তাঁদেরকে এ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় আল্লার কিতাব ও আল্লার কালাম। এখন মানুষ এসব পয়গাম্বরের পবিত্র জীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং তাদের উচছাংগের শিক্ষা পর্যালোচনা করে তাঁদের প্রতি ঈমান আনে কিনা তাতেই হচেছ তার বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরীক্ষা। সত্যানুসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ যারা, সত্যের বাণী ও খাঁটি মানুষের শিক্ষা মেনে নিয়ে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে; আর না মানলে বুঝা যাবে যে সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করে তাকে মেনে নেবার যোগ্যতা তাদের মধ্যে নেই, এ অস্বীকৃতি তাদেরকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য করে দেবে এবং খোদার জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না।

ঈমান বিল গায়েব; কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে যদি কারো কোন জ্ঞান না থাকে, তখন সে কোন জ্ঞানী লোক নিজের চিকিৎসা নিজেই করে না, বরং ডাক্তারের কাছে চলে যায়। ডাক্তারের সনদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা থাকে, তাঁর হাতে বহুরোগী আরোগ্য লাভ করে এবং এমনি আরো বহু খবর জেনে সে ঈমান আনে যে, তার চিকিৎসার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন ডাক্তারের ভিতরে তা মওজুদ রয়েছে। তিনি যেসব ঔষধ যে ভাবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন, এ ঈমানের উপর নির্ভর করে সে তেমনি করে তা ব্যবহার করে এবং তার নির্দেশিত জিনিসগুলো সে বর্জন করে। এমনি করে আইন কানুনের ব্যাপারে একজন লোক ঈমান আনে উকিলের উপর এবং তারই আনুগত্য করে যায়।

www.pathagar.com

শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের উপর ঈমান এনে তাকেই মেনে চলে। কোথাও যাবার সময় রাস্তা জানা না থাকলে তখন কোন জানা-শোনা লোকের উপর ঈমান এনে তার দেখানো পথে চলতে হয়। মোট কথা, দুনিয়ার যে কোন কাজ মানুষ নিজের অবগতি ও জ্ঞানের জন্য কোন অভিজ্ঞ লোকের উপর ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করতে বাধ্য হয়। এরই নাম ঈমান বিল-গায়েব।

ঈমান বিল-গায়েব বলতে বুঝায়, যা কিছু মানুষের জানা নেই তা কোন জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মানুষ তার উপর প্রত্যয় পোষণ করবে। আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণরাজি সম্পর্কে মানুষ কিছুই অবগত নয়। তাঁর ফেরেশতারা তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ করে যাচেছন এবং সব দিক দিয়ে মানুষকে ঘিরে রয়েছেন, তাও কেউ জানে না। খোদার ইচছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার পন্থা কি তার খবরও কারো জানা নেই। আখেরাতের জীবনের সঠিক অবস্থা সকলেরই অজ্ঞাত। এর সব কিছুর জ্ঞান মানুষকে এমন এক লোকের কাছ থেকে হাসিল করতে হবে, যাঁর বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, খোদাভীতি, পাক-পবিত্র জীবন ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তার মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, তিনি যা বলেন তা নির্ভুল এবং তার সব কথাই প্রত্যয়ের যোগ্য। একেই বলে ঈমান বিল-গায়েব। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও তাঁর ইচছা অনুযায়ী কাজ করার জন্য ঈমান বিল-গায়েব অপরিহার্য, কেননা পয়গাম্বর ব্যতীত অপর কোন মাধ্যম দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব এবং সঠিক জ্ঞান ব্যতীত ইসলামের পথে সঠিকভাবে চলাও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ত্রিংশতি অধ্যায়

আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রম বিকাশ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমরা এই নিবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার ক্রম বিকাশের মৌলিক উপাদান সমূহ এবং এতদসংক্রান্ত কার্য্যকরনের সার সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

নির্দিষ্ট আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এর মৌলিক উপাদান সমূহ অনুপস্থিত বা অপূর্ণ রেখে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে কোন নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারই ক্রমবিকাশ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানতত্ত্বের এটাই চূড়ান্ত রায় যা অংক শাস্ত্রের অনুরূপ যেমন দুই আর দুই চার হয়, পাঁচ বা ছয় হতে পারে না।

কোন নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যায়ন করে অথবা নির্দিষ্ট আদর্শটি রপ্ত করে এবং তার বাস্তবায়ন এর ইতিহাস পড়ে নির্দিষ্ট কোথায় ও তার বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেই নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা যায় না। এর বাস্তবায়ন নির্দিষ্ট সীমারেখার অভ্যন্তরে সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী জনগনের মন মানসিকতা, সমাজের নৈতিক, মনস্তাত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কার্য্যক্রম পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করে তদানুযায়ী নির্ধারন করতে হয়। গোটা পৃথিবীতেও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ রাষ্ট্র বা বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব। কিন্তু নির্দিষ্ট আদর্শটি ঠিক রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী মানুষের মননশীলতার উপর ভিত্তি করে ভাষা, বর্ন নির্বিশেষে এটার প্রয়োগ পদ্ধতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়। আর এই নির্দিষ্ট আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োগ পদ্ধতি হয়ে থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ। চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যায়ন করে সনদপত্র পেয়ে থাকেন অনেকেই কিন্তু রোগীর দেহের নির্দিষ্ট রোগ সঠিকভাবে নির্নয় করতে ব্যর্থ হয়ে অনেক ডাক্তার রোগীর জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হন আবার অন্য চিকিৎসক সমমানের সনদপত্র নিয়ে রোগীর দেহের নির্দিষ্ট রোগ নির্নয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারায় সঠিক ঔষধ নির্ধারনের মাধ্যমে রোগীর দেহের নির্দিষ্ট রোগটি নিরাময় করে কৃতিত্ব অর্জন করে থাকেন।

www.pathagar.com

মানব দেহ এবং সমাজ দেহের রোগ নির্নয় এবং এটার নিরাময়ের জন্য দাওয়াই বা নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রয়োগে, নির্দিষ্ট অবস্থা বিশ্লেষণে ভুল হলে অবস্থা হয় তদানুরূপ যেমন রোগীর দেহের রোগ ডাক্তার কর্তৃক ভুল বিশ্লেষিত হয়ে যদি সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রে হয় কালাজ্বর আর ঔষধ তো অবশ্যই তদানুযায়ীই হয়ে থাকে আর ভুল ঔষধ সেবন করতে করতে অকালেই রোগীর যেমন প্রান নাশের সম্ভাবনা দেখা দেয় সমাজ বা রাষ্ট্র দেহের রোগ ভুল বিশ্লেষিত হয়ে যদি রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃক ভুল চিকিৎসা চলতে থাকে তা হলে রাষ্ট্রের অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক রোগীর অনুরূপ। আরও কথা থেকে যায়, রোগীর দেহের কোন নির্দিষ্ট রোগ যেমন সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যায় না রোগ এর লক্ষন মুহুর্তের জন্য ও নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থান করে না সর্বক্ষন এর পরিবর্তন অব্যাহত থাকে আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিও পুংখানুপুংখ ভাবে বিশ্লেষণ করে অবস্থানুযায়ী ঔষধ পরিবর্তন করতে হয় ঠিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানেও সর্বক্ষন অবস্থার পরিবর্তন অব্যাহত থাকে আর পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ বা তত্ত্বের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর তা করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনিবার্য কারনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য।

কোন নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু উপায় উপাদান বিশেষ ভাবে বর্তমান থাকা চাই। যেমন সর্ব প্রধান শর্ত হল নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য যিনি নেতৃত্ব দিবেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক দিক এর উপরে উক্ত নির্দিষ্ট আদর্শের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন। নির্দিষ্ট আদর্শের নেতাকে মনে হবে নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতিবিম্ব। নির্দিষ্ট আদর্শের পুস্তক যদি অনুপস্থিত থাকে তা হলে নেতাকে উপস্থিত রেখেই সকল কাজ সমাধা করার মত অবস্থা নেতার জীবনে বর্তমান থাকা চাই। নেতার জীবনের সম্পূর্ণ দিকই খুটে খুটে দেখলে মনে হবে নেতাই নির্দিষ্ট দর্শন যা বাস্তবায়নের জন্য পুস্তকের আর প্রয়োজন নাই। এমন নেতার নেতৃত্বে যে কর্মিবাহিনী গঠিত হয় তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কারণেই উক্ত আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে থাকে। আর এই কর্মীবাহিনী যখন বিভিন্ন প্রক্রিয়া আর পরীক্ষা নিরীক্ষার চড়াই উত্তরাই পার হয়ে বাস্তব কর্মকান্ডের ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট আদর্শের মূর্ত প্রতীক হতে পারে তখন জনমনে তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়, তারা কি করতে চাচেছ। ঠিক তখনই উক্ত কর্মীবাহিনী তাদের অভিষ্ট লক্ষে পৌছাবার গতি পায়।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে জনগন যে সব রীতি নীতি আচার ব্যবহার সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অভ্যস্ত থাকে, নির্দিষ্ট "আদর্শ" যা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকে উক্ত আদর্শের আলোকে জনগনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন নির্দিষ্ট আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য্য। আর এই অপরিহার্য্য প্রয়োজন পূরণের জন্য তীব্র ইচছা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রাখলে নির্দিষ্ট আদর্শ কর্মীবাহিনী এক পর্যায় গিয়ে যখন অভিষ্ঠ লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনিত হতে পারে। ততো দিনে এক দিকে সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী হয়, অপর দিকে কর্মীবাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিকলতার ভীতর দিয়ে নির্দিষ্ট আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিক্ষা নিরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে যায়। এই দ্বিবিধ উপাদান যখন একটি নির্দিষ্ট সিমানায় এসে যায়। যেমন সমাজের জনগনের একটি "বিশেষ অংশ" যা নির্দিষ্ট আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নে অপরিহার্য। নির্দিষ্ট আদর্শের নিখূঁত অনুসারী হয়ে নিজেদের চরিত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং পাশাপাশি কর্মীবাহিনী ও সুশিক্ষিত ও মজবুত হয়ে প্রতিকুল রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিরোধ করার মত শক্তি অর্জন করে ঠিক তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনিবার্য কারণে জন্ম লাভ করতে পারে একটি আদর্শ রাষ্ট্র। উক্ত আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করার পর তা টিকিয়ে রাখা এবং তার বিকাশ লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করার প্রয়োজন তাহল কর্মীবাহিনীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষন দিয়ে পূর্বেই প্রস্তুত রাখা। যা আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য্য। আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের সাথে সাথেই বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যা না হলে প্রতিকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। যা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মীবাহিনী ছাড়া মোকাবেলা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উপরোল্লিখিত সকল উপায় উপাদান সমূহ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান থাকলেই বিশেষ রাষ্ট্রটি রাতারাতি তার নির্দিষ্ট আদর্শের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারে না। যতদিন না উক্ত রাষ্ট্রের জনগন তাদের বংশগতি বা কুল সংক্রমন অতিক্রম করে নির্দিষ্ট আদর্শে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক দিগের নিখুঁত পরিবর্তন সাধন করতে পারে। ততদিন

www.pathagar.com

অভিষ্ট লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হতে পারে না। বংশগতি বা কুল সংক্রমন যা পুরুষাক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন গুনাবলী। যা এমন মজ্জাগত সহজাত প্রবনতার আকার ধারন করে যার বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য তেমনি বংশানুক্রমিকভাবে এর বিভিন্ন ক্রটি বিচ্যুতির কারণ উদঘাটন করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা এবং চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রাখলে ধীরে ধীরে এর আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে এক পর্যায়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আদর্শ বা কল্যান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়া সম্ভব। এজন্য বড় বড় বক্তৃতা দিলে কাজ হয় না। এজন্য প্রয়োজন কিছু বিশেষ মাধ্যমে চেষ্টা সাধনা বা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, যেমন জাতীয় প্রচারের যতগুলি মাধ্যম থাকে, যেমন আধুনিক যুগে টি,ভি, রেডিও, চলচিচত্র, পত্র পত্রিকা, নাটক, উপন্যাস সহ সকল মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রক করে গতানুগতিক সকল সংস্কৃতি এবং সভ্যতার অপপ্রচারের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র নির্দিষ্ট আদর্শের সফল প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করতঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করে নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। এমনি ভাবে নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতি পুংখ্যানুপুংখ্যভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুশীলনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। তা হলে ধীরে ধীরে ইপ্সিত আদর্শ বা কল্যান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিখুঁত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আর ততদিন পর্যন্ত ঐ নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে ভালমন্দ, সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনিবার্য্য কারণে অব্যাহত থাকতে বাধ্য। একটি কল্যান রাষ্ট্রের ক্রম বিকাশ এত সুকঠিন যা তড়িঘড়ি করে আদৌ সম্ভব নয়, যেমন ধানের কলে ধান তুলে দিলেই চাল বের হতে শুরু করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়ক তাদের নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটিকে তাদের অভিষ্ট লক্ষে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে, তার আভ্যন্তরীন কারণ উদঘাটন করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আলোচিত নিবন্ধের কল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপনের উপাদান ও শর্ত সমূহের কোন না কোনটি অনুপস্থিত ছিল। যার অনিবার্য্য কারনে রাষ্ট্র নায়ক হয় বন্দি হয়ে অথবা প্রাণ দিয়ে নয়তো লাঞ্চিত হয়ে ভুলের বা অজ্ঞতার খেসারত দিয়েছেন। কারণ একটি বিমানের পরিচালক যদি বিমানের সকল অংশের সংযোগ ঠিক না করে বিমানটি আকাশে উত্তলনের চেষ্টা করেন বা উত্তলন করেন তাহলে পথিমধ্যে বৈমানিকের

www.pathagar.com

জীবনে যে কোন বিপদই আসতে পারে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বিমানের যাত্রীদের দুর্দশার কথা না বললেও কারো বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। বিমানটি আকাশে উত্তলোনের পূর্বে বৈমানিকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল বিমানটির কোন অংশের কি অবস্থা বর্তমান রয়েছে তা ভালভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা। যদি কোন ক্রুটি থেকে থাকে তা হলে উক্ত ক্রুটি সম্পূর্ণ মুক্ত করা। এর পর আবারও ভালভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা যে বিমানটি এখন আকাশে উত্তলোনের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে কিনা। যদি উপযোগী হয়ে থাকে তা হলে আকাশে উত্তলোন করা নতুবা যাত্রায় আপাততঃ ক্ষান্ত দেয়া। পরবর্তিতে সকল উপায় উপাদান ঠিক করে উপযোগী করতে পারলে আকাশে উত্তলন করা যেতে পারে। কিন্তু এ সকল দায়িত্ব কর্তব্য সঠিক ভাবে সম্পাদন না করে নিজে এবং যাত্রীদের জীবনে বিপদ ডেকে আনার পরে বৈমানিক যদি অন্য কারো দোষ দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে কাউকেও ক্ষনিকের জন্য ভুল বুঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অযৌক্তিক বিষয়টি বোঝানো সম্ভব নয়।

অনেক সময় রাষ্ট্র নায়কদের দেখা যায় অবাধ গনতান্ত্রিক অথবা জগাখিচুড়ি পরিবেশের ভিতরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরহন করে সমাজতন্ত্রের অথবা ইসলাম তন্ত্রের সাইনবোর্ড মদের দোকানে মধুসুদনের সাইন বোর্ডের মত লটকিয়ে দিয়ে রাতারাতি প্রগতিশীল বনে যান। প্রাথমিক অবস্থায় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের এত সহজ উপায় আর দ্বিতীয়টি নেই সত্য কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় যে, জনপ্রিয়তা নষ্ট করার এটিই একমাত্র পথ, তাতে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আর এই জোড়াতালি দেওয়া পথে সস্তাজনপ্রিয়তা অর্জন রাষ্ট্র নায়কদের জীবনের ঝুকির কারণগুলির অন্যতম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন সার্কাস পার্টির খেলোয়াড যদি সুন্দরবন হতে সদ্য বাঘ ধরে এনে পোষ না মানিয়ে তার মুখে আহার তুলে দিয়ে দর্শকের বাহবা কুড়াতে চেষ্টা করেন সেই খেলোয়াড়ের যে দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয় উক্ত জগা খিচুড়ি পরিবেশের মধ্যে ক্ষমতায় আরোহন করে সমাজতন্ত্র বা ইসলাম তন্ত্রের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাষ্ট্র নায়কের দশা যে যুক্তিযুক্ত কারণে তাই হবে এতে আশ্চর্য্যের কি আছে বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুবার ঘটেছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র নায়করা

www.pathagar.com

আবার জনগনের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিতে চান সমাজতন্ত্র বা ইসলামতন্ত্রের স্বাধ। এটা ঐ ধরনের অজ্ঞতা প্রসুত ব্যাপার যেমন আখ মাড়াই করা কলে সরিষা মাড়াই করে তেল পাওয়ার আশা করা।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রয়োগে ভাবাবেগ এর বিন্দুমাত্র স্থান নাই। যেমন ভাবাবেগের স্থান নাই রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তারের। ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে যারা জনগনের এই বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব বহন করেন। তারা হয়তো বলতে পারেন ছাত্র কি আমি খারাপ ছিলাম? সার্টিফিকেট কি আমি কম পেয়েছি? এই দেখুন বিভিন্ন দেশ হতে ও দুই চারখানা সনদপত্র জোগাড় করেছি। যোগ্যতা কি আমার কম? সেই সকল সার্টিফিকেট ধারী রাষ্ট্র নায়কদের জন্য একটি তুলনাই যথেষ্ট হবে যেমন সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ ব্যারিষ্টারকে যদি ক্যানসারের রোগ চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়, তার রোগী চিকিৎসায় যেমন সফলতা আসবে ঠিক ঐ সার্টিফিকেট ধারী রাষ্ট্র নায়কের সফলতাও তদরূপ আসবে। যুক্তিযুক্ত কারণে ভিন্ন ফল আশা করা যায় না। বর্তমান বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জনগন এবং রাষ্ট্রনায়কদের অবস্থা আলোচিত নিবন্ধের প্রায় অনুরূপ। কতদিনে এই দূরাবস্থার অবসান ঘটবে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শাসক হয়ে একটি সুস্থ সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবেশ গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তা একমাত্র অনাগত ভবিষ্যতই বলে দিতে পারে। তাই রাষ্ট্র নায়ককে অবশ্যই নেতৃত্বের গুণাবলিতে মহিমান্বিত হতে হবে। সাথে সাথে যে আদর্শ তিনি বাস্তবায়ন করতে চান সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকতে হবে এবং নেতার জীবনে উক্ত আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এসব উপায় উপাদান বর্তমান থাকা এবং নেতৃত্বের গুণাবলিতে মহিমান্বিত নেতার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হলে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করতে পারেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে অসহায় বিশ্ববাসীর প্রাণের দাবীর আদর্শ বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামী বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী-শিশু, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ক্রন্দন রোল বন্ধ হতে পারে। এতে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইতে পারে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন, আমাদের কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ১৭৯, ১৮২-১৮৩।
২. অধিকারদর্শন ৩৩২-৩৩৩।
৩. অধিবিদ্যা ২৩১-২৩২।
৪. অমরত্ব ১০৯-১১১, ১৪১-১৪২, ১৭১-১৭২।
৫. অনহং ২৮৬-২৮৭।
৬. অহং ২৮৬-২৮৭।
৭. অশুভের সমস্যা ১২২, ৩০৫-৩০৬।
৮. অস্টিন, জে.এল. ৩৫৩।
৯. অস্তিত্ববাদ ৩৫১।
১০. আত্মজ্ঞান ২৮৯-২৯১।
১১. আত্মসত্তা ৭৪-৭৬, ১৭০-১৭১।
১২. আত্মা ২৪৮-২৫০।
১৩. আধুনিক দর্শন ৬-৯।
১৪. অর্নষ্ট ম্যাক ৩৫২।
১৫. আবেগ ১০৪-১০৫।
১৬. আরোহ পদ্ধতি ৫৭।
১৭. আলেকজান্ডার অব এফ্রোডিসিয়াস ১৩।
১৮. আলেকজান্ডার, স্যামুয়েল ৩৪৯।
১৯. ইচছার স্বাধীনতা ১৪০।
২০. ইটালিয় প্রকৃতিবাদ ১৮-১৯।
২১. ইতিহাস দর্শন ৩৩৩-৩৩৬।
২২. ইন্দ্রিয়জ ও ধারণা ১৬০-১৬২।
২৩. ঈশ্বর ৭৬-৭৭, ৯৩-৯৭, ১০০, ১৩৯-১৪০, ১৫১-১৫৩, ১৭২-১৭৪, ২৫৩-২৫৬।
২৪. কেপলার ৪৮।
২৫. কোপারনিকাস ৪৬-৪৭।
২৬. কোঁদিলাক ২০১-২০২।
২৭. ক্যাবানিস ২০৬-২০৭।
২৮. ক্যাম্পানেল্লা ২২-২৩।
২৯. ক্যারুস ৩০৮।
৩০. ক্যালবিন, জন ২৯-৩০।
৩১. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ৮৪।

www.pathagar.com

৩২. ক্লার্ক, স্যামুয়েল ১৮৮।
৩৩. আবদুল্লাহ আল-মুতী ঃ ১৯৯৭ঃ মহাকাশে কি ঘটেছে। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
৩৪. দ্বিজেন শর্মা ঃ ১৯৯৪ ঃ চার্লস্ ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
৩৫. মোহাম্মদ আবুল কালাম ঃ ১৯৮৫ ঃ অভিব্যক্তি বিজ্ঞান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩৬. Abel. George O. 1975. Realm of the Universe. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sydney.
৩৭. Alexeev, V.P. 1986. The Origin of the Human Race. Progress Publ., Moscow.
৩৮. Andrews, Peter. and Chris Stringēr. 1989. Human Evolution- an Illustrated Guide. British Museum (Nat. Hist.), U.K.
৩৯. Anfinsen, Christian B. 1963. The Molecular Basis of Evolution. John Wiley & Sons, Inc., New York.
৪০. Asimov, Isaac. 1982. Exploring the Earth and the Cosmos. Penguin Books.
৪১. Asimov, Isaac. 1984. Asimov's New Guide to Science. Penguin Books, 27 Rights Lane, London, 8 5TZ, U.K.
৪২. Asimov, Isaac. 1992. The Secrets of the Universe. Oxford Univ. Press, Walton Street, Oxford, OX2 60P, U.K.
৪৩. Boslough, John. 1989. Beyond the Black Hole- Stephen Hawking's Universe. Fontana/Collins.
৪৪. Bowler, Peter J. Evolution : The History of an Idea. University of California Press. Berkley, Lon Angeles, London.
৪৫. Brookfield, A.P. 1986. Modern Aspects of Evolution. Hutchinsons.
৪৬. Corliss Lamon : The Philocophy of Humanision.
৪৭. আরজ আলী মাতুব্বর ঃ সত্যের সন্ধান।
৪৮. কুরআন মজীদ (কিতাবুল্লাহ)।
৪৯. সহীহ্ বুখারী, ইমাম বুখারী (র)।

www.pathagar.com

৫০. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম (র)।
৫১. সুনানে আবু দাঊদ।
৫২. সুনানে তিরমিযী।
৫৩. সুনানে ইবনে মাজাহ।
৫৪. সুনানে নাসাঈ।
৫৫. তাবারানী।
৫৬. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াহ, ইবনে কাসীর, মাতুবাআতুস আদাবিয়াহ, মিসর, ১৩৩২ হিজরী।
৫৭. আল-জাওহারাতুল মুনীফা ফী শারহি ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবু হানাফী (র), মোল্লা হোসাইন, দায়েরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩২১ হিজরী।
৫৮. আদ্‌দারারুল কামিনা, ইবনে হাজার আসকালানী, দায়েরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৮ হিজরী।
৫৯. আররিয়াযুন নাযেরাহ ফী মানাকিবিল আশারাহ, মুহিব্বুদ্দীন আত তাবারী, মাতবাআতু হুসাইনিয়া, মিসর, ১৩২৭ হিজরী।
৬০. আস-সিয়ার, ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী।
৬১. আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে হিশাম, মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী, মিসর, ১৯৩৬।
৬২. আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, দায়েরাতুল মাআরিফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৫ হিজরী।
৬৩. আসসাওয়ায়েকুল মুহ্‌রিকাহ, ইবনে হাজার আল হায়সামী (১৫০৪-১৫৬৭ ঈসায়ী)।
৬৪. আল-ইকদুল ফরীদ, ইবনে আবদু রাব্বিহী, লাজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজামাহ, কায়রো, ১৯৪০ হিজরী।
৬৫. আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী।
৬৬. আল-গোফরান, আবুল আলা আল মাআররী, দারুল মাআরি, মিসর, ১৯৫০ ঈসায়ী।
৬৭. আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহ্‌ওয়া ওয়ান নিহাল, ইবনে হায্‌ম, আল-মাতবাআতুল আদাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩১৭ হিজরী।
৬৮. আল-ফারকু বাইনাল ফিরাকি, আবদুল কাহের বাগদাদী, মাতবাআতুল মাআরিফ, মিসর।
৬৯. আল-ফিক্‌হুল আওসাত, আস-সালাফী।
৭০. আল-ফিকহুল আকবর, ইমাম আবু হানীফা (র)।
৭১. আল-ফিহ্‌রিস্ত, ইবনে নাদীম, মাতবাআতুর রাহমানিয়া, মিসর, ১৩৪৮ হিজরী।
৭২. আল-কাশ্‌শাফ, যামাখশারী, আল-মাতবাআতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১৩৪৩।

www.pathagar.com